গ্রন্থাগার

৭ম বর্ষ ॥ বৈশাখ : ১৩৬৪ ॥ ১ম সংখ্যা

: সূচী :

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার

৭ম খণ্ড ॥ ১৩৬৪

সম্পাদক

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ কলিকাতা-১২

গ্রন্থাগার

৭ম খণ্ড :: ১৩৬৪

নির্ঘণ্ট

প্রবন্ধ

লেখকের নামানুসারে বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত

সাধারণ সংবাদ

মেদিনীপুর

হাওড়া

হুগলী

অন্যান্য রাজ্যের খবর

অন্যান্য দেশের খবর

পরিষদ কথা

বিবিধ বার্তা

গ্রন্থাগার

৭ম বর্ষ] বৈশাখ : ১৩৬৪ [১ম সংখ্যা

একাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

মুখবন্ধ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের একাদশ অধিবেশনের স্থান নির্বাচন করিতে এ বৎসর নানা অনিবার্য কারণেই বিলম্ব ঘটে। অবশ্য সম্মেলনের তারিখ বহু পূর্বেই 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় ঘোষিত হইয়াছিল।

গত ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ও পুরুলিয়ার হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের আমন্ত্রণে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের একাদশ অধিবেশন সম্মেলনের প্রারম্ভে উদ্‌ঘাটিত সাহিত্য মন্দির সংলগ্ন জগদীশচন্দ্র মুখার্জী হলে অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন।

বঙ্গভুক্তির অব্যবহিত পরেই এবৎসর পুরুলিয়ায় সম্মেলনের উদ্যোগ আয়োজন সকলের মনে বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার করে। বিপুল উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয় পুরুলিয়ার সমাজসেবী ও গ্রন্থাগার-অনুরাগীগণের মধ্যে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন বর্তমানে এক বিরাট পরিবর্তনের সম্মুখীন। সর্বাত্মক গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় রাজ্য-সরকার উদ্যোগী হইয়াছেন। রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য সর্বাগ্রেই প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ অনুযায়ী সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রণয়ন। সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি এ বৎসরের অধিবেশনের আলোচ্য মূল-প্রবন্ধের বিষয় নির্বাচন করেন। 'গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপন পরিকল্পনা' শীর্ষক আলোচ্য মূল-প্রবন্ধটি সম্মেলনের পূর্বে প্রকাশিত 'গ্রন্থাগারের' চৈত্র সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। গত সম্মেলনের ন্যায় এবারও প্রতিনিধিগণ একাধিক দলে বিভক্ত হইয়া আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন; চূড়ান্ত

সুপারিশ ও প্রস্তাবগুলি সমাপ্তি অধিবেশনে গৃহীত হয়। পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবারও অনাড়ম্বর পরিবেশে নিত্য সমস্যা ও আশু প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা প্রাধান্য লাভ করে। বিভিন্ন স্থান হইতে সমবেত প্রতিনিধিগণের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-পরিচয় ও চিন্তার আদান-প্রদান এবং পুরুলিয়ার কর্মীগণের সহিত মেলামেশা জনিত অন্তরঙ্গ পরিবেশ সবিশেষ হৃদয়স্পর্শী হয়।

সম্মেলনের অনুষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনায় স্বাভাবিক কারণেই ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিয়া যায়। ট্রেণের সুদীর্ঘ বিলম্বের জন্য কার্য্যসূচীর পরিবর্তন সকলেরই আয়ত্বের অতীত হইয়া পড়ে। আনুষ্ঠানিক ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদেরই—সেজন্য আমরা সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। দীর্ঘ পথশ্রম ও রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি ও পরিশ্রান্তি উপেক্ষা করিয়া প্রতিনিধিগণ সীমিত ও স্বল্প সময়ে নিষ্ঠা সহকারে পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। সম্মেলনের সাফল্য তাঁহাদের আন্তরিক সহযোগিতা, ক্লেশ স্বীকার ও একনিষ্ঠ উদ্যমের ফলেই সম্ভব হইয়াছে। সম্মেলন তাঁহাদের একান্তই নিজস্ব। সেজন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা নিতান্তই বাহুল্যমাত্র।

অত্যন্ত অল্প সময়ে সম্মেলনের ব্যবস্থাপনায় চমকপ্রদ কৃতিত্ব দেখাইয়া সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন অভ্যর্থনা সমিতির কর্মীগণ। তাঁহাদের সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা ও আন্তরিক আতিথেয়তা সকলকে বিশেষরূপে অভিভূত করিয়াছে। ক্লান্তিহীন কর্মনিষ্ঠ তরুণ স্বেচ্ছাসেবকগণের নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম ও পুরুলিয়ার নাগরিকগণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা সম্মেলনের ব্যবস্থাপনাকে যথাসম্ভব ত্রুটিহীন করিয়া তোলে। পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা ও বিভিন্ন জেলার সংবাদপত্রগুলির নিকট হইতে যে সহযোগিতা আমরা পাইয়াছি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির নিকট হইতে সম্মেলনের কাজে যে সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করিয়াছি তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

ফণিভূষণ রায়
কর্মসচীব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

জগদীশচন্দ্র মুখার্জী হলের দ্বারোদঘাটন

১৯শে এপ্রিল শুক্রবার সায়াহ্নে সম্মেলনের উদ্বোধন অধিবেশনের পূর্বে হরিপদ সাহিত্য মন্দির সংলগ্ন নবনির্মিত জগদীশচন্দ্র মুখার্জী হলের আনুষ্ঠানিক

দ্বারোদ্ঘাটন করেন সম্মেলনের মূল সভাপতি শ্রী বি, এস, কেশবন। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীঅশোক চৌধুরী প্রথমে 'হল' নির্মাণের ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে পুরুলিয়ার স্বনামধন্য আইনজীবি শ্রীজগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অর্থ সাহায্যের উল্লেখ করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

সুধীবৃন্দ

খর বৈশাখের প্রচণ্ড দাবদাহে অপ্রকৃতিস্থ প্রকৃতির রুদ্র তাণ্ডব উপেক্ষা করিয়া জ্ঞানের অনির্ব্বাণ দীপশলাকা হস্তে বাংলার বিভিন্ন অংশ হইতে আপনারা উষর ও কঙ্করময় মানভূমের বুকে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন—আপনাদের এই প্রীতি ও শুভেচ্ছা কৃতজ্ঞ অন্তঃকরণে স্বীকার করিয়া আপনাদের আমরা আন্তরিক অভিনন্দন এবং সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতেছি। প্রায় দীর্ঘ অর্দ্ধ-শতাব্দি পরে বাংলার বক্ষপঞ্জর হইতে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের কেবল ভগ্নাংশ মাত্র ততোধিক ভগ্ন বাংলার বুকে আবার ফিরিয়া আসিল—আনন্দ ও বেদনার এই মিলন আগামী দিনের উজ্জলতর ভবিষ্যতের আশা ও আনন্দে মধুময় হইয়া উঠুক ইহাই প্রার্থনা করি।

দামোদর ও সুবর্ণরেখা বেষ্টিত এবং কংশাবতী বিধৌত মানভূমের অরণ্য ও পর্ব্বতসঙ্কুল প্রকৃতি এবং রুক্ষ কর্কশ ভূমির অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় রসের অফুরন্ত ধারা সদা প্রবাহমান। জীবনের প্রতি ছন্দ হইতে মধু আহরণ করিয়া রূপ ও রসের পরিবেশণে কার্পণ্য সে করে না—তাই সুজলা সুফলা বাংলার মতই মানভূমেও বারমাসে তের-পার্ব্বণের মাধ্যমে স্বীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াই বাংলার সংস্কৃতির সহিত নিবিড় ঐক্যের ধারা বহন করিয়া চলিয়াছে। বাংলার বাউল গানের মতই মানভূমেও বাউল গানের অভাব নাই—বাংলার কীর্ত্তনের মতই মানভূমের গ্রামে গ্রামে কীর্ত্তনের ধুম পড়ে। কিন্তু সেই সঙ্গে কীর্ত্তনের আদি রূপ ঝুমুরকে মানভূম ভোলে নাই, তাহাকে সজীব ও প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। মানভূমের কথ্য বাংলার মধ্যে প্রাচীন বাংলা শব্দের যথেষ্ট প্রাচুর্য্য রহিয়াছে। চর্যাপদের পরবর্ত্তী কালের বাংলা শব্দের যে রূপ মানভূমের কথ্য ভাষার মধ্যে সেই প্রাচীন শব্দ এখনও ব্যবহৃত হয়। মানভূমের প্রাচীন বাংলা পুঁথিগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া, পুরাতত্ত্বের নিদর্শনগুলির অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও বিচার বিশ্লেষণ করিলে হয়ত অনেক লুপ্ত বিষয়ের উপর আলোকপাত হইবে।

ছোটনাগপুর তথা প্রাচীন ঝাড়খণ্ডের অরণ্যাকুল অঞ্চলও বাংলার সংস্কৃতির

দ্বারা প্রভাবিত হয়। চৈতন্যদেব এই অরণ্য সঙ্কুল অঞ্চল পথকে অতিক্রম করিয়া উড়িষ্যা যাত্রা করেন এবং তাহার প্রায় এক শতাব্দী পরে নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রমুখ উত্তরসাধকেরা ঝাড়খণ্ড অতিক্রম করিয়া বন-বিষ্ণুপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। এইভাবে ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম্ম ছোটনাগপুরের আদিম আরণ্যক ধর্ম্মের সংস্কার সাধন করিয়া আসিয়াছে এবং গত তিন শতাব্দী ধরিয়া বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি ঝাড়খণ্ডে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। সাঁওতাল, ভূমিজ, খেড়িয়া প্রভৃতি আদিম আরাণ্য জাতিরা এখন বাঙ্গালীদের মতই কালীপূজা করে এবং সাঁওতাল পরগণা, রাঁচী, মানভূম, পঞ্চ পরগণা প্রভৃতির আদিম জাতিরাও বাঙ্গালীদের ন্যায় দুর্গাপূজা করে। বাংলার সংস্কৃতির যোগেই ছোটনাগপুরের আদিম জাতিসমূহের বিবিধ সংস্কার ও উন্নতি সাধন হইয়াছে। একদিকে বাংলার শাক্ত মতের প্রভাবে মানভূম, সিংভূম প্রভৃতি অঞ্চলের রঙ্কাকালী আরণ্যক জাতিসমূহের নিকট হাঁস ও মুরগী বলি এবং পচাই-এর নৈবেদ্য পাইতেছে—অন্যদিকে বাংলার বৈষ্ণব ধারায় প্রভাবান্বিত হইয়া ময়ূরভঞ্জ, মানভূম সিংভূম ও ছোটনাগপুরের গিরি-প্রান্তরে হরিসভা ও সংকীর্ত্তন কত কোল ও দ্রাবিড় জাতিকে তাহাদের জীবনধারার সংস্কার সাধন করিয়া হিন্দুধর্ম্মে স্থান দান করিয়াছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানভূম বাংলার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। সুতরাং মানভূমের ইতিহাস বাংলার ইতিহাসেরই এক অধ্যায় মাত্র। গুপ্ত, পাল ও সেন বংশের আমল হইতে মুঘল বা বৃটিশ আমলের ইতিহাস আলোচনা করিলে মানভূম যে বাংলারই অন্যতম ভূভাগ তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।

গুপ্তযুগে বাংলাদেশ দণ্ডভুক্তি, বর্দ্ধমানভুক্তি প্রভৃতি যে সকল ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল - মানভূম সেই বর্দ্ধমান ভুক্তিরই অন্তর্গত ছিল। সমগ্র দামোদর উপত্যকাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই বর্দ্ধমানভুক্তি উত্তরে ময়ূরাক্ষী এবং দক্ষিণে সুবর্ণরেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ইহার পর পাল বংশের আমলে বাংলার অশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এই সময়ে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রসার ও প্রভাব ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম্ম তান্ত্রিকতায় রূপান্তরিত হইলে বাংলার সমাজ জীবনে এক বিপর্যয় দেখা দেয়। বাংলার সমাজে এই ভাঙ্গন ও দুর্নীতির প্রতিক্রিয়ায় সেন বংশের আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটে। মানভূমের ক্ষেত্রেও আমরা সেই একই চিত্র দেখিতে পাই। বাংলা দেশের মতই মানভূমেও ব্রাহ্মণ্য যুগের পুনঃভ্যুত্থানের

ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের আবরণে আত্মগোপন করে। ফলে বৌদ্ধ বা জৈন মন্দির অথবা মূর্ত্তি হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি তথা মন্দিরে—বিশেষ করিয়া শিবমন্দিরে—রূপান্তরিত হয়।

পাল বংশের সময় বাংলা দেশ বরেন্দ্রী, বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ়, প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। জৈন শাস্ত্র আচারঙ্গ সূত্রেও আমরা রাঢ় দেশের উল্লেখ পাই এবং স্বয়ং মহাবীর ও অন্যান্য জৈন তীর্থঙ্করেরা রাঢ় দেশের বজ্রভূমিতে ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে আসিয়া বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হন। রাঢ় দেশ তখন বজ্রভূমি ও সুহ্ম ভূমিতে বিভক্ত করা হইয়াছিল। মানভূম সম্ভবতঃ সেই বজ্রভূমির অন্তর্গত ছিল এবং অধুনাকালের ভূমিজগণ তখন বজ্রভূমির অধিবাসী ছিলেন।

পাঠান যুগেও অর্থাৎ ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলজীর বঙ্গ আক্রমণের সময়ও আমরা রাঢ়, বাগড়ী, বঙ্গ, মিথিলা প্রভৃতি বাংলার জনপদ সমূহের উল্লেখ দেখি।

আকবরের আমলে বাংলা দেশ ১৯টি সরকারে বিভক্ত ছিল :—যথা, পুর্ণিয়া, মদারণ প্রভৃতি। এই মদারুণ বা মান্দারণ (গড়ে মান্দারণ) সরকারের অন্তর্ভুক্ত মহালগুলির নাম ছিল্ব ধবলভূম, সিংভূম, শেরগড় বা শিখরভূম, প্রভৃতি। সাঁওতালীতে পঞ্চকোটের অন্যতম নাম হইল শিখরভূম। বাংলার পানিহাটি, বাগড়ী, মণ্ডলঘাট, প্রভৃতি মহলের সহিত এগুলি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। আইন-ই-আকবরীতে এ সকলের বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে।

মানভূম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারেও পঞ্চকোট দুর্গের কাল নির্ণয় সূত্রে দুয়ারবাঁধ ও খড়িবাড়ী নামক তোরণ দুইটির বাংলা লিপিতে শ্রীবীর হাম্বীরের উল্লেখ ও ১৬৫৭ সম্বৎ অর্থাৎ ১৬০০ খৃঃ অব্দ নির্ণয় করা হইয়াছে। বীর হাম্বীর অর্থে বিষ্ণুপুর রাজ বীর হাম্বীরকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।

বৃটিশ আমলেও মানভূম বাংলারই অংশ ছিল। গ্র্যান্টের রিপোর্ট হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে পাচেট বাংলার পশ্চিম প্রান্তের অংশ ছিল এবং ইহা সুব বিহারের চুটিয়া নাগপুর (রাঁচী জেলা) ও রামগড় দ্বারা বেষ্টিত ছিল।

১৮০৫ সালের ১৮ নং রেগুলেশন অনুযায়ী জঙ্গল মহল জেলা গঠিত হয় এবং মানভূম ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৩৩ সালের ১৩ নং রেগুলেশন অনুযায়ী জঙ্গল মহল জেলা ভাঙ্গিয়া সাউথ ওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সী গঠন করা হয় এবং ঐ রেগুলেশন অনুসারেই মানভূম একটি স্বতন্ত্র জেলা গঠিত হয় এবং মানবাজারে জেলার প্রধান কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৩৮ সালে মানভূম জেলার প্রধান কার্য্যালয় মানবাজার হইতে পুরুলিয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়।

১৮৪৬ সালে ধলভূম পরগণা মানভূম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সিংভূম জেলার সহিত যুক্ত করা হয় এবং ঐ সালে চৌরাশী, চেলিয়ামা, মালিচন্দ, বলখণ্ডী বড়শাড়া বনচাষ প্রভৃতি মানভূমের অঞ্চলগুলির ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা বাঁকুড়ার অধীন করা হয়। মানভূমের ছাতনা, গৌরাংডি, চাষ ও পাচেটের শাসন সংক্রান্ত অনেক বিষয় বাঁকুড়ার অধীন ছিল।

১৮৫৪ সালের ২০ নং রেগুলেসন অনুযায়ী ছোটনাগপুর বিভাগের সৃষ্টি হয় এবং ইহা বাংলার লেঃ গবর্ণরের অধীনে থাকে। এই রেগুলেসন অনুসারে ক্রিটিয়ার এজেন্সী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং মানভূম ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে বাংলা দেশকে দ্বিধা বিভক্ত করিবার কার্জ্জনী পরিকল্পনা বাতিল হইতে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু তাহার জের স্বরূপ ১৯১১ সালে বিদেশী শাসন কর্ত্তাদের সুবিধা অনুযায়ী এবং বিশেষভাবে প্রতিশোধ স্বরূপ পুরাতন বাংলা দেশকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া (১) আসাম (২) বাংলা (৩) বিহার ছোটনাগপুর-উড়িষ্যা এই তিনটি প্রদেশ গঠিত হয়। নামের সংক্ষেপের জন্য শেষোক্ত প্রদেশটীকে কেবল বিহার ও উড়িষ্যা বলা হইত। পুরাতন বাংলা দেশ হইতে এই নূতন প্রদেশগুলি গঠন করার ফলে মানভূম, ধলভূম, দুমকা, জামতাড়া, কিষণগঞ্জ প্রভৃতি বাংলাভাষী অঞ্চল বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে এবং কাছাড়, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি বাংলাভাষী অঞ্চল নূতন আসাম প্রদেশে যুক্ত হয়।

মানভূম জেলার পুঞ্চা, পাড়া, পুরুলিয়া, রঘুনাথপুর, কাতরাস প্রভৃতি অঞ্চলে জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য যুগের বহু ভগ্ন দেউল, মূর্ত্তি প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল প্রাচীন মন্দিরাদি প্রধানতঃ কংশাবতী বা কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত। দামোদর নদের তীরেও বহু প্রাচীন মন্দিরাদি বা তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

জয়পুর থানা হইতে প্রায় চার মাইল দূরে কাঁসাই নদীর দক্ষিণ তীরে তিনটি সুবৃহৎ ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির অবস্থিত। মন্দির প্রাঙ্গণের প্রবেশ দ্বারে একটি ষড়ভুজা ও একটি দশভুজা মূর্ত্তি এবং দুইটি গণেশ ও শিবদুর্গার মূর্ত্তি বর্ত্তমান। ইহা ছাড়া বুদ্ধ মূর্ত্তিও রহিয়াছে এবং মন্দিরগুলিতে রাজহংসের খোদিত মূর্ত্তি হইতে মনে হয় এইগুলি বৌদ্ধ মন্দির ছিল, পরে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত হয়। মন্দিরে সিংহবাহিনী মূর্ত্তি সকল ও মন্দিরগুলি দশম বা একাদশ শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়। মূর্ত্তিগুলির খোদাই কার্য্য বেশ সুনিপুণ এবং সর্ব্বোচ্চ মন্দিরটি প্রায় বাট ফুট উচ্চ।

পুঞ্চা থানার বুধপুর গ্রামে বুদ্ধেশ্বরের মন্দির এবং পাকবিড়রা গ্রামে ভীমকায় ভৈরব মূর্ত্তি ও তৎসহ অন্যান্য জৈন মূর্ত্তিগুলি জৈন প্রভাবের সাক্ষ্য দিতেছে। রঘুনাথপুর থানার দামোদরের তীরস্থ তেলকুপীর প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে ভৈরবনাথ ও পার্ব্বতীর মন্দির দুইটি সমধিক খ্যাত। এতদ্ব্যতীত রাজা শশাঙ্কের রাজধানীরূপে খ্যাত বরাহবাজার থানার পবনপুরের ধ্বংসাবশেষ, পাড়া থানায় বঙ্কিনীদেবীর মন্দির প্রভৃতি উপলক্ষ্য করিয়া বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত হইয়াছে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে মানভূমের বৎসামান্য অবদান বিশেষ ভাবে লোকসঙ্গীতের অনুশীলনের মাধ্যমেই প্রকাশ লাভ করিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য চর্চ্চার একটা ঝোঁক দেখা দেয় এবং বিক্ষিপ্তভাবে সাহিত্য চর্চ্চার গোষ্ঠি গড়িয়া উঠিতে থাকে। ছোট ছোট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই সাহিত্যিক প্রচেষ্টা রূপ গ্রহণ করে এবং এই জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। কিন্তু সংহতভাবে সাহিত্য-চর্চ্চা ও সাহিত্য প্রচেষ্টার ক্ষেত্র গড়িয়া উঠে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ১৩২৭ সালের ২০শে অগ্রহায়ণ (ইং ১৯২১ সাল) এই গ্রন্থাগারটি জন্মলাভ করে এবং সেই বৎসরের ৭ই পৌষ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং এই বৎসরটি উভয় দিক হইতেই বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। এই গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা ও প্রগতির সূত্রে দুইজন স্মরণীয় ব্যক্তির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় হরিপদ দাঁ মহাশয়ের বদান্যতায় এই গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জীর জামাতা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বৈবাহিক মনীষি কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একনিষ্ঠ সাধনায় এই প্রতিষ্ঠানটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। বিগত ছত্রিশ বৎসর কাল ধরিয়া হরিপদ সাহিত্য মন্দির সমগ্র জেলার সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ হইয়া আছে। কিন্তু এই জেলার সর্ব্বগ্রাসী দারিদ্র্য, শিক্ষা বিস্তারের অভাব এবং বিশেষ করিয়া সরকারী ঔদাসীন্যের ফলে কোনও সুষ্ঠু গঠন মূলক কার্য্যধারা আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। বিশেষ করিয়া বিগত ছয় সাত বৎসর ধরিয়া তদানীন্তন বিহার সরকারের ভাষা ও শিক্ষা সংক্রান্ত ভ্রান্ত ও বৈষম্যমূলক দুর্নীতির ফলে এই জেলার সমগ্র সমাজ জীবনে এক নিদারুণ বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। এই প্রতিকূল অবস্থায় সুস্থ গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্ভব হয় নাই।

আজ সমগ্র বাংলায় গ্রন্থাগার আন্দোলন এক বিরাট পরিবর্তনের সম্মুখীন। বহু রূপে পশ্চাদপদ মানভূমের এই অংশ বাংলার সহিত সংযুক্ত হইবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়া বাংলার সুধী ও গ্রন্থাগার অনুরাগীবৃন্দের নিকট পথ নির্দ্দেশ

চাহিতেছে। আপনাদের সুদূরপ্রসারী অভিজ্ঞতা ও সুচিন্তিত কর্মধারায় এই সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হউক ইহাই আমাদের অন্তরের কামনা।

সুস্বাগতম্ অভ্যাগতবৃন্দ—

শ্রীজগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর উদ্বোধন ভাষণ

সম্মেলনের উদ্বোধন ভাষণে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু বলেন—সকল প্রাণীই যেমন জীবন ধারণের জন্য আহার্যের সন্ধান করে মানুষও ঠিক তেমনি জৈবিক অস্তিত্বের জন্য সর্বদা সচেষ্ট। কিন্তু উদরের তৃপ্তিবৃত্তি ব্যতিরেকে মনুষ্য জীবনের একটি প্রধান ও বিশেষ বৃত্তি আত্মার তৃপ্তিবৃত্তি সাধন। এবং আত্মার ক্ষুধা নিবারণে গ্রন্থই ভোজ্যের প্রধান উপকরণ। গ্রন্থাগার মানুষকে এই আহার্যের আহরণে সহায়তা করে—আত্মার ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় গ্রন্থাগারে।

এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের আদি ও ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে তিনি বলেন— বর্তমানে এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন কিছুটা অষ্টাদশ শতাব্দীর পশ্চিমী ধারা অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। অবশ্য পশ্চিমী দেশগুলির মত এদেশের গ্রন্থাগারগুলি শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে গড়িয়া উঠে নাই—কারণ শিক্ষা-ব্যবস্থাই এদেশে বিদেশী শাসকদের শাসনকার্যের প্রয়োজন ও সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রবর্তিত হইয়াছিল—এবং শিক্ষিত মুষ্টিমেয় লোকের চিত্ত-বিনোদনের জন্যই গ্রন্থাগারগুলি গড়িয়া উঠে। সেজন্য এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঠিক মূল্যায়ণ ও কার্যক্রম নির্দ্ধারণের প্রয়োজন রহিয়াছে। লোকের শিক্ষার হার ও মান অনুযায়ী এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে গঠিত গ্রন্থাগারগুলি স্বতঃস্ফূর্ত জন-প্রচেষ্টাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জন-প্রচেষ্টাতেই রূপ লাভ করিয়াছে এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন। দেশের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অভ্যুদয়ে বর্তমানে এ আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সরকারী উদ্যোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন—খুবই আশা ও আনন্দের কথা বিগত ত্রিশ বৎসর যাবত আমরা যে সরকারী সাহায্য ও প্রচেষ্টার দাবী করিয়াছিলাম তাহা বহুলাংশে কার্যে পরিণত হইয়াছে ও হইতে চলিয়াছে।

কিন্তু সরকারকে মনে রাখিতে হইবে যে জন-সংযোগ ও সহযোগিতার উপর তাঁহাদের পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। বেসরকারী গ্রন্থাগার কর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতা ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ সরকারকে লইতে হইবে।

বাংলা মায়ের কোলে পুরুলিয়া ফিরিয়া আসায় তিনি হর্ষ প্রকাশ করেন ও রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনে এতদঞ্চল নিজ ভূমিকায় যথাযথ অংশ গ্রহণ করিবে এই আশা তিনি ব্যক্ত করেন।

একাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মূল সভাপতি

শ্রীবি, এস, কেশবন-এর অভিভাষণ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের একাদশতম অধিবেশনে পৌরোহিত্য করিবার জন্য আহ্বান করিয়া পুরুলিয়ার নাগরিকবৃন্দ আমাকে যে সম্মান দান করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি তাঁহাদের নিকট গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। নয় বৎসর ধরিয়া আমি বাংলাদেশে বাস করিতেছি এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকরূপে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরীর অধিবাসিদের সেবা করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। ভারতের এই সাংস্কৃতিক রাজধানীতে থাকায় এক মুহূর্ত্তের‌ও জন্য আমার মনে অনুশোচনা আসে নাই। অথবা তাহাও ঠিক নহে। এই প্রাণস্পন্দিত নগরীতে কর্ম্মব্যস্ত প্রতিটি মূহূর্ত্ত আমি পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করিয়াছি—ইহাই আমি বলিতে চাই।

আমি বাংলার, অর্থাৎ বিভক্ত বাংলার, প্রতিটি স্থান পরিদর্শন করিয়াছি এবং এমন কোন স্থান দেখি নাই যেখানে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কোন মহতী ধারা বহমান নাই। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের অনুষ্ঠান এই কারণে আমার কাছে আশীর্ব্বাদস্বরূপ হইয়াছে। বাঙালীর সদা-জাগ্রৎ মনস্বিতা এবং অভ্যাগতের প্রতি উদার অভ্যর্থনা সকলকেই গভীরভাবে অভিভূত করে। সরস্বতীর কণ্ঠে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং আরও অনেক অত্যুজ্জ্বল মণিরত্নে খচিত যে 'ব্রজমালা' বাংলাদেশ দুলাইয়া দিয়াছে, আমি মনে করি না যে, ভারতের অন্য কোন অংশের সেই গৌরব আছে। মনীষী ও মহাপুরুষের সৃষ্টির গৌরবেও বাংলা কাহারও পশ্চাদ্‌বর্ত্তী নয়। শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন এই বাংলার মৃত্তিকাকে স্পর্শ করিয়া উত্থিত

হইয়াছেন। এই বাংলাদেশেরই স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের সুমহান আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সকলকে বজ্রনির্ঘোষে সচেতন করিয়া তাঁহার মহতী বাণী ও আদর্শ ঘোষণা করিয়াছেন। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'- উপনিষদের এই বাণী এরূপ স্ফূর্ত প্রাণাবেগে আর কেহই উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই। দেশের এই প্রকার সাংস্কৃতিক পরিবেশের জন্যই "এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল"-এর সংস্থাপন বাংলাদেশে সম্ভব হইয়াছিল। জ্ঞান সাধনায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চিরস্মরণীয় দান বিশ্ববন্দিত। অর্থহীন আচার ও অন্ধ কুসংস্কারের পাষাণভার হইতে সমগ্র দেশকে মুক্ত করিবার প্রথম প্রচেষ্টা এই বাংলাদেশেই শুরু হইয়া--ছিল। সমাজ-সংস্কারের সেই বহুতর পুরোবর্ত্তীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—এই কয়েকটি শ্রেষ্ঠ নাম উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। কেবল আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ও সমাজমুক্তির প্রদীপ্ত সাধনাতেই বাংলাদেশ স্থির থাকে নাই। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সাম্রাজ্যশক্তির বিশাল পাষাণদুর্গের ভিত্তিমূল পর্যন্ত নাড়াইয়া দিয়াছিলেন। মহাপ্রাণ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দূরদৃষ্টি ও সর্বজনীন ঔদার্য্য প্রাদেশিকতার ভেদগণ্ডি অস্বীকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সমগ্র ভারতবর্ষের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিকদের ধাত্রীস্বরূপা করিয়াছিল। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অগণ্য মনীষী ভারতের এই প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ে লালিত হইয়া উত্তর-জীবনে কীর্ত্তিমান হইয়াছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, ভারতের শ্রেষ্ঠতম ঐতিহাসিক শ্রীযদুনাথ সরকার-ঐতিহাসিক রচনার অত্যুচ্চ আদর্শের দিগ্‌দর্শকরূপে এখনও আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সর্বপ্রকার সংস্কৃতি সাধনার নায়কগণ বাংলা দেশ হইতেই আসিয়াছেন। ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত এবং পুরুষ পরম্পরায় বিদেশী-নির্জ্জিত এই দেশের অধিবাসী নিছক বুদ্ধিজীবী এবং অন্যবিধ শারীরিক কর্ম্মে অপটু—এই প্রকার বিবেচনাহীন সিদ্ধান্ত করিতে অনেকেই প্রলুব্ধ হইয়াছেন। রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য সৃষ্ট মূঢ় সামরিক জাতিতত্ত্ব দেশরক্ষার ব্যাপারে পূর্ণ অংশ গ্রহণে বাঙ্গালী যুবসমাজকে বাধাগ্রস্ত করিয়াছে। মাদ্রাজের 'স্যাপারস্' ও 'মাইনার্স' এবং বাংলাদেশের এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখোপাধ্যায় এই সামরিক জাতিতত্ত্বের অসারত্ব চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। কুণ্ঠিত রক্ষণশীল এবং নৈরাশ্যবাদীগণ যাহাই বলুন বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিধারা এখনও অব্যাহত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান আছেন ইহা সত্বেও বাংলা সাহিত্য পতনের

পথে এরূপ কে বলিবে? তরুণ বাংলার সৃজনী আবেগ বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা'য় আজও স্পন্দিত। সতেজ রচনাসমৃদ্ধ 'শনিবারের চিঠি'কে বাংলাদেশের আধুনিক 'স্পেক্টেটার' বলা চলে। অস্বীকার করা যায় না, অসংখ্য অসার রচনায় দেশ ভরিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীর কোন অংশ সম্বন্ধে তাহা সত্য নয়? দীপশিখা এখনও জ্বলিতেছে—ইহাই সার কথা। কিছু তৈল সঞ্চার করিয়া সলিতা উস্কাইয়া দিলেই তাহা পূর্ব্বের মতোই অম্লানদীপ্তিতে জ্বলিতে থাকিবে। বৃত্তিমূলক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে এই অতীত পরিক্রমা আশা করি আপনারা ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখিবেন। তাই বলিয়া অনুশোচনা করিবার কোন প্রয়োজন আমি দেখি না। কারণ বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির একটি দোষ এই যে, পটভূমিকার বিশালত্ব সম্পর্কে সচেতন না হইয়া তাহারা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই প্রবলভাবে কাজ করিয়া যায়। অবশ্য প্রশ্ন উঠিতে পারে, চিকিৎসক, পদার্থবিদ, রসায়নবিদ, জীবতাত্ত্বিক বা ঐ ধরণের সম্মেলনের প্রতি এই মন্তব্য কি সমভাবে প্রযোজ্য? বৃত্তিমূলক সম্মেলনে নিজ পরিভাষা ব্যবহৃত হইবে না এই কথা বলা কি নিতান্ত মূঢ়োচিত নয়? কারণ পরিভাষা সকল বিজ্ঞানের প্রবেশকুঞ্চিকা; আর যে কোন প্রগতিশীল বিজ্ঞানের পক্ষে প্রতীক অপরিহার্য্য। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়। কিন্তু একটু অনুধ্যান করিলেই দেখা যাইবে যে, রসায়নবিদ, পদার্থবিদ, জীবতাত্ত্বিক ও চিকিৎসকগণ যে অর্থে বিজ্ঞান সাধক, গ্রন্থাগারিকগণ সেই অর্থে বিজ্ঞানী নহেন। আমাদের অবস্থা তুচ্ছ হইলেও অনন্য—কেন না কেবল মানব সেবাই আমাদের অস্তিত্বের মূল কারণ নয়, নিবিড় মানবিক সম্পর্ক স্থাপনও আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীরও নিতান্ত প্রয়োজন আছে। তথ্য ও জ্ঞানের প্রণালীবদ্ধকরণে গ্রন্থাগারিক নিশ্চয়ই তাঁহার সেইরূপ কঠোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও মূলনীতি মানিয়া চলিবেন, যাহাতে অল্প সময় ও আয়াসে জ্ঞান-ভাণ্ডারের সকল দিক সাধারণের কাছে উন্মুক্ত হইয়া যায়। ব্লিস, ডিউই, রঙ্গনাথন প্রভৃতি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের চিন্তানায়ক প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি ভিন্ন বৃহৎ ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাগারে কাজ করা অত্যন্ত কঠিন। অতি গর্ব্বের বিষয়, এই দেশের গ্রন্থাগার চেতনার মুখ্য নেতাকে সম্মানিত করিয়া ভারত সরকার আমাদের বৃত্তিকে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে বৈজ্ঞানিক এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকতা খব গুরুত্বপূর্ণ হইলেও, আমাদের বৃত্তি অতি সঙ্কীর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রাম যতদিন না গ্রন্থাগারের ও পড়িবার সুযোগ সুবিধা পাইতেছে, ততদিন আমাদের কার্য্য শেষ হইবে না এই কথা বহুশ্রুত। আমি বিশ্বাস করি যে, কোন না কোন সময়ে ঐ পূর্ণতা সম্ভবপর হইবে; কিন্তু ইহাও স্মরণযোগ্য যে এই বিষয়ে আমাদের অতি সতর্কতার সহিত চিন্তা করা প্রয়োজন। মানচিত্রের উপর অসংখ্য বিন্দুদ্বারা ছোট, বড়, ভ্রাম্যমাণ ইত্যাদি বহুপ্রকার গ্রন্থাগার চিহ্নিত করা এবং নানা কাজকর্ম্মের হৃদয়গ্রাহী হিসাব নিকাশ দেওয়া খুবই চিত্তাকর্ষক। কিন্তু এই সব প্রচেষ্টার বাস্তবক্ষেত্রে মূল্যায়নের সময় দেখা যায় যে, ইহাদের কোনই মূল্য নাই। গ্রাম্য গ্রন্থাগার স্থাপন করা বেশ কঠিন কাজ। কারণ প্রতি গ্রামে বাক্স ভর্ত্তি পুস্তক লইয়া গিয়া পাঠের নির্দ্দেশ দেওয়া হইল এবং অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া গেল—এমন মনে করা নিশ্চয়ই চলে না।' বস্তুত এই সমস্যা যেন জলসেচনের সমস্যা। যাহা পরিচিত, সেই চেনা ও জানার ক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ করিয়া পরে অপরিচিত ও অচেনা ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। আপনারা সকলেই জানেন যে, বর্ত্তমানে আমাদের শহর অঞ্চলেও কাজ সন্তোষজনকভাবে চলিতেছে না। তুলনা দিয়া বলিতে পারি কোন বৃহৎ দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধান করিতে হইলে চাষযোগ্য অঞ্চলেই প্রথম মনোযোগ দিতে হয়। আদর্শবাদের সহিত একথা আপনারা বলিতে পারেন না, 'এস, সর্ব্বপ্রথম রাজস্থানের মরুভূমিকে চাষের উপযোগী করা যাক।' তাহাকে উর্ব্বর করিবার জন্য সমস্ত জল সেইখানেই নিঃশেষ করা উচিত নয়। জাতীয় গ্রন্থাগার পরিকল্পনায় জলাশয়, খাল প্রভৃতি উৎসগুলি মনে রাখিতে হইবে। গ্রন্থাগারের সম্পদরূপে যাহা পাইয়াছি তাহার যথাযথ বিন্যাস করাই আমাদের কর্ত্তব্য। সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন সংহতির। দেশের প্রত্যেকটি স্থানে সুযোগ সুবিধা দিবার কাজ পূর্ণমাত্রায় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে চতুর্দ্দিক ভালোভাবে নিরীক্ষণ করা আবশ্যক। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, এইরূপ ব্যক্তির জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইয়া দিলে সে তাহার প্রতিবেশীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে। আমরা আশা করি, আমাদের পরিষদ এইরূপ ব্যক্তির অনুসন্ধান করিয়া যথাযথভাবে শিক্ষিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

দেশের জেলা এবং গ্রাম্য গ্রন্থাগারিকের কাজ ক্রমশঃ জীবন্ত ও মানব সম্পর্কিত হইয়া উঠিতেছে। 'অডিও-ভিসুয়াল' শিক্ষা, বাগ্মিতা, শিল্পবোধ, শিক্ষার লক্ষ্য ও উপায় ইত্যাদি সার্ব্বভৌম শিক্ষা গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের দিতে

হইবে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আমার মতে উহা প্রকৃতপক্ষে নগণ্যমাত্র। বর্ত্তমানকালে জেলা ও গ্রাম্য গ্রন্থাগারিক অবশ্যই নিছক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কিছুর অধিকারী হইবেন। যে সব প্রগতিশীল দেশে পুস্তক প্রকাশনা, গ্রন্থাগার ও উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থা অতি উন্নত অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, সেই সকল দেশের শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের গ্রন্থাগারিকের পক্ষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানসম্মত গুণাবলী থাকাই যথেষ্ট বলিয়া ধরা চলিতে পারে। কিন্তু পড়িবার সুযোগ সুবিধা, পুস্তক এবং সাজসরঞ্জাম যেখানে এখনও পরিপূর্ণ রূপ পায় নাই সেই সকল অনগ্রসর দেশে গ্রন্থাগারিক বৃত্তিকুশলীর অতিরিক্ত কিছু হইবেন। গ্রন্থাগারিকতার সহিত আমার সম্পর্ক যতই গভীর হইয়া উঠিতেছে, আমি ততই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেছি যে উন্নতশ্রেণীর গ্রন্থাগারিক গড়িবার একমাত্র পথ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ব্যতীত অপরাপর বহু বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দান।

আধুনিক সাধারণ গ্রন্থাগারের কার্য্যকলাপ প্রভূত পরিমাণে চিন্তার খোরাক জোগাইতেছে। অসংখ্য লোক পুস্তকের সীমিত সংখ্যার জন্য অভিযোগ করেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি বিস্ময়কর ভাবে সাধারণকে গ্রন্থাগারমনা করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু যে প্রশ্ন আরও বড় তাহা হইল ব্যক্তিজীবনকে সমৃদ্ধতর, অধিকতর চিন্তাশীল ও প্রয়োজনীয় করিবার ক্ষেত্রে কতদূর সার্থকতা এই প্রতিষ্ঠানগুলি অর্জ্জন করিয়াছে? পুস্তক লেনদেন ও গ্রাহকদের সংখ্যায় এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর মিলিবে না। পৃথিবীর যে কোন দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারে নিযুক্ত কর্ম্মচারীর মানস গঠন সম্বন্ধে কি বলা চলে? পাঠকদের চাহিদা মিটানো ছাড়া তাহারা আর কি অধিক কাজ করিতেছে? আপনারা জানেন বড় বড় দোকানে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী সাজানো থাকে এবং কাউন্টারের' পেছনে কর্ম্মচারী সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকেন। শহরের সকল লোকই জিনিষ ক্রয় করিবার জন্য দোকানে ভিড় করে ও কর্ম্মচারীগণ সাহায্য করেন। ঐরূপ বড়ো দোকান হইতে সাধারণ গ্রন্থাগার কতোটা পৃথক এবং গ্রন্থাগারকর্ম্মী ও দোকানের কর্ম্মচারীর মধ্যে সাদৃশ্যই বা কতদূর? সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজকর্ম্মকে হেয় করিবার উদ্দেশ্য আমি এ সব কথা বলিতেছি না। গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের সাফল্য ও কৃতিত্বের প্রতি যাহারা শ্রদ্ধাশীল, তাহাদের মধ্যে আমিও একজন। কিন্তু যখন সারা দেশে জেলা ও গ্রাম্য গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য এবং ঐ উদ্দেশ্যে

গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের জন্য বহু চিন্তা ও অর্থব্যয় হইতেছে, তখন আমি এ সব প্রশ্ন না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

গ্রন্থাগারের উন্নতি বিষয়ে এই দেশে কী কী হইয়াছে তাহার হিসাব লওয়া যাক। জেলা গ্রন্থাগার ভবন ও ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য বহু প্রাদেশিক সরকারকে ভারত সরকার সাহায্য করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা চলে গ্রন্থাগার ভবন ও ভ্রাম্যমান পুস্তকযানের পরিকল্পনায় যথাযথ ভাবে বৃত্তিকুশলীর মতামত লওয়া হয় নাই। কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনেকেই জানেন না যে, গ্রন্থাগারের কাজের রূপের উপর নির্ভর করে ভবনের বিশেষ ধরণের স্থাপত্য আজও সেই সনাতন ধারণা বিদ্যমান যে পুস্তকযান কেবল বই আনানেওয়ার গাড়ি বিশেষ ; বিভিন্ন কেন্দ্রে বই দেওয়া ও কিছু সময় অন্তর তাহা ফিরাইয়া লওয়াই ইহার কাজ। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে পুস্তকযানের ইহা একটা কাজ—কিন্তু সমগ্র কাজের বৃহত্তর পটভূমিকা অর্থাৎ মানব সম্পর্ক স্থাপনের কাছে ঐ কাজ নগণ্য। পুস্তকযানের জন্য পুস্তক নির্বাচন, পাঠকসমীপে পুস্তক উপস্থাপনের উপায়, পাঠের ফলাফল এবং পাঠ্যবস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে সতর্ক অনুধ্যান—এইগুলি ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের পক্ষে অপরিহার্য্য কাজ। জানি না কেন, গ্রন্থাগারিকগণ এই দেশের শিক্ষা কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসভাজন নয়। ইহা উভয় পক্ষের দোষ হইতে পারে। কারণ গ্রন্থাগারিকের ব্যক্তিত্বের উপর ইহা নির্ভরশীল, আবার এই ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ভারতসরকার এই সমস্যা বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় অবহিত এবং জেলা গ্রন্থাগার, গ্রাম্য গ্রন্থাগার ও বিদ্যালয়-গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের বিশেষভাবে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে একটী কেন্দ্রীয় শিক্ষালয় অনতিবিলম্বে গঠিত হইবে।

শিক্ষালয়-গ্রন্থাগারিকের উল্লেখ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আর এক মর্মন্তুদ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে শিক্ষালয় ভবন পরিকল্পনায় কেন্দ্রস্থলে গ্রন্থাগারের অবস্থিতির উপর জোর দেওয়া হয়। শিক্ষক ও ছাত্র উভয় পক্ষেরই ইহা প্রয়োজন। কিন্তু এই দেশে কতকগুলি নূতন শিক্ষালয়-ভবনেও গ্রন্থাগারকে 'কোণঠাসা' করার ব্যবস্থা হইয়াছে। যেখানে একজন পদস্থ, দরদী, ও বিচক্ষণ শিক্ষক শিক্ষালয় গ্রন্থাগারের দায়িত্বভার লইবেন, সে স্থলে এখন দেখিতে পাই অকৃতী, ব্যক্তিত্বহীন শিক্ষক গ্রন্থাগারিকের পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। গ্রন্থাগারে পাঠ করিবার সময় ছাত্রদের নিকট আনন্দের পরিবর্তে বিশেষরূপে যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচন যথাযথভাবে

করা হয় না। শিক্ষালয়ে গৃহীত পাঠ্যসূচীর সহিত গ্রন্থাগারের পুস্তক সম্ভারের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। এই প্রসঙ্গে কেবল একটি সুখের কথা—দিল্লীর 'সেন্ট্রাল ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশন' ছাত্রদের জন্ত গ্রন্থাগারিকতা পাঠ্যসূচীর অন্যতম বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আমি আশা করি আরও ব্যাপকভাবে ও সুচিন্তিত ভাবে ইহার অনুসরণ করা হইবে।

দেশের শিক্ষা প্রসঙ্গে দেখিতে পাই শিক্ষার উচ্চতর অবস্থার প্রতি চিন্তা ও অর্থব্যয় করা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় গবেষণাগারগুলিই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। মাধ্যমিক, প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষার বিষয়ে নানাভাবে নানা কথা বলা হইতেছে এবং বহু পরীক্ষা চলিতেছে। কিন্তু সমস্যার আকার ও আর্থিক কৃচ্ছ্রতার জন্য উন্নতি শম্বুকগতিতে হইতেছে। তবু সরকার ও জনসাধারণ সমস্যা সমাধানের জন্য বদ্ধপরিকর এবং পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসরে এই ব্যবস্থার কিছু উন্নতি হইবে। গ্রন্থাগারিকতার দিকে সাহিত্য আকাদমী ও জাতীয় গ্রন্থাগার জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। সর্ব্বভারত প্রসারী একটি 'ডকুমেন্টেশন' কেন্দ্রও খোলা হইয়াছে। রাজধানীতে সাধারণ গ্রন্থাগারের একটি দিগ্‌দর্শক পরিকল্পনা চালু হইয়াছে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা দিতেছেন। মাদ্রাজের সাধারণ গ্রন্থাগার আইন ঐ রাজ্যের গ্রন্থাগার ভবনের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছে। তদানীন্তন হায়দরাবাদ রাজ্য এই আদর্শের অনুসরণ করিয়াছিল। গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থার দ্বারা অনুপ্রাণিত ও চালিত না হইয়াও গ্রন্থাগার উন্নতিকল্পে বোম্বাই রাজ্য একটি কার্যনির্ব্বাহক সংসদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। দিল্লী, আলিগড়, বেনারস, বিশ্বভারতী প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকার চালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজ নিজ গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণকল্পে উদ্যোগী হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশন গৌহাটি উৎকল বিহার, পাটনা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পক্ষে স্নেহশীলা ধাত্রীস্বরূপা হইয়াছে। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও ঐ কমিশন দ্বারা নিজ নিজ গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য সাহায্যপুষ্ট হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে যে গ্রন্থাগার উন্নয়নে এদেশ ক্রমেই সচেতন হইয়া উঠিতেছে। ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো সেমিনারের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় মৌলানা আবুল কালাম আজাদের উদ্বোধন ভাষণে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের দেশব্যাপী গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্পর্কিত নীতির এক সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

"ভারত কৃষিপ্রধান দেশ।' শহরবাসীদের তুলনায় গ্রামীণ অধিবাসীদের সংখ্যা অধিক হইতে শতগুণ। সেই কারণে শহরাঞ্চল অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজন অধিকতর। আমরা দেশের প্রত্যেক ব্লকে এক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে চাই যাহার কেন্দ্রস্থল হইবে জেলা গ্রন্থাগার। জেলা গ্রন্থাগার ভ্রাম্যমাণ গাড়ীর সাহায্যে গ্রামবাসীদের নূতন পুস্তক সরবরাহ করিয়া পঠিত পুস্তক ফেরৎ লইয়া আসিবে। ভারতে প্রায় ৩২০টি জেলা আছে, তন্মধ্যে একশত জেলায় অনুরূপ গ্রন্থাগার ইতিমধ্যে সংগঠিত হইয়াছে কিংবা হইতেছে। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আশা করা যাইতেছে যে, ১৯৬১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সকল জেলাতেই জিলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে।

"প্রতি রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার জেলা গ্রন্থাগারগুলির প্রতিষ্ঠাপনায় ও তত্ত্বাবধানে সহায়তা করিবে। ঐ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারগুলি পরস্পরের সহিত যোগাযোগ করিয়া চলিবে এবং কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে অবস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগারগুলির এবং দিল্লীর জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংযুক্তভাবে দেশব্যাপী এক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবে।"

মন্ত্রী মহাশয় বর্ণিত কার্যক্রমের সাফল্যলাভের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হইতেছে দেশের গ্রন্থ-উৎপাদনের দুরবস্থা। প্রকাশনের সংখ্যার দিক থেকে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের পরে তৃতীয় স্থানটি আমাদেরই; কিন্তু গুণাগুণের দিক হইতে বিচার করিলে আমাদের স্থান তদনুরূপ উচ্চ নহে। আন্তর্জাতিক আর্থিক মান অনুযায়ী ভারতীয় গ্রন্থের মূল্য অন্যান্যদের তুলনায় অনেক কম। কিন্তু এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী তাহাও যথেষ্ট উচ্চ এবং নিম্নমূল্যের গ্রন্থও সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিই ক্রয় করে অধিক। এমত অবস্থায় পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাগণের বলিবার সুযোগ ঘটে যে এদেশে গ্রন্থ-ব্যবসায় তেমন লাভজনক নহে। এই কথায় কিছু সত্য থাকিতে পারে। কিন্তু আন্তরিকভাবে দেখিলে একথা বলা চলে না যে, নিকৃষ্টতা সর্বদা নিম্নমূল্যেরই পরিচায়ক। এদেশে অনেক উচ্চ মূল্যের গ্রন্থ বিশেষ করিয়া কলেজের পাঠ্য পুস্তক দেখিতে খুবই কদর্য। পুস্তক প্রস্তুতকরণে এবিষয়ে কোনও আগ্রহ দেখা যায় না। জাতীয় গ্রন্থ পুরস্কারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির কথা অস্বীকার করি না, কিন্তু সেগুলি বিরল নিদর্শনমাত্র। এই দুরবস্থায় ঐগুলিই আমাদের যাহা কিছু আশা-ভরসার সঞ্চার করে। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশের মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানই বহু উৎকৃষ্ট মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জার পরিচয় দিয়াছেন।

সম্মেলনের প্রারম্ভে জগদীশ চন্দ্র মুখার্জী হল উদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীঅশোক চৌধুরী। পার্শ্বে উপবিষ্ট সম্মেলনের মূল সভাপতি শ্রী বি, এস, কেশবন ও শ্রীজগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সম্মেলন উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ। চিত্রে মূল সভাপতি শ্রীকেশবন, শ্রীযুক্তা ঘোষ, শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু প্রভৃতিকে দেখা যাইতেছে।

একাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের স্থান। বাম পার্শ্বে হরিপদ সাহিত্য মন্দির সংলগ্ন জগদীশ চন্দ্র মুখার্জী হল।

গ্রুপ আলোচনায় রত প্রতিনিধিগণের দুটি গ্রুপকে দেখা যাইতেছে।

সম্মেলন উপলক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রাপ্ত কয়েকটি শুভেচ্ছাবাণী

একাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে যে সকল শুভেচ্ছাবাণী পাওয়া যায় সেগুলির কয়েকটির অংশ-বিশেষ নিম্নে সংকলিত হইল :—

বিদেশ হইতে প্রাপ্ত :—

Director of Lenin Library, Mosco :

In the name of the collective of the employees of Lenin Library, I personally greet the Eleventh Bengal Library Conference. I wish success.

The Library of Congress, Washington :

…Hope that your Eleventh Conference was a stimulating one that has better prepared the participants for their efforts in the year ahead to improve library service, each in his own way.

The Library Association, London :

· Extend most cordial good wishes for a happy and successful conference and for the further progress of library work in Bengal.

Association of Special Libraries and Information Bureaux : London :

…Best wishes for your forthcoming Library Conference. We hope that it will benefit all those who participate in it and that it will lead to better services in the libraries of your country and to an improvement in the status of librarians.

New Zealand Library Association, Wellington :

…The New Zealand Library Association is watching with interest and pleasure the growth of library service in Asia and wishes the Bengal Library Association every success in this great work.

Library Association of Australia :

May I on behalf of the Library Association of Australia extend our best wishes for the success of your conferences.

স্বদেশ হইতে প্রাপ্ত :—

Shri S. Radhakrishnan, Vice-President, New Delhi :

...I wish your conference success.

Asstt. Educational Adviser, Ministry of Education, India :

I am very happy, to learn that you have held the Eleventh Bengal Library Conference on the 19th and 20th April 1957...... West Bengal has taken such a prominent part in the development of library movement in the past that we always note with keen interest library activities in that state......

Secretary, Andhradesh Library Association, Andhra Pradesh :

·· With best wishes to the Conference.

Secretary, Bombay Library Association, Bombay :

Wish Conference every success.

Secretary, Indian Association of Special Libraries and Information Centres, Calcutta :

...It is with great pleasure that I bring to the Bengal Library Association the hearty falicitations of the Council and the Members of the Indian Association of Special Libraries and Information Centres on this auspicious occasion of the Eleventh Conference at Purulia.

Shri N. K. Sidhanta, Vice-Chancellor, University of Calcutta :

...I have great pleasure in sending my best wishes for the success of the conference.

Shri Hemendra Prasad Ghose :

...I wish the conference success.

Sri J. C. Ghosh :

"Wish you all success.

শ্রীকমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য :

...সম্মেলন সাফল্যলাভ করুক ইহাই আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করিতেছি।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

(ক) রাজ্যের বিভিন্ন অংশে আঞ্চলিক ও শাখা-গ্রন্থাগার স্থাপন।

সম্মেলনের অভিমত এই যে :—

১। আমাদের দেশের বিভিন্ন অংশে গ্রন্থাগারগুলি কোনও একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অর্থ ও অবৈতনিক কর্মীর নিয়মিত যোগানের অভাবে বহুক্ষেত্রে দীর্ঘকালের পরিচালনে আশানুরূপ ফল লাভ করা যায় নাই।

২। বর্তমানের জন চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলিকে বাঁচাইয়া রাখায় এবং প্রয়োজনমত নূতন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা একান্ত আবশ্যক। এই গ্রন্থাগারগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশুল্ক করা একান্ত কাম্য। নিঃশুল্ক করিতে গেলে সরকারের এবং স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থ সাহায্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

৩। উপযুক্ত নিয়মানুযায়ী জন প্রতিনিধিবৃন্দের হস্তে এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনভার অর্পন করা উচিত।

৪। প্রতি জেলায় একটি করিয়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থাকা আবশ্যক; বড় বড় জেলাগুলিতে বা যে সকল জেলায় যাতায়াতের উত্তম ব্যবস্থা নাই সে সকল ক্ষেত্রে একাধিক জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন প্রয়োজন।

৫। সমৃদ্ধ সহর অঞ্চলের জন্য একরূপ, মফঃস্বল অঞ্চলের জন্য একরূপ এবং গ্রামাঞ্চলের জন্য ভিন্নরূপ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। সমৃদ্ধ সহরাঞ্চলের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী এক বা একাধিক আঞ্চলিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা অবিলম্বে প্রয়োজন।

যে সকল অংশে মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং শিক্ষিতের হার উচ্চ সে সকল স্থানে অনতিবিলম্বে উপযুক্ত সমৃদ্ধ আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সংগঠন করা আবশ্যক।

পল্লী অঞ্চলের প্রয়োজন মত আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের তত্বাবধানে শাখা গ্রন্থাগার এবং ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ও পাঠকেন্দ্র পরিচালনের সুবন্দোবস্ত করা আশু প্রয়োজন।

(খ) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা।

সম্মেলনের অভিমত এই যে :—

১। সমগ্র রাজ্যের গ্রন্থাগার সংঠনের কেন্দ্র হইবে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার : এই গ্রন্থাগারকে ন্যূনপক্ষে নিম্নলিখিত কর্তব্য পালন করিতে হইবে :—

(ক) রাজ্যের অভ্যন্তরে গ্রন্থ-ঋণের ব্যবস্থা করা। এই কার্য্যের সহায়ক হিসাবে রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত গ্রন্থাগারের সম্মিলিত সূচী প্রণয়ন করা।

(খ) বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ-পঞ্জী প্রণয়ন করা।

(গ) প্রয়োজনমত গ্রন্থাগার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা ও বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার বিবরণ দাখিল করা।

(ঘ) রাজ্যে সাধারণভাবে শিক্ষা ও বিশেষভাবে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ সম্পর্কে প্রয়োজন মত তথ্য নির্দ্ধারণ ও উহার ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

(ঙ) রাজ্যের মধ্যে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর গ্রন্থ-সূচী প্রণয়নের জন্য রাজ্যের মধ্যে প্রকাশিত সমস্ত পুস্তক অন্ততঃ একখণ্ড করিয়া সংগ্রহ করা।

(চ) উপযুক্ত পুস্তক প্রকাশের প্রয়োজন অনুভূত হইলে সরকারকে সে বিষয়ে অবহিত করা।

(ছ) সম্ভব মত রাজ্য গ্রন্থাগার মারফত বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পুস্তক ক্রয় করা ও উহার বর্গীকরণ ও সূচী প্রণয়নে সাহায্য করা।

রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগারগুলি তাহাদের প্রয়োজনীয় পুস্তক ক্রয়ের সময় ইচ্ছা করিলে ঐ তালিকাটি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নিকট অবগতির জন্য প্রেরণ করিবেন। ইহা রাজ্যের সম্মিলিত গ্রন্থ-সূচী প্রনয়ণের সহায়ক হইবে, এবং অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ প্রতিবেশী অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্তৃক যাহাতে অনাবশ্যক ক্রীত না হয় এবং সেই অর্থ যাহাতে অন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক ক্রয়ে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহার সহায়তা করিবে।

(গ) কেন্দ্র, আঞ্চলিক শাখা গ্রন্থাগারের পরস্পর সম্পর্ক।

সম্মেলনের অভিমত এই যে :—

১। রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সমগ্র গ্রন্থাগার সংগঠনের মত মত শীর্ষদেশে অবস্থিত থাকিবে। প্রয়োজন মত বিভিন্ন জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক

গ্রন্থাগার ও শাখা গ্রন্থাগারকে সাহায্য করিবে। আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কাজ পরীক্ষা ও পরিদর্শনের অধিকার রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের থাকিবে।

(ঘ) গ্রন্থাগারের কর্তৃত্ব।

এই সম্মেলনের অভিমত এই যে :—

রাজ্যের সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্ত প্রয়োজনীয় আইনানুগ আত্মকর্তৃত্ব সম্পন্ন (Autonomous) গ্রন্থাগার পরিচালন সংস্থা গঠন করিতে হইবে। এই সংস্থায় নিম্নলিখিত রূপ প্রতিনিধি থাকিবে।

(ক) রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি।
(খ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি।
(গ) রাজ্যের বিভিন্ন জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি।
(ঘ) স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি।
(ঙ) বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগিগণ।

(ঙ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা ব্যবস্থা ও গবেষণা।

সম্মেলনের অভিমত এই যে :—

১। রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইলে উপযুক্ত শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন হইবে। কেমন ভাবে কাজ করিলে কাজের উন্নতি হইতে পারে তাহা পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার এই দায়িত্বকে কোনও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারকে না দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উপর ন্যস্ত করাই উপযুক্ত।

২। এই বিষয়ে রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পারস্পরিক সহযোগিতায় বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা বর্দ্ধিত করা উচিত।

৩। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও গবেষণার ব্যবস্থা স্থাপনের জন্ত যথোপযুক্ত অর্থ সাহায্য করিয়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে এই কার্যের ভার অর্পণ করা হউক।

(চ) গ্রন্থাগার আইন।

সম্মেলনের অভিমত এই যে :—

বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতে হইলে এবং গ্রন্থাগারের সুযোগ সুবিধা আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিস্তারিত করিতে হইলে রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক একটি সর্বাত্মক গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। দেশের আপামর জনসাধারণের নিরক্ষরতা যদি দূর করিতে হয় তাহা হইলে বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিনাশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের একান্ত প্রয়োজন।

সম্মেলনে গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাব।

১। বর্ত্তমানে সাধারণ বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে মধ্যে মধ্যে সরকার কর্ত্তৃক যে পরিমান অর্থ সাহায্য করা হয়, তাহা নিয়মিত বাৎসরিক সাহায্যে রূপান্তরিত করা হউক এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী উক্ত অর্থ সাহায্যের পরিমান নির্দ্ধারণ করা হউক।

২। সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনা সমূহের অন্যতম অঙ্গরূপে গ্রন্থাগারগুলির গৃহ নির্মাণ বা গৃহ সম্প্রসারণ ইত্যাদি কার্য্য গ্রহণ করা হউক এবং তদনুযায়ী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রন্থাগারগুলির উন্নতি বিধানে সরকারী অর্থ সাহায্য (উন্নয়ন বাবত) মঞ্জুর করা হউক।

৩। দেশের অধিকাংশ গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাগারিকগণ যথাযথ শিক্ষণপ্রাপ্ত নহেন এবং তাঁহারা অনেকে কোনও পারিশ্রমিক পান না বা পারিশ্রমিক বাবদ যাহা পান তাহাও অত্যল্প; অতএব ঐ সমস্ত গ্রন্থাগারকে সংক্ষিপ্ত শিক্ষণ দানের জন্য বিভিন্ন জেলায় ও অঞ্চলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহযোগিতায় সাময়িক ব্যবস্থা করা হউক এবং তাঁহাদের জন্য সরকার হইতে যথাসম্ভব পরিমাণ ভাতা মঞ্জুর করা হউক।

৪। বর্ত্তমান বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে ক্রমে ক্রমে উন্নীত করিয়া ব্যাপকতর ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত করার মধ্যবর্ত্তী স্তরে উক্ত গ্রন্থাগারগুলির উন্নতিবিধানে সরকারকে অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। এবং সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলির ন্যায় ঘাটতির ভিত্তিতে (on Deficit Basis) গ্রন্থাগারগুলিকেও সাহায্য দানের প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে হইবে ও আবশ্যকীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

৫। এই সম্মেলন কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে যে তাঁহারা যেন কারখানা আইনের (Factory Act) আওতাভুক্ত প্রতিটি কারখানার মালিক বা পরিচালকবর্গকে শ্রমিকদের জন্ম কারখানার মধ্যে একটি করিয়া অবৈতনিক গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্তে অনুরোধ করেন।

৬। পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাগারিকগণের বেতন ও পদমর্যাদা শিক্ষকগণের সমতুল্য করা হউক।

৭। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি সরকারী গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাগারিকগণের নিকট হইতে যে 'সিকিউরিটি ডিপোজিট' অথবা 'ফাইডেলিটি বণ্ড' চাহিয়াছেন, তাহা অবিলম্বে প্রত্যাহার করার জন্ম অনুরোধ করা যাইতেছে।

বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগার

ইন্দ্রনাথ মজুমদার

সদ্য অনুষ্ঠিত একাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রস্তুতি ও প্রচার কর্মসূত্রে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলাম। সময় সংক্ষেপ থাকার জন্ম ব্যাপকভাবে পরিদর্শন করা হয়ে ওঠেনি। তবে প্রধান প্রধান প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিই দেখেছি। আলোচনাটা মোটামুটি এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে ভিত্তি করেই করতে চাই।

প্রথমে বাঁকুড়া জেলার কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। বাঁকুড়া জেলার আয়তন হচ্ছে ২,৬৪১১ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১৩১১,২৫১ জন। এর মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা হচ্ছে মোট ২২১,৯৪৫ জন। জেলায় মোট গ্রন্থাগারের সংখ্যা হচ্ছে; ৬৮টি এর মধ্যে ৩টি কলেজ গ্রন্থাগার, ১৭টি স্কুল গ্রন্থাগার এবং বাকী ৪৮টি হচ্ছে সাধারণ গ্রন্থাগার। এই ৪৮টির মধ্যে অনেকগুলিই আবার গ্রন্থাগার পদবাচ্যই নয়। এই ৪৮টি গ্রন্থাগারের মোট পাঠক সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ২৫০০ হাজার; মোট শিক্ষিতের সংখ্যার সঙ্গে এই সংখ্যার আকাশ পাতাল তফাৎ বিদ্যমান।

বাঁকুড়া জেলার ইতিহাস অনেক প্রাচীন হলেও এর গ্রন্থাগারের ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। জেলায় প্রথম যে দুটি গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে তার একটি হচ্ছে বাঁকুড়া সদরে এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হল লাইব্রেরী, অপরটি বিষ্ণুপুরে বিষ্ণুপুর পাবলিক লাইব্রেরী। বিষ্ণুপুর পাবলিক লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা ৫০০০।

সম্প্রতি এঁদের বিরাট বিস্তল নিজস্ব গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হতে চলেছে। অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের অভাবে পুস্তকগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ সম্বন্ধে এঁদের বিশেষ সচেতনতা দেখলাম না।

বিষ্ণুপুর মহকুমায় গেলিয়া গ্রামের গেলিয়া জাতীয় গ্রন্থাগার বেশ ভাল সুসংগঠিত গ্রন্থাগার। এঁদের পুস্তক সংখ্যা প্রায় ১০০০। এছাড়া মহকুমায় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার বলতে ২টি আছে; একটি খয়রাপুর গ্রামের বিবেকানন্দ লাইব্রেরী, অপরটি কুচিয়া কোল গ্রামের বসন্ত লাইব্রেরী।

সোনামুখি শহরে ভাল গ্রন্থাগার একটিও নেই। সম্প্রতি জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিকের সাহায্য ও বসুদেব আশ্রমের পরিচালনায় বসুদেব গ্রন্থাগারের কাজ শুরু করেছে। তবে এদের বেশীই হচ্ছে ধর্মগ্রন্থ। সোণামুখি থানার ইন্দাড়িয়া গ্রামের অতুল কামিনী পাঠাগারই হচ্ছে অঞ্চলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার।

পাত্রসায়র থানার গ্রন্থাগার আন্দোলন মোটামুটি সংগঠিত। এখানকার সদুদয় নেতাজী গ্রন্থাগার জেলার মধ্যে সবচেয়ে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার। এঁদের পুস্তক সংখ্যা প্রায় ১৭০০; এঁরা এই অঞ্চলের অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলিকে সংগঠন করার দায়িত্ব নিয়েছেন। বালসি গ্রামের ধ্রুব সংহতি মোটামুটি সংগঠিত গ্রন্থাগার।

খাতড়া শহরে খাতড়া ক্লাব এণ্ড সেন্ট্রাল রিক্রিয়েশান লাইব্রেরী একমাত্র গ্রন্থাগার। এঁদের পুস্তক সংখ্যা প্রায় ৭০০ শত এবং এঁদের সম্পাদক আমায় জানালেন যে গ্রন্থাগারটি নাকি সরকারের এরিয়া থিকে পড়েছে।

বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি করতে হলে শর্ট ট্রেনিং ক্যাম্পএর সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। এর গুরুত্ব শুধু কুশলী গ্রন্থাগারিক সৃষ্টিতেই নয়। বহু গ্রন্থাগার কর্মীর একত্র সমাবেশে মনের এবং রুচির যে পরিবর্তন হয় তাতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরলা নম্বর শত্রু গ্রাম্য দলাদলির হাত থেকে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া যায়। গ্রন্থাগার পরিষদকে এদিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করছি। বাঁকুড়াতে এখনও সরকারী জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়নি, তবে হওয়ার কথা চলছে। বাঁকুড়া জেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই ভাল। কাজেই ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের কাজ এ জেলায় খুব ভাল চলবে। এবং ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু হলে বাঁকুড়া জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলন খুব তাড়াতাড়ি প্রসার লাভ করতে পারবে।

গ্রন্থ-সমালোচনা

বাংলা দেশের গ্রন্থাগার (১ম খণ্ড)—শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য। দেবদত্ত এণ্ড কোম্পানী, ৬নং বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৮৲ টাকা।

কয়েক বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি রবিবাসরীয় বসুমতীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার সময় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। লেখক যদিও গ্রন্থাগারবৃত্তির সহিত যুক্ত নন, তবু গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ বিশেষরূপে অভিনন্দনযোগ্য যে নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত লেখক বাংলা দেশের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা প্রত্যেক গ্রন্থাগার-প্রেমিককে অনুপ্রেরণা দেবে।

আলোচ্য খণ্ডে লেখক কলকাতা ও হাওড়ার ছাপ্পান্নটি গ্রন্থাগারের বিবরণ দিয়েছেন। ন্যাশনাল লাইব্রেরি এবং এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারগুলির ইতিহাস পাওয়া যাবে। এ ছাড়া কলকাতা ও হাওড়ার সকল খ্যাতনামা পাব্লিক লাইব্রেরির ইতিহাস, কার্যপরিচালনার পদ্ধতি, পুস্তক-সংখ্যা, চাঁদার হার, মূল্যবান্ পুস্তকসংগ্রহের পরিচয় ইত্যাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বাংলা দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় এই সব তথ্য যে বিশেষরূপে সাহায্য করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গ্রন্থাগার কর্মীদের নিকট এ বইটি রেফারেন্স বইয়ের মর্যাদা লাভ করবে।

গ্রন্থকার গ্রন্থাগারিক বৃত্তির সহিত যুক্ত না থাকায় সংগৃহীত বিবরণ থেকে কতকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য বাদ পড়েছে। গ্রন্থাগারের মূল্য বিচারের জন্য কোন্ কোন্ তথ্য আবশ্যক সে বিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে আলোচনার পর একটি পরিকল্পনা স্থির করে নিলে লেখকের পরিশ্রম আরো সার্থক হত। যেমন ধরা যাক, গ্রন্থাগারের পাঠক সংখ্যা, একটি নির্দিষ্ট বছরে পুস্তক ধার দেবার সংখ্যা, আয়ের পরিমাণ ও ব্যয় ইত্যাদি তথ্য না জানলে গ্রন্থাগারের পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকে। আর একটি ত্রুটিও লক্ষ্যণীয়। ১৯৫২ সালের সংগৃহীত তথ্য ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হওয়ায় অনেক সংশোধনের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তা হয়নি। প্রকাশকের কৈফিয়ৎ সত্ত্বেও এ বছরের ছাপা বইয়ে "বর্তমানে মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়", ইত্যাদি তথ্য পরিবেশিত হলে পাঠক

বিস্মিত হবেন। প্রধান প্রধান গ্রন্থাগারগুলির তথ্য সংশোধন করা খুব কষ্টসাধ্য ছিল বলে মনে হয় না।

এই ত্রুটি সত্ত্বেও লেখককে আমরা এ ধরণের একটি বই লিখে বাংলা প্রবন্ধ— সাহিত্য সমৃদ্ধ করবার জন্য ধন্যবাদ জানাই। এরূপ সীমিত চাহিদার বই প্রকাশ করে প্রকাশক যে ঝুঁকি নিয়েছেন সে জন্য তিনিও অভিনন্দন লাভ করতে পারেন। আমাদের একান্ত দরিদ্র গ্রন্থাগার-সাহিত্যে এই বইটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতাব্দীর আলেখ্য—লেখক শ্রীবিমলেন্দু কয়াল। কয়াল পুস্তক প্রকাশনী, ৯।১।এস্ ডাঃ সুরেশ সরক র রোড কলিকাত —১৪ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৵০+১০৪+৪০। মূল্য তিন টাকা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস আধুনিক বাংলা তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের শিক্ষার ইতিহাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে বাংলা ভাষায় এই ইতিহাস প্রচার খুব সময়োচিত হইয়াছে। East India Companyর আমলে এদেশে শিক্ষার উন্নতির জন্য Adam সাহেবের ব্যবস্থানুযায়ী ১৮২৩ সালে General Committee of Public Instruction স্থাপিত হয়। তাহার পর ইংরাজী শিক্ষার দিকে দেশের আকর্ষণ বিশেষভাবে বাড়িয়া যায় এবং শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যকলাপ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। ফলে সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ১৮৪২ সালে Council of Education প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় এদেশীয় ছাত্রদের নিপুণতা লক্ষ্য করিয়া পরিশেষে ছাত্রদের উৎসাহ-বর্ধনের ও যোগ্যতাকে যথাযোগ্যভাবে স্বীকৃতি দিবার উদ্দেশ্যে ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা গ্রহণের প্রতিষ্ঠান হইতে ক্রমান্বয়ে শিক্ষাদানের ও গবেষণার সহায়তার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ছাত্রদের শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া জীবিকা সংস্থানে সহায়তা পর্যন্ত নানা কাজে আজ ইহা আত্মনিয়োগ করিয়াছে। বস্তুতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙালী মাত্রেরই প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। ইহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটি পাঠক সমাজে সমাদৃত হইবে বলিয়াই মনে হয়। বইয়ের ভাষা ভাল, ছাপা মোটামুটি নির্ভুল।

—বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

একাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বৎসরান্তে আমরা একাদশ সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলাম, পুরুলিয়ায়। পুরুলিয়ার সদ্য বঙ্গভুক্তির পর সেই ভূমিতে এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান আমাদের মনকে কিছুটা আবেগময় করে তুলেছিল, এ সত্য অনস্বীকার্য। আবেগ বহুদিনের প্রবাসী আত্মীয়কে স্বজনের মধ্যে লাভ করার স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র। তা যুক্তিকে দুর্ব্বল ক'রে কর্ম্মপন্থা নির্ব্বাচনে বিভ্রান্তি ঘটায় না, তা' বুদ্ধির উপলব্ধিকে অন্তরের স্পর্শে শ্রীমণ্ডিত করে তোলে।

এই অনুকূল পরিবেশের মধ্যেই আমরা একাদশ সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলাম। গত সম্মেলনের নির্দ্দেশকে ভিত্তি করে রচিত একটি প্রবন্ধে আমাদের আলোচনার সীমা নির্দ্দেশ করে। আপাতদৃষ্টিতে আমরা আমাদের অনেকবারের উচ্চারিত দাবীকে নোতুন করে করলাম বলেই বোধ হয়। কিন্তু সে দাবীর স্বরূপ যে বিশদ বর্ণনার পর অতীত রূপকে অতিক্রম করে চলেছে তা' লক্ষ্য করবার।

যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আজ সরকারী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে আগতপ্রায় বলে বোধ হচ্ছে তা কিরূপে বিকশিত হলে কোন পথে পরিচালিত হ'লে সর্ব্বাধিক সামাজিক সার্থকতা লাভ করতে পারে তার নির্দ্দেশ দেওয়াই একাদশ সম্মেলনের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল। গৃহীত প্রস্তাবাবলীতে নির্দ্দেশ যতদূর সম্ভব সুস্পষ্টভাবেই দেওয়া হ'য়েছে। সম্মেলনে বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে প্রকাশিত এই সুচিন্তিত জনমতকে উপযুক্ত মর্য্যাদায় গ্রহণ করা দেশের সরকারের স্বাভাবিক কর্ত্তব্য বলেই বোধ হয়।

সম্মেলনের নির্দ্দেশ পরিষদ কর্ম্মীদেরও গুরু দায়িত্বের সম্মুখীন করে দিয়েছে, প্রধানতঃ দুই দিকে। প্রথমতঃ যে নির্দ্দেশকে আরও ব্যাপকভাবে সাধারণে প্রচার করার ভার মূলতঃ পরিষদ কর্ম্মীদের। দ্বিতীয়তঃ সে নির্দ্দেশের মধ্য হতে আগামী দিনের বক্তব্যকে রূপায়িত করার কাজও এই পরিষদ কর্ম্মীদেরই। বিশদ এবং বহুল আলোচনার মধ্য দিয়েই আজকের বক্তব্যের সেই নবরূপ লাভ সুলভ হয়ে উঠবে, আগামী সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ের রূপ রেখা নির্দ্দিষ্ট হয়ে যাবে।

পরিষদ কর্ম্মীদের কাছে তাই আমরা আবেদন জানাবো যে আপনারা সম্মেলনের গৃহীত সুপারিশাদিকে বিভিন্ন সভা বা পাঠচক্রে আলোচনা করুন। সম্মেলনের সমস্ত বক্তব্যকে সকলের সমস্ত লোকের কাছে পৌঁছিয়ে দিন। যে

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আগত প্রায় তাকে সামাজিক সার্থকতায় সবচেয়ে ভালো পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। এ দায়িত্ব সক্রিয়ভাবে পালন করাই আমাদের কর্তব্য। সকলের সাধ্যমত শক্তি ও বুদ্ধি দিয়েই কর্তব্য পালন করা প্রয়োজন। কোনও নিষ্ক্রিয়তার ফলে যদি শ্রম বা অর্থের কোনও অপব্যয় বা অসার্থক ব্যয় ঘটে বা অন্য কোনও অনভিপ্রেত অবস্থার সৃষ্টি হয় তবে নিষ্ক্রিয় থাকার যুক্তিতে বোধহয় তার দায়িত্ব এড়ানো সম্ভব হবে না।

শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারের বেতন ও পদমর্যাদা শিক্ষকগণের সমতুল্য করার জন্য যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় সে সম্পর্কে আমরা পূর্বেও নানাক্ষেত্রে আমাদের মতামত জানিয়েছি। শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম পরিপূরক হিসেবে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিহার্য—এবং সেই কারণে গ্রন্থাগারিকের পদও দায়িত্বপূর্ণ। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব সমপর্যায়ভুক্ত। উপযুক্ত শিক্ষক বিনা শিক্ষা যেমন সার্থকতা লাভ করেনা, উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক ব্যতিরেকেও শিক্ষা তেমনি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এ দুই পদের মধ্যে বেতন ও পদমর্যাদার তারতম্যের দরুণ উপযুক্ত ও যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারিক পদের প্রতি কোনও আকর্ষণই সৃষ্টি করে না। ফলে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ হয় না। একথা বিবেচনা করেই সম্মেলন সরকারী ও বে সরকারী স্কুল ও কলেজ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকগণের বেতন ও পদমর্যাদা শিক্ষকগণের সমতুল্য করার অভিমত প্রকাশ করেছে।

সম্মেলন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে ফ্যাক্টরী এ্যাক্টের আওতাভুক্ত সকল কলকারখানার শ্রমিকদের আইনানুযায়ী অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদির মধ্যে গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্তির জন্যে অনুরোধ করেছে। কলকারখানায় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনের কথা অনেকেরই অভিনব মনে হয়েছে। কিন্তু বিদেশের নজির না টেনেও এদেশেই ইতিমধ্যে বহু কারখানায় প্রয়োজনের তাগিদে ক্লাব, ক্যানটিনের সঙ্গে গ্রন্থাগারের যে সুযোগ সুবিধা হয়েছে সে কথার উল্লেখ করা যেতে পারে। উৎপাদনের শ্রী ও সমৃদ্ধির জন্যে টেকনিক্যাল লাইব্রেরীর প্রয়োজন অনস্বীকার্য এবং শ্রমিকদের যান্ত্রিক জীবনে মানবিক সত্তার উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে —গ্রন্থাগারেরই ব্যবহার ফলপ্রদ হবে।

গ্রন্থাগার

৭ম বর্ষ।] জ্যৈষ্ঠ : ১৩৬৪ [২য় সংখ্যা

বইয়ের ভবিষ্যৎ

অভয়কুমার সরকার

আমেরিকায় একটা কথা উঠেছে বইয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে। কথাটা হ'লো এই—এখনকার এই সিনেমা, টেলিভিশন, রেকর্ডের যুগে লোকে কি আর বই পড়তে চাইবে?

কথাটা একটু পরিষ্কার ক'রে বলা দরকার। ধরুন, সারাদিনের কাজ-কর্মের পর অবসন্ন শরীর আর মন নিয়ে আপনি বাড়ী ফিরলেন। হাতের কাছে টেলিভিশন সেট থাকলে তখন হয়ত সেটা খুলে আপনি কোন নাটকের অভিনয় দেখলেন কিংবা আপনার টেপ রেকর্ডিংয়ে কোন কবিতার আবৃত্তি, কোন নভেল পাঠ শুনলেন। বইয়ের কথা আপনার মনেও হ'লো না, তাছাড়া পড়ারও একটা কষ্ট আছে। দেখা বা শুনা অবসন্ন শরীরেও সম্ভব।

বইয়ের বিষয়-বস্তু যদি দেখে কিংবা শুনে জেনে নেওয়া যায় তাহলে কত সুবিধা একবার ভেবে দেখুন। কষ্ট ক'রে অক্ষর পরিচয় করতে হবে না বানান মুখস্থ করতে হবে না। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সরকারকে মাথা ঘামাতে হবে না। লোকে সত্যি সত্যি না পড়ে পণ্ডিত হতে পারবে। কথাটা একটু তলিয়ে দেখুন। বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে ছাপা বইয়ের মতই যদি রেকর্ড করা বই সহজ লভ্য হয়, তাহলে আপনি কি রেকর্ড করা বই বেশী পছন্দ করবেন না? পাঠ-যন্ত্রের মধ্যে বইখানা রেখে দিয়ে শ্রবণ-যন্ত্র কানে লাগিয়ে নিন, ব্যস পাতার পর পাতা বই পড়ে শোনাবেন লেখক আপনাকে। ইচ্ছা করেন তো আপনি আলো নিভিয়ে আরাম করে আপনার শয্যার উপর শুয়ে পড়ুন, কিংবা ঘরের মধ্যে ছেলেমেয়েরা যদি গোলমাল করে, তবু আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক-তত্ত্ব শুনতে আপনার একটুও অসুবিধা হবে না।

কারা বই পড়ে এবং কেন বই পড়ে এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনো খুব বেশী নয়। তবে দেখা গেছে উচ্চ শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বই পড়াও বেড়েছে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের হাতে অবসর সময় বাড়াকমার সঙ্গে বই পড়া বাড়াকমারও একটা সম্বন্ধ রয়েছে। অর্থোপার্জনেই যাঁদের দিন কেটে যায়, যাঁরা সামান্য লেখাপড়া শিখেছেন, যাঁরা বিত্তবান, সাধারণত তাঁদের মধ্যে পাঠক সংখ্যা কম। বইয়ের দাম কম হ'লে, ছাপা পরিপাটী হ'লে, প্রচ্ছদপট সুন্দর হ'লে পাঠক বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। তবু একই গল্প যদি চলচ্চিত্রে এবং মুদ্রিত গ্রন্থে পাওয়া যায় তাহলে বহু পাঠক প্রথমটাতেই আকৃষ্ট হবেন। ছবি দেখে বা বই পড়া শুনে কোন গল্পের অনুসরণ করতে অসুবিধা হয় না, বিশেষ করে যদি বিষয়বস্তু অপরিচিত না হয়। কিন্তু বই পড়তে শিখতে হয়, এর জন্য অক্ষর জ্ঞান থাকা চাই। তাছাড়া দেখে আর শুনে বুঝতে যত দেরী হয়, পড়ে বুঝা আরও সময় সাপেক্ষ, কারণ পড়তে গেলে দেখতে আর শুনতে হয়ই তাছাড়া বুঝতে হয়।

আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের সভাপতি র‍্যালফ্ শ' যিনি সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন, তিনি 'ইলেকট্রিক ব্রেণের' মত যন্ত্র তৈরী করতে সিদ্ধহস্ত। বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি পুস্তক লেন-দেনের একটা যন্ত্র তৈরী করেছেন। তিনি একবার বলেছিলেন, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিট্যানিকার সমগ্র বিষয়বস্তুকে বৈদ্যুতিক চুম্বক শক্তিতে রূপায়িত ক'রে 'ইলেকট্রিক ব্রেণের' মত যন্ত্রে ধরে রাখা যায়, যার সাহায্যে বোতাম টিপে প্রয়োজনমত প্রশ্নের উত্তর জেনে নেওয়া যায়। তবে এতে বিরাট খরচ, তাছাড়া বইটা রাখতে যত জায়গা দরকার, এই যন্ত্র আর অন্যান্য সরঞ্জাম রাখতে তার ১৫ গুণেরও বেশী জায়গা লাগবে। কেউ কেউ এমন কথাও ভাবতে শুরু করেছেন যে, যে সমস্ত প্রশ্ন গ্রন্থাগারে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয় তার উত্তরগুলোও এইভাবে যান্ত্রিক সাহায্যে দেওয়া যেতে পারে। তাতে একদিকে যেমন সূত্রসন্ধান সহায়ক গ্রন্থাগারিকের কাজ হাল্কা হ'য়ে যাবে, অন্যদিকে তেমনি প্রশ্নকারীরও সময় বেঁচে যাবে।

এগুলো এখনও কথার কথা। ইতিমধ্যে যা ঘটেছে, তা হ'লো এই। ওদেশের বড় বড় রেকর্ড তৈরীর কারখানায় নাটক, গান ও অন্যান্য বিষয়বস্তু যার অর্থের চেয়ে শব্দের আবেদন অগ্রগণ্য তাদের রেকর্ড তৈরী হচ্ছে। লাইব্রেরী অব্ কংগ্রেস, হার্ভার্ড ইউনিভারসিটিও এ সব কাজ কিছু কিছু হাতে নিয়েছেন। দু একটি প্রকাশকও ছেলেদের বই ছাপার সঙ্গে সঙ্গে তার রেকর্ডও

তৈরী করেছেন এবং বাক্সের মধ্যে ক'রে রেকর্ড ও বই একই সঙ্গে বিক্রী হচ্ছে। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে আজকাল শুধু বই নিয়ে কারবার করা চলছে না। প্রায় সবাই বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামোফোন রেকর্ড, রোল করা টেপ রেকর্ডিং ইত্যাদি রাখছেন। রকমারী ছবি, মডেল, চার্ট, শিল্পবস্তুর নমুনা ইত্যাদি সংগ্রহ করছেন; ফিল্ম, ফিল্ম ষ্ট্রিপ, স্লাইডও রাখা হচ্ছে। এদের বিজ্ঞান সম্মত সূচী তৈরী করা হচ্ছে। নিয়মিত লেন-দেনেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারে বিশেষভাবে তৈরী প্রকোষ্ঠ রাখতে হয়েছে, যেখানে এসে শ্রোতারা রেকর্ড বাজিয়ে শুনছেন একই রেকর্ড ৫।৬ জন শ্রোতা শুনতে পারেন তার বন্দোবস্ত রয়েছে। শেষে শ্রোতারা পছন্দ মত রেকর্ড বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছেন। সুদূর পল্লীতেও এই সব জিনিষ পাঠানো হচ্ছে। রাখবার জন্য বিশেষ আধার তৈরী করতে হয়েছে, প্রকোষ্ঠে তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞ নিযোগ করতে হয়েছে। এই সব শ্রব্য-দৃশ্য সরঞ্জাম বাদ দিয়ে কেবল মুদ্রিত ও হস্তলিখিত গ্রন্থ নিয়ে গ্রন্থাগার করবার সাহস আর এদের নেই।

গোড়ার প্রশ্নে ফিরে আসা যাক্। সত্যিই কি মুদ্রিত গ্রন্থ রেকর্ড করা গ্রন্থের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হবে? সুদূর ভবিষ্যতের কথা কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে অন্ততঃ হাজার বছরের মধ্যে গ্রন্থের স্থান অদ্বিতীয় থাকবে একথা বলা কিছু কঠিন নয়। আমরা যে গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত তার কতকগুলো সুবিধা আছে যা রেকর্ডের নেই। রেকর্ডে ছবি নেই, কোন বিশেষ অধ্যায় বা অনুচ্ছেদ দেখবার সুবিধা নেই, রাখিবার জায়গা বেশী লাগে, বইয়ের মত হাতে হাতে ঘুরতে পারে না আর ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী, তাছাড়া আয়ু কম ও দাম বেশী। এত সস্তায় এত কম জায়গায় এত বেশী জ্ঞান এত মনোরম করে উপযুক্ত সূচী দিয়ে সাজিয়ে সংগ্রহ ক'রে রাখবার যে পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে বইয়ের মধ্যে তার তুলনা নেই। রেকর্ড চলচ্চিত্র, স্থির চিত্র বইয়ের পরিপূরক হ'তে পারে, কোনটাই তার বদলী নয়।

কাল পরিবর্তনের সন্ধিস্থলে পুরাতনের সহিত নূতনের দ্বন্দ্ব অনিবার্য। সত্যকে 'অত্যাগের' কাছে হেয় করিয়া নূতনকে হার মানিলে চলিবে না। আঘাত সংঘাতের দ্বারাই সত্যের রাজ-সিংহাসন নির্মিত হইতে থাকে—অতএব বোঝা পাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বাধা দিবার শক্তি পুরাতনের আছে, কিন্তু বাধা কাটাইবার শক্তি নূতনের। সেই শক্তি যদি পর্যাপ্ত হয় তবে সত্যকে পাথরের তলায় গোর দেওয়া হয়। —রবীন্দ্রনাথ

ছক ও খাতাপত্র

বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য নানারকমের খাতাপত্রের প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিভাগেই যে যে কাজ করা হয় তাহার এরূপ লিখিত বিবরণ থাকা প্রয়োজন যাহাতে কোন কর্মী প্রতিষ্ঠানকে ছাড়িয়া গেলেও তাহার সমস্ত কার্যের আনুপূর্বিক ইতিহাস রচনা করা যায়—যাহাতে কর্মীর প্রত্যেক কাজটিই যথাযথভাবে করা হইয়াছে কিনা, তাহা মিলাইয়া লওয়া যায়। সুতরাং গ্রন্থাগারে কী কী খাতাপত্র থাকা প্রয়োজন, ইহার বর্ণনা করা মানে সংক্ষেপে সমস্ত গ্রন্থাগার পরিচালনার মূল কথাগুলি আলোচনা করা।

গ্রন্থাগারের সব চেয়ে প্রথম প্রয়োজন যদি গ্রন্থ হয়, তাহা হইলে গ্রন্থের পরিগ্রহণ বহি (Accession Register) গ্রন্থাগারের সব চেয়ে প্রথম প্রয়োজনীয় খাতা। বস্তুতঃ গ্রন্থাগারের সমস্ত সম্পদের মোটামুটি হিসাব আমরা এই বই হইতেই পাইয়া থাকি। বীমা কোম্পানি, সরকার, পরিদর্শক সকলের গ্রন্থাগারের সম্পদ বিবেচনায় এই পুস্তকের লিখিত হিসাবপত্রকেই সব চেয়ে বেশী প্রাধান্য দিয়া থাকেন।

পরিগ্রহণ বহিতে প্রত্যেক সংগৃহীত পুস্তকের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হয়। সাধারণতঃ ইহার জন্য ছক (form) প্রস্তুত অবস্থায়ই কিনিতে পাওয়া যায়। পরিগ্রহণ বহিতে সাধারণতঃ এই কয় বিষয়ের সংবাদ দেওয়া হয় :--

পরিগ্রহণ সংখ্যা	পরিগ্রহণ দিবস	পুস্তকের বিবরণ				
		নাম	লেখক	প্রকাশক	প্রকাশ স্থান	প্রকাশ ও সংস্করণ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

দাতা বা বিক্রেতার নাম	মুদ্রিত মূল্য	বিল সংখ্যা ও তারিখ	পৃষ্ঠা সংখ্যা	গ্রন্থ সংখ্যা	নিষ্কাশনের বিবরণ	মন্তব্য
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪

পরিগ্রহণ সংখ্যা (accession number) :—গ্রন্থাগারে যেমন যেমন বই পাওয়া যায়, বিষয় প্রভৃতির বিচার না করিয়া তেমন তেমনই বইগুলিতে এক ক্রমিক সংখ্যা (serial number) দেওয়া হয়। এই সংখ্যাকে পরিগ্রহণ সংখ্যা বলে। পরিগ্রহণ সংখ্যাটি সাধারণতঃ বইয়ের নামের পাতায় (Title Page) পিছন দিকে লেখা হয়। তাহা ছাড়াও প্রত্যেক গ্রন্থাগার প্রতি গ্রন্থের কোন এক নির্দিষ্ট সংখ্যক পৃষ্ঠায় এই সংখ্যাটি লিখিয়া রাখে। বই-চোরেরা অনেক সময় বইয়ের নামের পাতাটি ছিড়িয়া ফেলিয়া বইয়ের প্রকৃত মালিকের সম্পর্ক বিলোপের চেষ্টা করে। তাহা ছাড়া বইয়ের নামের পাতায় পাঠ্য বিষয় সাধারণতঃ থাকে না এই জন্যও নামের পাতা অসাধু লোকেরা সহজেই বিলুপ্ত করে। কিন্তু বইয়ের ভিতরের এক অজানিত পাতায়, যে পাতা পাঠ্য বিষয়ের বিবরণ পরিপূর্ণ তাহাতেও বইয়ের পরিগ্রহণ সংখ্যা লেখা থাকা কচিৎ কদাচিৎ হয়ত বইয়ের মালিকানা সাব্যস্ত করিতে অনেকখানি সাহায্য করিতে পারে।

কোন কোন গ্রন্থাগারে প্রতি বৎসর নূতন করিয়া পরিগ্রহণ সংখ্যা আরম্ভ করা হয়। অর্থাৎ আগের বৎসর ১৯৫৬ সালে যদি ১৩৬ খানা বই কেনা হইয়া থাকে তাহা হইলে ১৯৫৭ সালে কেনা প্রথম বইয়ের পরিগ্রহণ সংখ্যা লেখা হয় ১৯৫৭ সালের ১ ইত্যাদি। কিন্তু ইহা অসুবিধাজনক।

পরবর্তী বৎসরের ক্রমিক পরিগ্রহণ সংখ্যা নূতন করিয়া না লিখিয়া পূর্ব বৎসরের শেষ সংখ্যার পর হইতে আরম্ভ করাই বিধেয়। ইহাতে লিখিতে হইবে কম, এবং গ্রন্থাগারের মোট সংগৃহীত পুস্তক সংখ্যা গ্রন্থাগারিকের নখাগ্রে থাকিবে।

পরিগ্রহণ দিবস (accession date) :—যে তারিখে সংগৃহীত গ্রন্থের বিবরণ পরিগ্রহণ বহির অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেই তারিখটিকেই পরিগ্রহণ দিবস বলা যায়। পরিগ্রহণ দিবসের আলোচনা প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই গ্রন্থ আসামাত্র পরিগ্রহণ-বহির অন্তর্ভুক্ত করার সুবিধা অসুবিধার বিবেচনা আসিয়া পড়ে। বই-কেনার পর পাঠকের হাতে পৌঁছান পর্যন্ত বইকে কতকগুলি প্রক্রিয়ার (Process) মধ্য দিয়া যাইতে হয়। বিষয়, গ্রন্থকার ও গ্রন্থ সংখ্যার সঙ্কেত অর্থাৎ বইয়ের সঙ্কেত-নাম (Call Number) বইয়ের উপর লিখিয়া রাখা ও সূচী নির্মাণ তাহার অন্যতম। পরিগ্রহণ বহিতে বইয়ের এই সঙ্কেতগত নামটিও লিখিয়া রাখিতে হইবে। সুতরাং পরিগ্রহণ বহিতে পুস্তকের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিবার পূর্বেই উহা নিরূপিত হইয়া আসা প্রয়োজন। সুতরাং অনেকে বলেন, পরিগ্রহণ বহিতে

পুস্তকের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার কাজ সবচেয়ে শেষে করিতে হয়। তাহাদের প্রধান যুক্তি এই যে তাহা না হইলে প্রতি বইয়ের জন্য পরিগ্রহণ বহি দুইবার লেখার আবশ্যক হয়—প্রথমবার বইটির বর্গীকরণ ও সূচীলেখনের পূর্বে এবং দ্বিতীয়বার এই সমস্ত হইয়া যাইবার পর। বই কেনার পর বর্গীকরণ বিভাগে পাঠাইবার সময় বইগুলির জন্য তাহা হইলে পৃথক্ তালিকা নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। কিন্তু বইয়ের জন্য চালানের বা বিলের যদি একাধিক প্রতিলিপি পাওয়া যায় তাহা হইলে ঐরূপ একটি প্রতিলিপিতেই স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া বইগুলি অপর বিভাগে দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে পরিগ্রহণের তারিখটি পুস্তক ক্রয়ের অর্থাৎ পুস্তক বিক্রেতার বিলের তারিখের সহিত এক নাও হইতে পারে।

পুস্তকের বিবরণ :—প্রথম সংস্করণ ব্যতীত গ্রন্থের সংস্করণের সংখ্যা গ্রন্থনামের সহিত উল্লেখ করিতে হইবে। গ্রন্থ একাধিক খণ্ডে সম্পূর্ণ হইলে গ্রন্থের খণ্ড সংখ্যাও গ্রন্থনামের মধ্যে উল্লেখ্য।

বিল সংখ্যা ও তারিখ এবং ভাউচার সংখ্যা—অনেক গ্রন্থাগারেই এই দুইটি বিবরণ পৃথক্ করিয়া লেখা হয় না। তারিখ হিসাবে বিল ভাউচারগুলিকে একত্র সাজাইয়া রাখিলে একটি লিখিয়া রাখিলেই সেই সূত্রে অপরটিকে খুঁজিয়া বাহির করা যায়। সেই জন্য দুইটি বিবরণ পৃথক্‌ভাবে লিখিবার তেমন অনিবার্যতা নাই। তবুও যদি সম্ভব হয় দুইটি বিবরণই লিখিয়া রাখিলে অনেক সময় আর একটি খাতা খুঁজিয়া বাহির করিবার ঝঞ্ঝাট এড়ান যায়।

নিষ্কাশণের বিবরণ (Details of writing off or weeding out) :—পরিগ্রহণ বহিতে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত পুস্তকের জন্যই গ্রন্থাগারিককে হিসাব দিতে হয়। তাই কোন গ্রন্থকে পরিগ্রহণ তালিকা হইতে নিষ্কাশিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার গ্রন্থাগারিকের থাকে না—থাকে গ্রন্থাগার পরিচালক সমিতির। ঐ সমিতির যে তারিখের যত সংখ্যক প্রস্তাব অনুযায়ী পুস্তকের নিষ্কাশন অনুমোদিত হয় তাহা এই স্থানে লিখিয়া রাখিতে হয়।

পরিগ্রহণ বহির আলোচনা প্রসঙ্গেই আমরা বিল বহি ও ভাউচার বহির কথা উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণতঃ গ্রন্থাগারে বইগুলির সঙ্গে সঙ্গে বিল আসে না, আসে চালান তাহার পরে চালানে উল্লিখিত বইগুলির মধ্যে যেগুলি কেনা সাব্যস্ত হয় সেইগুলির জন্য বিল আসে। এই বিলের টাকা যখন দেওয়া

হয়, তখন বিলের পিছনে বিক্রেতা বা তাহার কোন প্রতিনিধির স্বাক্ষর দেওয়া হয়। তাহার পর সাধারণতঃ একটি গার্ড ফাইলে ঐগুলিকে আট্‌কাইয়া রাখা হয়।

বিভিন্ন দোকান হইতে বই কেনা হয় বলিয়া বিলগুলির মধ্যে কোন সংখ্যাগত পারম্পর্য থাকে না। ফলে তারিখ ব্যতীত আর এমন কোন সূত্রই পাওয়া যায় না যাহাতে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিলটিকে সহজে বাহির করা যায়। এই জন্য বিলের টাকা দেওয়ার পারম্পর্য অনুসারে বিলগুলির উপর ক্রমিক সংখ্যা বসাইয়া দেওয়া হয়। এই সংখ্যাগুলিকে ভাউচার সংখ্যা বলা যায়। গার্ড ফাইলটিকে সাধারণতঃ Invoice Book বা বইয়ের চালানের খাতা বলা হয়। আর্থিক ব্যাপারে পরিগ্রহণ বহিটির পরই এই চালান বহির গুরুত্ব। গ্রন্থাগারের হিসাব পরীক্ষার সময় ইহার অনুসরণ করিয়াই গ্রন্থের জন্য ব্যয়গুলিকে মিলাইয়া লওয়া হয়। কোন বিক্রেতা বিক্রীত পুস্তকের দাম আদায় করিয়াছে কিনা ভুলিয়া গেলে ইহার সাহায্যেই বিষয়টির নিষ্পত্তি করা যায়। বিলে উল্লিখিত প্রত্যেক বইয়ের পাশে পরিগ্রহণ সংখ্যাটি লিখিয়া রাখিলে তবেই এই বিলগুলিকে পুস্তকের সঙ্গে সম্বন্ধ করা যায়।

পরিগ্রহণ বহির আলোচনা প্রসঙ্গেই আমরা আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি। গ্রন্থাগার পরিচালক সমিতির সভার বিবরণ সম্বন্ধীয় পুস্তক ও গ্রন্থাগারের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বহি।

গ্রন্থাগারের হিসাবের খাতা রাখার কথাও এই প্রসঙ্গে আসিয়া পড়ে। এই হিসাবের খাতায় সমস্ত আর্থিক লেনদেন লিখিয়া রাখিতে হয়।

পরিগ্রহণ প্রসঙ্গে আমরা গ্রন্থসূচীর উল্লেখ করিয়াছি। বস্তুতঃ গ্রন্থসূচী ব্যতীত কোন গ্রন্থাগারই চলিতে পারে না। পরিগ্রহণ বহি যেমন গ্রন্থাগারের সম্পদ্ যথাযথ রক্ষার জন্য প্রয়োজন, গ্রন্থ-সূচীও তেমনই সেই সম্পদ্‌কে ব্যবহারে লাগাইবার জন্য প্রয়োজন,। গ্রন্থসূচী (Catalogue) নির্মাণের জন্য একটি গ্রন্থের নানারূপ বিবরণ (Index) রচনা করিতে হয়। গ্রন্থগুলি মঞ্চে যেভাবে সাজান থাকে তাহার বিবরণও লেখা প্রয়োজন। ইহা অনুবর্গ সূচীর (Classified Catalogue) সহিত অভিন্ন হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু তবুও এইরূপ একটি বিবরণ গ্রন্থ-সংগ্রহের হিসাব নিকাশের জন্য পৃথক্ করিয়া রাখা প্রয়োজন। এই বিবরণকে মঞ্চ তালিকা (Shelf-list) বলা হয়। খরিদ্দার আসিবার পূর্বেই যেমন দোকানদারকে তাহার মালপত্র গুছাইয়া রাখিতে হয়, তেমনই গ্রন্থাগারে সাধারণকে আহ্বান করিবার পূর্বেই

ইহার পরিগ্রহণ বহি, চালান বহি, গ্রন্থসূচী ও মণ্ড তালিকা ঠিক্ করিয়া লইতে হয়। এইগুলি ঠিক্ করিয়া না রাখিলে কোন গ্রন্থাগারই তাহার বইগুলির যথাযথ সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে পারে না।

গ্রন্থাগারের কাজ আরম্ভ করিতে গেলেই পাঠকের প্রয়োজন। সুতরাং পাঠকদের বিবরণ বহি থাকা প্রয়োজন। পরিগ্রহণ বহি আলগা পত্রকে (Book Cards) রাখার বিরুদ্ধে বীমা কোম্পানী প্রভৃতির আইনঘটিত আপত্তি একটি প্রবল বাধা। সুতরাং পরিগ্রহণ বহি বাঁধান হওয়াই দরকার। কিন্তু সভ্যের আবেদন পত্রটি যদি ৫''×৩'' পত্রে (card) করা যায় তাহা হইলে সেইগুলিকে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজাইয়া রাখা যায়। সভ্যের আবেদন পত্রের এক পৃষ্ঠে গ্রন্থাগারের নাম লিখিতে হইবে। তাহার পর সভ্য হইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য ছাপাইতে হইবে। পরে নাম সহি করিয়া দিতে হইবে। ঐ পাতায়ই গ্রন্থাগারে চাঁদা দেয় থাকিলে চাঁদা যে বৎসর পর্যন্ত শেষ করা হইয়াছে, সেই বর্ষের সংখ্যা লেখার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। সুপারিশকারক বা জামিন কেহ থাকিলে তাঁহার নাম, ঠিকানাও ঐ পাতায়ই লিখিয়া রাখিতে হইবে। কিছু জমা রাখা হইলে তাহার উল্লেখও ঐ পত্রকে রাখিতে হইবে।

পত্রকগুলিকে পাঠক নামের আগুক্ষর হিসাবে বর্ণানুক্রমে সাজাইয়া রাখিতে পারিলে একটি সুন্দর পাঠক-বিবরণ (Borrowers' Register) নির্মিত হইতে পারে।

রসিদ বহি প্রত্যেক সাধারণ প্রতিষ্ঠানের ন্যায় গ্রন্থাগারকেও রাখিতে হইবে। হিসাবের খাতায় লিখিত গ্রন্থাগারের ব্যয়গুলিকে যেমন বিল বহির বা ভাউচার বহির সাহায্যে মিলাইয়া লওয়া হয়, তেমনই আয়গুলিকে মিলাইয়া লইতে হয় রসিদ বহির সহিত। বস্তুতঃ রসিদ না দিয়া কোনরূপ অর্থাদিই গ্রহণ করা উচিত নহে। প্রত্যেকটি রসিদ বহিতে ক্রমিক সংখ্যা অঙ্কিত থাকা প্রয়োজন। রসিদের একটি প্রতিলিপি গ্রন্থাগারে রাখিতে হইবে এবং তাহার উপর অঙ্কিত সংখ্যাটির উল্লেখ হিসাবের খাতা লিখিবার সময় করিতে হইবে।

গ্রন্থাগারের অপর প্রয়োজনীয় খাতা হইতেছে বই লেনদেনের হিসাব। নেওয়ার্ক বা ব্রাউন পদ্ধতিতে বইয়ের লেনদেন করা হইলে অবশ্য পুস্তক পত্রক (Book Card) একক কিংবা পাঠকের অনুমতি পত্র (Borrowers' Ticket) ও পুস্তক পত্রক একত্র এই নথির কাজ করিতে পারে। যে সমস্ত গ্রন্থাগারে

পুস্তক লেনদেনের জন্য নেওয়ার্ক বা ব্রাউন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না, সেখানে পৃথক্ পৃথক্ খাতায় এই হিসাব রাখিতে হয়। এই খাতা রাখার দুইটি পদ্ধতি আছে। প্রথমতঃ যেমন যেমন বই দেওয়া হয় তেমন তেমন পর পর লিখিয়া যাওয়া হয়। যদি ধার দেওয়া বইটিতে ধার দেওয়ার তারিখটি লেখা থাকে তাহা হইলে বই ফেরতের সময় সেই বইয়ের হিসাব পরিশোধ করা কঠিন হয় না, কিন্তু যদি সেই তারিখটি কোথাও লিপিবদ্ধ না থাকে তাহা হইলে এইরূপ হিসাব দেখিয়া বইটি ফিরাইয়া লওয়া সহজ হয় না। লেনদেনের খাতা রাখার দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল প্রত্যেক পাঠকের জন্য পৃথক্ পত্র রাখা। তাহাতে যদি বইটি ধার দেওয়ার তারিখ নাও লেখা থাকে তাহা হইলেও বইটি ফিরাইয়া লওয়ার অসুবিধা হয় না। বই লেন দেন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রত্যেক প্রগতিশীল গ্রন্থাগারই পরিসংখ্যান বিশেষ করিয়া পুস্তক আদান প্রদানের পরিসংখ্যানের জন্য খাতাপত্র রাখে। পাঠকদের সুবিধা-অসুবিধা, পুস্তক ক্রয়ের সুপারিশ, বইয়ের চাহিদা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মন্তব্য প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিবার জন্যও ব্যবস্থা প্রায় প্রত্যেক প্রগতিশীল গ্রন্থাগারই করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া পুস্তক-পত্রক, পাঠকের অনুমতি-পত্র, পুস্তক প্রত্যার্পণের বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি নানাবিধ ছাপান ছক গ্রন্থাগারে ব্যবহার করা হয়। ইহার কোন কোনগুলির সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠিলে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। কিন্তু যেগুলির উল্লেখ করা হইল সেইগুলি সর্বত্র সব গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্যই অপরিহার্য।

গ্রন্থ ও মুদ্রণ শিল্প

পশুপতি ভট্টাচার্য

গ্রন্থ ও মুদ্রণ শিল্পের সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ তা আর আজ আলোচনা-সাপেক্ষ নয়। গ্রন্থ প্রকাশ ও তার প্রসার আজ মুদ্রণ শিল্পের উপরই একান্ত নির্ভরশীল। মানুষ নিজের চিন্তা প্রকাশের তথা আত্মবিকাশের আদিম প্রবৃত্তির তাড়নায় পাহাড়ে-পর্বতে খোদাই করেছে তার চিন্তার স্বাক্ষর। সমাজ বিজ্ঞান বলে মানুষ তার চিন্তা অধিক সংখ্যক লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই নিত্য নূতন মাধ্যম খোঁজে নেয়; মুদ্রণ শিল্পের গোড়া-পত্তন মানুষের সেই আদিম তাড়নারই এক রূপ,

তাই 'মানুষের কথা' পর্য্যন্তেই শেষ হয়নি। পুঁথির যুগও ছাড়িয়ে গ্রন্থে এসে পৌঁচেছে, লিপির পার্থক্য সত্ত্বেও মাধ্যম এক হয়ে গেছে। পুঁথিলেখা, পুঁথিলেখা থেকে কাঠের অক্ষর সাজানো আর তা থেকে ধাতুর অক্ষর সাজানো, অধুনা Printing without Type-এরও নিরীক্ষা চলেছে। সভ্যতার বিবর্ত্তন ঐ শিল্পকেও ভিন্নতর স্তরে নিয়ে যাচ্ছে।

গ্রন্থ

একজনের চিন্তা অপরের কাছে পেঁাছনর একটি মাধ্যম গ্রন্থ। আর সেই মাধ্যমকে সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করে তোলে মুদ্রণ শিল্প। শিক্ষা ও চিন্তার প্রসার আজ প্রত্যক্ষভাবেই মুদ্রণ শিল্পের উপর নির্ভরশীল। অনেকে হয়ত বলবেন, অক্ষরজ্ঞান মুদ্রণ-শিল্পের উপর নির্ভরশীল হলেও শিক্ষা ততটা নয়, অর্থাৎ তাঁরা শিক্ষা ও অক্ষর জ্ঞানের ভিতর একটু সূক্ষ্ম রেখা টানার পক্ষপাতি। ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে কথাটা হয়ত ঠিক, কিন্তু আজকের যান্ত্রিক যুগে বাস্তব সম্মত কিনা সে প্রশ্ন থেকেই যায়। গ্রন্থ শিক্ষার মাধ্যম। একমাত্র মাধ্যম না হলেও শ্রেষ্ঠ মাধ্যম, একথা আমি বলবই। সিনেমা বা যাত্রা বা ঐ ধরণের কোন কিছুর আবেদন দর্শক বা শ্রোতার কাছে সমষ্টিগতভাবে এবং তা মূলতঃ প্রচারধর্মী। মানুষের চেতনায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে উদ্দেশ্যমূলক লোক্‌শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে কিন্তু মানুষের চিন্তার স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশের বাধা কি না ভাব্‌বার বিষয়। গ্রন্থ 'সেখানে ব্যক্তি' মানসের পৃথকভাবে খোরাক সরবরাহ করে। স্বাধীন চিন্তার পথ বাতলায়। তার আবেদন শুধুমাত্র পাঠকের বুদ্ধির কাছে। তাই গ্রন্থই-ব্যক্তি মানুষের জ্ঞান সঞ্চয়ের শ্রেষ্ঠতম উপায়। পৃথক ভাবে বহুর কাছে স্থায়ী ভাবে তত্ত্ব আর তথ্য পরিবেশন গ্রন্থ মারফৎই সম্ভব। 'আমারটি মূল পুঁথি, তোমারটি মেকি' এ সমস্যার সমাধানও গ্রন্থ তথা মুদ্রন শিল্পের প্রবর্ত্তনেই সম্ভব হয়েছে।

মুদ্রণ

শিক্ষার সম্প্রসারণে মুদ্রণ শিল্পের অবদান কতখানি তা নিয়ে আলোচনা আজ অতীতের পর্যায়ে। গ্রন্থ-প্রকাশনে ও তার ব্যাপক প্রসারে মুদ্রণ শিল্পের দ্রুত উন্নতি বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছে। অনেকে হয়ত প্রশ্ন করে বসবেন, 'গ্রন্থ-গ্রন্থাই, তা বলে মুদ্রণ শিল্পের খুঁটিনাটি নিয়ে আমাদের এত

আলোচনার কী প্রয়োজন। আপনি যদি পাঠক হন তবে আমার উত্তর—পড়ে পড়ে বই পড়ার সময় তার বোধ না হয় এমন কোন কাগজ আছে কী না? চোখে কষ্ট না হয় এমন কোন অক্ষরে গ্রন্থ ছাপা যায় কী না, তা জানতে নিশ্চয় আপনাদের কৌতূহল আছে। অথবা সুন্দর একটি গ্রন্থ যখন হাতে নিয়ে খোশ মেজাজে বলেন, 'বাঃ বইটিত বেশ করেছে,' আপনি কী জানেন আপনার এই উক্তিটির অন্তরালে মুদ্রণ শিল্পের হাত কতখানি।

গ্রন্থের চরিত্রের উপর গ্রন্থের অক্ষর বিন্যাস নির্ভর করে। ছোটদের কবিতার বই আর বড়দের দর্শন তত্ত্বের বই নিশ্চয় একই অক্ষরে মুদ্রিত হবে না, কেন হওয়া উচিত নয় তা আমরা বারান্তরে আলোচনা করবো। যাই হোক, মুদ্রণ শিল্পের সামগ্রিক আলোচনা যখন এই একটি নিবন্ধে সম্ভব নয়, তখন মোটামুটি একটা কাঠামো দাঁড় করালে এই দাঁড়ায়—একটি অক্ষর বিন্যাস বিভাগ আর একটি মুদ্রণ বিভাগ, এই নিয়েই মুদ্রণ শিল্প, প্রধানতঃ এই দুই স্তম্ভের উপরই মুদ্রণ সংস্থা নির্ভরশীল। সহকারী হিসাবে কোন কোন স্থানে প্রুফ্ রিডিং, ইম্পোজিং ইত্যাদি অন্যান্য বিভাগও থাকে।

অক্ষর বিন্যাস বিভাগ আবার দুই ভাগে বিভক্ত: হস্ত বিন্যাস ও যান্ত্রিক বিন্যাস।

হস্ত বিন্যাস—বিভিন্ন ভাষা অনুযায়ী 'কেসের' বিভিন্ন ঘরেতে অক্ষর থাকে। যেমন ইংরাজীর বেলায় ২টি উপরের 'কেস' ও তলার 'কেস' কিন্তু বাংলার বেলায় ৪টী ইত্যাদি।

ইংরাজী উপরের 'কেসের' ঘর থেকে তলার 'কেসের' কতক কতক ঘর অপেক্ষাকৃত বড়। এর কারণ অক্ষর মালার মধ্যে কিছু অক্ষর বেশী ব্যবহার হয়। ইংরাজী স্বরবর্ণের মধ্যে a, e, i, o, u। ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে r, t, c, d, m, n, h। বাংলার মধ্যে ক, দ, ম, ন, স, ত, র, অ, া, ে প্রভৃতি ঘর বড় থাকে, একটি ষ্টিক্ অক্ষর-বিন্যাসক বাঁ হাতে রেখে ও ডান হাতে 'কেস' হতে অক্ষর নিয়ে বিন্যাস করে চলে।

যান্ত্রিক বিন্যাস—যান্ত্রিক বিন্যাস বলতে বুঝায় লাইনো টাইপ্, ইন্টার টাইপ্ ও মনো টাইপ্। 'লাইনো' ও 'ইন্টার টাইপ্' জাত এক গোত্র আলাদা কিন্তু 'মনো টাইপ্' জাত ও গোত্র দুই-ই আলাদা। শব্দের পৃথকীকরণে সমতা রক্ষা করা যান্ত্রিক বিন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পুস্তক নির্বাচনের নীতি

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রয়োজনীয় বই যোগ্য পাঠকের হাতে উপযুক্ত সময়ে তুলে দেওয়া হল সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যথোপযুক্ত নীতি অনুসারে কাজ করা উচিত। দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রবর্তক মেলভিল ডিউই আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবহারের জন্য ১৮৭৬ সালে পুস্তক নির্বাচনের জন্য একটি নীতি নির্ধারণ করেছিলেন। সেই নীতিটি হল: The best reading for the largest number at the least cost. অর্থাৎ বৃহত্তম সংখ্যক পাঠকের জন্য শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন বই সংগ্রহ করতে হবে সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে। এই নীতির মধ্যে তিনটি প্রধান কথা রয়েছে: শ্রেষ্ঠ বই; বৃহত্তম সংখ্যক পাঠক এবং সর্বনিম্ন ব্যয়। এই তিনটি অংশের অর্থ কি তা পর্যালোচনা করলে ডিউইর নীতির তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে।

শ্রেষ্ঠ বই

গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে শ্রেষ্ঠ বইয়ের সংখ্যা নগণ্য। সমালোচকের বিচারে বইটি শ্রেষ্ঠ হতে পারে; কিন্তু শুধু কাগজকলমের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রন্থাগারিকের নিকট স্বীকৃতি পাবে না। 'শ্রেষ্ঠ' কথাটি সম্বন্ধ সূচক, পারিপার্শ্বিক অনেক বিষয়ের উপর পুস্তকের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে। পুস্তক নির্বাচনের সময় "শ্রেষ্ঠ বই" কথাটি সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করতে হয়। এর ফলে গ্রন্থাগারিকের নিকট শ্রেষ্ঠ বই বলতে এই বোঝায়:

১। স্ব-ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ; অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর লেখা বইগুলি বিচার করে বলতে পারি কোনটি শ্রেষ্ঠ কোনটি অপকৃষ্ট। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা, শিল্পকলা, ধর্ম ও দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপরে লেখা পুস্তকের সংগ্রহ থেকে একটি বইকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করা যায় বা এক শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে একটি পুস্তককে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। যেমন, বিজ্ঞানের বা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বই। কিন্তু এও ঠিক হল না। সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। সাহিত্যে কত শ্রেণী বিভাগ ও রূপ বিভাগ রয়েছে। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর বই থেকে একটিকে শ্রেষ্ঠ বলে

উচিত করা যায় না। শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বা শ্রেষ্ঠ কাব্য নির্বাচন করা চলে। কিন্তু একটি কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে একটি উপন্যাসের তুলনা করে কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ তা স্থির করা যায় না। রসায়ন শাস্ত্রের মধ্যে এত উপবিভাগ আছে যে সমগ্রভাবে রসায়নের সকল বই বিচার করে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণের চেষ্টা করলে ভুল হবে। প্রত্যেকটি উপবিভাগের উপরে লিখিত বইগুলির মূল্য পৃথক ভাবে বিচার করা প্রয়োজন। এই জন্যই বলা হয়েছে যে শ্রেষ্ঠ পুস্তকের অর্থ একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ বই ; ক্ষেত্রবিশেষের সর্বোৎকৃষ্ট বই। সামগ্রিক ভাবে সকল বই বিচার করে একটিকে শ্রেষ্ঠ পুস্তকের মর্যাদা দেওয়া সম্ভব নয়।

২। গ্রন্থাগারিকের নিকট এভাবে স্ব স্ব ক্ষেত্রে গুণ বিচারের দ্বারা শ্রেষ্ঠ বলে নির্ধারিত পুস্তকও শ্রেষ্ঠ না হতে পারে। যে বই একটি বিশেষ গ্রন্থাগারের পাঠকরা ব্যবহার করবে এবং পাঠ করে উপকৃত হবে গ্রন্থাগারিকের নিকট সে বই উৎকৃষ্ট। পুথিগত শ্রেষ্ঠ বইয়ের গ্রন্থাগারে মূল্য নেই। কারণ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হল চাহিদা অনুযায়ী পাঠকদের জন্য বই সংগ্রহ করা। যে বই পাঠকরা পড়বে না সে বই গুন বিচারে যতই ভালো হোক না কেন গ্রন্থাগারিকের নিকট শ্রেষ্ঠ বই নয়। তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' যে একটি শ্রেষ্ঠ বই তা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে পল্লী অঞ্চলের গ্রন্থাগারে মূল হিন্দী বইটি ব্যবহৃত হবার আশা নেই বললেই চলে। কারণ হিন্দী বই পড়ে উপভোগ করবার মতো পাঠক বাঙলা দেশের গ্রামে বেশি নেই। 'রামচরিত মানসের' বাংলা অনুবাদ সমাদৃত হবার আশা অনেক বেশি। যদিও মূলের তুলনায় অনুবাদ গ্রন্থের উৎকর্ষ অনেক কম, তথাপি অঞ্চলবিশেষের গ্রন্থাগারে মূল অপেক্ষা অনুবাদই শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হবে। ঠিক তেমনি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা যদিও অন্যতম শ্রেষ্ঠ রেফারেন্স বই, তবু বাংলা দেশে এমন গ্রন্থাগার আছে যেখানে এ বই ব্যবহার করবার মতো উপযুক্ত পাঠক নেই। সেখানে হয়তু এভরিম্যানস্‌ এনসাইক্লোপিডিয়ার মতো ছোট ও সহজ রেফারেন্স বই ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনা বেশি। সুতরাং বিশেষ কোন একটি গ্রন্থাগারের প্রয়োজনের দিক থেকে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা শ্রেষ্ঠ বই না হয়ে এভরিম্যানস্‌ এনসাইক্লোপিডিয়া শ্রেষ্ঠ রেফারেন্স বই হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। কেন না, যে বই ব্যবহৃত হবে গ্রন্থাগারিকের নিকট সে বইয়েরই মূল্য।

৩। যে বই বিশেষ একটি বিষয় সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহল তৃপ্ত করতে সক্ষম তাকেও শ্রেষ্ঠ বই বলা যেতে পারে। হয়ত এ বইয়ের অন্যান্য প্রয়োজনীয় গুণ নেই। তবু পাঠকের চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন হলে এ ধরণের বইকেও শ্রেষ্ঠ বলা যায়। কোনো পাঠক যদি একটি বিশেষ দিনের তিথি নক্ষত্র ইত্যাদি জানতে চায় তাহলে পঞ্জিকাই উত্তর দেবার শ্রেষ্ঠ বই। পঞ্জিকার সাহিত্যিক গুণ নেই ; একটানা পড়বার মতো বইও নয়। তথাপি বিশেষ একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে বলে গ্রন্থাগারিকের নিকট এটিও একটি শ্রেষ্ঠ বই।

সকল শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ পুস্তকেরই নিম্নলিখিত চারটি গুণ অবশ্যই থাকা চাই : (ক) সত্যতা, তথ্য ও অনুভূতি ; (খ) ভাষার ও বক্তব্যের প্রাঞ্জলতা ; (গ) সুরুচি ; (ঘ) সাহিত্যিক গুণ। সাহিত্যিক গুণ অবশ্য কয়েক শ্রেণীর বইয়ের মধ্যে আশা করা যায় না—যেমন ইয়ার বুক ইত্যাদি। তবে পরিবেশিত বিষয়বস্তু সহজবোধ্য ভাষায় বলা চাই। যে কোন বই বিচার করবার সময় উপরোক্ত গুণগুলি আছে কিনা তা দেখা প্রয়োজন।

গ্রন্থাগারের জন্য শ্রেষ্ঠ পুস্তক নির্বাচন করতে হলে কতকগুলি নীতি মেনে চলতে হবে। সেই নীতিগুলি মোটামুটি এই :

(১) পুস্তক বিচারের জন্য একটি মান নির্ধারণ করে পুস্তক নির্বাচনের সময় সেই মান যথাসম্ভব রক্ষা করে চলতে হবে।

(২) পুস্তকে আলোচিত বিষয়বস্তু বিচার করতে হবে। অন্য কোন কারণে অর্থাৎ ছাপা, ছবি, বাঁধাই ইত্যাদি যেন পুস্তক নির্বাচনকে প্রভাবান্বিত না করে।

(৩) সকল বিষয়ের শ্রেষ্ঠ বই সংগ্রহ করা হবে গ্রন্থাগারিকের আদর্শ। কিন্তু যে বই উৎকর্ষে মাঝারি শ্রেণীর তা-ও কেনা যেতে পারে যদি সে বই পাঠকরা ব্যবহার করবে এমন সম্ভাবনা থাকে। কোন কোন বিষয়ের শ্রেষ্ঠ বই সাধারণ পাঠকের পক্ষে কঠিন বলে মনে হতে পারে। যেমন, "টয়েনবির স্টাডি অব হিস্টরি।" যদিও এটি এই উপবিষয়ের উপর শ্রেষ্ঠ বই, তথাপি দশ খণ্ডের পূর্ব-সূত্র কন্টকিত এই বৃহৎ বইটি সাধারণ পাঠক পড়তে উৎসাহ বোধ করবে না। কিন্তু এই বিষয়ের উপর সহজ করে লেখা একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর বই হয়ত পাঠকরা আগ্রহের সহিত পড়বে।

(৪) ভালো বইয়ের একাধিক খণ্ড কেনা ভাল, অপকৃষ্ট বই কিনে শুধু সংখ্যা বৃদ্ধি করে লাভ নেই।

(৫) যে বই প্রকৃতই ব্যবহৃত হবে একমাত্র সেই বই সংগ্রহ করতে হবে।

(৬) গ্রন্থাগারিকের মন উদার হতে হবে। তাঁর ব্যক্তিগত মতামত এবং রুচি পুস্তক বিচারের অন্তরায় যেন না হয়।

(৭) উপন্যাসকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। যে উপন্যাস নির্দিষ্টমান উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়েছে তা গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করা যেতে পারে। উপন্যাস অবসর বিনোদনের একটি সুষ্ঠু উপায়; এর শিক্ষাগত মূল্যও কম নয়। তাছাড়া উপন্যাস বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে খুব সাহায্য করে।

(৮) বইয়ের বিষয়বস্তুর বিন্যাস এবং আকার গ্রন্থাগারের উপযোগী হওয়া চাই। বিষয় ভালো হতে পারে, কিন্তু তার বিন্যাস যদি ভালো না হয় তাহ'লে পাঠকদের পক্ষে ব্যবহারের অসুবিধা। পুস্তকের সূচী, নির্ঘণ্ট, গ্রন্থপঞ্জী, অধ্যায় বিভাগ ইত্যাদি থাকলে পাঠকদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়। বইয়ের আকার খুব ছোট বা খুব বড় হলে গ্রন্থাগারে ব্যবহারের পক্ষে অসুবিধা হবে।

(৯) পুস্তক বিচারের পূর্বে লেখক, প্রকাশক ও বইয়ের দাম সম্বন্ধে খবরাখবর নিতে হবে। প্রকাশকের বৈশিষ্ট্য কি, প্রকাশক সাধারণতঃ কি ধরণের বই বের করে থাকে, পূর্বে প্রকাশিত পুস্তকগুলি সমাদৃত হয়েছে কিনা ইত্যাদি দেখা প্রয়োজন। যে লেখকের বই বিচার করা হচ্ছে তিনি কোন্ শ্রেণীর লেখক, তাঁর আর কোন বই আছে কিনা, তাঁর শিক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং কোন্ বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতার বিবরণ জানতে হবে। বইয়ের বাজারে গ্রন্থাগারকে কত ডিস্কাউণ্ট দেওয়া হয়। পুরনো দুষ্প্রাপ্য বইয়ের দাম কি হতে পারে, এবং বিদেশী বইয়ের বেলায় বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হার কি—এসব সংবাদ গ্রন্থাগারিককে রাখতে হবে।

(১০) যে বই ব্যবহৃত হবে সে বই সংগ্রহের উপর আমরা উপরে জোর দিয়েছি। কিন্তু দু'টি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম বাঞ্ছনীয়। প্রথমতঃ ক্ল্যাসিক্স্ ও স্ট্যাণ্ডার্ড বই গ্রন্থাগারে রাখতে হবে, সে বইয়ের চাহিদা না থাকলেও। বাংলা দেশের যে কোন সাধারণ গ্রন্থাগারে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, চণ্ডীদাসের পদাবলী, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ইত্যাদি রাখা অত্যাবশ্যক। লোকে হয়ত এসব বই কমই পড়বে। তবু এগুলি জাতীয়-সংস্কৃতির সম্পদ; পাঠকদের হাতের কাছে এদের রাখতে হবে। কেউ যেন

পড়তে চেয়ে হতাশ না হয়। এ জাতীয় বই পাঠকের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নেও সাহায্য করে।

দ্বিতীয়তঃ, যে অঞ্চলে গ্রন্থাগারটি অবস্থিত সে অঞ্চলের ইতিহাস, ভূগোল ও অন্যান্য সকল বই সংগ্রহ করতে হবে। বইগুলি খুব কম ব্যবহৃত হ'লেও গ্রন্থাগারের পক্ষে এটি অবশ্য কর্তব্য।

বৃহত্তম সংখ্যক পাঠক

সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হল প্রত্যেক পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী পুস্তক সরবরাহ করা। যে অঞ্চলে পাবলিক লাইব্রেরিটি কাজ করছে সে অঞ্চলের সকল নাগরিকই প্রয়োজনীয় পুস্তকের জন্য দাবি জানাবার অধিকারী। কলেজ লাইব্রেরি ছাত্র ও অধ্যাপকদের চাহিদা মেটাবে। এমনি করে প্রত্যেক শ্রেণীর গ্রন্থাগার তাদের তালিকাভুক্ত পাঠকদের দাবি পূরণ করবে; সাধারণ গ্রন্থাগারে পাঠকদের এই দাবীর বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। এই বৈচিত্র্যের কারণ মানুষের রুচির বিভিন্নতা। পাঠকদের সব দাবিই কি মেটাতে হবে? হ্যাঁ, মেটাতে হবে যদি সে দাবি ন্যায়সঙ্গত হয়। তখনই প্রশ্ন ওঠে কোন্ দাবি ন্যায়সঙ্গত, এবং কোন্ দাবি ন্যায়সঙ্গত নয়? মানুষের আর্থিক, মানসিক, আত্মিক এবং সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে যে বই সাহায্য করে, সে বইয়ের জন্য যে চাহিদা তা ন্যায়সঙ্গত। সাধারণ গ্রন্থাগারের এই চাহিদা মেটানো অবশ্য কর্তব্য।

কিন্তু প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে গ্রন্থাগারের সামর্থ চাহিদার তুলনায় অনেক কম। ইচ্ছা সত্বেও এমন টাকা থাকে না যা দিয়ে প্রত্যেক পাঠকের চাহিদা মেটানো যেতে পারে। সুতরাং পাঠকের দাবিকে বিচার করতে হয়। দাবির মূল্য ও পরিমাণ যাচাই করে কোনো একটি বই কেনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চাই। যে দাবি মানুষকে সুখী করতে এবং আত্মোন্নতিতে সাহায্য করবে সে দাবির মূল্য আছে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার জন্য যে চাহিদা তা মূল্যবান। কিন্তু বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে এর চাহিদার পরিমাণ খুবই কম হবার আশঙ্কা। অর্থাৎ একজন পাঠক হয়ত ব্রিটানিকা পড়তে চেয়েছে। এই বই হয়ত অল্প কয়েকজন পাঠকই পড়বে। কিন্তু তবু দাবিটি যে মূল্যবান তাতে ভুল নেই। শুধু দাবির মূল্য দেখলে গ্রন্থাগারিক ভুল করবে না। এনসাইক্লোপিডিয়ার পাঠক যদি একজন মাত্র থাকে তাহ'লে একজন পাঠকের

জন্য এতটাকা ব্যয় করলে অন্য পাঠকদের প্রতি অবিচার করা হবে। আবার দাবির পরিমাণের উপরও সব সময় নির্ভর করা চলে না। সাধারণ গ্রন্থাগারে গোয়েন্দা কাহিনীর দাবির পরিমাণ হয়ত সবচেয়ে বেশী; কিন্তু মূল্য খুবই কম। গোয়েন্দা কাহিনী মানুষের আত্মোন্নতির সহায়ক নয়। সুতরাং গ্রন্থাগারিককে দাবির মূল্য ও পরিমাণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে পুস্তক নির্বাচন করতে হয়। শুধু দাবির মূল্যের উপরে অথবা পরিমাণের উপরে নির্বাচন নির্ভর করে না।

নিজের জন্য যে বই কিনি সে বই আমার ভালো লাগলেই কেনা সার্থক। কিন্তু গ্রন্থাগারে একজন পাঠকই যদি একটি বই পড়ে তাহলে নির্বাচনের নীতির ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়। একটি বই যত অধিক সংখ্যক পাঠক ব্যবহার করবে পুস্তক নির্বাচন ততই সাফল্য লাভ করেছে বলা যেতে পারে। বৃহত্তম সংখ্যক পাঠকের জন্য পুস্তক নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করতে হয়:

১। যে অঞ্চলে গ্রন্থাগার অবস্থিত সেই সমাজের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। তাহলে গ্রন্থাগারের উপর সমাজের চাহিদা সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যাবে।

২। পুস্তক নির্বাচনের জন্য এমন একটি নিয়ম স্থির করতে হবে যার সাহায্যে পাঠকদের দাবি তৃপ্ত করা যেতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মানও উন্নত হতে পারে।

৩। একটি বই সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিকের অভিমত থেকে পাঠকরা বইটিকে কি ভাবে গ্রহণ করবে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ, অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক বই সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তিনি তাঁর পাঠকদের রুচির সঙ্গেও পরিচিত। সুতরাং কোন বই সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত পাঠকদের ভালো লাগা মন্দ লাগার ইঙ্গিত বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪। যারা বর্তমানে গ্রন্থাগার ব্যবহার করছে তাদের জন্য উপযুক্ত বই তো সংগ্রহ করতেই হবে। তাছাড়া যারা ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারে পড়তে আসবে তাদের কথা মনে রেখেও পুস্তক নির্বাচন করা উচিত।

৫। শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, ছাত্র প্রভৃতি বিভিন্ন পাঠক-গোষ্ঠীর চাহিদা মেটাবার উপযুক্ত বই কেনবার দিকে দৃষ্টি রাখাও গ্রন্থাগারিকের পক্ষে একান্ত কর্তব্য।

৬। ক্ল্যাসিকস্ ও স্ট্যাণ্ডার্ড বই ব্যতীত অন্য যে সব বইয়ের বর্তমানে চাহিদা নেই, কিংবা ভবিষ্যতেও চাহিদার সম্ভাবনা নেই, সে শ্রেণীর বই কেনা

উচিত নয়। এমন কোন বই যদি গ্রন্থাগারে থাকে যা অনেকদিন যাবৎ পাঠকরা একেবারেই ব্যবহার করে না তা বাতিল করে দেওয়া ভালো।

৭। যে সব পাঠক নিজেদের দাবি জোর করে আদায় করবার জন্য সর্বদাই মারমুখী হয়ে থাকে, যারা চায় যে তাদের মনোনীত প্রত্যেকটি বই কিনতে হবে, গ্রন্থাগারিককে সে সব পাঠকদের সংযত করে রাখা চাই। এমন পাঠকের সংখ্যাই বেশি যারা নিজেদের দাবি জোর করে পেশ করতে পারে না। তাদের প্রয়োজনের কথা গ্রন্থাগারিকের মনে রাখা উচিত।

৮। যদি টাকা থাকে তাহলে বিশেষজ্ঞদের জন্য এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্য চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ ধরণের বই সরবরাহ করা যেতে পারে। পরিমাণের দিক থেকে এ চাহিদা হয়ত নগণ্য, কিন্তু নিশ্চয়ই মূল্যবান চাহিদা। সমাজে যারা শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে শীর্ষস্থানীয় তাঁদের বই দিয়ে সাহায্য করলে পরোক্ষে সমাজেরই লাভ। পুস্তক নির্বাচনের সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম ঘটলেও বিশেষজ্ঞদের বই সরবরাহ করা উচিত।

৯। যদি বই ব্যবহারের আশা না থাকে তাহলে কোন বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ গড়ে তোলবার চেষ্টা সঙ্গত হবে না। ঠিক তেমনি কোন সিরিজের সব বই না কিনে যেগুলি ব্যবহারের সম্ভাবনা আছে শুধু সেই বইগুলি কিনলেই যথেষ্ট। যে বই পাঠকরা সত্যি ব্যবহার করবে, যে বই সত্যি ভালো, একমাত্র সে বই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হবে—পুস্তক নির্বাচনের এই হবে মূলনীতি।

সর্বনিম্ন ব্যয়

সর্বশ্রেষ্ঠ বই বৃহত্তম সংখ্যক পাঠকের জন্য সংগ্রহ করবার সময় ব্যয়ের দিকটা বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করতে হবে। গ্রন্থাগারের সঙ্গতি চাহিদার তুলনায় সব সময়ই অনেক কম থাকে। সুতরাং অত্যন্ত হিসাব করে যথাসম্ভব কম দামে বই কিনতে হবে। যে টাকায় হিসাব করে কিনলে পাঁচ খানি ভালো বই কেনা যেতে পারে, বেহিসাবী হয়ে সেখানে চারখানি কিনলে পুস্তক নির্বাচনের নীতি ব্যর্থ হয়ে গেল। কোন দোকান থেকে কিনলে সবচেয়ে বেশি ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে, ভালো পুরণো বই কোথায় সস্তায় বিক্রি হচ্ছে,—এসব খবর গ্রন্থাগারিকের রাখা চাই।

সর্বাপেক্ষা কম খরচায় পাঠকদের ভালো বই সরবরাহ নীতি সফল করবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন :

১। স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সহিত পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। তার ফলে অনেক বই না কিনেও অন্য লাইব্রেরী থেকে বই এনে পাঠকের দাবি মেটানো যায়।

২। যদি বিশেষ কোন একটি বিষয়ে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সমৃদ্ধ করবার নীতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে তাহলে সেই নীতি অনুসরণ করে চলা উচিত। ধরা যাক, কোনো গ্রন্থাগার স্থির করেছে ইতিহাসের সংগ্রহ সমৃদ্ধ করবে। দু'এক বছর ইতিহাসের বই কিনে যদি আবার দর্শনের বই কিনতে আরম্ভ করা যায়, তাহলে কোন বিষয়ের সংগ্রহই সমৃদ্ধ হতে পারে না, অর্থের অপচয় ঘটে।

৩। বছরের প্রথমেই বই কেনার জন্য বরাদ্দ অর্থ বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুপাত হিসাবে ভাগ করে বাজেট তৈরি করতে হবে। এই বরাদ্দ যে অপরিবর্তনীয় হবে তা নয়। তথাপি নির্দিষ্ট বরাদ্দ যথাসম্ভব মেনে চলা উচিত। যদি বিশেষ প্রয়োজন ঘটে তাহলে হয়ত সমাজবিদ্যার বরাদ্দ থেকে সাহিত্যের জন্য কিছু টাকা ব্যয় করা যেতে পারে।

৪। অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ করেন। বহু মূল্যবান ব্যক্তিগত সংগ্রহ গ্রন্থাগারে দান করা হয়। গ্রন্থাগারিককে এসব বিষয়ে খোঁজখবর রাখতে হবে। যাতে বিনামূল্যে বই পাওয়া যেতে পারে সে জন্য গ্রন্থাগারিকের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

উপরে পুস্তক নির্বাচনের নীতি সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার সারমর্ম হল এই :

১। পুস্তক ক্রয়ের বরাদ্দ এমন ভাবে ব্যয় করতে হবে যে বৃহত্তম সংখ্যক পাঠকের জন্য শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন বই যেন সংগৃহীত হয়।

২। যে বই সত্যি ব্যবহৃত হবে, যে বই ব্যবহার করে পাঠকরা আত্মিক মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনে সহায়তা লাভ করবে, একমাত্র সে বইই সংগ্রহের যোগ্য। এ বই জ্ঞান, সংবাদ, প্রেরণা ও আনন্দের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। বর্তমানে ব্যবহৃত হতে পারে, ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্যও সংগ্রহ করে রাখা যায়।

৩। পুস্তক নির্বাচন সম্বন্ধে যথেষ্ট বিবেচনার পর একটি নীতি গ্রহণ করে ভুল প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তা অনুসরণ করা উচিত। বারে বারে নীতি পরিবর্তন করলে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ এলোমেলো ভাবে গড়ে ওঠে; গ্রন্থাগারের সংগ্রহের কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে না। (ড্রুরি-র অনুসরণে)

পরিষদ কথা

গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের গ্রীষ্মকালীন বিভাগের উদ্বোধন

গত ৯ই মে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের গ্রীষ্মকালীন বিভাগের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত। পরিষদ সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু পৌরোহিত্য করেন।

শিক্ষণ গ্রহণে উদ্যোগী সংযেত ছাত্রছাত্রীগণকে লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক সিদ্ধান্ত বলেন যে—আমি গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের সর্বাধিক গুরুত্ব উপলব্ধি করি, অনেকেই বলে থাকেন যে আধুনিক দৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয় একটি গ্রন্থ সংগ্রহ মাত্র। এবং উপযুক্ত গ্রন্থাগারিকই গ্রন্থের যথাযথ ব্যবহারের একমাত্র সহায়ক। মানুষের ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক বর্গীকরণ পদ্ধতির পরিবর্ধনের প্রয়োজন রয়েছে। গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণের সাথে সাথে অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। দেশ স্বাধীন হবার পর শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমগ্র শিক্ষার ক্ষেত্রে তথা নিরক্ষরতা দূরীকরণ হতে, প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার একটি প্রধান পরিপূরক গ্রন্থাগার—কিন্তু শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক বিনা গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু সুপরিচালন অসম্ভব। গ্রন্থাগারিক বৃত্তি একটি মহান বৃত্তি। জ্ঞানের ধারক ও বাহক গ্রন্থের আগারের সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহার শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের উপর বর্তায়, আশা করি আপনারা এ গুরু দায়িত্ব বহনে আপনাদের পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করবেন।

নবদ্বীপে পক্ষকালব্যাপী গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিবির

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংযোগ ও সংগঠন সংস্থার উদ্যোগে নবদ্বীপে গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবিরের অনুষ্ঠান গত বছরের আশ্বিন মাসে আয়োজিত হয়েছিল। কিন্তু বান-বন্যার দরুণ শিবির অনির্দিষ্টকালের জন্য পেছিয়ে যায়। বিগত ২৬শে মে হতে উক্ত শিবির শিক্ষণ একপক্ষ কাল যাবৎ অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্যোক্তা ছিলেন নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার। নদীয়া জেলার সমাজ শিক্ষার প্রাধিকারিক শ্রীবিনয়কুমার মুখোপাধ্যায় শিবির উদ্বোধন করেন। সর্বসমেত ২৪ জন শিক্ষার্থী শিবিরে যোগদান করেছিলেন। নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যার একাংশকে আধুনিক পদ্ধতিতে শ্রেণী বিন্যস্ত ও সূচীবদ্ধ করা হয়। শিবিরের সমাপ্তি দিবসে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন নদীয়া জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীকীর্তিরঞ্জন

বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন পরিষদ সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু। আহ্বায়ক কমিটির সভাপতি শ্রীতিনকড়ি বাগচী এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে শিবিরের কার্য বিবরণ বিবৃত করেন। শ্রীবসু তাঁর ভাষণে জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আশার কথা জনসাধারণ ও সরকার আজ সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা উপলব্ধি করছেন। ফলে গ্রন্থাগার আন্দোলন দেশে ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করছে। এই আন্দোলনকে মহান লক্ষের দিকে নিয়ে যাবার জন্যে তিনি দেশের তরুণ সমাজ-সেবাকর্মীগণকে আহ্বান জানান। শ্রীফণিভূষণ রায় ও শিক্ষার্থীদের পক্ষ হতে শ্রীরণেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ভাষণ দান করেন। সভায় শিক্ষার্থীগণকে অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ করা হয়। শিক্ষার্থীগণ সমবেত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে চা পানে আপ্যায়িত করেন।
(আগামী সংখ্যায় এ সম্পর্কে লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিতব্য)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা ও পরিষদের অন্যান্য চিঠি-পত্রাদি ডাকযোগে প্রেরণের কার্য দ্রুতকরণের জন্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি একটি Addressograph Machine ক্রয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সেজন্য পরিষদের সকল সদস্যকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে পরিষদের খাতায় ও ডাক-তালিকায় মুদ্রিত তাঁহাদের নাম ঠিকানায় কোনরূপ ভুল থাকিলে, কিংবা যাঁহারা ঠিকানা পরিবর্তন করিয়াছেন, তাঁহারা যেন অনতিবিলম্বে পরিষদ কার্যালয়ে তাহা জানাইয়া দেন।

১৯৫৬ সালের চাঁদা অনবধানতা বশতঃ যাঁহাদের বাকি পড়িয়াছে অবিলম্বে তাহা পরিষদ কার্যালয়ে জমা দিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। (প্রতিষ্ঠানিক বার্ষিক চাঁদা ৮৲ ; ব্যক্তিগত বার্ষিক চাঁদা ৩৲)

কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
সাময়িক কার্যালয়
৩৩, হুজুরিমল লেন
কলিকাতা-১৪

গ্রন্থাগার সংবাদ

শশিপদ ইনষ্টিট্যুট ॥ ইনষ্টিট্যুট লেন ॥ কলিকাতা-৩৮ ॥

গত ১৯শে মে ইনষ্টিট্যুটে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক হীরেন্দ্রকুমার সান্যাল। বিধান সভা সদস্য শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভাপতি ও বিভিন্ন ব্যক্তির ভাষণের পর আবৃত্তি ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। শ্রীসৌম্যেন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'ঋতু বিচিত্রা' গীতিনাট্য অভিনীত হয়। নৃত্যে ও সংগীতে স্থানীয় কুশলী শিল্পীগণ সকলের প্রশংসা অর্জন করেন।

তরুণ পাঠাগার ॥ ইছাপুর-নবাবগঞ্জ ॥ চব্বিশ পরগণা।

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার সন্ধ্যা ৭৷৷টায় যষ্ঠীতলা, ইছাপুর-নবাবগঞ্জ, ২৪-পরগণার তরুণ পাঠাগারের উদ্যোগে রবীন্দ্র ও নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে পাঠাগার সভাপতি শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র পাল মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যষ্ঠীতলা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সভায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন লোক সেবক সম্পাদক শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য, এম-এল-এ মহাশয়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে পাঠাগার সম্পাদক শ্রীভোলা ঘোষের ভাষণ হইতে জানা যায় যে, তরুণ পাঠাগার কর্তৃক গত কবি পক্ষের প্রথম সপ্তাহে (২৫-৩১-এ বৈশাখ'৬৪) 'গ্রন্থ সংগ্রহ সপ্তাহ প্রতিপালিত হওয়ায় তাঁরা মোট ৬৪৭ খানি গ্রন্থাদি সংগ্রহ সক্ষম হইয়াছেন এবং প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন আরো ৫৫জন সুধীর। এইরূপ ব্যাপক আন্দোলন মনে হয় ২৪-পরগণা জেলায় এই প্রথম। এই সংগৃহীত পুস্তক প্রদর্শনী ঐ একই স্থানে অনুষ্ঠিত হয় গত ১১ই ও ১২ই জ্যৈষ্ঠ। এই সংগে তিনি আরো জানান: তরুণ পাঠাগার কার্যকরী সমিতির বিগত ৭ম অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব: কবিপক্ষে গ্রন্থ সংগ্রহ সপ্তাহে আমাদের গ্রন্থ সংগ্রহ প্রচেষ্টাকে উদার এবং সহানুভূতিশীল হইয়া যিনি বা যাঁহারা আগাইয়া আসিয়া সাফল্যমণ্ডিত ও সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহাকে বা তাঁহাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে এই সভা। সেই সংগে এই সভা আরো আশা রাখে যে ভবিষ্যতেও তিনি ও তাঁহারা তরুণ পাঠাগারের প্রতিটি গ্রন্থাগার-আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকিয়া প্রতিষ্ঠানটিকে করিয়া তুলিবেন সার্থক ও

গৌরবান্বিত। প্রধান অতিথি শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন : এইরূপ সংগ্রহ রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে।…

বল্পীপুর সম্মিলনী ॥ বল্পীপুর ॥ চব্বিশ পরগণা।

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ কবিকঙ্কন অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের পৌরোহিত্যে রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসরোজকুমার ঘোষ প্রভৃতি ভাষণ দান করেন। সভাপতির ভাষণের পর রহড়ার গণনাট্য সঙ্ঘ 'দুই বিঘা জমি' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। স্থানীয় তরুণ শিল্পীগণ কর্তৃক পরিবেশিত আবৃত্তি ও সংগীত অনুষ্ঠানটিকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলে।

বসন্ত স্মৃতি পাঠাগার ॥ চাকদহ ॥ নদীয়া।

গত ৮ই বৈশাখ পাঠাগারের ৩৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস বিপুল উদ্দীপনার সহিত প্রতিপালিত হয়। এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস। এই দিনে পাঠাগার কর্তৃক আয়োজিত 'জীবনে সাহিত্যের প্রভাব" শীর্ষক দ্বিতীয় বার্ষিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সর্বশ্রী সন্ধ্যা রায় চৌধুরী ও শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন।

বিবেকানন্দ পাঠাগার ॥ কাঁদোয়া ॥ থর্মদা ॥ নদীয়া।

গত ২৯শে বৈশাখ পাঠাগার প্রাঙ্গণে শ্রীসচ্চিদানন্দ মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীসতু মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি আকর্ষণীয় হয়। পাঠাগারের পরিচালনায় সম্প্রতি একটি ছোট গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিচারক পদ গ্রহণ করেন জলছবি পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরেণুপদ দাশ। প্রতিযোগিতায় ছোট গল্পে সর্বশ্রী লোকেশ হোম রায় ও মনীন্দ্রকুমার মোদক এবং আধুনিক কবিতায় সর্বশ্রী পিনাকী মুখোপাধ্যায় ও মিলনেন্দু বিশ্বাস যথাক্রমে ১ম ও ২য় স্থান অধিকার করেন।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী ॥ মানকর ॥ বর্ধমান।

গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে লাইব্রেরীর উদ্যোগে প্রত্যুষে এক প্রভাতফেরী আয়োজিত হয়। সন্ধ্যায় স্থানীয় অন্নপূর্ণাতলায় একটি জনসভা ও নৃত্যগীতানুষ্ঠান হয়। পৌরোহিত্য করেন মানকর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীনারায়ণচন্দ্র আচার্য।

বাসুদেব গ্রন্থাগার ॥ সোনামুখী ॥ বাঁকুড়া ॥

বাসুদেব গ্রন্থাগারের দ্বিতীয় বর্ষ সাফল্যের সহিত পূর্ণ হ'ল। গ্রন্থাগারের কার্যবিবরণীতে প্রকাশ যে এতাবৎ ৫০৮ খানি গ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছে এবং পাঠগৃহে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা নিয়মিত রাখা হয়। গত এক বছরে ২৪৪৬ খানি পুস্তক লেনদেন হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির বদান্যতায় ও স্থানীয় জনসাধারণের উৎসাহে গ্রন্থাগারের নিজস্ব গৃহ নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বাসুদেবজী সেবক সমিতির অন্যতম একটি বিভাগ গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে ১০টি ইউনিয়ন এলাকায় ৪০টি শাখার মাধ্যমে একটি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালন ও স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলার এক পরিকল্পনা সমিতির বিবেচনাধীনে রয়েছে।

জুবিলী লাইব্রেরী ও রামরঞ্জন টাউন হল ॥ সিউড়ী ॥ বীরভূম ॥

বীরভূম জেলায় এই লাইব্রেরীর ক্রমোন্নতি ও জনপ্রিয়তা প্রশংসনীয়। সম্প্রতি শ্রীজগন্নাথ সিংহ গ্রন্থ ক্রয়ার্থ ৫০০৲ টাকা গ্রন্থাগারে দান করেছেন। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও গ্রন্থাগারে সাড়ম্বরে রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী। এছাড়া সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানাদির মধ্যে গত ১১ই মে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতি উন্মোচন উপলক্ষে এক মহতী জনসভার আয়োজন হয়। সভাপতিত্ব করেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীব্রজকান্ত গুহ মহাশয়। সভায় গ্রন্থাগারের সম্পাদক ও উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভাষণ দান করেন।

তরুণ লাইব্রেরী ॥ কোতুয়ালী ॥ মালদহ ॥

গত ২৬শে বৈশাখ জেলা সমাহর্তা শ্রীসুবোধ চন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হয়। মহকুমা শাসক শ্রীসুবোধ কুমার চৌধুরী ও উপস্থিত অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় অংশ গ্রহণ করেন।

শিশির স্মৃতি পাঠাগার ॥ বনডাহি ॥ জাহানপুর ॥ মেদিনীপুর ॥

গত ২৬শে মার্চ বনডাহি শিশির স্মৃতি পাঠাগারের ৪র্থ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীতারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন, প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের অধ্যাপক শ্রীসুবোধ রঞ্জন রায়। সভায় বিগত বছরের সম্পাদকীয় বিবরণী পাঠ করেন সম্পাদক শ্রীপ্রবোধ রঞ্জন গাহাড়ী। শ্রীকণিকা হালদার, শ্রীব্যোমকেশ সাঁতরা, শ্রীঅনন্ত কুমার

ঘটক ও শ্রীমোহিত কুমার প্রমুখ ব্যক্তিগণ সভায় বক্তৃতা করেন। শ্রীকণিকা হালদার ও শ্রীসুবোধ রঞ্জন রায় গ্রন্থাগার ও পাঠক-পাঠিকা সম্পর্কে কয়েকটি সংগঠনমূলক প্রস্তাব আলোচনা করেন। ব্যোমকেশ সাতরা উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর নিকট হইতে গ্রন্থাগার উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন প্রস্তাব আহ্বান করেন। সভায় ঝাড়গ্রামের রাজকুমার শ্রীবীরেন্দ্র বিজয় মল্লদেব বিশেষ শুভার্থীরূপে উপস্থিত ছিলেন।" সভান্তে সমাগত অতিথিবৃন্দকে প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুত যতীন্দ্র নাথ পাহাড়ী জলযোগে আপ্যায়িত করেন।

পূর্বাশা গ্রন্থাগার ॥ বালী ॥ হাওড়া ॥

গত ২৬শে মে, ১৯৫৭ বালী পূর্বাশা গ্রন্থাগারের উদ্যোগে ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি বক্তৃতামালার নবম বক্তৃতা ও রবীন্দ্র জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বালীর বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রীশ্যামাপদ শাস্ত্রী মহাশয় পৌরোহিত্য করেন এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন প্রখ্যাত দার্শনিক শ্রীজ্ঞানচাঁদ মহাশয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী স্বর্ণা ভট্টাচার্য, অনিমা চট্টোপাধ্যায়, সুনীল মুখোপাধ্যায়, সুনীতি মুখোপাধ্যায়, শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, শক্তি দে ও লীলা পাঠক। সঙ্গীত, আবৃত্তি, পাঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের সুষ্ঠু পরিবেশনে উক্ত দিনের অনুষ্ঠান সকলকে তৃপ্তি দান করে। বহু রবীন্দ্র ভক্ত নরনারীর সমাবেশে এবং শান্ত, রুচিপূর্ণ ও গম্ভীর পরিবেশে ঐ দিনের অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হয়।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র স্মৃতি সাহিত্য মন্দির ॥ পেঁড়ো ॥ হাওড়া ॥

গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র স্মৃতি সাহিত্য মন্দির পাঠাগারে 'রবীন্দ্র জয়ন্তী' আড়ম্বরের সহিত পালন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক শ্রীঅজিতধন ঘোষ, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিজলীভূষণ রায়, শ্রীকৃপাসিন্ধু বিশ্বাস। বক্তাগণ রবীন্দ্র সাহিত্যের ও রবীন্দ্রনাথের জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া সময়োপযোগী ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। শ্রীমানসমোহন বিশ্বাসের পরিচালনায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় ছাত্রছাত্রীগণ আবৃত্তি ও সঙ্গীতে সকলকে পরিতৃপ্ত করেন।

ষ্টুডেন্টস লাইব্রেরী ॥ ৩৫৪, জি, টি, রোড ॥ সালিখা ॥ হাওড়া ॥

সালিখা ষ্টুডেন্টস লাইব্রেরীর পরিচালনায় পঞ্চদশ বার্ষিক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা গত ২৮শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় 'ক' বিভাগে

সর্বশ্রী নির্মল রায়, দেবীপ্রসাদ মিশ্র, 'খ' বিভাগে সর্বশ্রী বিধান চন্দ্র দে, অনিরুদ্ধ দত্ত, ভারতী চক্রবর্তী যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করেন। প্রধান বিচারক ও সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্বশ্রী অক্ষয় চক্রবর্তী, তারক চট্টোপাধ্যায় ও তারকদাস গঙ্গোপাধ্যায় বিচারক ছিলেন।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি পাঠাগার ॥ ত্রিবেণী ॥ হুগলী ॥

গত ২৭শে জানুয়ারী পাঠাগারের ৩৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। পূর্বঘোষিত সভাপতি শ্রীসত্যপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতির জন্য শ্রীপাঁচুগোপাল দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ত্রিবেণী টিস্যু মিলের ম্যানেজার শ্রী এফ, এ, বেনউইক। পাঠাগার সম্পাদক তাঁর কার্যবিবরণীতে পাঠাগারের ইতিহাস ও ক্রমোন্নতির উল্লেখ করে পাঠাগারের ভবিষ্যৎ উন্নতি বিধানের জন্যে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে বহু জনসমাগম হয়।

মনোহরপুর পাবলিক লাইব্রেরী ॥ ডানকুনি ॥ হুগলী ॥

গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ '৬৪ শনিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় মনোহরপুর সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীযতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর পঠিত বার্ষিক বিবরণীতে পাঠাগারের আর্থিক সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। প্রতি বর্ষের ন্যায় এই বৎসরেও একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইয়াছিল। শ্রী ভট্টাচার্যের তথ্যপূর্ণ ও মনোজ্ঞ বক্তৃতা সকলকে চমৎকৃত করে।

প্রগতি পাঠাগার ॥ জিরাট ॥ হুগলী ॥

গত ২২শে মে প্রগতি পাঠাগারের ৩য় জন্ম বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। সকাল ৭ ঘটিকার সময় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বৈকাল ৫ ঘটিকার সময় একটি সাধারণ সভার আয়োজন করা হয় এবং উক্ত সভায় জিরাট কলোনী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযামিনীকান্ত দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রগতি পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীঅনিল কুমার চক্রবর্তী পাঠাগারের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন এবং চিত্তরঞ্জন সন্নামত, যতীন্দ্র কুমার মজুমদার এবং রবীন্দ্র চন্দ্র দাস প্রভৃতি সভ্যগণ পাঠাগারের উন্নতি কল্পে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে রাত্র ২-৩০ মিঃ পর্যন্ত সঙ্গীতানুষ্ঠান করা হয়।

গ্রন্থ সমালোচনা

শহীদ স্মৃতি কথা ॥ ঢাকা জিলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সমিতি, কলিকাতা কর্তৃক প্রণীত ও সমিতির পক্ষে ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ॥ ৮+১০৬ পৃঃ ॥ মূল্য ৩।।০ টাকা।

এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্গত ঢাকা জেলার দান সম্বন্ধে ইতিহাস রচনার জন্য ঐ জেলার রাজনৈতিক কর্মীরা উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁদের এই উদ্যোগের প্রথম প্রয়াস হিসাবে 'ঢাকা জিলা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস প্রণয়ন সমিতি কর্তৃক 'শহীদ স্মৃতি কথা' রচিত হয়েছে।

স্বদেশী যুগ (১৯০৫ খৃষ্টাব্দ) থেকে ভারতীয়দের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরকরণ (১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের সাথে প্রকাশ্য সংঘর্ষে গুলি বা লাঠির আঘাতে, কারাগারে অনশনে বা স্বাভাবিক কারণে এবং ফাঁসিকাষ্ঠে, ঢাকায় অথবা অন্যত্র কর্মরত ঢাকা জেলার অধিবাসী ও ঢাকা জেলায় কর্মরত অন্য জেলার অধিবাসী যে সকল শহীদ জীবন দান করেছেন তাঁদের জীবনকাহিনী এই গ্রন্থে লিপিবন্ধ করা হ'য়েছে বলে সমিতি দাবী করেছেন। সাইত্রিশ জন শহীদের জীবন কাহিনীর কিছু কিছু অংশ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং তম্মধ্যে বত্রিশজনের প্রতিকৃতি মুদ্রিত হ'য়েছে। দেশের অন্যান্য অংশে অনুরূপভাবে তাঁরা জীবন দান ক'রেছেন, অন্যান্য সূত্রে তাঁদের জীবন কথা লিখিত ও প্রকাশিত হ'লে তাদের সমন্বয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে শহীদদের জীবন দান অধ্যায়ের একটা সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হ'তে পারে। কাজেই সমিতির এই প্রয়াস এক ব্যাপক আয়োজনের প্রথম ধাপ হিসাবে প্রশংসার যোগ্য।

যাঁদের সম্বন্ধে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হ'য়েছে তাঁদের জীবন কাহিনী সংগ্রহ করার পর প্রবন্ধ লেখায় অথবা প্রবন্ধগুলি সম্পাদনার প্রকৃত দায়িত্ব আরও ক্ষমতাবান লেখকের উপর ন্যস্ত হ'লে গ্রন্থের অধিকতর উৎকর্ষ সাধন হ'ত এবং কাহিনীগুলি অধিকতর উপাদেয়ভাবে পরিবেশিত হতে পারতো গ্রন্থ পাঠে স্বভাবতঃই একথা মনে আসে।

অল্প কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণিত জীবনীগুলিকে সম্ভব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এক ঘটনাসূত্রে গ্রথিত করার প্রয়াসের অভাব গ্রন্থের উপযোগিতা বৃদ্ধির পথে অন্তরায় হিসাবে কাজ ক'রেছে। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে লিখিত জীবন কাহিনীগুলির কোন কোন স্থলে বিরক্তিকর উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগ বিষয়-বস্তুর গাম্ভীর্য ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ ক'রেছে।

এই গ্রন্থ ভবিষ্যতে ইতিহাস বা জীবনী লেখকের কাজের সহায়ক হবে। গ্রন্থে বর্ণিত শহীদদের কারও সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির কিছু জানবার আগ্রহ থাকলে সে আগ্রহ পূরণে এ গ্রন্থ কিছুটা সাহায্য ক'রবে। (প্র. চ. ব.)

অন্তরাগে আলাপন [দ্বিতীয় ভাগ]—স্বামী বাসুদেবানন্দ মহারাজের ক্লাস ডায়েরী হইতে···শ্রীশুভেন্দুপ্রসাদ রায় চৌধুরী ও শ্রীবিজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ॥ ১৩০ পৃঃ, মূল্য ২।।০ টাকা।

গ্রন্থখানিতে মোট ৫২টি বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসু ও শিষ্যদের প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী যাহা বলিতেন, তাঁহার ডায়েরী হইতে এইখানে সেগুলি সংকলিত হইয়াছে। সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর কালের আলোচনার সংকলন। কিন্তু আলোচনাগুলি কোন বিশেষ কালের নহে, চিরকালের মানবাদর্শ, পুনর্জন্ম, হিন্দুধর্মের রূপান্তর, খৃষ্টধর্মের গোড়ার কথা, চীন, কোরিয়া, জাপান, শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাপদ্ধতি, জারাসুষ্টধর্ম, পরমানন্দ বাদের ইতিহাস, ব্রহ্ম ও শূন্যনির্বাণ, শিল্প, হিগেলবাদ, প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং কোথাও মূল আধ্যাত্মিক আদর্শের সুরটি ক্ষুন্ন হয় নাই। গ্রন্থখানির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক এই যে সব কিছুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্লেষণ করিয়া দেখার এবং অন্ধ গোঁড়ামি বাদ দিয়া যথাযথভাবে বুঝিবার ও মূল্য নিরূপণের প্রয়াস প্রতিটি আলোচনার মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া আছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম ও দর্শনে লেখকের অধিকার ও প্রতিটি তত্ত্ব সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বোধ ও সুতীক্ষ্ণ বিচার শক্তি প্রশংসনীয়। স্বামীজী কতকগুলি চমৎকার পারিভাষিক শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন। ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গী কোন কোন ক্ষেত্রে একটু কঠিন মনে হইবে; কারণ বিষয় গৌরব ও আলোচনার সংক্ষিপ্ততা। —হরিপদ চক্রবর্তী

ব্লাডপ্রেসার ও করোনারী থ্রম্বোসিস—ডাঃ নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ॥ দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, কলিকাতা ॥ ১৩৬১ ॥ ৩২ পৃঃ ॥ সচিত্র ॥ মূল্য ১৲ ॥

আধুনিক যুগে করোনারী থ্রম্বসীস ও ব্লাড প্রেসারের নানারূপ উপসর্গে মৃত্যুকথা আমরা প্রায়ই শুনিয়া থাকি এবং তজ্জন্য আতঙ্কগ্রস্ত হই। আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি সাধারণতঃ অগ্রগামী এবং শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই এই সব রোগের প্রাবল্য বেশী। সুতরাং অনেকেই এই রোগ সমূহের কারণ এবং বিস্তৃত বিবরণ জানিতে উৎসুক হইবেন। ডাঃ দাশগুপ্ত তাঁহার উল্লিখিত পুস্তিকাটিতে অতি অল্প কথায় সুন্দরভাবে উহা বিশদ করিয়া দিয়াছেন।

গ্রন্থকার প্রথম মানব হৃৎপিণ্ড ও তাহার ভিতর শোণিত প্রবাহের বিবরণ,

উপমা এবং চিত্রের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ব্লাডপ্রেসার জিনিষটা কি, সুস্থ শরীরে বয়স অনুসারে কিরূপে ব্লাডপ্রেসার পরিবর্তিত হয় তাহা এবং ব্লাডপ্রেসার পরিমাপন প্রণালীর বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্লাডপ্রেসারাধিক্যে কি কি উপসর্গ হয় এবং করোনারী থম্বোসিসের কারণ সম্বন্ধে পাঠকজনকে যথাসাধ্য আলোকিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকার এই রোগসমূহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার যথোচিত চিকিৎসা প্রণালীর কথাও বলিয়াছেন। —ডাঃ বিনয়েন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

টি. বি. সহজবোধ্য ও সহজসাধ্য ।। ডাঃ নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম. বি.। শ্রীবীণা দাসগুপ্ত কর্তৃক ১৫৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত ।। ১৩৬১ ।। মূল্য ৫৲ টাকা ।। ১৯১ পৃঃ, সচিত্র ।।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে লেখক সাধারণের বোধগম্য করিয়া টি. বি. সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় সহজ ও সরল ভাষায় লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সামাজিক ও স্বাস্থ্যনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রচিত এইরূপ গ্রন্থের প্রচুর উপযোগীতা আছে। টি. বি.'র মত একটা ব্যাধির চিকিৎসক ও রোগী উভয়েরই পরস্পর সহযোগিতা একান্ত কাম্য। এবং ইহার জন্য প্রয়োজন ঐ রোগ সম্বন্ধে রোগীর সংস্কারমুক্ত মন ও চিকিৎসকের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতি ও চিন্তাধারা। লেখক এই গ্রন্থখানিকে চিকিৎসক এবং জনসাধারণ উভয়েরই উপযোগী করিয়া রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকখানির দ্বারা চিকিৎসক সম্প্রদায় কতখানি উপকৃত হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক জটিল তথ্য সহজভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। যদিও ইহাতে লেখক বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তথাপি সাধারণ মানুষের পক্ষে ইহা কতখানি বোধগম্য হইবে বলা শক্ত। কোনও রোগ সম্বন্ধে চিকিৎসকের জ্ঞান ও রোগীর সাধারণ জ্ঞান এক বস্তু নহে। এই প্রকার পুস্তক এইরূপভাবে রচিত হওয়া প্রয়োজন যাহাতে রোগী চিকিৎসা ও অন্যান্য বিষয়ে চিকিৎসকের সহযোগিতা করিতে উদ্যোগী হয়। স্থানে স্থানে লেখক কিছু কিছু অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন যদিও সেগুলি জনকল্যাণমূলক। পুস্তকখানির ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী সহজ ও সরল। ইহা পাঠে জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণ হইবে আশা করা যায়। —ডাঃ অমিয়কুমার ভট্টাচার্য

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার কর্মী

সহর ক'লকাতার উত্তর উপকণ্ঠে সম্প্রতি কোনও একটি গ্রন্থাগারে যাবার সুযোগ ঘটেছিল। বছর তিরিশেক পূর্বে গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রন্থ-সংগ্রহ ভালই। প্রবীন এক কর্মী বই লেনদেনের কাজ করছিলেন। কর্মী বলতে আর কাউকে দেখা গেল না। ভদ্রলোকটির শুনলাম তখন অত্যধিক জর, সর্দি-কাশিতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। অনুমান করলাম 'ফ্লু'তে তিনি আক্রান্ত। জিগ্যেস করলাম অন্য কর্মীদেরও কি 'ফ্লু' ধরেছে। 'না মশাই,' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি ছাড়া আর গ্রন্থাগার খোলবার দ্বিতীয় কোনও লোক নেই'। কথায় কথায় জানা গেল যে গ্রন্থাগারের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং গ্রন্থাগারের কাজে আর কাউকে পাওয়া যায় না, স্থানীয় অধিবাসীরা গ্রন্থাগার সম্বন্ধে উদাসীন, আর 'কমিটি মেম্বারদে'র 'মিটিঙে'ই যা কিছু উৎসাহ দেখা যায়। তিনি অভিযোগে করলেন যে আজকালকার তরুণদের মতিগতিই ভিন্ন, বাজে গল্পগুজব ছাড়া তারা আর কিছু বোঝে না।

এ জাতীয় গ্রন্থাগারের সংখ্যা কম নয়—যেখানে দু'একটি কর্মীই নিজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে টিকিয়ে রেখেছেন। এ অবস্থা যে মোটেই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয় তা বলাই বাহুল্য। মুষ্টিমেয় কর্মীরা গ্রন্থাগারের সেবা করে থাকেন যথেষ্ট নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত এবং অনেক ক্ষেত্রে একাদিক্রমে দীর্ঘকাল যাবৎ। তাঁদের চরম ব্যর্থতা এই যে তাঁরা নিজেরাই নিরলস পরিশ্রম করে যান শুধু, নতুন কর্মী সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দেন না। নিজেদের যে কোনও কারণজনিত অনুপস্থিতিতে ভবিষ্যতে তাঁদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান, যার জন্যে তাঁরা সময় ও শ্রমদানে কার্পণ্য করেন না, তার কি পরিণতি হবে তা ভেবে দেখেন না। বহু ভাল গ্রন্থাগারকে কর্মীর অভাবে নষ্ট হয়ে যেতে দেখা গেছে।

এ সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ ও তার সম্ভাব্য প্রতিকার সম্বন্ধে আমাদের সচেষ্ট হওয়ার আশু প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয়।

সাংগঠনিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও আভ্যন্তরিক বিরোধ ছাড়া এর অপর কারণ হ'ল স্থানীয় জনসাধারণের গ্রন্থাগারের প্রতি উৎসাহহীনতা।

গ্রন্থাগার পরিচালন সম্পর্কে নবীন ও প্রবীনদের মধ্যে বিভেদ প্রায়শঃই দেখা যায়, বহুক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠরা কনিষ্ঠদের দায়িত্বপূর্ণ কাজ ও পদ হতে বঞ্চিত করেন। পারস্পরিক বিরোধের ফলে এক পক্ষ দূরে সরে যায়। নিষ্ঠাশীল অনেক কর্মীর মধ্যে একটি দূরারোগ্য ব্যাধি হ'ল 'আমিই সব করব' মনোভাব। কাজ ভাগ করে সকলকে দিয়ে করিয়ে নেবার আস্থা ও মনোবৃত্তি তাঁদের থাকে না। 'নিজেই সব করব, কাউকে কিছু করার অবকাশ ও কৃতিত্ব দেব না' এ প্রবৃত্তি অনেকটা ফুটবল খেলায় খেলোয়াড়দের 'নিজেই গোল দেব' মনোভাবের মত, তাতে 'টিম ওয়ার্ক' নষ্ট হয়ে যায়। কাজের সুযোগ ও স্বাধীনতা দিয়ে উৎসাহী তরুণদের গ্রন্থাগার পরিচালনে আকৃষ্ট করার চেষ্টা বহু ক্ষেত্রেই হয় না।

নতুন কর্মীদল সৃষ্টি ও কাজেকর্মে শিক্ষা দেওয়ার প্রশ্ন শুনতে নেহাৎই মামুলি ঠেকলেও প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বহু প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। সাংগঠনিক ত্রুটি-বিচ্যুতি আভ্যন্তরিক দলাদলি প্রভৃতির সমাধান কর্মীদের নিজেদেরই আয়ত্বাধীন। সমাধানের বাঁধাধরা কোনও 'ফরমুলা নেই।

স্থানীয় অধিবাসীদের গ্রন্থাগারের প্রতি ঔদাসিন্য জনিত দ্বিতীয় কারণটি মূলগত ও বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন রাখে। সাজিয়ে গুছিয়েত বসেছি কিন্তু খদ্দের কই? অর্থাৎ বাড়ী, বই, পত্রপত্রিকা, আসবাবপত্র সবই রয়েছে, কিন্তু লোকে আসে না কেন, কেনইবা গ্রন্থাগারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে না? দেখতে হবে কর্মপদ্ধতির মধ্যে কোনও গলদ রয়ে গেছে কিনা।

লোকের মধ্যে পাঠস্পৃহা না থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু লোকের মধ্যে পাঠস্পৃহা জাগিয়ে তোলাটা দুঃসাধ্য নয়। নানা কার্য ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লোককে অনায়াসে গ্রন্থাগারমুখী করে তোলা যায়। তার ফলে ক্রমশঃ সকলের মধ্যে গ্রন্থানুরাগ বর্দ্ধিত হয়। আমাদের গ্রন্থাগারগুলির কর্মপরিধি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থ-কেন্দ্রীক। কিছুসংখ্যক গ্রন্থাগারের পরিবেশ খুবই নিষ্প্রাণ ও নিরানন্দময়। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যখন আত্মবিশ্লেষণ এবং বিশেষ

কারুর সমালোচনা নয় তখন একটা কথা স্পষ্টই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমাদের অনেক গ্রন্থাগারেই কর্মীদের মধ্যে মানবপ্রীতির অত্যন্ত অভাব দেখা যায়। গ্রন্থ-প্রীতি যেমন গ্রন্থাগার কর্মীদের একটি প্রধান গুণ হওয়া প্রয়োজন, ততোধিক প্রয়োজন তাঁদের মানবপ্রীতি। গ্রন্থাগারকে লোকপ্রিয় করে তুলতে হ'লে উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়েই কর্মীদের সচেতন হতে হবে। গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করা সম্পর্কে ইতোপূর্বে বহু আলোচনাই হয়েছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যালয়ে বহু গ্রন্থাগারের কার্যবিবরণী ও নানাবিধ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ ও সংবাদ এসে থাকে। শুধু রবীন্দ্র জয়ন্তী ও সরস্বতী পূজা উপলক্ষেই শত শত চিঠিপত্র আসে। কিন্তু অধিকাংশ অনুষ্ঠান-সূচী ও বিবরণের মধ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী বা গঠনমূলক কাজের পরিচয় খুব অল্পই পাওয়া যায়। গ্রন্থাগারের বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত ইছাপুর-নবাবগঞ্জের তরুণ পাঠাগার কর্তৃক রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত গ্রন্থ-সংগ্রহ ও প্রদর্শনীর বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তেমনি গত সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে আয়োজিত গ্রন্থ ও প্রাচীরপত্র প্রদর্শনী জনসাধারণের সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক কিরূপে ঘনিষ্ট করে তোলা যায় তার একটি উদাহরণ। এ জাতীয় কর্মপ্রচেষ্টা আরও কয়েকটি গ্রন্থাগারের মধ্যেও অল্পবিস্তর দেখা যাচ্ছে। আমাদের গ্রন্থাগারগুলির জনপ্রিয়তা ও সমৃদ্ধির প্রয়োজনে আমাদের কর্মপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন চাই।

নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই যে আমাদের কাজ করতে হয় সে কথা অস্বীকার করা চলে না। তদনুযায়ীই আমাদের চিন্তা, কাজ ও পদ্ধতি নিরূপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের বর্তমান শ্রম ও প্রচেষ্টা নিষ্ফল ও নিরর্থক হবে যদি না আমরা উত্তরকালের উপযুক্ত কর্মীদল সৃষ্টি না করি এবং সর্বজনের সঙ্গে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাণের সংযোগ স্থাপন না করি।

গ্রন্থাগার

৭ম বর্ষ] আষাঢ় : ১৩৬৪ [৩য় সংখ্যা

ফিল্ম-রেডিও টেলিভিশন বনাম বই

মুরারী ঘোষ

সহ-গ্রন্থাগারিক, মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী, খিদিরপুর

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেই যে দুঃখ করে বলেছিলেন যে এদেশে বইয়ের অনেক শত্রু। রোদ আছে, জল আছে, ঝড় আছে, উই আছে, ইঁদুর আছে আর আছে সবচেয়ে বড় শত্রু পণ্ডিতের মূর্খ পুত্র। কিন্তু যাঁরা খবর রাখেন তাঁরা জানেন বইয়ের শত্রুপক্ষের এই ঐতিহাসিক তালিকার শেষ অংশীদারটি বাদে আর সকলকেই জব্দ করা গেছে আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে। বিশেষ করে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে পুস্তক-সংরক্ষণ বিদ্যার উন্নত চর্চা ও গবেষণা শাস্ত্রী মশায়ের এই দুঃখ অনেকাংশে লাঘব করবে। অনেকেরই আশংকা মত এই দুঃখ আবার নতুন আকারে নাকি দেখা দিচ্ছে পুস্তক-প্রেমীদের মধ্যে। ১৯৫৬ সালে বৃটিশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশনে এক বক্তা দুঃখ জানিয়েছিলেন :

Undoubtedly reading is the chief sufferer of Television.

অধুনা এই আশংকা নানা আকারে দেখা দিচ্ছে, কেননা আজ বইয়ের অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী, আমাদের বই পড়ার অবসর যারা কেড়ে নিচ্ছে। সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন। ছাপার অক্ষরের থেকে এদের আকর্ষণ সাধারণ মানুষের কাছে নাকি ঢের বেশী।

নাকি আমাদের রুচি বদলে যাচ্ছে ফিল্ম-রেডিও-টেলিভিশনের সহজলভ্য মনোহারিত্বে। এমন আশংকা পৃথিবীর চিন্তাবিদদের অধুনা খোরাক বটে কিন্তু আসল পরিসংখ্যানের জগত আমাদের অন্যরূপ সংবাদ এনে দেয়। চিন্তাশীলেরা তাতে স্বস্তি পেতে পারেন। এমন কি, এমন খবরও যদি পাই যে ইংলণ্ডে টেলিভিশন শোনেন ১৬০ লক্ষ লোক আর সাধারণ লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে পড়েন ১৩০ লক্ষ লোক।[১] তবু কিন্তু তাও আমাদের বিচার্য ছবির সমস্ত দিক নয় কেননা এর সংগে এ খবরও উল্লেখযোগ্য যে (টেলিভিশনের লাইসেন্সধারী বাড়া সত্ত্বেও)

(১) Courier : February, 1957.

বছরের পর বছর বৃটিশ পাবলিক লাইব্রেরী আর কাউণ্টী লাইব্রেরীর পুস্তক এবং পুস্তক আদান প্রদানের সংখ্যা ক্রম হারে বেড়েই চলেছে।

রোদ, জল, ঝড়, উই আর ইঁদুরের হাত থেকে যাদের বাঁচানো যাচ্ছে তারা যথেষ্ট পরিমাণে অপঠিত থাকছে বলে যে ক্ষোভ শোনা যায় তা কতদূর বিশ্বাস-যোগ্য তার হিসেব কষে বার করা যায়। কেননা রেডিও-টেলিভিশন-আর সিনেমা জগতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বই পড়ার স্পৃহা কতটুকু আর নষ্ট করতে পারে। বরঞ্চ পাল্টে তাদেরই লাগানো যায় বই পড়ার স্পৃহা জাগানোর কাজে। যে-কোনো সাধারণ-গ্রন্থাগার-কর্মীদের এ অভিজ্ঞতা নতুন নয় যে যখনই কোনো পরিচিত কি অপরিচিত উপন্যাস চিত্রে রূপায়িত হয়েছে তখন অন্তত সেই চিত্রের খাতিরেই সে উপন্যাসের চাহিদা বেড়ে যায় প্রায় প্রত্যেক বড় গ্রন্থাগারেই। অপঠিত উপন্যাসের চিত্ররূপ তার মস্ত বিজ্ঞাপন। এমন কি প্রকাশকের হিসেবেও এই চিত্রায়িত উপন্যাসের প্রতিক্রিয়াও কম লাভজনক নয়। চমৎকার এক উদাহরণ আছে আমেরিকায়। বিখ্যাত মার্কিণ লেখক ও জীবনীকার কার্ল সাণ্ডবার্গের রচনা নিয়ে বিশেষ প্রোগ্রামে টেলিভিশনে দেশময় যখন প্রচার চলেছিল তার কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই দেখা গেল সাণ্ডবার্গের সমস্ত বই আমেরিকার প্রায় সব দোকানে উজাড় হয়ে বিক্রি হোয়ে গেছে। ফ্রান্সের সাপ্তাহিক টেলিভিশন প্রোগ্রামে নতুন এক ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বই আর তাদের লেখকদের টেলিভিশনের পর্দায় হাজির করান হয়। লক্ষ লক্ষ দর্শক আর শ্রোতাদের সামনে লেখককে লেখানো আর তাঁর মূল বক্তব্য শোনানো হয়। চমৎকার এই ব্যবস্থা। টেলিভিশন বা সিনেমা, প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসর থেকে সরে গিয়ে ছাপার অক্ষরের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে।

বইয়ের সংগে রেডিও ও টেলিভিশন আর ফিল্মজগতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কত অসার তার বিস্তৃত হিসেব পৃথিবীর বাৎসরিক পুস্তক প্রকাশনার পরিসংখ্যান বিচার করলেই মিলবে। ইউনেসকোর হিসেব থেকে জানা যায় যে সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর পাঁচশো কোটির (৫,০০০,০০০,০০০) ওপর বই প্রকাশিত হচ্ছে।[২]

(২) ইউনেসকো থেকে ভারপ্রাপ্ত মিঃ আর, ই. বার্কার সংকলিত 'বুকস ফর অল' বইতে পৃথিবীর প্রকাশিত তাবৎ বইয়ের খবর নানান হিসেবে আর পরিসংখ্যানে প্রকাশিত হয়েছে। বই রাজ্যের অনেক চমকপ্রদ খবর পাওয়া যাবে এই বইতে।

আর, ক্রমবর্ধমান হার এই প্রকাশনার। পৃথিবীর শতকরা ৭৫টা বই ছাপা হয় মোট দশটা দেশ থেকে বাকী ২৫টা আসে তালিকার অন্য ৫০টা দেশ থেকে। প্রকাশিত বইয়ের অর্ধেক অংশ চলে যায় স্কুল কলেজে পাঠ্য পুস্তক হিসেবে বাকী অর্ধেকের প্রধান অংশীদার হোল পৃথিবীর গ্রন্থাগার সমূহ। বার্কার সংগৃহীত পরিসংখ্যান থেকে সারা দুনিয়ার বই রাজ্যের অনেক খবর বার করে নেওয়া যায়। বই প্রকাশের হিসেব মত প্রথম দশটা দেশের পরিসংখ্যান এখানে তুলে দেওয়া হল :

	নামানুসারে প্রকাশিত পুস্তক সংখ্যা				লোক সংখ্যা	প্রতি দশলক্ষ লোক পিছু প্রকাশিত বই সংখ্যা	অনুবাদ বই সংখ্যা	গ্রন্থাগারের বই (কোটি)	শিক্ষিতের হার
	১৯৫২	১৯৫৩	১৯৫৪	১৯৫৫	কোটি	১৯৫২	১৯৫২	১৯৫২	%
রাশিয়া	৩৭৫০০	—	—	৫৪৭৩২	২০	১৮৮	১৬.৯	৬৫	৯০
ইংলণ্ড	১৮৭৪১	১৮২৫৭	১৯ ৮৮	১৯৯৬২	৫	৩৭৫	২১.৮	২৮.৬	৯৯
ভারত (১৯৫০)	১১৪০০	—	—	—	৩৬.৭	৪৭	—	—	১৭
জাপান	১৭৩০৬	২০২৯৩	১৯৮৩৭	২১৮৫৩	৮.৭	১৯৯	১১.৭	—	৯০
জার্মাণ,কে,রিপা-	১৩৯১৩	১৫৭৩৮	১৬২৪০	১৫৮৩৭	৪.৮	২০৬	১৫.৪	১০.৮	৯৯
যুক্তরাষ্ট্র	১১৮৪০	১২০৫৭	১১৯০১	১২৫৮৯	১৬	৭৪	—	৬৬.৪	৯৭
ফ্রান্স	১০৪১০	১০০১৭	১০৬৭২	১১৭৯২	৪.৩	২৪২	৯.৮	১৩	৯৭
ইটালী	৯৬৭৯	৮৯৭২	৮৫১৪	৯৩২০	৪.৭	২০৬	৬.৭	—	৭৮
চীন (১৯৫০)	৭০৪৯	—	—	—	৪৬.৫	১৫	৫৮	—	৪৭
নেদার ল্যাণ্ডস	৬৭২৮	৭০৪৫	৭০১৯	৭৫৫৩	১	৬৭৩	—	৩.১	—

(তালিকা : ১)

এক ভারতবর্ষ আর চীনের পুস্তক সংখ্যার হিসেব পাওয়া গেছে কেবল ১৯৫০ সালের। আর কোনো বছরের পাওয়া যায়নি। চীনের কি অবস্থা জানি না, ভারতে এখনও বই প্রকাশনার জগতে অতুলনীয় অরাজকতা। মোট

বইয়ের সংখ্যা দূরের কথা ভারতের ১৪টা প্রধান ভাষায় * কোনটায় কত বই বছরে প্রকাশিত হয় তারই বা হিসেব কে রাখছে ? ভারতীয় প্রকাশনা জগত এক নির্বিকল্প চিন্তাহীন রাজ্যে বাস করে। তাদের না আছে হিসাবের দায় না আছে জাতীয় কর্ত্তব্য। সরকারী ভাবে যে খবর তাঁরা প্রকাশ করেন সময়ে সময়ে তার সংবাদ-গুরুত্ব বাহুল্য মাত্র *। আর কপিরাইট লাইব্রেরী হিসেবে জাতীয় গ্রন্থাগারের অসহায় দশা এখনও ঘোচে নি। অন্তত জাতীয় গ্রন্থাগারের কাছ থেকে পুস্তক পরিসংখ্যান আমরা আশা করতে পারতুম। শিক্ষার হার, মোটামুটি গ্রন্থাগারের প্রসার, নানান পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি এরকম আরো নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিচারে আমাদের জাতীয় উন্নতি আন্দাজ (!) করে নিতে হবে। অন্ততঃ যতদিন শিক্ষার হার উর্দ্ধমুখী ততদিন আমাদের বইয়ের জগত ক্রমপ্রসারশীল এরকম ধারণা অযৌক্তিক নয়।

উদাহরণ হিসেবে আমাদের আদর্শ স্থানীয় হোল জাপান। যদিও বই প্রকাশের সংখ্যা বিচারে (১৯৫০ সালের সংখ্যা ১৯৫২ সালে) ভারতের স্থান তৃতীয় তবু প্রয়োজনের তুলনায় এ হিসেবের গুরুত্ব অসম্ভব রকমের কম। কেননা প্রতি দশ লক্ষ অধিবাসী পিছু দেশে মোটে ৪৭টা বই প্রকাশ হচ্ছে। ইউনেসকো যে তালিকা ছাপিয়েছেন (বুকস ফর অল) আমাদের স্থান সেখানে মাত্র চীন দেশের উপরে। ১০ লক্ষ অধিবাসী পিছু পুস্তক প্রকাশের নিম্নতম সংখ্যা হোল চীনে (১ নং তালিকা দ্রষ্টব্য)। তবু চীনের শিক্ষা-জগত আমাদের থেকেও ক্রমপ্রসারশীল। ফলে কয়েক বছরের মধ্যে তার পরি-সংখ্যানের চেহারা বদলালে আমাদের অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। হয়তো অনতিভবিষ্যতে আমাদের এ দশাও ঘুচবে, কিন্তু তা একান্ত নির্ভরশীল শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে। 'ভারতীয় গণতন্ত্র পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী সংখ্যক অশিক্ষিত মানুষদের পরিচালনা করে—তাই সিনেমার প্রসার যথেষ্ট থাকলেও (এবং টেলিভিশন বোধ হয় একটিও নেই) ফিল্ম বা রেডিওর প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখানে

(৩) বাংলা, অসমীয়া, গুজরাটী, হিন্দী, কানাড়া, কাশ্মিরী, মালয়ালম, মারাঠী, উড়িয়া, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু, উর্দ্দু।

(৪) 1. Indian Publishers and Bookseller, 2. Publishers' Monthly, 3. The Book-Trader Bulletin, 4. The Book Trade Review.

চিন্তারও বাইরে। তবু এই স্বল্পশিক্ষার বিরাট আসরেও আমাদের প্রকাশকরা আর একটু তৎপর হওয়ারও সুযোগ খুঁজে নিতে পারেন (তাঁদের লাভের কড়ি বজায় রেখেও)। যে কোন গ্রন্থাগার-কর্মী আমার এই অভিমত নিশ্চয়ই সমর্থন কোরবেন।

জাপানের যে ছবি ফুটে উঠেছে পরিসংখ্যানে তার তুলনা ভারত ও চীনের সংগে কোনক্রমেই করা চলে না। কেবলমাত্র উদ্ধৃত সংখ্যার দিক থেকে নয় জাপানের সর্বাঙ্গীন জাতীয় উন্নতি এশিয়ার কোন দেশের সংগেই তুলনীয় নয়। শিল্পে, বিজ্ঞানে এবং মানসিক উৎকর্ষতায় তাদের আসন বিশ্বের উন্নততর দেশের পাশেই সংগৃহীত। এক রাশিয়া ছাড়া তাদের বাৎসরিক বই প্রকাশের বর্ধিত হার বইয়ের চাহিদার নিশ্চিত ব্যারোমিটার (অর্থনীতি অনুযায়ী এখানেও চাহিদা ও যোগানের মেকানিজম্ অবশ্যই ক্রিয়াশীল)। এখানেও ফিল্ম রেডিও টেলিভিশনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ওঠে। কেননা জাপানের টেলিভিশনের প্রায় আড়াই লক্ষ গ্রাহক (১৯৫৩ সালে ইউনেস্কোর হিসাব অনুযায়ী : Courier May 1956)। তবু পুস্তক পাঠস্পৃহা হ্রাসের অভিযোগ এদেশে ওঠে না এবং উঠতেই পারে না। কেননা তাদের বাৎসরিক বই প্রকাশের দ্রুত প্রগতি টেলিভিশনের চটকদারী মনোহারিত্বকে নিশ্চিত পরাজিত করেছে। জাপানের শিক্ষার হার শতকরা ৯০। আর প্রতি দশলক্ষ লোক পিছু ১৯৯টি নতুন বই ছিল ১৯৫২ সালে। তিন বছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬০ (১৯৫৫)। ১৯৫২ সালে সতেরো হাজার তিনশো ছয় ছিল প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা, ১৯৫৫ সালে প্রকাশ পেয়েছে একুশ হাজার ছশো তিপ্পান্ন। পৃথিবীর প্রধান ৯টা ভাষায় প্রকাশিত বই সংখ্যার মধ্যে প্রতি ৮টা বইয়ের একটা হবে জাপানী ভাষায় (১৯৫২)। উল্লিখিত ৯টা ভাষার শতকরা ১১·৭টা বই হোল জাপানী ভাষায় প্রকাশিত।

ভাষা	:	প্রকাশস্থান	:	শতকরা হিসাব
ইংরাজী	:	গ্রেট ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, (ভারতের কোনো তথ্য নেই)।	:	২১·৮
রাশিয়ান	:	সোভিয়েট রাশিয়া।	:	১৬·৯
জার্মান	:	মূল জার্মান ভূখণ্ড, অষ্ট্রিয়া সুইজারল্যাণ্ড।	:	১৫·৪

ভাষা	:	প্রকাশস্থান	:	শতকরা হিসাব
জাপানী	:	জাপান।	:	১১·৭
ফরাসী	:	ফ্রান্স, বেলজিয়াম, মরক্কো,	:	৯·৮
স্পেনীয়	:	স্পেন, আর্জেন্টিনা, ল্যাটিন আমেরিকা।	:	৭·৫
ইটালীয়	:	ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড।	:	৬·৭
পর্তুগীজ	:	পর্তুগাল, ব্রাজিল।	:	৫·৪
চীনা	:	চীন।	:	৪·৮
				১০০

(তালিকা : ২)

• অনুবাদ সাহিত্যের দিকেও যদি তাকানো যায় তাহোলে বিশ্বের সেরা অনুবাদকারী দেশগুলির পাশেই তার স্থান—অনুবাদে প্রথম পাঁচটা দেশের পঞ্চম স্থান হোল জাপানের।

দেশ	:	অনুদিত বইয়ের সংখ্যা
জার্মানী (ফেডারেল ও রিপাবলিক)	:	১৮০৬
ফ্রান্স	:	১১৫২
পোলাণ্ড	:	১০৩২
ইটালী	:	১১১৬
জাপান	:	১০৬৩

(তালিকা : ৩) (ইনডেক্স ট্রানস্লেশানাম্ : ১৯৫৬ : ইউনেস্কো)

ওপরের এই তথ্যগুলো থেকে জাপানের পুস্তক-প্রীতির নিশ্চিত নমুনা পাওয়া যায়, যা নাকি আমাদের দেশেও অনুকরণীয়।

বই পড়ার স্পৃহা পৃথিবীতে ক্রমে বেড়েই চলেছে। ভবিষ্যতে পৃথিবীর এই হোল একমাত্র আশার কথা। তবু আজ পৃথিবীর অর্ধেক লোক শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত। বইয়ের আলোয় প্রবেশদ্বার সেখানে রুদ্ধ। তবু শিক্ষিত মানুষের প্রাণান্ত চেষ্টায় পৃথিবীর নানা দেশে অশিক্ষার অন্ধকার

আজ দূর হোতে চলেছে। যে সব দেশে এখনও সবে মাত্র শিক্ষার আলো গিয়ে পৌঁছোচ্ছে সেখানে এক অসীম সম্ভাবনার অবকাশ থমকে রয়েছে। তবু সেখানে অধুনা বই প্রকাশের যে সমস্যা ইউনেস্কো তা তুলে ধরেছে :

The difficulty is not so much in printing, since there are various machines and techniques in existence which are designed to produce books and other printed matter in small quantity ······. The difficulty is to find or train competent authors or translators ; to obtain supply of materials (such as paper, type and machinery)······to, distribute the finished product under conditions of great distances and poor communications ; and above all, to find the money. (Courier : Feb. : 1957)। আসলে ব্যক্তিগত চেষ্টায় অশিক্ষার অন্ধকারের এই বিরাট যবনিকা তোলা যাবে না। বলিষ্ঠ পরিকল্পনায়, অফুরন্ত কর্মোদ্যোগে শত শত মানুষের চেষ্টা এখানে নিয়োগ করতে হবে। লেখক, অনুবাদক, শিল্পী, মুদ্রাকর, প্রকাশক, ব্যবসায়ী শিক্ষক এক বিরাট মেকানিজমের অন্তর্ভুক্ত হবে। এককালে খৃষ্টান মিশনারীরা অন্ধকার দেশের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। গণশিক্ষার প্রাথমিক প্রচেষ্টায় এ ধরণের একক উদ্দীপনার হয়তো স্থান ছিল। কিন্তু আজ কাজের ক্ষেত্র বহু সহস্র গুণে বেড়ে গেছে। এখানে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থত্যাগে দুনিয়ার অর্ধেক মানুষকে শিক্ষার আলোকে মুক্তিস্নান করানো যাবে না। সরকারী অর্থ, প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার যোগাযোগে টেনে আনতে হবে সাধারণ মানুষকে। সোভিয়েট রাশিয়া এখানে পৃথিবীর আশ্চর্য উদাহরণ স্থল। কুরিয়ারে প্রকাশিত একটা সংবাদ তুলে দিই এখানে :

A foreign visitor to the Soviet Union last year expressed surprise at the large number of street vendors, he saw, selling books on commission basis for the overcrowded bookstores of Moscow. The street-vendors are almost as common as the ice-cream stands he reported, adding : "Russia to-day is a nation of readers, and book production, although immensely increased since the second World War, has not yet begun to satisfy the demands". (Courier : Feb : 1957)

রাশিয়ার বই আর বইয়ের জগত সম্পর্কে ইউনেস্কোর দপ্তরে যে খবর এসে পৌঁছোচ্ছে তার পরিসংখ্যান আমাদের অনিবার্য বিস্ময়ের উৎস। কুরিয়ারের ভাষাতেই : Figures for a single year are staggering, those for the

38 year period from 1918 to 1955 are almost astronomic। আমাদের এক নম্বর তালিকা দেখলেই দেখতে পাব যে এক ১৯৫৫ সালেই রাশিয়ায় প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা চুয়ান্ন হাজার সাতশো বত্রিশ। এই সমস্ত বইয়ের প্রতিলিপি সংখ্যা (কপি) ১০০ কোটীকেও ছাড়িয়ে গেছে। অসম্ভব দ্রুতগতিতে রাশিয়ায় বইয়ের জগৎ সম্প্রসারণশীল। রাশিয়াতে ৮০টা ভাষা। ১৪০টা উপভাষা। মোট ১৬টা রিপাবলিকে ৩৮ বছর ধরে ১২২টা ভাষায় পুস্তক রচনা হচ্ছে। যে সব ভাষায় প্রাক বিপ্লব যুগে কোনোদিন কোনো বই লেখা হয় নি, কথ্য ভাষা হিসেবে পরিগণিত ছিল, তারা অনেকেই আজ আধুনিক বর্ণ লিপিতে সজ্জিত। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তৃত সড়ক উন্মুক্ত হয়েছে তাদের লিপি মাধ্যমে। সরকারী উদ্যোগ সেখানে বইয়ের জগতে নিয়ত কর্মশীল। তাই বই প্রকাশনায়, বই পড়ার উদ্যোগ প্রসারে সেখানে সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিযোজিত। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে বই পড়ার নেশা ছড়িয়ে পড়েছে রাশিয়ায়। যে তুলনায় নিরক্ষরতা দূর হচ্ছে তার সংগে তাল রেখে চলেছে বই পড়ার নেশা। এ যেন অনেক দিনের উপবাসী মানুষের সামনে প্রচুর খাবারের থালা রেখে দেওয়া। এমন একটা অবস্থার বর্ণনা দিয়েছে Courier : "The people of the Soviet Union have so great a passion for things cultural that it is said they will read any good book they can lay their hands on"।

কেবলমাত্র সোভিয়েট দুনিয়া বলে নয়, পৃথিবীর যে কোনো অন্ধকারতম দেশে ক্রমপ্রসারিত শিক্ষার হারের সংগে তাল রেখে লেখক, শিক্ষক, প্রকাশক, মুদ্রাকর ও সরকারী উদ্যোগ ও অর্থের পরিকল্পনা মত যোগাযোগ ঘটালে শিক্ষার প্রদীপ এক অনাস্বাদিত দুনিয়া আলোকিত করে তুলবে, সেখানে রেডিও-টেলিভিশন-ফিল্মের সুলভ মোহ কোনক্রমেই বইয়ের একাধিপত্য নষ্ট করতে পারবে না। এমনিতেই পৃথিবীর অন্য অংশে যখন বইয়ের রাজত্বে "লেসে ফে'য়ের" (*laissez faire*) প্রাধান্য সেখানেও বইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। বই পড়ার মোহ থেকে শিক্ষিত মানুষ কোনদিনই বিচ্যুত হবে না। তার ক্ষুধার্ত চৈতন্যের একমাত্র খোরাক হোল বই। আর বই সম্পর্কে স্মরণীয় সেই সাধুবাক্য : "There are no uninteresting except non-interested readers"। আসলে কোন বই কোন দিন আকর্ষণ হারাবে না একজন না একজন পাঠকের ক্ষুধার সম্পদ তার লিপির আড়ালে আত্মগোপন করে থাকে। এই ক্ষুধার সম্পদ চাহিদা মত জোগান দিতে জানলেই পৃথিবীর আশ্চর্যতম ম্যাজিকের সৃষ্টি

হবে ; এমনিতেই দেখি প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে পৃথিবীতে বইয়ের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। আমাদের এক নম্বর তালিকা থেকে রাশিয়া, চীন ও ভারত বাদ দিলে বাকী ৭টা দেশের পরিসংখ্যান হিসেব করলে দেখতে পাবো যে প্রতি ৫ মিনিটে সাতটা দেশের যে কোন এক স্থানে একটা না একটা নতুন বই সৃষ্টি হয়েছে ১৯৫৫ সালে। রাশিয়া, চীন ও ভারতকে বাদ দিলে বাৎসরিক মোট নতুন বইয়ের যা হিসেব পাবো তা হোল :

১৯৫২ : ৮৮,৬১২ ১৯৫৩ : ৯২,০৭৬

১৯৫৪ : ৯৩,৩৬১ ১৯৫৫ : ৯৮,৫০৯

এই পরিসংখ্যান মতে ক্রমপ্রসারিত বইয়ের জগৎ। পুস্তক চাহিদার এই সংশয়হীন ব্যারোমিটারে আমরা ধরে নিতে পারি যে বই পড়ার আগ্রহ পৃথিবীতে দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। এই আগ্রহ সম্পূর্ণ নষ্ট করার মত শত্রু পক্ষের সন্ধান আজো পাওয়া যায় নি। রোদ, জল, ঝড়, উই আর ইঁদুরের ঐতিহাসিক শত্রুতা আজ ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। নতুন যুগের শত্রুরাও কেউ বই পড়ার নিরুদ্বিগ্ন অবসর কেড়ে নিতে পারবে না। এমন কি হিটলারী শত্রুতাও চিরস্থায়ী নয়। বই আর মানুষের আত্মার ঘনিষ্টতর সম্পর্কের চিরস্থায়ী বাঁধন ক্রমশই দৃঢ়তর হতে চলেছে। বই সম্পর্কে ইষ্টম্যানের সেই মনোরম সাধুবাক্য তুলে ধরার লোভ সামলাতে পারছি না :

"The books are not papers and ink and cloth, they are persons. For the most part they are a company of immortals who have weathered the centuries and are now marching towards eternity. They invited me to walk with them a little way. They open their hearts to me. They told me their adventures, their romances, their meditations and their exploration of the inner world. They lifted my horizons. They made me laugh and cry and rejoice to be living in the same world......... They invite you too. (F. Eastman : Books that have shaped the World).

বইয়ের আমন্ত্রণে যখন আপনি আমি সংখ্যায় সংখ্যায় সাড়া দিচ্ছি তখনো কিন্তু দুনিয়ার অর্ধেক মানুষ বইয়ের সংগে কোনো সম্পর্ক রাখবার সুযোগই পাচ্ছে না। বইয়ের মূল্য অর্ধ দুনিয়ার কাছে এখনো অপরিজ্ঞাত। রেডিও–সিনেমা-টেলিভিশন না থাক (যেমন আফ্রিকার মধ্যদেশে, কি পৃথিবীর মরুভূমি প্রান্তরে) কিন্তু অন্য এক শত্রুতার অবশেষ থেকে যাচ্ছে। শাস্ত্রী মশাই কথিত এই ঐতিহাসিক তালিকার সেই শেষ অবশেষটুকু। বইয়ের

শেষ শত্রু এবং বোধ হয় মোক্ষম শত্রু হোল নিরক্ষর মানুষেরা। অশিক্ষার অন্ধকারে এই অমূল্য সম্পদের কোন মূল্যই নেই। আসলে এই শত্রুনাশের একমাত্র হাতিয়ার হোল শিক্ষার প্রসার। বইয়ের এই শেষ শত্রু বধের নিশ্চিত আয়োজনে স্বল্প শিক্ষিত মানুষদের দেশে গ্রন্থাগার সমূহের ভূমিকা অনেকখানি।

ভারতবর্ষে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার পরিসংখ্যান

(১৯৫৬ সাল)

ভারতবর্ষে প্রকাশিত মোট পত্র-পত্রিকা	:	৬৫৭০ খানি
তন্মধ্যে—মাসিক পত্রিকা	:	২৫০৬ ,,
সাপ্তাহিক পত্রিকা	:	১৯০০ ,,
পাক্ষিক পত্রিকা	:	৫১৮ ,,
দৈনিক পত্রিকা	:	৪৭৬ ,,
প্রদেশ হিসাবে—বোম্বাই হইতে	:	১২৭১ ,,
পশ্চিমবঙ্গ হইতে	:	১১২৯ ,,
উত্তরপ্রদেশ হইতে	:	৭৭৬ ,,
মাদ্রাজ হইতে	:	৭১৭ ,,
দিল্লী হইতে	:	৫৬০ ,,
বিহার হইতে	:	২৮৬ ,,
উড়িষ্যা হইতে	:	২১৫ ,,
মধ্যপ্রদেশ হইতে	:	১৬৫ ,,
আসাম হইতে	:	৩৪ ,,
ভাষা হিসাবে—হিন্দী	:	১৯%
ইংরেজী	:	১৭%
বাংলা	:	১০%
উর্দু	:	৯%
গুজরাটি	:	৭%
মারাঠি ও তামিল	:	৫%
অন্যান্য	:	৫%
হিন্দী পত্রিকার মোট সংখ্যা	:	১২৫৪ খানি
ইংরেজী পত্রিকার মোট সংখ্যা	:	১১৩৩ খানি
বাংলা পত্রিকার মোট সংখ্যা	:	৬৩৩ খানি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ গ্রন্থাগার

বিনয়েন্দ্র সেন গুপ্ত

নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগারের (Free Public Library) প্রথম প্রতিষ্ঠা থেকে একে সর্বোত্তম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব যুক্তরাষ্ট্রের। ১৮৫২ সালে বোষ্টন পাবলিক লাইব্রেরীর প্রথম বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে সাধারণ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমগুলি এমনভাবে প্রচারিত হওয়া উচিত যাতে সমাজের বেশী সংখ্যক লোক সমাজ ব্যবস্থার মূলগত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে পড়াশুনা করে এবং চিন্তা করে।

উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রমশিল্পের প্রসারের ফলে সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজন ঘটল, জনগণের মধ্যে পুস্তকের চাহিদা বাড়ল এবং গ্রন্থাগার হল সর্বজনের অবিরত জ্ঞানার্জনের প্রতিষ্ঠান। অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মেরীল্যাণ্ড ও নর্থ ক্যারোলাইনার জেলায় জেলায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপরেই নিউইংল্যাণ্ডের ছোট সহরগুলিতে গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। প্রথম দিকের গ্রন্থাগার-গুলি সাধারণতঃ চাঁদাভিত্তিক কিংবা কোন সংস্থার দ্বারা পরিচালিত। শিল্প সংস্থা বা কর্মচারী সংঘগুলি তাঁদের সভ্যদের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রগতিমূলকভাবে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার স্থাপনায় ম্যাসাচুসেটস্ অগ্রগন্য কারণ এখানেই প্রথম জাতীয় অর্থভাণ্ডার থেকে সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপন ও পরিচালন আইনগতভাবে স্বীকৃত হয়। তারপর থেকেই গ্রন্থাগার মার্কিণ জীবনের অংগীভূত হয়েছে। পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচালনগত স্থানিক হওয়ার বৈশিষ্ট্যে গ্রন্থাগার মার্কিণ জীবনের ঐতিহ্যের মূলে প্রবেশ করেছে। ১৮৭৬ সালে মার্কিণ গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হয়। তারপর থেকে এই পরিষদ গ্রন্থাগার পরিচালনায় মান নির্দেশ করে এবং নূতন ধারার প্রবর্তন করে এর যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছেন। সংখ্যার দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা বেশী গ্রন্থাগারের সমাবেশ হয়েছে। দেশের ছোট বড় সব সহরেই ছড়িয়ে রয়েছে তারা। আটটী সাধারণ গ্রন্থাগার আছে যাদের প্রত্যেকের গ্রন্থসংগ্রহ ১০ লক্ষের কিছু বেশী আর ষোলটী আছে যাদের গ্রন্থসংখ্যা ৫ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষের মধ্যে। এই গ্রন্থাগারগুলি সাধারণ পাঠকদের চাহিদা মেটায়। গবেষক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা এদের ওপর নির্ভর করেন না। অধিকাংশ গ্রন্থাগারই তাদের শাখাগুলির জন্য বইএর একাধিক কপি রাখে। বহুজনপোষিত এই সব গ্রন্থাগারগুলির আঞ্চলিক শাখার

পুস্তক সংগ্রহে আঞ্চলিক রুচি ও মানসের পরিচয় মেলে। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে Enoch Pratt Free Library, Baltimore ; নিউইয়র্ক সাধারণ গ্রন্থাগার, Cleveland সাধারণ গ্রন্থাগার ; এবং বোস্টন সাধারণ গ্রন্থাগার। বয়স্কদের বইপড়া এবং পাঠ পরিচালনে স্থানীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা স্পষ্ট। সমস্ত রকম পাঠস্পৃহাকে উজ্জীবিত করা এবং সর্বপর্যায়ের পাঠানুশীলনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সমস্ত পাঠক সমাজ তথা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যক্তি এবং সমষ্টির উপযোগী গ্রন্থ সঞ্চয় করা এদের কাজ। পাঠস্পৃহাকে উজ্জীবিত করার নানারকম উপায় এঁরা উদ্ভাবন করেছেন। পুস্তক প্রদর্শনী এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য। অনেকে বিশেষ উপলক্ষ্যে সেই সময়ে আলোচ্য বিশেষ বিষয়ের গ্রন্থ তালিকা প্রস্তুত করেন। মার্কিণ গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতি বছর, তার আগের বছরে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বইয়ের তালিকা প্রস্তুত করেন। হাজার পাঠক উৎসুকভাবে এই তালিকার প্রতীক্ষা করে। অনেক গ্রন্থাগার ব্যক্তিগতভাবে পাঠকদের বিশেষ অনুশীলন বা কৌতূহলের বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করে রাখে—এবং নূতন বই কেনা হলে যে পাঠক সেই বিষয়ে আগ্রহী তাঁকে জানিয়ে দেয়।

এ ছাড়া কতকগুলি গ্রন্থাগার টেলিভিসনকে পরীক্ষামূলকভাবে পাঠস্পৃহা জাগানর কাজে ব্যবহার করছে। অনেক গ্রন্থাগারে Readers' Adviser বা পাঠকের পরামর্শদাতার পদ সৃষ্টি করে ব্যক্তিগতভাবে পাঠককে সাহায্য করা হচ্ছে। এঁর লক্ষ্য হচ্ছে সহানুভূতির সংগে শিক্ষা, অর্থাসংগ্রহ ও চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রয়োজন মেটানো, অবশ্য শিক্ষাগত প্রয়োজনই প্রাধান্য পাবে।

কতকগুলি গ্রন্থাগার নিম্নলিখিত দুই রকম ভাবে পাঠকগোষ্ঠির সহায়তা করে—ক্লাব, বিবিধ সংস্থা, কর্মপ্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির নিকট সাহায্য পৌছে দিয়ে এবং বিভিন্ন পাঠকগোষ্ঠিকে গ্রন্থাগারে আসন দান করে। গ্রন্থাগারের সমস্ত যৌথ প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হচ্ছে গ্রন্থরাজির সম্যক ব্যবহারের ফলে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষলাভ যাতে পাঠকবর্গ আরও বেশী পড়েন এবং সমালোচনামূলক ভাবে পড়েন। শতকরা চল্লিশটী গ্রন্থাগার তাঁদের বইপত্র এবং অন্যান্য উপকরণকে ভিত্তি করে নিজস্ব কর্মসূচী তৈরী করেন। বড়ো বড়ো গ্রন্থাগারের ভ্রাম্যমান শাখা আছে। যে সব জায়গায় গ্রন্থাগারের স্থায়ী শাখা নেই সেখানকার বালক বালিকা এবং বয়স্কদের জন্য বই পৌছে দেওয়া হয়। কোন জেলায় যিনি বাস করেন, কাজ করেন এবং বিদ্যালয়ে যোগদান করেন তাঁকেই লাইব্রেরী কার্ড দেওয়া হয়। এই একই কার্ডের সাহায্যে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার থেকেও বই নেওয়া যায়। কিন্তু এখান থেকে তথ্যসংগ্রহ করা যায় না। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

এবং তার নিকটবর্তী শাখায় এই কাজ করা হয়। নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরী অন্য সমস্ত গ্রন্থাগার থেকে একটু অন্য রকম। এই দুটি গ্রন্থাগার থেকে সাধারণ পাঠক ছাড়া গবেষকদেরও সাহায্য করা হয়। নিউইয়র্ক গ্রন্থাগার পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম গ্রন্থাগার যার পুস্তক সংখ্যা ৪০ লক্ষ এবং বহু বিষয়ে সমৃদ্ধ। ডেট্রয়েট সাধারণ গ্রন্থাগার মধ্য-প্রতীচ্যের ইতিহাস গ্রন্থে সমৃদ্ধ ; ক্লীভল্যাণ্ড সাধারণ গ্রন্থাগারে লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ সংগ্রহ আছে।

এবার Enoch Pratt Free Libraryর কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলব। এখানে ৯ জন সদস্য দ্বারা গঠিত বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ আছে।

প্রকাশন বিভাগ দুটী শাখায় বিভক্ত ; একজন ডিরেক্টার এবং একজন সহকারী ডিরেক্টর আছেন ; ডিরেক্টরের অফিসে আছেন একজন সেক্রেটারী, একজন একজিকিউটিভ এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট, তিনজন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট (তাদের মধ্যে দুজন পার্ট টাইম), সাতজন ষ্টেনোগ্রাফার এবং ছাপাখানায় তিনজন সহকারী। ডিরেক্টরের অফিসে আছেন একজন সেক্রেটারী, এবং এডমিনিষ্ট্রেটিভ এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট, তিনজন দ্বার পরীক্ষক, এগার জন বেয়ারা (তার মধ্যে ২ জন পার্ট টাইম) এবং একজন সুইচ্‌বোর্ড দেখবার লোক। পার্সোনেল অফিসে ২ জন অফিসার এবং তিনজন সহকারী ; প্রদর্শনী এবং প্রচার বিভাগে একজন কর্মকর্তা এবং পাঁচজন সহকারী।

নিয়ামক বিভাগের (Processing Division) (১) পুস্তক-সংগ্রহ বিভাগে (acquisition) আছেন একজন প্রধান, একজন বইএর অর্ডার দেন এবং আরও পাঁচজন আছেন তার মধ্যে একজন দলিলপত্রের (documents) রক্ষক, একজন সাময়িক পত্র পত্রিকার তত্ত্বাবধানে একজন কেরাণী এবং একজন সহকারী সহ কাজ করেন। (২) সূচীপ্রনয়ণ বিভাগে আছেন একজন প্রধান, একজন প্রশাসনিক সহকারী এবং আরো ত্রিশজন। (৩) বই বাঁধাই বিভাগে একজন প্রধান এবং আরো ষোলজন। এ ছাড়া আছে কেন্দ্রীয় জনসংযোগ বিভাগ—বাণিজ্য ও অর্থনীতি বিভাগ (একজন প্রধান, একজন প্রশাসনিক সহকারী এবং একজন সহকারী)। (৪) শিশু বিভাগে একজন প্রধান এবং আরও তিনজন। (৫) পুস্তক সঞ্চালন ও সু-পাঠ্য গ্রন্থ বিভাগে তিনজন থাকেন, সঞ্চালন ও রেজিষ্ট্রেসন বিভাগে একজন প্রশাসনিক সহকারী এবং আরো সতেরজন, এ ছাড়া দু'জন বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক আছেন। পৌর শাস্ত্র ও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে আছেন একজন প্রধান, একজন প্রশাসনিক সহকারী এবং তিনজন অন্য কর্মচারী ; শিক্ষা, দর্শন ও ধর্ম বিভাগে একজন প্রধান, একজন প্রশাসনিক সহকারী এবং চারজন

অন্য কর্মচারী, ফিল্ম বিভাগে একজন প্রধান, একজন প্রশাসনিক সহকারী এবং অপর তিনজন কর্মচারী; চিত্র সংগ্রহ বিভাগে একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, একজন অন্য কর্মচারী; চারুশিল্প বিভাগে একজন প্রধান, একজন প্রশাসনিক সহকারী এবং অপর পাঁচজন কর্মচারী; তথ্য সরবরাহ বিভাগে একজন প্রধান, একজন প্রশাসনিক কর্মচারী এবং দশজন অপর কর্মচারী—যাদের মধ্যে দুইজন পার্ট টাইম কর্মচারী আছেন। সংবাদপত্র বিভাগে দুইজন কর্মচারী আছেন। ইতিহাস, ভ্রমণ ও জীবনী বিভাগে একজন প্রধান, একজন প্রশাসনিক সহকারী এবং আর চারজন। সাহিত্য বিভাগে—একজন ভারপ্রাপ্ত, একজন প্রশাসনিক এবং চারজন আরো আছেন। পো রুমের (Edger Allen Poe) জন্য আছেন একজন। মেরীল্যাণ্ড বিভাগে একজন প্রধান, একজন প্রশাসনিক সহকারী এবং আরো তিনজন। অল্প বয়স্কদের বিভাগে একজন ভারপ্রাপ্ত। সংযোগ বিভাগে (১) বয়স্কদের জন্য পাঁচজন (২) শিশুদের জন্য চারজন (৩) অল্প বয়স্কদের জন্য ২ জন, বাণিজ্য ও সৌধ বিভাগে (Business and Buildings Division) একজন প্রধান এবং প্রশাসনিক কর্মচারী, তাছাড়া তিনজন আছেন গ্রন্থাগার ভবনের রক্ষণকারী, দু'জন মোটরচালক, একজন বৈদ্যুতিক মিস্ত্রী, দুজন এলিভেটার অপারেটর, তার মধ্যে একজন পার্ট টাইম, দুইজন ইঞ্জিনিয়ার, চব্বিশজন দ্বাররক্ষী এবং রক্ষিণী, তাদের মধ্যে তেরজন পার্ট টাইম। সিপিং ও ষ্টকরুমে একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং আরও দুজন, তাছাড়া চারজন প্রহরী।

দ্বিতীয় বিভাগ হচ্ছে সম্প্রসারণ বিভাগ—এখানে একজন প্রধান, একজন প্রশাসনিক সহকারী এবং অপর সাতজন আছেন যার মধ্যে একজন পার্ট টাইম—বিদ্যার্থী সংগ্রহের জন্য দুইজন, আভ্যন্তরীণ কর্জ বিভাগের জন্য ৫ জন; দশটী ভ্রাম্যমান পুস্তকালয় (Book Mobiles)।

এছাড়া আরও আঠাশটী প্রশাখা আছে যাদের প্রত্যেকের নিজস্ব একজন গ্রন্থাগারিকসহ স্বতন্ত্র কর্মচারী আছে, একজন করে প্রহরী আছে এবং শাখার আয়তন অনুযায়ী কর্মচারী সংখ্যার তারতম্য আছে।

বর্গীকরণ পদ্ধতি বর্ণমালার সাহায্যে গঠিত।

এনক্ প্র্যাট্ গ্রন্থাগার থেকে একটী খুব সুখপাঠ্য স্টাফ রিপোর্টার প্রকাশিত হয়। নানারকম স্কেচ এবং ব্যঙ্গচিত্র থাকে এতে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে নবসংযোজিত পুস্তকের মাসিক তালিকাও এতে প্রকাশিত হয়।

এই বিবরণ থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ গ্রন্থাগারের আয়তন সম্পর্কে ধারণা হবে।

কাউনটী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এখানে খুব উন্নত ধরণের ; বড় নগরগুলির ব্যবস্থাও তেমনি। দুই জায়গাতেই পরিচালন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকৃত এবং স্থানিক পরিচালনে প্রশাসন পর্ব খুবই সংক্ষেপিত। পরিচালন ব্যবস্থাকে দ্রুত এবং বৈচিত্র্যময় করার জন্য আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি এবং আবিস্কারের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। আই, বি, এম মেসিনের সাহায্যে বইএর লেনদেনের রেকর্ড রাখা হচ্ছে এবং প্রত্যেক শাখা গ্রন্থাগারে বিশদ গ্রন্থসূচী রাখার ফলে সেখানকার গ্রন্থাগারিক পাঠকদের সহায়তা করতে পারেন।

ষ্টেটের আইন অনুযায়ী কাউনটী গ্রন্থাগারগুলি স্থাপিত হয়েছে এবং এদের গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের ও নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে কর সংগ্রহ করে গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে গ্রন্থাগার পরিচালনার উদ্যোগ সম্পূর্ণ স্থানিক সমাজের হাতে এসে গেছে।

১৯৫০ সালের মে মাসে কাউনটী কাউন্সিলে যে আইন পাস হয় তার ফলে গঠিত মনটগোমারী কাউনটী লাইব্রেরীর কথা উল্লেখযোগ্য। উক্ত আইনের দ্বারা এই গ্রন্থাগার কাউনটী ম্যানেজার এবং গ্রন্থাগার বিভাগের ডিরেক্টারের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করবার ক্ষমতা অর্জন করেছেন।

(লেখকের মূল ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে অনুবাদ করিয়াছেন মীরা চৌধুরী)

নবদ্বীপে গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির

গৌরাঙ্গচন্দ্র কুণ্ডু

নবদ্বীপে গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির পরিচালনার ভূমিকায় যে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, তা' থেকেই একটি স্বতন্ত্র নিবন্ধের উপাদান যোগান যায়। গুরুত্ব স্বীকার করে আলোচ্য ক্ষেত্রে তার দু' একটু উল্লেখ না করা অসঙ্গত হবে বলে অতি সংক্ষেপে সে ইতিহাসের দু' এক টুকরো উপস্থিত করছি।

স্থানীয় সমাজকর্মী শ্রীযুক্ত নির্মল চন্দ্র চৌধুরী তাঁর স্কুল কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ও অনুগ্রহে সহসা গ্রন্থাগার সংগঠনের মধ্যে যে সত্য ও রস খুঁজে পেলেন, তাহাই নবদ্বীপে গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল বলে ধরা যেতে পারে। তিনি ১৯৫৫ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসেই নবদ্বীপের গ্রন্থাগার সমাজে তার রস-প্রবাহ সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট হন, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে নবদ্বীপের গ্রন্থারগুলিকে সংগঠিত করে কিভাবে তার স্থায়িত্ব, জনপ্রিয়তা এবং জনকল্যাণের উপযোগিতা বৃদ্ধি করা যায় তৎপ্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তার ফলেই নবদ্বীপে গ্রন্থাগার শিক্ষা বিষয়ে কিছুটা সাড়া অনুভব করা যায় এবং কোন কোন মহলে এদিকে উৎসাহ প্রকাশেরই নজির পাওয়া যায় কতিপয় উৎসাহীর পরিষদ পরিচালিত ক্লাশে অংশ গ্রহণে। তারপর আরো বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নবদ্বীপের বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলিকে সুসংবদ্ধ ও সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ দলকে গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিক্ষায় সুনিপুণ করার কথাও তিনি চিন্তা করেন এবং তাঁর লক্ষ্য হল নবদ্বীপে একটি গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির পরিচালনা করা। এভাবে তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ জনসেবার যে আদর্শে গঠিত, সেই সেবাবৃত্তির আদর্শানুপ্রাণিত কর্তৃপক্ষের সহৃদয় অনুগ্রহে এখানে একটি শিক্ষণ শিবির পরিচালনা স্বীকৃত হয়।

আসলে গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির জিনিষটি কি এবং কি তার উদ্দেশ্য সে বিষয়ে কিছু না বললে সাধারণ পাঠকের পক্ষে অনুধাবন করা অসুবিধা হতে পারে। যেদিন থেকে গোটা ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত কুশলী কর্মীর প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকে, সেদিন বাংলা দেশেও তার অভাব কিছুমাত্র কম ছিল না। সে অভাব মিটানোর দায়িত্ব একদিকে নিয়েছেন

নবদ্বীপ শিক্ষণ শিবির সমাপ্তি উপলক্ষে গৃহীত আলোকচিত্র
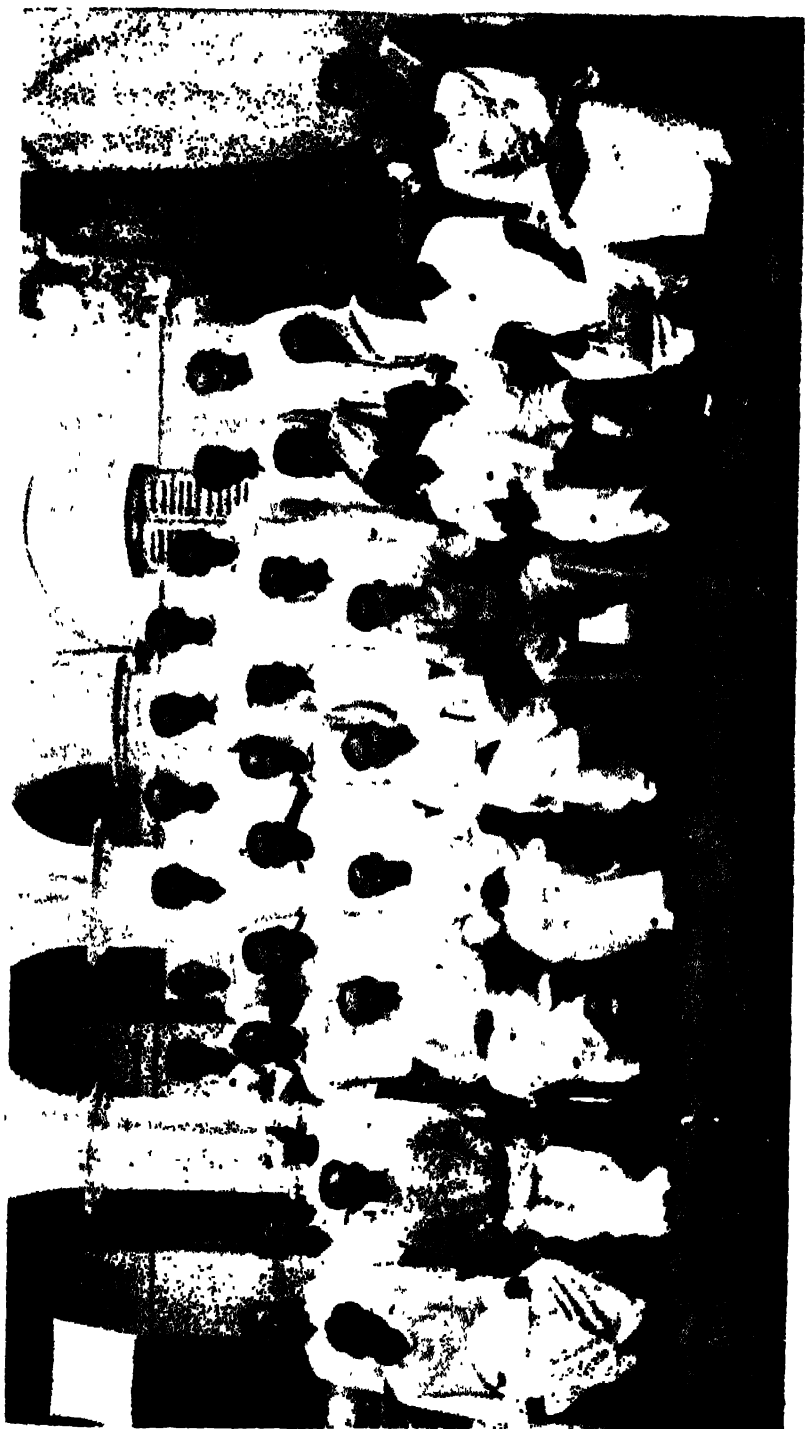
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা কোর্সের প্রবর্তন করে, অন্যদিকে নিয়েছেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তিন মাসের সার্টিফিকেট কোর্স চালু করে। কিন্তু এ সকল থাকা সত্ত্বেও পরিষদ বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জেলায় একটি স্বল্প মেয়াদী শিবির খোলেন এবং কিছু সংখ্যক স্থানীয় কর্মীকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে কুশলী করে তোলেন। কিন্তু কেন? এই কেন কথার উত্তর দান প্রসঙ্গেই পরিষদ সচিব শ্রীফণিভূষণ রায় বলেন : "সমস্ত দেশে উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সৃষ্টি করে তাকে সুপরিচালিত করতে হলে…… যে বিরাট শিল্পকুশল বাহিনীর প্রয়োজন দেশে আজও তার সৃষ্টি হয় নি।…… কতকটা এই পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করেই ভারতের অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের মত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদও অল্প মূল্যে শিল্পবিদ্যা বিতরণের ব্যবস্থা করেন।…… কর্মধারার ত্রুটী পরিষদ কর্মীদের মনে চিন্তা জাগিয়ে তোলে, এই ত্রুটীকে অপসারণ করার চিন্তার মধ্য দিয়েই বিভিন্ন জেলায় অল্প সময়ের শিক্ষণ শিবির পরিচালনার কল্পনা জন্মলাভ করে।"* শ্রীযুক্ত রায়ের উক্তির স্বপক্ষীয় ব্যাখ্যাকে সমর্থন করেই বলা যায় যে, মূলতঃ তিনটি কারণে শিক্ষণ শিবিরের প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রথমতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা কোর্স ও পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্স শিক্ষণ গ্রহণে অনেকের দুটি বাধা আছে—একটি আর্থিক বাধা, অপরটি শিক্ষাগত বাধা। বাংলার বিভিন্নাঞ্চল থেকে কলিকাতা শহরে থেকে শিক্ষা গ্রহণের ব্যয় বহন সকলের পক্ষে সম্ভব নয় এবং সার্টিফিকেটের নিম্নতম শিক্ষা ইণ্টারমিডিয়েট ও ডিপ্লোমার স্নাতক ডিগ্রী। ফলে শিক্ষা ও অর্থের দিক থেকে যাঁরা একটু সবল, তাঁদের মধ্যেই গ্রন্থাগার শিক্ষণ সীমায়িত। এ জন্যই যাঁদের অর্থও নেই, প্রয়োজনীয় শিক্ষাও নেই তাঁদের সুযোগ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে এ শিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, এ পর্যন্ত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত বা গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণের অধিকাংশই বিভিন্ন স্কুল কলেজের পক্ষ থেকে মনোনীত হয়ে আসেন। কিন্তু পেশা হিসাবে সর্বত্র এ শিক্ষার আর্থিক স্বীকৃতি ও যথাযথ মূল্য দানের সুযোগ না থাকায় তাঁদের অনেকেই কার্যান্তর গ্রহণে বাধ্য হন। আর যাঁরা কর্মক্ষেত্রের অন্যান্য দিক থেকে প্রায় বঞ্চিত তাঁরাও জীবিকার্জনের পথ হিসাবে গ্রন্থাগার শিক্ষণ বিষয়ে এগিয়ে আসেন। তাঁরাও শহরাঞ্চলের সরকারী বা অর্থ সচ্ছল বে-সরকারী গ্রন্থাগারগুলিতে দু' পয়সার ব্যবস্থা করে নিয়ে কার্য গ্রহণ করেন। ফলে মফঃস্বলের অর্থহীন গ্রন্থাগারগুলি সামান্য বেতনের বিনিময়ে আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষণপ্রাপ্ত লোক পান না। এ সকল কর্মীর শিক্ষণ গ্রহণের মূলে

* গ্রন্থাগার : [illegible], ১৯৬১। পৃঃ ১২—১৪)

পেশাগত লক্ষ্যই প্রধান; সেবাবৃত্তির কোন আদর্শ তাঁদের নেই। নিজ নিজ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে যাঁরা জনসেবার কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেবাবৃত্তি গ্রহণ করেছেন, সে সকল সেবাপরায়ণ স্থানীয় কর্মী সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই শিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন। এঁদের লক্ষ্য হবে নিজ নিজ গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিক্ষায় কুশলী বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে নিজ গ্রন্থাগার সংগঠিত করা এবং জনসাধারণকে তাঁর শিক্ষণের উপকারিতা গ্রহণের সুযোগ দিয়ে শিক্ষণ শিবিরের প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তোলাই এঁদের কাজ। তৃতীয়তঃ দেশের সমস্ত গ্রন্থাগারকে সুসংবদ্ধ করতে হলে যে পরিমাণ শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন, রয়েছে তদপেক্ষা অনেক কম। অথচ প্রতি বৎসর মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন কর্মী শিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে বেরোন। অধিক সংখ্যায় শিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার্থীর ভীড় থাকাতেও সকলকে সেখানে সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। আবার পল্লী অঞ্চলের ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে অর্থব্যয়ে শিক্ষার্থী প্রেরণ করাও অসম্ভব। এ সকল অসুবিধার দিক লক্ষ্য করেই অন্ততঃ মফঃস্বল বাংলার শিল্পকুশলের সমস্যাটা দূর করার জন্য বিভিন্ন দিকে এই শিক্ষণ শিবির অভিযান। আর একটা কারণও এখানে উল্লেখ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, প্রায় জনসাধারণেরই ধারণা বর্তমান পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার সংগঠনের কোন অর্থই হয় না। তাঁরা এখনো গ্রন্থাগার শিক্ষণের সত্য-সন্ধান না পেয়ে দীর্ঘদিনের চিরাচরিত সংস্কারমুক্ত হতে পারছেন না। এ জন্য বাংলার প্রান্তে প্রান্তে গ্রন্থাগার শিক্ষণের আবশ্যকতা হাতে-কলমে কাজের মধ্য দিয়ে বুঝতে হবে এবং সেই সঙ্গে প্রচারও করতে হবে। এতদুদ্দেশ্যেও জেলায় জেলায় শিক্ষণ শিবির পরিচালনার আবশ্যকতা আছে।

এ সকল কারণেই নবদ্বীপেও গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবিরের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। এখানে সর্বশুদ্ধ ৩৫টি গ্রন্থাগার রয়েছে। এ ছাড়াও নবদ্বীপের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও অধুনা বহু ছোট-খাটো গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। এ সমস্ত গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যাপারে দেখা যায় সেই গতানুগতিক "খাতা-প্রথা" (Khata system)। এর জন্য দায়ী অবশ্য কর্তৃপক্ষের কুসংস্কার ও গোঁড়ামি। বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক যুগেও এ ধরণের Stereo-typed মনোবৃত্তি বিস্ময় উৎপাদন করে।. (অবশ্য সম্প্রতি দু'একটি গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ এদিকে সম্পূর্ণ সচেতন।) এজন্যই আন্দোলনের মাধ্যমে এ সকল গ্রন্থাগারগুলিকে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে সংগঠিত করার জন্য নবদ্বীপে "গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবির" পরিচালনার আশু প্রয়োজন ছিল।

স্থান নির্বাচন ব্যাপারে দেখা যায়, বিদ্যাসাগর স্মৃতি সংসদ গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে শিবির পরিচালনার প্রচেষ্টা আরম্ভ হলেও তাঁদের পর্যাপ্ত পুস্তক থাকা সত্বেও পরিসর স্থানাভাবে সেখানে করা সম্ভব হলো না। অনুকূল শ্রেণী-পরিবেশ লাভের আশায় বিদ্যাসাগর কলেজ কর্তৃপক্ষকেও অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা প্রাথমিক ব্যয় বহনে নিরুৎসাহ প্রকাশ করায়, এবং পক্ষান্তরে নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই আগ্রহের সহিত সমর্থিত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনাতেই বর্তমান শিক্ষণ শিবির পরিচালনার সিদ্ধান্ত হয়।

নবদ্বীপ শিবির পরিকল্পনা প্রায় বৎসরাধিক কাল থেকে করা হয়েছে। পরিদর্শন ও অনেক যোগাযোগের মাধ্যমে গত পূজাবকাশে এ শিক্ষণ শিবিরের সময় নির্ধারিত হয়। কিন্তু সহসা সর্বগ্রাসী জলপ্লাবন নবদ্বীপের সাধারণ জীবনযাত্রাকে এমনভাবে বিপর্যস্ত করে দিল যে, তার অব্যবহিত পরেই ঐ অবস্থায় শিবির পরিচালনা সম্ভব নয়। তারপর সময় নির্ধারণে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কেননা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে যেমন সব সময় পরিচালনার কাজে অংশ গ্রহণে বাধা আছে তদ্রূপ আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রায় অনেকেই স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-গ্রন্থাগারিক বলে স্কুল কলেজ ছুটি ভিন্ন হওয়া অসম্ভব। অবশেষে দীর্ঘদিন আগ্রহে অপেক্ষমান থাকার পর এবার গ্রীষ্মাবকাশে ২৬শে মে থেকে ১ই জুন শিক্ষণ শিবিরের সময় চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়।

শিক্ষার্থী সংগ্রহে একটা অদ্ভুত সাড়া পাওয়া যায়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নির্দেশক্রমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫ জন নির্দিষ্ট হলেও আগত প্রার্থীর সংখ্যা প্রচুর থাকায় যোগ্যতা ও কার্য সম্ভাবনার দিক থেকে প্রার্থী নির্বাচনের সমস্যা উপস্থিত হয়েছিল। বহুজনকে বঞ্চিত করেও আমাদের তালিকায় প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯ জন। অবশ্য যোগদানের সময় ২৬ জনকে পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে ৫ জন মহিলা শিক্ষার্থীও আছেন। এ সব শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই স্থানীয় স্কুল, কলেজ ও গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে এসেছিলেন। নবদ্বীপের সহরতলী বিদ্যানগর ও বাবলারী থেকে ২ জন এবং ডিষ্ট্রিক্ট লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন থেকে ১ জন শিক্ষার্থী যোগদান করেন। মদনপুর থেকেও ১ জনের নাম পাওয়া গিয়েছিল; তিনি শেষ পর্যন্ত যোগদান করেন নি।

এবার শিক্ষণ শিবিরের কাজের কথায় আসা গেল। শিক্ষণ শিবিরের কাজ আসলে প্রায় সবটাই হাতে কলমে এবং এজন্যই শিবির শিক্ষণের নীতি অনুযায়ী

কোন একটি গ্রন্থাগারকে সংগঠিত করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ আরম্ভ হয়। তাই এক্ষেত্রেও পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে শিবিরের কাজ আরম্ভ হলো।

নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটু পরিচয় করে নিলে কাজের পরিকল্পনা এবং কাজ করার পক্ষেও সুবিধা হবে। সে পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলা যায়, বাংলায় যে কয়টি প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগার আছে নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার তাদের অন্যতম। এ গ্রন্থাগার ১৯০৭ সাল থেকে বিভিন্ন দিক দিয়ে জনগণের সাহিত্য পিপাসা নিবারণ করে আসছে। প্রায় ২৫০০ প্রাচীন পুঁথি, বহু দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থ, বৈষ্ণব গ্রন্থ এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থসহ এই গ্রন্থাগারের মোট পুস্তক সংখ্যা প্রায় ১২৫০০। এ ধরণের একটি গ্রন্থাগারকে সংগঠনের কাজে পেয়ে শিবিরের কাজে সুবিধাই হয়েছে মনে হয়।

শিবিরের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে ২৬শে মে সকাল সাড়ে সাত ঘটিকায় একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয়। নদীয়া সোস্যাল এডুকেশন অফিসার শ্রীবিনয়কুমার মুখোপাধ্যায় শিবির উদ্বোধন ও সভাপতির কাজ করেন। পরিষদ সচিব শ্রীফণিভূষণ রায় এবং যুগ্ম সচিব শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস সহ সহরের বহু বিশিষ্ট অভ্যাগত ও পণ্ডিতমণ্ডলী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষার্থীগণের সুবিধার জন্য তাঁদের সম্মতি নিয়ে প্রত্যহ ক্লাশ আরম্ভ করা হয় বেলা ১১টা থেকে এবং বৈকাল ৫টা পর্যন্ত ক্লাশ চলে। মধ্যে কিছুক্ষণের বিশ্রামের অবকাশও ছিল। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষনীয় বিষয়কে মোট আটটিভাবে ভাগ করা হয় এবং সেগুলি—(1) Classification, (2) Cataloguing, (3) Pasting of Book Pockets, writing of Book Cards & Pasting of Date labels, (4) Checking, (5) Accessioning (Records correction), (6) Filing, (7) Pasting Book Tags and (8) Shelving. একটা বই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হওয়ার পর ঐ সকল প্রণালীর মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঠকের হাতে যাওয়ার সুযোগ হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে শিবিরের মোট শিক্ষার্থী ২৪ জন। ২ জন করে ১২টি দলে তাঁদের ভাগ করা হয়। কাজের বিভাগ আটটি হলেও কোন কোন বিভাগের কাজ বেশী ও অপেক্ষাকৃত সময় বেশী লাগায় সে সকল বিভাগের কাজে একাধিক কর্মীদল কাজ করেছেন। এমনভাবে কার্যসূচী প্রণয়ণ করা হয়েছিল যে, চক্রাকারে কাজ করে প্রত্যেকের পক্ষেই ঐ আটটী বিভাগে অন্ততঃ

একবার কাজ করার সুযোগ হয়েছে, এবং ফলে গোটা পদ্ধতিটাই তার হাতে কলমে শেখবার সুযোগ হলো।

উক্ত আটটি বিভাগের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ কাজটা শেখানোর প্রণালীটি বড় অদ্ভুত। প্রথমে ব্ল্যাক বোর্ডের সাহায্য নিয়ে মৌখিক আলোচনার (Theoretical Discussion) মধ্য দিয়ে বিষয়টি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের একটি ধারণা দেওয়া হয়, এবং তারপরেই সুরু হয় কাজ। আমরা Activity Methodএ শিক্ষাদানের কথা শুনেছি। সেখানে শিক্ষণীয় বিষয়টি একটি সমস্যার আকারে ছাত্রের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। ছাত্রই নিজ বিদ্যা বুদ্ধি-সামর্থ্য অনুযায়ী সেটি সমাধান করতে চেষ্টা করবে এবং প্রয়োজন বোধে শিক্ষকের নির্দেশ বা সাহায্য নিতে পারবে। আমাদের গ্রন্থাগার শিক্ষণও Activity Methodএ শিক্ষা দেওয়া হয় বলা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের ১২টি গ্রুপের মধ্যে মোট কাজ বুঝিয়ে দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো; যখনই কারোর কোন অসুবিধা হয় বা কোন Technical Difficulty উদ্ভূত হয়, তখনই তিনি শিক্ষকের সাহায্যে সে বিষয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করেন। নূতন বিষয় উত্থাপিত হলেই প্রথমে তা থিয়োরেটিক্যাল ক্লাশে আলোচিত হত এবং পরে তদনুযায়ী কাজ হত। এছাড়াও গ্রন্থাগার সংরক্ষণ, গ্রন্থাগার সজ্জা, গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থাগার সংগঠনের বিভিন্ন আনুসঙ্গিক আলোচনাও হয়। এরূপে গ্রন্থাগার পরিচালনার বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এবং পরিচালনা সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যা ও প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার উত্তর লাভের সুযোগে শিক্ষার্থীগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেও মোটামুটিভাবে গ্রন্থাগার সংগঠন সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেন।

নবদ্বীপে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সম্ভাবনার প্রতি তাকালে আশার সঞ্চার হয়। যতদূর চোখে পড়ে, বিভিন্ন স্কুল-কলেজের গ্রন্থাগারসহ এখানকার গ্রন্থাগার-সংখ্যা ৩৫ এর উপর। এর মধ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার, বিদ্যাসাগর কলেজ গ্রন্থাগার ও বঙ্গবাণী গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্যই। শিক্ষণ-শিবিরের এক পক্ষ কালের কাজে সাধারণ গ্রন্থাগারের মাত্র এক হাজার বই নূতন প্রণালীতে সজ্জিত হয়। কাজেই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে সংগঠিত করার জন্য আরও প্রচুর কর্মীর প্রয়োজন। যে ২৪ জন শিক্ষণপ্রাপ্ত হলেন, তাঁদের কেউ কেউ হয়ত কার্যান্তরে অন্যত্র চলে যাবেন; আবার কোন কোন প্রতিষ্ঠানের একাধিক শিক্ষার্থীও ছিলেন। "সেজন্য নিজ নিজ গ্রন্থাগারগুলিকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক গ্রন্থাগারের একজন করে কর্মীকে শিল্প বিদ্যায় শিক্ষণের সুযোগ দিতে হলে আরো দুতিনটে শিক্ষণ শিবির পরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে।

বর্তমান শিবির আরম্ভ হওয়ার পরও বহু ইচ্ছুক ব্যক্তির কাছ থেকে অভিযোগ শুনতে হয়েছে তাঁদের সুযোগ দেওয়া হয়নি বলে বা অনেক স্থলে জানানো হয়নি বলে। এমন কি, এখানে আরো একটি শিক্ষণ শিবির পরিচালনার অনুরোধ জানিয়ে কতিপয় উৎসাহী যুবক পরিষদ সচিব ও পরিষদ সভাপতির সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও করেছেন।

শিক্ষণ শিবিরকে কেন্দ্র করে দুটি উৎসবেরও আয়োজন হয়। একটি হলো শিবির উদ্বোধন, পূর্বেই এসম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে, অপরটি সমাপ্তি উৎসব। নদীয়া জেলার বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক শ্রীক্ষিতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি-রূপে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু প্রধান অতিথি রূপে অংশগ্রহণে উৎসবের গাম্ভীর্য বৃদ্ধি পায়। নদীয়া জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীকালিপদ বিশ্বাস সহ বহু বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ উপস্থিত হয়েছিলেন। সভায় আহ্বায়ক কমিটির সভাপতি শ্রীতিনকড়ি বাগচী, প্রধান অতিথি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, পরিষদ সচিব শ্রীফণিভূষণ রায়, জেলা গ্রন্থাগারিক এবং শিক্ষার্থীদের পক্ষে শ্রীবলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত বসু তাঁর ভাষণে শিক্ষার্থীদের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন যে, বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীর উৎসাহ ও উদ্দীপনার আভাস পেয়ে তাঁর মধ্যে আশার সঞ্চার হচ্ছে।...এই শিক্ষণ শিবিরের শিক্ষাই শেষ নয়। এটা সূচনা, পরবর্তী চর্চার ও অনুশীলনের পথ দেখিয়ে দিয়েছে। তৎপর শ্রীযুক্ত বসু শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞানপত্র ('Attendance Certificate) দান করেন। সর্বশেষে সভাপতি মহাশয় ও গ্রন্থাগারিকের আদর্শ কর্তব্যের প্রতি ইঙ্গিতে এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন।

এই শিক্ষণ শিবির পরিচালনায় যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীগণ একই উদ্দীপনা ও উৎসাহ নিয়ে সমভাবে একসঙ্গে কাজ করার আদর্শ। পরিষদ-সভাপতি শ্রীযুক্ত বসু তাঁর ভাষণের একস্থানে বলেছেন যে, এখানকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে বয়স ও অন্যান্য দিকে পার্থক্য থাকলেও উৎসাহ ও উদ্দীপনার দিকে সকলেই সমবয়সী, এবং ইহাই সাফল্যের সূচনা। এখানে সর্বনিম্ন বয়স ১৪ এবং সর্বোচ্চ প্রায় ৭০; সর্ব নিম্ন শিক্ষা নন-মেট্রিক, সর্বোচ্চ স্নাতক ডিগ্রী। এর মধ্যে সাহিত্যিক, সাংবাদিক সমাজকর্মী, খেলোয়াড়, স্কুলের শিক্ষক, আবার ছাত্র ছাত্রীও ছিলেন কয়েকজন। কিন্তু সমস্ত রকম বিভিন্নতা ভুলে গিয়ে প্রত্যেকেই একমুখী হয়ে একটি সামুদায়িক জীবন (Community Life) গড়ে তুলতে পেরেছিলেন এবং তারই ফলে

আনন্দ ও অধ্যবসায়ের মধ্যে কাজ করতে পেরেছেন। অভিনন্দিত করছি আমাদের সাংবাদিক সাহিত্যিক গঙ্গোপাধ্যায় দম্পতিকে, যাঁরা জীবনের প্রথমার্ধ প্রায় শেষ করে ও স্বামী-স্ত্রী যুগ্মভাবে এগিয়ে এসেছেন জনসেবার আদর্শ নিয়ে। অপর লক্ষ্যনীয় হলো শ্রীবিজয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়, যিনি জীবন-সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে মস্তকে শুভ্রকেশ, দেহে বার্ধক্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নিয়েও অসীম উৎসাহ ও ধৈর্যের সঙ্গে সমানভাবে কাজ করে গেছেন। অভিনন্দন জানাতে হয় সেই সব ছেলে-মেয়েদের, যাঁরা বিশ্বালয়ের গণ্ডী উত্তীর্ণ না হয়েই বা সবেমাত্র পার হয়েই সেবাবৃত্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে একাজে অংশগ্রহণ করেছেন। দিকে দিকে এসকল কর্মীর উৎসাহ ও উদ্দীপনা গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জয়যুক্ত করে তুলবে, নবদ্বীপের শিক্ষা শিবিরের কর্মীদের কর্মনিষ্ঠা ও কর্মানুরাগ যেন সে আশারই সঞ্চার করছে।

শিবির পরিচালনায় কিছু কিছু অসুবিধা বোধ করতে হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান হলো সময়। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে শিক্ষা শিবিরের শিক্ষা কোন কর্মক্ষেত্র প্রশস্ত করে দেবে না, তবে নিজ নিজ গ্রন্থাগারকে সংগঠিত করার একটা সুযোগমাত্র দেওয়া। কাজেই গোটা বিষয়টার উপর একটি সম্পূর্ণ ধারণা দেওয়ার পক্ষে সময় খুবই কম। দ্বিতীয় অসুবিধা সম্বন্ধে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু নিজেই বলেছেন যে, এ ত্রুটি ছাত্র শিক্ষকের ত্রুটী নয়; ইহা পরিষদের উদ্যোক্তাদের গবেষণার বিষয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানটি পাশ্চাত্য দেশের আমদানী হওয়ায় এপর্যন্ত বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিষয়ক পর্যাপ্ত গ্রন্থের অভাব রয়ে গেছে। যে দু'একটি বই-ই একমাত্র সম্বল তা-ও যুগোপযোগী নয়। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দশমিক বর্গীকরণের Scheduleএ আজকালকার বহু নামের অভাব দৃষ্ট হয়। আবার অনুবাদ সাহিত্যের সংখ্যাও অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় সমস্যা আরো বেড়ে গেছে। অনুবাদ পুস্তকের মূল লেখকের নাম Scheduleএ থাকবে, অথচ সে সব নাম এদেশীয় নয় বলে এবং উহা বহু পুরাণো বলে প্রভাতবাবুর গ্রন্থে তাহা স্থান পায়নি। শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর গ্রন্থকার নামাও ঐ একই দোষে অভিযুক্ত। সুতরাং 'দশমিক বর্গীকরণ' এবং "গ্রন্থকার নামা" পুস্তক দুইখানি যুগোপযোগী করে পরিবর্তিত আকারে অবিলম্বে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। আর বাংলায় Subject Heading-এর কোন বই-ও নেই। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞগণ এবিষয়ে দৃষ্টি দিয়ে বাংলায় Subject Headingএর বই প্রস্তুত না করলে শিক্ষণ শিবিরের সমস্যার সমাধান হবে না। এছাড়া আবহাওয়ার অস্বাভাবিক পরিবর্তনেও কাজের কিছু অসুবিধা হয়েছে।

শিবির পরিচালনায় শিক্ষকের (Instructor) ভূমিকায় চারজনের নাম উল্লেখ করা যায়। প্রথম দু'দিন শ্রীফণিভূষণ রায় ও শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস ছিলেন। পরে রাখালবাবু একাই ২রা জুন পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যান। ঐ দিনই শ্রীননীগোপাল বসাক এসে যোগদান করেন। ৩রা জুন থেকে শ্রীবসাক ও শ্রীনির্মলচন্দ্র চৌধুরী যুগ্মভাবে শিবির পরিচালনার কাজ শেষ করেন।

শিবির পরিচালনার অংশ নিয়েছেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ব্যবস্থাপনায় নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার। একের উদার সেবাবৃত্তি, দ্বিতীয়ের অসীম উৎসাহ ও আগ্রহ না হলে উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় কাজ হত না। নবদ্বীপের জনসমাজের সেবার দায়িত্ব দিয়ে কর্মী সৃষ্টির দায়িত্ব যাঁরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন, তাঁরা প্রশংসাবাদার্হ। এজন্য জনসমাজের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ প্রাপ্য নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি বাগচীর, আর প্রাপ্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃপক্ষের।

সর্বশেষে মন্তব্য বলা যায় যে, কুশলী কর্মীর সমস্যা আমাদের মেটাতে হবে। হিসাব দিয়ে দেখানো যায় যে, কলেজ বাদে পশ্চিম বাংলায় স্কুলের সংখ্যা প্রায় ২২০০। ১ জন করে হিসাবে ২২০০ জন শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর আবশ্যক। কিন্তু প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয় ও পরিষদ মিলে প্রায় (৪০ + ১৫০)এর ৬০% = ১১৪ জন Trained Librarian পাওয়া যেতে পারে। এঁদের প্রায় ৫০% Deputed শিক্ষক গ্রন্থাগারিক এবং বাকী ৫০% কোন গ্রন্থাগারে কাজ করেনও নাই, Trained হয়ে করবেনও না, অন্যত্র ভাল কাজ পেয়ে চলে যাবেন। সুতরাং অবশিষ্ট ৫৭ জন অর্থাৎ ৬০ Trained গ্রন্থাগারিক দিয়ে ২২০০ গ্রন্থাগারিকের চাহিদা মেটাতে সময় লাগবে প্রায় ৩৭ বৎসর। সেজন্যই এভাবে কাজ চলে না। ইংলণ্ডে ১৯৪৭ সালের শিক্ষা আইনে যখন দেখা গেল যে ৭০ হাজার Trained Teacher প্রয়োজন তখন সে দেশে Emergency Trainingএর ব্যবস্থা হলো। আমাদের এ সমস্যাকেও পূরণ করার জন্য Emergency Librarianship Trainingএর দরকার। এজন্য এই পক্ষ-কালের শিক্ষণ শিবিরকে ৪৫ দিনের করে এবং Curriculum পরিবর্তন করে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে। সেই Training Certificateকে শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক স্বীকার করানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এরজন্য শিক্ষকদিগকে Full Pay সহ Depute করতে হবে। তাঁদের বেতন এবং Training ব্যয় সরকারকে বহন করতে হবে। যতদিন না এ ধরণের ব্যবস্থা কার্যকরী হয় ততদিন শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের সমস্যা দূর হতে পারে না।

গ্রন্থাগার সংবাদ

সুবিজ্ঞী গ্রন্থাগার ॥ সিউড়ি ॥ বীরভূম ॥

গত ১৮শে জুন, শুক্রবার সন্ধ্যায় রামরঞ্জন পৌর ভবনে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ১২০তম জন্ম বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব সভায় পৌরোহিত্য করেন ধানাগ্রাম তপোবনের সংসভাবতী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারের সহ-সভাপতি ডাঃ কালিগতি বন্দ্যোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন করেন। বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল সেন বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন। ডাঃ বনমালী চক্রবর্তী (বীরভূমের সিভিল সার্জেন) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। গ্রন্থাগারের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী সমাগত অতিথিগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভায় সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীবৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুহাস নন্দী প্রভৃতি।

ফুরফুরা ইয়ংম্যান্‌স এ্যাসোসিয়েশন ॥ ফুরফুরা শরিফ ॥ হুগলী ॥

গত ২রা মে জনাব মহম্মদ আম্বিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিবর্গ আগামী তিন বৎসরের জন্য কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন :—

সৈয়দ হাফিজুদ্দিন (সভাপতি), মিঞা আবদুল কুয়ায়ুম (সহ সভাপতি), মহম্মদ আম্বিয়ার (সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক), মিঞা মহম্মদ আমানুল্লাহ (যুগ্ম-সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ), মুফতি হেদায়েতউল্লাহ্ (পত্রিকা সম্পাদক ও সহ সম্পাদক) সৈয়দ এ. আলম (সম্পাদক, সাহিত্য পরিষদ), মোঃ হেসামুদ্দিন (পত্রিকা সহ-সম্পাদক), মুফতি হবিবুল্লাহ (হিসাব পরীক্ষক ও মুদ্রক), মুন্সি আবুল ফজল (হিসাব-রক্ষক), মোল্লা ওয়ালিউর রহমান (সহ-গ্রন্থাগারিক). খোন্দকার গোলাম আহিয়া (সংগ্রাহক), মুন্সি নুরুল ইসলাম (সংগঠক)।

বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি ॥ শেওড়াফুলি ॥ হুগলী ॥

সুরুচী-সম্পন্ন পাঠক-গোষ্ঠি গঠনের একটি মূল্যবান পরীক্ষা সম্প্রতি সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নিম্নে মুদ্রিত লৈখিক চিত্র এই পাঠকদের পরিবর্তনের হার নির্দেশ করিতেছে :
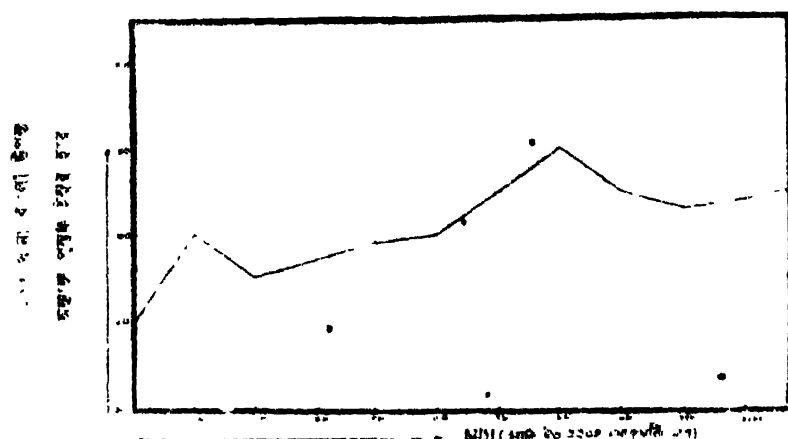
এই পরিবর্তনের জন্য নিম্নলিখিত ভাবে চেষ্টা করা হইয়াছিল ঃ

(১) সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি পুস্তক পাঠে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য পাঠকদের ঐ সকল বিষয়ের পুস্তকের বিষয়বস্তু সহজ ও সরলভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

(২) নূতন পুস্তক পাঠে পাঠকগণের আকর্ষণ বেশী থাকে বলিয়া বিশেষ বিবেচনার সহিত উপন্যাস ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের পুস্তক ক্রয়ের হার ক্রমে ক্রমে বাড়াইয়া দেওয়া হয়। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে পুস্তক ক্রয় বন্ধ থাকায় অন্যান্য বিষয়ের পুস্তক ইস্যুর হার কিছু কমিয়া যায়।

(৩) পাঠচক্রের মাধ্যমে আলোচনা বৈঠক, অনুষ্ঠানাদি, প্রবন্ধাদি প্রতিযোগিতা, হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ, পাঠকক্ষ ব্যবহারের অধিক সুযোগ সুবিধা দান প্রভৃতি এ পাঠরুচী পরিবর্তনের অনেক সহায়তা করিয়াছে।

শান্তি ইন ॥ কলিকাতা

গত ২৮শে এপ্রিল উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা দিবস মহাসমারোহে উদযাপিত হয়। প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু এবং প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের রেজিষ্ট্রার শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মধ্য কলিকাতা হইতে নব নির্বাচিত বিধান-সভার সদস্য শ্রীযতীন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ধর, পল্লীর নব নির্বাচিত

পৌর-প্রতিনিধি শ্রীমুকুল সর্বাধিকারী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া, 'দেশের সামগ্রিক শিক্ষা বিস্তারে গ্রন্থাগারের অবদান' শীর্ষক বিষয়ের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত দিবস সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় পণ্ডিত বীরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রকে তাঁহার ডক্টরেট উপাধি লাভ উপলক্ষে এবং শ্রীমণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়কে তাঁহার 'কত অজানারে' গ্রন্থের জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ পুস্তক রচয়িতার সম্মানলাভ উপলক্ষে সম্বর্ধিত করা হয়। এই উপলক্ষে সেওড়াফুলি মধুচক্র সাহিত্য সংসদ কর্তৃক গীতি-বিচিত্রা 'আবির্ভাব' পরিবেশিত হয়।

সাহাপুর লাইব্রেরী ॥ কলিকাতা—৩৮ ॥

বিগত ৫ই মে পাঠাগার পরিচালিত অষ্টম বার্ষিক নিখিল বঙ্গ রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত নির্বাচন, পুরস্কার বিতরণী উৎসব ও বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রথ্যাতনামা প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী। বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করেন নাট্যকার রমেশচন্দ্র গোস্বামী, সাহিত্য-রসিক শ্রীপ্রবোধ সেন এবং শিল্পী শ্রীসবিতাব্রত দত্ত। রচনা বিচার করেন অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী। আনুষ্ঠানিক কর্মসূচীর মধ্যে দক্ষিণ সহরতলী সঙ্গীত সমাজ কর্তৃক গীত ও পাঠাগার সম্পাদক কর্তৃক কথিত পাঠাগারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় গীতি আলেখ্যের মাধ্যমে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়।

সম্পাদকীয়

আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বহুমুখী উদ্দেশ্যের অন্যতম হ'ল নব নব গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু নিছক করণীয় হিসেবেই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয় না। বলা বাহুল্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয় মানুষের ব্যবহার ও প্রয়োজনের তাগিদেই। গ্রন্থাগারের সংখ্যা তাই কোনও দেশের শিক্ষার মান ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের মাপকাঠি। ইদানিং এ রাজ্যে বিশেষ করে মহানগরী ক'লকাতায় যে হারে গ্রন্থাগার সৃষ্টি হচ্ছে ও হয়ে চলেছে তা থেকে কি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে দেশের লোকের গ্রন্থাগারমুখীনতা তথা শিক্ষার হার তদনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে—নাকি গ্রন্থাগারের সংখ্যা বর্ধিত হয়েছে অন্য কোনও কারণে?

গত সংখ্যায় 'গ্রন্থাগার কর্মী' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধের সমালোচনা প্রসঙ্গে কেহ কেহ বলেন যে কর্মীর অভাব যে সব প্রতিষ্ঠানের প্রধান সমস্যা, তাদের আশেপাশে নতুন নতুন গ্রন্থাগার কিরূপে গড়ে ওঠে। বস্তুতঃ দুটি প্রসঙ্গ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

একই অঞ্চলে, এমন কি একই পাড়ায় দুটি তিনটি করে গ্রন্থাগার দেখতে পাওয়া যায়। কর্মী ও অর্থের অভাবে হয়ত ভাল ও পুরণো গ্রন্থাগার উঠে যাবার উপক্রম হয়েছে—আর তারই কাছেপিঠে নতুন আর একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, অবস্থা তাদের কোনটারই স্বচ্ছল হয় না। নানাবিধ অভাব-অসুবিধাজনিত কারণে বহু গ্রন্থাগারেরই অকাল মৃত্যু ঘটে। স্বল্পমেয়াদী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনেকে 'ব্যাঙের ছাতা' বলে পরিহাস করেন, কিন্তু আমরা সে সকল প্রতিষ্ঠানের আদর্শ প্রণোদিত কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টার প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা পোষণ করি। তবে এ কথাও বলা দরকার যে একই স্থানে অহেতুক একাধিক গ্রন্থাগার সেখানকার সমাজসেবী কর্মীদের মধ্যে বিচ্ছেদ ও অনৈক্যের পরিচয় দেয় এবং শ্রমদান ও অর্থদানের অপচয় ঘটায়। এক পাড়ায় খেলাধূলা, গানবাজনা প্রভৃতির ক্লাব একাধিক থাকলে ক্ষতি নেই। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে একাধিক গ্রন্থাগার না থাকাই বিধেয়। কারণ পরিপ্রেক্ষিতের বিচারে দীর্ঘায়ু এবং যৌথ উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে একান্তই প্রয়োজন।

যদি দেখা যায় যে, কোনও অঞ্চলের বর্তমান গ্রন্থাগার সেখানকার চাহিদা মেটাবার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছে, তাহলে নতুন গ্রন্থাগারের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু কি কারণে অনাবশ্যক গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তার বিচার বিশ্লেষণ করা দরকার।

সেদিন কোনও এক গ্রন্থাগারের কর্মকর্তাগণ দুঃখ করছিলেন যে কর্মীর অভাবই তাঁদের বর্তমান দুরবস্থার কারণ। গ্রন্থাগারটির নিজস্ব গৃহ আছে, বইয়ের সংখ্যাও মন্দ নয়। কিশোর বিভাগ নেই—কিশোর গ্রন্থ আগে যা কেনা হয়েছে, এখন আর হয় না। সদস্য সংখ্যা সেটির ক্রমেই কমছে। কৌতুকপ্রদ ব্যাপার যে তারই অদূরে স্থানীয় তরুণরা একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছে, ভাড়া করা এক টিনের চালাঘরে। উৎসাহ ও আগ্রহে তাদের দারিদ্র্য ঢাকা পড়ে গেছে। মজার লাগল যে বড়দের তারা সদস্যপদ দেয়, কিন্তু ভোট দেবার অধিকার দেয়নি। দেশের অধিকাংশ গ্রন্থাগারে কিশোরদের প্রশ্ন একেবারেই অবহেলিত ও উপেক্ষিত। কিশোররা তাই নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করে নেয়। তাদের কথা চিন্তা করে বড়রা কিছু করলে নিশ্চয় তাঁরা উপকৃত হবেন। উভয়ের সংযুক্ত উদ্যোগ সাফল্যের পথ প্রশস্ত করে তুলবে।

গ্রন্থ নির্বাচন বহু ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির কারণ হয়। গ্রন্থাগারের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণ দর্শাতে গিয়ে একজন গ্রন্থাগারিক বলছিলেন, 'কি করব বলুন আমরা ত ডিটেকটিভ বই রাখি না, তাই ক্রমশঃ মেম্বার কমে যাচ্ছে, আর এ যুগের ছেলেরাও উচ্ছন্নে গেছে—তারা কেবল চায় খেলা আর সিনেমা-পত্রিকা, মোহন সিরিজ নয়ত নীহার গুপ্তর বই ; দিতে গেলুম একটি ছেলেকে আইনষ্টাইনের জীবনী, না-নিয়ে সে চাইল ঝিন্দের বন্দী।' এই শ্রেণীর গ্রন্থাগারিকদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ পরিবর্তন দরকার। মোহন সিরিজের পাঠকের অযথা অসন্তোষ সৃষ্টি না করে কিংবা রাতারাতি কাউকে আইনষ্টাইনের জীবনী জাতীয় বই পড়াবার জেদ না করে প্রথম দিকে পাঠকের ইচ্ছা ও অভিরুচি মত বই পড়তে দিয়ে পরে আস্তে আস্তে তাদের রুচির মোড় ফেরানো যেতে পারে।

কোনও পল্লীতে গ্রন্থাগার থাকতেও তার আশে পাশে নতুন গ্রন্থাগার অসংখ্য কারণে গড়ে ওঠে—তার কয়েকটির উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বয়োজ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণ অনেক সময় নিজ মনোনীত বই কনিষ্ঠদের দিতে বাধা করেন—ফলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়। নতুন কিংবা দামী বই অনেক ক্ষেত্রে কেবল

কমিটি মেম্বারদেরই দেওয়া হয়। বই কেনার সময় অনেক গ্রন্থাগারে সাধারণ সদস্যদের মতামত নেওয়া হয় না। বই লেনদেন ছাড়া অন্য কোনও অনুষ্ঠান না থাকায় কোনও কোনও গ্রন্থাগারের সদস্যদের অসন্তোষের সৃষ্টি করে। কর্মকর্তাদের কিংবা কর্মচারীদের অপ্রীতিকর ব্যবহার বহুস্থলে নাম প্রত্যাহারে সদস্যদের প্রবৃত্ত করে। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ এই যে বহু প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় পদ ও ক্ষমতাপ্রিয় বা গ্রন্থাগারের ভালমন্দ সম্বন্ধে উদাসীন ব্যক্তি, যাঁরা দৈনন্দিন কাজকর্মে কোনও সহায়তা করেন না, এমনকি অনেকে মিটিংএও আসেন না, তাঁদের কমিটিতে নেওয়া হয়। অথচ কাজ করতে ও দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক উৎসাহী ব্যক্তিদের দায়িত্বপূর্ণ কাজ বা পদ কিছুই দেওয়া হয় না। এ সব নানা কারণই পুরাণো গ্রন্থাগারের অবনতি ঘটায়। তখন নতুন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করলে দোষারোপ করা যায় না। এর একমাত্র প্রতিকার বন্ধুত্বমূলক আলাপ আলোচনার দ্বারা পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি বা বিবাদ-বিরোধ ভঞ্জন।

ব্যক্তিগত ও দলীয় আধিপত্যের লিপ্সায় যে সব গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে সেগুলি সর্বদাই নিন্দনীয়। অস্বাস্থ্যকর দলাদলি ও রেশারেশির শোচনীয় পরিণাম উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মুমূর্ষু অবস্থা ও বিনাশ। ফলে গ্রন্থাগার আন্দোলন অনেক পিছনে সরে যায়।

নবীন ও প্রবীণদের মধ্যে মতবিরোধ ও দ্বন্দ্বের কথা আগে বলেছি। কৈশোরে অথবা ছাত্রজীবনে অনেককে ঝোঁকের বশে গ্রন্থাগার স্থাপনে উদ্যোগী হতে দেখা যায়। পরে নানা কার্যে রত হয়ে পড়ায় বা উৎসাহ কমে যাওয়ায় তারা আর গ্রন্থাগার পরিচালনের অবকাশ পায় না। এই শ্রেণীটিকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ ও দায়িত্ব দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

শতধা বিভক্ত জমিতে কৃষিকার্য যেমন লাভজনক নয় অনেকটা সেইরূপ কারণেই (uneconomic) একস্থানে একাধিক গ্রন্থাগারের অবস্থান ক্ষতিকর। ঘরের ভাড়া, আলোর খরচ, লোকজনের মাহিনা কাগজখাতার খরচ প্রভৃতি ছাড়াও একই দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা ও একই পুস্তক ক্রয়ে এক স্থানে অবস্থিত দুটি গ্রন্থাগারকেই স্বতন্ত্র ব্যয় বহন করতে হয়। সন্তোষজনক কাজ না হওয়ায় অনেক সময় পৌরসভা ও সরকারের অর্থ সাহায্য কমে যায়। ত্রুটীপূর্ণ পরিচালনের ফলে জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি হতে গ্রন্থাগারগুলি বঞ্চিত হয়। গ্রন্থাগারগুলির মিলিত অবস্থান তাদের শক্তি বৃদ্ধি ও পরি-

চালন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করে। অনাবশ্যক দ্বিবিধ ব্যয় নিবারিত হয়। শ্রম ও অর্থের বিভাগজনিত অপচয় ঘটে না।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন শৈশব হতে কৈশোরে উপনীত হয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু সমস্যা এখনও অজস্র। স্বেচ্ছাকর্মী ও সংগৃহীত চাঁদার দ্বারাই গ্রন্থাগারগুলি পরিচালিত হয়। মুষ্টিমেয় কর্মীরা যদি বিভক্ত হয়ে পড়ে তাহলে আন্দোলনের স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হবে। একমাত্র কোনও এক কেন্দ্রীয় সংস্থার (statutory authority) নিয়ন্ত্রণে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব। কিন্তু তার আগে প্রতি এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারগুলির কর্মীগণের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সংযোগ ও মিলন হওয়া দরকার।

সমাজের সর্বক্ষেত্রে বিবাদ-বিরোধ ও দলাদলি থাকতে পারে। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে গ্রন্থাগারে সহ-অবস্থান নীতি একান্ত কাম্য। জাতি-ধর্ম-দল-মত নির্বিশেষে সকলেরই গ্রন্থাগারে সমমর্যাদা ও অধিকার গ্রন্থাগার নীতির (Library Ethics) মূলকথা।

সদিচ্ছাসম্পন্ন, নীতিনিষ্ঠ ও আদর্শপ্রবণ কর্মীরা ক্ষমতা ও পদলোভীদের প্রভাবে যাতে বিভক্ত ও বিভ্রান্ত না হয়ে পড়েন সে বিষয়ে তাঁদের সর্বদা সচেতন হতে হবে। বিভেদ সৃষ্টির হেতু নির্ণয় ও তার সমাধান কর্মীদেরই ওপর বর্তায়। বিষয়টি গ্রন্থাগার কর্মী ও দরদীদের বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন রাখে।

গ্রন্থাগার

৯ম বর্ষ] শ্রাবণ : ১৩৬৪ [৪র্থ সংখ্যা

পুঁথি সংরক্ষণ

গোপিকামোহন ভট্টাচার্য

ভারতীয় সংস্কৃতির নব জাগরণের প্রথম সোপান তার অতীতযুগের কথা কাহিনীর উদ্ধার। অতীতের নবরূপায়ণের মাঝেই বর্তমানের সার্থকতা, অনাগতের ভিত্তি প্রোথিত। কিন্তু এই সত্যটি আজও আমাদের অজানা রয়ে গেছে। যুগপ্রসারী সীমাহিত দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ইতিহাস রচনার মূল উপকরণের সন্ধান তেমন বৈজ্ঞানিক পন্থায় আজও গৃহীত হয়নি। জাতীয় জীবনের নব উদ্বোধনের প্রকরণে সেই সব অনাবিলিত অনজ্ঞাত উপকরণের উদ্ধার ও যথাযথ সংরক্ষণই হবে আমাদের প্রধান ও প্রথম জাতীয় কর্তব্য। হস্তলিখিত পুঁথি এর মধ্যে প্রধান উপাদান।

সুদূর অতীতে বৈদিক শ্রোতযুগ যেদিন অস্তাচলের শিখরে আরোহণ করল, ভারতের আর্য-মনীষা যেদিন আপন স্মৃতিশক্তির ধারণ ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হল, সেদিন কোন এক অতর্কিত মুহূর্তে লিপির আবির্ভাব। রাজা রাজড়ার অনুশাসন খোদিত হল পর্বত-গাত্রে। এর ক্ষয় কোন দিন হবেনা—এই তাদের আশা—নাম হল 'অক্ষর' অর্থাৎ যার নাশ নেই। প্রস্তর যুগ চলে গেল, তাম্রপটের উপর রচিত হল রাজাদেশ। ক্রমশঃ শুধু আদেশ বা অনুশাসন নয়—আপন মনীষার ভাণ্ডার উজাড় করে দিল লিপির মাধ্যমে - ব্যক্তিকেন্দ্রিক জ্ঞান-ভাণ্ডার হল সর্বজনীন, নব অভ্যুদয়ের যাত্রাপথে আরও সহজলভ্য উপাদানের সন্ধানে ব্রতী হল সে, তালপত্র, ভূর্জপত্র ও সবার শেষে এল তুলোট কাগজ। এরই বুকে ভারতীয় মনীষার মসীলিপি অঙ্কিত হল।

সেদিনের বিদ্যাব্রতীদের শাস্ত্রালোচনা নিছক অধ্যয়ন ছিল না—এই শ্রবণের পরেও অধীত বিষয় নিয়ে চলত মনন ও সবার শেষে নিদিধ্যাসন—তবেই বিদ্যার পরিসমাপ্তি, জ্ঞানার্জনের সার্থকতা। নচিকেতা যমকে বলল—যে বিদ্যা দ্বারা

আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব না তাতে আমার প্রয়োজন কি (যেনাহং নামৃতং স্যাম্ তেনাহং কি কুর্যাম্, কঠোপনিষদ্)। এই অমৃতত্বলাভের একমাত্র পথ জনহীন প্রান্তরে তপস্যা—তাই পর্বত-কন্দর আশ্রয় করলেন তাঁরা। ভারতের সকল সাধনার ধন সঞ্চিত হল লোকচক্ষুর অন্তরালে গিরিগুহায়। গণজীবন থেকে হল সে বিচ্যুত।

মঠে মন্দিরে গুহায় এসব অজানা উপাদানের সন্ধান সুরু হয়েছে ব্রিটিশ রাজত্বের মূল প্রোথিত হবার পর থেকেই। কিন্তু ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের যত প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত হয়েছে এই পুঁথির মূল্য নির্ধারণ বা সন্ধান সে তুলনায় নগণ্য। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান' গ্রন্থের ভূমিকায় এই পুঁথি সংগ্রহের বাতিক থাকার জন্য যে কত জায়গায় উপহাসের পাত্র হয়েছেন তা বর্ণনা করেছেন। বার বার বিদেশীর আক্রমণে জর্জরিত মানুষ আশ্রয় নিয়েছে সহর ছেড়ে বহুদূরে অজ্ঞাত পল্লীর শান্ত পরিবেশে। সেখানে চলেছে দিনের পর দিন জ্ঞান তপস্যা। তাই আজও অমূল্য বহু অজানা পুঁথির সন্ধানে আমাদের যেতে হবে সুদূর পল্লীর মাঝে। সেখানে অজ্ঞানতার আবরণ বহু বিসর্পিত। এমন দেখেছি—গৃহপতি পূর্বপুরুষের বহু যত্নে সঞ্চিত শত শত পুঁথি আবর্জনাজ্ঞানে রাস্তায় ফেলে দিচ্ছেন, অনেক বাড়ির আটচালায় পুরুষানুক্রমে ঝুলছে পুঁথির স্তূপ। নামিয়ে দেখতে চাইলে অনুমতি মেলে না। শোনা যায়, পুরীর কোন এক বিখ্যাত মঠে বহু প্রাচীন মূল্যবান পুঁথির সংগ্রহ আছে। সেখানে গিয়ে শুনলাম—আছে বটে, কিন্তু সাধারণের তাতে প্রবেশাধিকার নেই। মঠাধ্যক্ষের "ট্রেজারির" মধ্যে দিনের পর দিন কীটের খাদ্যরূপে পরিগণিত হচ্ছে। কলকাতার কোন এক বিখ্যাত গ্রন্থাগারে "দেশাবলী বিবৃতির" এক পুঁথি আছে শুনে গিয়ে সন্ধান করলাম—পুঁথিটি কয়েক বৎসর পূর্বে সম্পূর্ণ ছিল, কিন্তু কয়েকজন গবেষকের আলোচনা ও ব্যবহারের ফলে তার মূল্যবান অংশটি লুপ্ত হয়েছে। এমনি ভাবে আমাদের অলিখিত ইতিহাস রচনার কত বহুমূল্য উপাদান দিনের পর দিন লুপ্ত হয়ে চলেছে।

এই সব অবলুপ্ত পুঁথির সন্ধানে পশ্চিম বঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ালে কত অজানা পুঁথির সন্ধান আজও মেলে। নব্য ন্যায় ও নব্য স্মৃতির যে গহনাতিগহন বিচারশৈলী একদিন সারা ভারতের ভাবমণ্ডলকে প্রভাবিত করেছিল, যার জন্যে একদিন বাঙ্গালীর মনীষা ভারতের মনন রাজ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল সেই বিদ্যার কত অজ্ঞাত পুঁথি লোক চক্ষুর অন্তরালে গ্রামের ভগ্ন

সেউলে জ্ঞান তপস্বীর জীর্ণ কুটিরে মহাকালের অতলগর্ভে বিলীন হয়ে চলেছে। শুধু সাহিত্য বা দর্শন নয়, এ পুঁথিগুলি সেকালের সমাজচিত্রের এক একটি বাস্তব প্রতিফলন। যে কোন গৃহেই সেকালে শাস্ত্রসেবিগণ প্রতিদিন ভাগবত পাঠ করতেন আর এরই ফলে রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবতের পুঁথির মধ্যে অনেক সময় সামাজিক রীতিনীতির ও বাজার দর এমন কি দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজার ফর্দ পর্যন্তেরও সন্ধান মেলে। কাল নির্ণয়ের পক্ষে সহায়ক বহু জন্ম পত্রিকাও পাওয়া যায়।

বাঙ্গলা দেশের বহু সুদূর পল্লীতেও আজ শত শত জনের উৎসাহী কর্মীর চেষ্টায় গ্রন্থাগার স্থাপিত হচ্ছে। এই গ্রন্থাগারের মাধ্যমে পল্লী জীবনের নবোত্থিত এক নবচেতনার এক নতুন ভাবসম্পদের আবির্ভাব ঘটছে। জন শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে বৃহত্তর গণজীবনের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র নিবিড় হয়ে চলেছে। কিন্তু গ্রন্থাগারকে সর্বজনীন শিক্ষার মূল কেন্দ্ররূপে গঠন করা কখনই সম্ভব নয়, যদি না এই জ্ঞান ভাণ্ডারের মাধ্যমে আমরা নিজের ঐতিহ্যকে জানার সুযোগ করে নিতে পারি। গ্রন্থাগার শুধুমাত্র গ্রন্থের 'আগার' না হয়ে জ্ঞান রাজ্যের বিভিন্ন শাখায় এর গতিপথ বিস্তৃত করে তবেই জাতীয় জীবনের উন্নয়নে এর দান হবে সর্বাঙ্গীন। এ জন্যই গ্রন্থাগারকে করে তুলতে হবে গবেষণার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। গ্রামের গ্রন্থাগার হবে স্থানীয় ইতিহাস সঙ্কলনের অন্যতম প্রধান উৎস। সেই গ্রামের সমস্ত পুঁথি স্থানীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের প্রচেষ্টায় সংগৃহীত হওয়া উচিত।

বহু গ্রন্থাগারকে সরকার বাৎসরিক সাহায্য দেন। কিন্তু যে-সব কর্মী তাদের গ্রন্থাগারকে একটি সংগ্রহশালায় পরিণত করতে চান সরকার পক্ষ থেকেও তাদের উৎসাহ ও অতিরিক্ত সাহায্য দেওয়া উচিত। শুধুমাত্র অপ্রকাশিত গ্রন্থের না, প্রকাশিত গ্রন্থের পুঁথিও সংগৃহীত হওয়া উচিৎ। কারণ লিপির ক্রমবিকাশ অথবা পাঠভেদ নির্ধারণের জন্য এদের মূল্য কোনও অংশে কম নয়। এমনি ভাবে যদি সামগ্রিক প্রচেষ্টায় আমরা প্রতিটি পল্লী গ্রন্থাগারকে দেশ জানার ও চেনার কেন্দ্ররূপে পরিগণিত করতে পারি সেদিন শহরের উৎসাহী গবেষক ছুটবেন বাংলার গ্রামে গ্রামে আপন গবেষণার মাল মশলা সংগ্রহের জন্য, পল্লী ও সহরের মধ্যে এক পরম পবিত্র আত্মীয়তার ভাব গড়ে উঠবে, জ্ঞানের মিলন সেতু রচিত হবে, গ্রন্থাগার হবে জ্ঞান তপস্বীর পরম তীর্থক্ষেত্র।

প্রাচীন পুঁথিলেখক

অশোক চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি আলোচনার প্রবাহে নানা গবেষণামূলক ব্যাখ্যার কোলাহলের বান ডাকিয়াছে। বিভিন্ন পত্রিকার কয়েকটি পাতা উলটাইলেই ব্যাপারটি বোধগম্য হইবে। ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই উহার পুরাতন ইতিহাস জানার জন্য এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়াছে। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে এখনও পণ্ডিত সমাজ নীরব। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোচনায় ভারতের ও ভারতের বাহিরের নানা স্থানে বিভিন্ন ভাষা ও লিপিতে লিখিত বহু অমূল্য পুঁথি রহিয়াছে। প্রাচীন শিলালেখ, তাম্রপট, মুদ্রা, গ্রন্থরাজি বা বিদেশী পর্যটকের বিবরণ অপেক্ষা লুপ্তপ্রায় পুঁথিগুলির মূল্য যে কোন অংশে কম নহে বরং বেশি অদ্যাপি তাহা স্বীকৃত হয় নাই। অনেকানেক মুষ্টিমেয় পণ্ডিতকুলচূড়ামণি প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ এগুলির দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও বৃহত্তর জনসমাজের এ বিষয়ে ঔদাসীন্য সমান ভাবেই বজায় রহিয়াছে, তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু ইহার জন্যও আক্ষেপ করি না। আশা আছে ভারতীয় সংস্কৃতি পুনর্গঠন কার্যে তাহাদিগের স্থান সসম্মানে স্বীকৃত হইবে। সেদিন আসিবে আবার আসিবে যখন ভারত তার নিজ অতীতের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনীর পুনরুদ্ধারে প্রাচীন পুঁথিগুলির যোগ্য মর্যাদা দিবে। দুর্ভাগ্যের কথা হইল এই, যে সম্প্রদায় রাত্রিদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া প্রাণপাত পূর্বক এই পুঁথিগুলি স্বহস্তে নকল করিয়া নিভৃতে এগুলি রক্ষা করিয়াছে—তাহাদের কথা লইয়া কেহই আলোচনা করে না। কাব্যে উপেক্ষিতা ঊর্মিলার আলোচনাও স্বয়ং কবি সম্রাট করিয়া গিয়াছেন কিন্তু এ পর্যন্ত একজন বিদগ্ধজনও এই হতভাগ্য গৃহকোণ লগ্ন যশোবিমুখ পুঁথিলেখকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই। সুউচ্চ অট্টালিকা দর্শনেই আমরা মুগ্ধ, তাহার নির্মাতার কথা কোন সময়ের জন্যও স্মরণ পথে উদিত হয় না।

অথচ অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই পুঁথিলেখকেরা সমাজের এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছিলেন। বিভিন্ন শ্রেণীর গুণকর্মের বিভাগ

হেতু বিভিন্ন শ্রেণীর যেরূপ সৃষ্টি সেইরূপ এই সুদক্ষ লিপিকারেরাও নিজেদের এক সম্প্রদায় গঠন করিয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছিলেন পুঁথিলেখা কাজটি তখনকার দিনে সত্য সত্যই গৌরবজনক ছিল—ইহাতে লজ্জার কিছু ছিল না—তাই প্রাচীন পুরাণ ও স্মৃতি-গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে আমরা দেখি যে এখনকার মত তখন এই সম্প্রদায় এত অবহেলিত বা লোক চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত ছিলেন না। নন্দিপুরাণ ইহাদের একটি সম্প্রদায় বলিয়া স্বীকার করিয়া অন্যান্য বুদ্ধিজীবিদের সহিত ইহাদের সমান আসন দিয়াছে। লক্ষ্মীধরের কৃত্যকল্পতরুতে বিদ্যাদান প্রসঙ্গে আমরা দেখি যে এই পুঁথি লেখক সম্প্রদায়ের বহু সমস্যা আলোচিত হইয়াছে। কোন্ সময় লেখা আরম্ভ করার পক্ষে প্রশস্ত, কোন্ দেবতার নাম স্মরণে নির্বিঘ্নে লেখার পরিসমাপ্তি ঘটে, মসী ও পত্র-লেখকের নাম কোন্ দিকে থাকিবে এ সকল কথা যথাযথ বিচার করিয়া, লেখার সময় প্রত্যেক পংক্তির মাঝে কতখানি ব্যবধান থাকিবে ও অক্ষরগুলির বা মাপ কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে নিবন্ধোক্তের কয়েকটি পংক্তি উল্লেখযোগ্য ঃ

চতুর্বর্ণৈঃ সমাখ্যাতো লিপ্যুল্লেখনবা বুধৈঃ
সম্প্রদায়বৈঃ লিপীনাং বিভিন্নাস হেতবঃ ।
মাত্রানুস্বারসংযোগ (গ) চ্যুতবর্ণাদিলক্ষিতৈঃ
নন্দিনাগরকৈর্বর্ণৈর্লেখয়েচ্চ পুস্তকম্ ॥

দেবীপুরাণেও এই ধরণের উক্তি আছে, ইহা ছাড়া যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির উপর অপরার্কের টীকা, বল্লাল সেনের দানসাগর হেমাদ্রির চতুর্বর্গ চিন্তামণি, রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্ব ও গোবিন্দানন্দের দানক্রিয়া কৌমুদী হইতে এই পুঁথি লেখক সম্প্রদায় ও পুঁথি লিখন সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সংবাদ পাওয়া যায়।

"প্রথমেই উপযুক্ত লেখকের সন্ধান করিতে হইবে, শুভ দিন নির্ধারণান্তে নানা বর্ণের মসী ও বিভিন্ন প্রকার লেখনী প্রস্তুত করিয়া সুবর্ণ, রৌপ্য বা গজদন্ত খচিত 'সারপত্র' (যাহার উপরে বইটি রাখিয়া নকল করিতে হয়) সংগ্রহ করিতে হইবে। পুঁথি লিখনের জন্য পূর্বাহ্নে সংগৃহীত পত্রগুলির প্রত্যেকটিরই লাল বা কাল কালি দিয়া সীমারেখা (marginal line) টানা উচিত। নূতন পুঁথির আবরণের জন্য ভাল কাপড় ও সুন্দর চিত্র অঙ্কিত কাষ্ঠাধারের প্রয়োজন, যেখানে বসিয়া পুঁথি লেখক নিজের কার্যে ব্যাপৃত থাকিবেন, সেই গৃহটিকে সুন্দর বর্ণে বা চিত্রে অঙ্কিত করিতে হইবে। কার্য আরম্ভ করিবার

পূর্বেই লেখককে সুবর্ণ, রৌপ্য বহু মূল্য অলঙ্কার ও প্রচুর অর্থ উপঢৌকন দিতে হইবে। লেখা সম্পন্ন হইলে ত কথাই নাই।

কাজেই দেখা যায় যে এই পুঁথি লেখা কাজটি যেমন সম্মানজনক ছিল ইহাতে অর্থ প্রাপ্তিরও সেই প্রকার সম্ভাবনা ছিল, এমতাবস্থায় যে কেহ ইচ্ছা করিলেই যে পুঁথি লেখক হইতে পারিত তাহা নহে. ইহাতে যেমন পাণ্ডিত্য সেইরূপ পরিশ্রম ও একাগ্রচিত্তের প্রয়োজন হইত। বর্তমান পণ্ডিত সমাজ এই ধারণাই পোষণ করিয়া থাকেন যে এই পুঁথিলেখক সম্প্রদায় প্রায়শঃই শাস্ত্রজ্ঞানপরাঙমুখ হইতেন, কিন্তু এই ধারণার মূলে কোন সত্য আছে বলিয়া মনে করি না। একাধিক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি হয়ত তাঁহাদের ছিল না। কিন্তু সাধারণতঃ পুঁথি লেখকেরা বিশেষতঃ বাঙ্গালী পুঁথিলেখকগণ যে কাব্য, নব্যন্যায় অথবা নব্যস্মৃতি-শাস্ত্রে শিক্ষিত ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই সংস্কৃত শ্লোক রচনায় বেশ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বহু পুঁথি আলোচনা করিলে এই দীন অবহেলিত পুঁথিলেখক সম্প্রদায়ের চিত্তচমৎকারি কবিত্বশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ইঁহাদের কাব্যবিন্যাস শৈলী, অসাধারণ শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার পরিবেশন রচনার ভাবগাম্ভীর্য ও রসমাধুর্য যে-কোনও উত্তম শ্রেণীর কবির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্রীরামলোচন নামক কোনও লেখক একস্থলে বলিতেছেন—

"ধীরো ধীবরধাম্নাং ভূতিমতাং ধর্মাত্মনাং ধার্মিকঃ।
কালে কার্যকলাকলাপকুশলস্য কৌলীন্য কার্ত্তীশ্বরঃ"

এইরূপ অনুপ্রাসবহুল রচনা কি লেখকের দক্ষতার পরিচয় দেয় না? উৎসানন্দ দেবশর্মা স্মৃতিসর্বস্ব গ্রন্থ লিখনান্তে বলেন—

'ভোঃ ভোঃ বিপ্রজনাঃ সভাজনবরা ধীরাঃ যশঃ শ্রীধরাঃ
তর্কব্যাকরণাদিশাস্ত্রনিপুণাঃ ধীরো রসা ভূরসাঃ (১)"

কিম্বা অন্যজনের স্মরণীয় উক্তি

রাজা স্বস্তি প্রজাঃ স্বস্তি দেশাঃ স্বস্তি তথৈব চ।
যজমানগৃহে স্বস্তি স্বস্তি গোব্রাহ্মণেষু চ॥

এই সকল শ্লোকের রচয়িতৃবর্গ দীর্ঘদিন পর্যন্ত লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করিয়া আছেন, ইঁহাদিগকে যোগ্য মর্যাদা দিতে আমরা এখনও এত কুণ্ঠিত কেন?

বৈদ্যনাথের প্রেতকাশী গ্রন্থের এক লিপিকার শিবশঙ্কর জাটিকর জাতিতে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত উক্তি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিবার মত হিতোপদেশের ন্যায় বহুমূল্য

জাত্যন্ধো ন চ বেত্তি বাহ্যনিয়মান্ ষণ্ডো ন চ স্ত্রীসুখম্,
বেশ্যা সৎপুরুষং খলঃ * * * * বন্ধ্যাপ্রসূতিশ্রমম্।
কাকো হংসগতিং খরোঽম্বুরসং দানং তথা * নরঃ
শ্বা বৈ সিংহপরাক্রমং মৃগপতে মর্খো মহাজ্ঞানিনাম্' ॥

এইভাবে বহু উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া লাভ নাই। রামলোচন, উৎসবানন্দ, বা শিবশঙ্করকে যাঁহারা শর্করাভারবাহী জীববিশেষের সহিত তুলনা করিতে চান তাঁহাদের উদ্দেশ্যে কিছু না বলাই ভাল, কিন্তু সত্যান্বেষী গবেষক ইঁহাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিবেন মনে করিতে পারি।

এই সম্প্রদায় ধীর স্থির ও বিনয়ী ছিলেন। বস্তুতঃ শেষোক্ত গুণটির জন্য তাঁহারা সমাজের সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। যে বিরাট কার্যের তাঁহারা ছিলেন উত্তরসাধক, তাহার গুরুভার স্কন্ধে বহন করিবার ক্ষমতা থাকিলেও দুই চারিটি ভ্রমপ্রমাদ ঘটিবারই কথা, এই বহুস্থলে তাঁহারা বলিয়াছেন

'কবকৃতমপরাধং ক্ষন্তুমর্হন্তি সন্তঃ ;

গরুড়পুরাণে লিপিকার শ্রীনীলকণ্ঠ পণ্ডিত বলেন

'মন্দার্থহীনং লিখিতং ময়াত্র
তৎসর্বমেতৎ পরিশোধনীয়ম্
কোপং ন কুর্যাৎ খলু লেখকস্য

শিবপুরাণ ও ঋগ্বেদ পদপাঠের দুই অজ্ঞাতনামা লেখক একই কথার পুনরুক্তি করিয়াছেন, তাঁহাদের উক্তিটি সত্যই অনন্যসাধারণ

অজ্ঞানতো বা মতিবিভ্রমাদ্বা
যৎ কিঞ্চিদূনং লিখিতং ময়া চ,
তৎ সর্বমার্যৈঃ পরিশোধনীয়ম্ ইত্যাদি

কাণ্ব সংহিতা পাঠের লিপিকার প্রথম পংক্তির স্থলে বলিলেন

অদৃষ্টভাবান্মতিবিভ্রমাদ্বা,

এইরূপ বিনয় ও ধৈর্য্য সত্যকারের পাণ্ডিত্যের উচ্চতমশিখরে আরোহণ না করিলে কখনই সম্ভবপর হয় না।

এই পুঁথিগুলির প্রতি তাঁহাদের পুত্রাধিক স্নেহ ছিল, পুত্রের প্রতিষ্ঠায় যেমন পিতার সুখ—পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে পিতা যেরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকেন—এই লেখকসম্প্রদায়ও তাঁহাদের পুঁথি জনসাধারণের গ্রহণীয় হইবে কিনা—যথেষ্ট আদৃত হওয়া বিষয়ে নিশ্চয়তা আছে কিনা—এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। জৈমিনি ভারতের এক অজ্ঞাতনামা লিপিকার সুন্দরভাবে মনের এই সন্দেহব্যাকুলচিত্রটি রূপায়িত করিয়াছেন। তিনি বলেন—

'লিখিতজ্ঞাতিযত্নেন ফলং দাস্যতি বা ন বা।
ইতি মে ব্যাকুলং চিত্তং স্থৈর্য্যং মা ভূৎ কথঞ্চন ।।

অকৃত্রিম স্নেহ ও গভীর অনুরাগ না থাকিলে চিত্ত এত ব্যাকুল হইয়া উঠে না। বিশ্বেশ্বর দত্তপণ্ডিত, যাজ্ঞিকদেবের স্মৃতিসার গ্রন্থ নকল করিতে গিয়া বলিলেন—

যাবল্লবণসমুদ্রো যাবন্নক্ষত্রমণ্ডিতো মেরুঃ।
যাবচ্চন্দ্রাদিত্যৌ তাবদিদং পুস্তকং জয়তু ।।

নিজনিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমপ্রসূত বস্তুর প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় কি। ভাগসূত বামণ দুবে নামক লিপিকারও ঋগ্বেদপদপাঠ লিখনে ঐ একই কথার পুনরুক্তি করিয়াছেন। এই অধুনা অনাদৃত পুঁথি-লেখকসম্প্রদায় নিজেদের সুনামেই সন্তুষ্ট ছিল। তাহারা সিদ্ধি বা পরমার্থের প্রয়াসী ছিল না। তাই দেখি উদ্যোগপর্ব গ্রন্থের লিপিকার শ্রীদেবীচরণ শর্মা বলেন—

যস্যার্থে লিখিতং গ্রন্থস্তস্য মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
তস্যৈব সিদ্ধিরেবাস্তু মাস্মাকন্তু মহত্ত্বশঃ ।।

তখনকার দিনে মুদ্রণের ব্যবস্থা না থাকায় পুঁথি হস্তগত করার অপচেষ্টা প্রবল ছিল। একজন অপরের নিকট হইতে একটি পুঁথি সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় সৎ বা অসৎ উপায়ের কথা সাময়িকভাবে বিস্মৃত হইতেন। তাই পুঁথি লেখকেরা নিজ নিজ গ্রন্থ রক্ষণ সম্বন্ধে সাবধান থাকিতেন। শ্রীরামদুলাল দেবশর্মা তাঁহার প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বের পুঁথিতে বলিলেন—

'নেতব্যা পুস্তিকা চৈষা দুঃখেন লিখ্যতে ময়া।
শূকরী তস্য মাতা স্যাৎ পিতা তস্য চ গর্দভঃ ।।'

এইপ্রকার আরও উক্তি দেখি দেবীচরণ শর্মার উদ্যোগপর্ব পুঁথিতে—

'যো হরেৎ পুস্তকমিমং পণ্ডিতো বাপাপণ্ডিতঃ।
মাতা চ শূকরী তেষাং পিতা তেষাঞ্চ গর্দভঃ ।।'

অজ্ঞাতনামা লেখকের হরিবংশ পুঁথিতে—

ইমাং মদীয়াং যদি নাম কশ্চিৎ—বিবেকশূন্যো হরতে চ পুস্তীম্ ।

নেত্রস্য হানিং নয়নস্য শোকং সর্বাঙ্গকুষ্ঠং লভতে চ নূনম্ ॥

অন্যায়ভাবে পুথিহরণকারীকে সর্বপাপাশ্রয়, পাপাত্মা বলিয়াছেন শ্রীরামলোচন তাঁহার নারদপুরাণ পুঁথিতে। যেমন—

ইদং পুরাণং পরমং যত্নেনোপার্জিতং নরঃ ।

যো হরিষ্যতি পাপাত্মা সর্বপাপাশ্রয়ো হি সঃ ॥

শ্রীকীর্তিনারায়ণ দেবশর্মা তাঁহার নারদ পঞ্চরাত্র পুঁথিতে আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া বলিলেন—

দুঃখেন লিখিতো গ্রন্থঃ পুত্রবৎ প্রতিপালয়েৎ ।

ইমং হরতি যো মূঢ়ঃ সনির্বংশো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

শিবগীতার এক পুথিলেখক বলেন—

ক্রিয়তে পুস্তিকা চেয়ং যেন বৈ পাপভাগিনা ।

করো হীনো ভবেত্তস্য ইত্যাদি ।

অথবা 'তিথিতত্ত্ব' পুঁথির কোন অজ্ঞাতনামা লেখক—

'যত্নেন লিখিতং গ্রন্থং যদি কশ্চিদপহ্নুতে ।

পুংশ্চলী জননী তস্য ইত্যাদি ॥

সত্য সত্যই এই পুঁথিগুলির উপরে তাঁহাদের পুত্রাধিক স্নেহানুরাগ ছিল। তাই এগুলির রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল সদা জাগ্রত, পুস্তিকাহরণকারীকে পাপাত্মা, মূঢ়, বিবেকশূন্য, সর্বপাপাশ্রয় প্রভৃতি গালিগালাজ করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই। 'অপহরণকারী নির্বংশ' হইবে, তাহার হস্তচ্ছেদ হইবে এমন কি তাহার জননী অন্য পুরুষগামিনী হইবে, এই প্রকার অভদ্রজনোচিত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। বহু পরিশ্রমে লিখিত প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় পুঁথিগুলির অপহরণ সহ্য করা সত্যই তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

তবে সুগন্ধি পুষ্পের সহিত কীটও দেব চরণে স্থান লাভ করিয়া থাকে। এই সর্বজনবরেণ্য পুঁথিলেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই যে সুপণ্ডিত ছিলেন, এ কথা বলিতে পারা যায় না। মক্ষিকাহন্তা কেরাণিকের ন্যায় দুই চারিজন 'দেবানাং প্রিয়ও' নিজের অক্ষমতা লুকায়িত রাখিয়া এ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শিবধর্মোত্তর এই সকল কুলেখকদের সম্পর্কে 'শতহস্তেন

বাজিনং' নীতি অবলম্বন করিতে বলিয়াছে, তাহারা নিম্নোক্তভাবে পুঁথির সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকে—

কোন অক্ষর বা মাত্রা বাদ, নূতন কোন অক্ষর সংযোজন, অশুদ্ধ পাঠ, শুদ্ধি ছলে যথেচ্ছ পরিবর্ত্তন, বিরোধার্থীকরণ ও ছন্দো ভঙ্গ' (শিবধর্মোত্তরের পুঁথি, কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থশালায় রক্ষিত নং জি ৩৮৫২, পৃষ্ঠা ৪৩ খ, ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

কেহ কেহ নিজ দোষ ক্ষালনের জন্য বলেন যে পুস্তক হইতে তাঁহারা নকল করিতেছেন তাহাই অত্যন্ত অশুদ্ধ ; কাজেই যাহা দেখিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন, লেখকের কোন দোষ নাই, আচারদীপের এক পুঁথিতে অজ্ঞাতনামা কোন লেখক বলেন,—

যাদৃশং পুস্তকং দৃষ্টা (? ষ্টং) তাদৃশং লিখিতং ময়া,
যদি শুদ্ধমশুদ্ধং বা মম দোষো ন দীয়তে ॥

বৈদ্য শ্রীঅভয়ানন্দ সেন শুদ্রাহ্নিকাচার পুঁথি নকল শেষ করিয়া বলিলেন—

'যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকে নাস্তি দোষঃ।'

লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরাকাণ্ডের লিপিকার রামনাথ দেবশর্মার উপমাযোগে উক্তি সত্যই সুন্দর— '

যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকে নাস্তি দূষকঃ
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাং চ মতিভ্রমঃ

বসুদেব শর্মা হরিবংশ নকল করিবার কালে বলিলেন—

'বং পুস্তকং বীক্ষ্য ময়া ব্যলেখি
তদত্যাশুদ্ধং' ... ...

বা

সকৃটপ্রত্যালিখিতং বিম্বদ্ভিঃ মম দোষো ন দাতব্যঃ'

'বিনায়ক স্তবরাজ নামক পুঁথি লেখা শেষ করিয়া লেখক বিষ্ণুদাস ঐ কথার পুনরুক্তি করিয়াছেন।

এইভাবে পুঁথিপত্রগুলি যথাযথ অনুসন্ধান করিলে সত্যই ভারতের এক অনালোচিত ইতিহাস পুনরুদ্ধৃত হইবে সন্দেহ নাই। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গী, কঠিন পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় এই চারিটি গুণের একত্র সমাবেশ ভিন্ন এ আলোচনা পুষ্ট হয় না। ভারতবর্ষে যে সামান্য কয়েকজনের মধ্যে ঐ বিভিন্ন গুণাবলী বর্ত্তমান, তাঁহাদের মনোযোগ এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইলে আলোচনাকারীর শ্রম সার্থক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ষ্টুডেন্টস্‌ ডে হোম

স্বপ্রকাশ গুপ্ত

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণ-দামামা থেমে গেল বটে, কিন্তু যুদ্ধের সময় আমাদের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে যে সব জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল সেগুলোর নিষ্পত্তি হোল না। খাদ্য ও বস্ত্র রইল দুর্মূল্য হ'য়ে—পল্লীগ্রামের লোকের জন্য ব্যবস্থা করা গেল না কোন নতুন বৃত্তির। দিনের পর দিন বেকার মানুষের দল সহরের দিকে জড় হ'তে লাগল জীবিকার সন্ধানে। তার উপর এল ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ। বাংলা দেশের ২/৩ অংশ চলে গেল পরদেশী হ'যে। কাতারে কাতারে নিজ বাসভূমে পরবাসীর দল জড় হ'তে লাগল আশ্রয়ের সন্ধানে, বৃত্তির সন্ধানে কলকাতা সহরে। ফলে এখানে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান সবই হয়ে উঠল দুর্লভ ও দুর্মূল্য।

উত্থান পতনের যুগে, পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে মানুষকে কষ্ট পেতে হয় এটা হয়ত খুব নতুন কথা নয়, কিন্তু এই কষ্টকর অবস্থার মধ্য থেকেই মানুষকে গড়ে তুলতে হয় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সংসারের ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে যাদের জীবনের অনেকখানি কেটে গেল, এই অশান্ত পরিবেশের মধ্যে তাদের বিপন্ন অবস্থা লক্ষ্য করে রাষ্ট্র দুঃখ বোধ করে নিশ্চয়ই এবং তাদের যতদূর সম্ভব সাহায্য ও সহায়তা দেবার চেষ্টাও ক'রে থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রধান স্বার্থ এদের নিয়ে নয়—রাষ্ট্রের স্বার্থ হচ্ছে এদের ঘরের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে। অভাবের নিষ্পেষণে, সুযোগ-রাবির অভাবে এই শিশু বৃক্ষগুলো যদি দলিত মথিত হ'য়ে যায়, তাহলে বর্তমান দুর্দৈবকে কাটিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ আসবে রাষ্ট্রের কোথা থেকে? তাই বাঙালী জাতির এই নিদারুণ সঙ্কট সময়ে জাতির ভবিষ্যতের আশা তরুণ কিশোর দল যাতে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে না যায় রাষ্ট্রকে সেদিকে নজর দিতেই হয়।

প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ষ্টুডেন্টস্‌ ডে হোম গুলোর প্রতিষ্ঠা করা হয়। সঙ্কীর্ণ, অপরিসর, বহুজন সমাকীর্ণ ঘরের বিরুদ্ধ পরিবেশে ছাত্রদের পক্ষে পড়াশুনো করা অসম্ভব—শরীরের পুষ্টির জন্য যে খাদ্যের প্রয়োজন, সীমিত আয়ের মধ্যে তার সঙ্কুলান করা দরিদ্র অভিভাবকের সাধ্যাতীত, এমন কি ক্লাসে পড়বার বইগুলি পর্যন্ত জোগাড় হয়ে উঠছে না—এই ত' আজ বাংলাদেশের

নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের প্রায় প্রত্যেক ঘরের অবস্থা। অথচ এরাই হ'চ্ছে জাতির বহুজন। তাই এই সব ছেলেদের পড়াশুনার যাতে ব্যাঘাত না হয় রাষ্ট্র নিজে সেই দিকে নজর দিতে চেষ্টা করছে। এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্য নিয়েই ষ্টুডেন্টস্ ডে হোমের পরিকল্পনা। ১৯৫৬ সালের ১লা ডিসেম্বর কল্‌কাতা সহরের তিন দিকে তিনটি ডে হোম প্রতিষ্ঠিত হয়। ৺রামকৃষ্ণ দেবের পবিত্র নামের সঙ্গে যুক্ত উত্তর কল্‌কাতার ডে হোমটি প্রতিষ্ঠিত হয় বাগ্‌বাজারের পশুপতি বোসের বাড়ীতে। মধ্য কল্‌কাতার ডে হোমটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে প্রতিষ্ঠিত হয় ২৯৯ নম্বর আপার সার্কুলার রোডের টাকী হাউসে আর দক্ষিণ কল্‌কাতায় মেয়েদের জন্য একটি স্বতন্ত্র ডে ষ্টুডেন্টস্ হোম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৪৭ নম্বর রাসবিহারী এভেন্যুতে।

প্রধানতঃ গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করেই ডে ষ্টুডেন্টস্ হোমগুলো গ'ড়ে উঠেছে। গ্রন্থাগার ছাড়াও এর প্রত্যেকটির সঙ্গে আছে একটি করে ক্যান্টিন আর অফিস। কিন্তু ক্যান্টিনের কাজ গ্রন্থাগারে সমাগত ছাত্রদের খাদ্য সরবরাহ করা আর অফিসের কাজ গ্রন্থাগার ও ক্যান্টিন সুশৃঙ্খলে পরিচালনার ব্যবস্থা করা, অর্থাদির পর্যবেক্ষণ করা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গ্রন্থাগারই হচ্ছে এই ডে ষ্টুডেন্টস্ হোমগুলোর প্রাণকেন্দ্র।

গ্রন্থাগারগুলো খোলা থাকে সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। কলেজের সমস্ত পাঠ্য বইয়ের অনেকগুলো করে প্রতিলিপি সংগৃহীত আছে এখানে। ফলে ছেলেরা তাদের পড়াশুনা এখানে বসেই করতে পারে এবং তাদের বইয়ের অভাবে অসুবিধায় পড়ার সম্ভাবনাও মোটেই থাকে না। সুদীর্ঘ সময় যেমন গ্রন্থাগার খোলা থাকে তেমনি ছেলেরা যাতে এখানে স্বল্প ব্যয়ে আহারের সুযোগ পায় তারও বন্দোবস্ত আছে। বস্তুতঃ ক্ষুধার তাড়নায় বাড়ী যেয়ে খেয়ে আসতে গেলে পড়ার সময়ের অনেকখানি অপব্যয় হয়ে যায়, এই বিবেচনায় ডে হোমের কর্তৃপক্ষ এখানে আহারের ব্যবস্থা করে এই আয়োজনকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলেছেন। আর এই আহার্য সরবরাহের জন্য মূল্যও নেওয়া হয় অতি সামান্য। মাত্র ৵০ দু'আনা পয়সা দিলেই ছাত্র পেট ভরে ভাত তরকারী কিংবা প্রচুর জলযোগের দ্রব্য পেতে পারে। এর জন্য রাষ্ট্র প্রত্যেক ছাত্র পিছু ।০ চারি আনা করে ব্যয় করে। ছ'আনার মধ্যে যে খাবার সরবরাহ করা হয় তাতে ক্যান্টিন পরিচালনার প্রশংসা না করে পারা যায় না। বাস্তবিক এই ডে ষ্টুডেন্টস্ হোমগুলো ছাত্রদের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়েছে।

সাধারণতঃ একজন ওয়ার্ডেন এই হোমগুলো পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন। গ্রন্থাগারে তাঁকে সাহায্য করার জন্য এখন পর্যন্ত ৫জন লোক আছে। এদের মধ্যে দু'জন করেন বর্গীকরণ, (Classification) সূচীলিখন (Cataloguing) প্রভৃতি গ্রন্থাগার বিষয়ক আনুষঙ্গিক (Technical) কাজ আর তিনজন প্রধানতঃ বই লেনদেনের কাজ করেন। তবে গ্রন্থাগারে এই পাঁচজন লোক কাজ করলেও গ্রন্থাগার সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চোদ্দ ঘণ্টা খোলা থাকায় কর্মীদের দু'দফায় কাজ করতে হয়। ফলে গ্রন্থাগারে কখনও ৫ জন লোক এক সঙ্গে কাজ করে না।

ডে ষ্টুডেণ্টস্ হোমের সভ্য হ'তে হলে ছাত্রের অভিভাবকের মাসিক আয় ৩০০্ টাকার অনুর্ধ্ব হওয়া চাই। এছাড়া যে সব ছাত্র নিয়মিত গ্রন্থাগারে পড়াশুনা করে না, তাদের ক্যান্টিনের সুযোগ দেওয়া হয় না। সুতরাং প্রকৃত পাঠেচ্ছু অভাবগ্রস্ত ছেলেদের মধ্যেই যাতে এই হোমের সুযোগ সীমাবদ্ধ থাকে কর্তৃপক্ষ সেদিকে বেশ দৃষ্টি দিয়েছেন।

ডে ষ্টুডেণ্টস্ হোম পরিচালনার জন্য একটা করে কমিটি নিযুক্ত হয়েছে। ওয়ার্ডেন এই কমিটির সহ সচিব। শিক্ষাবিদ্ বে-সরকারী লোকদের এই কমিটিতে যথেষ্ট সংখ্যায় গ্রহণ করার ফলে ডে হোমের পক্ষে গতানুগতিক পথ ছেড়ে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার উদ্যোগ দেখা দেবে এ আশা অনেকেই রাখেন।

এখন পর্যন্ত ডে হোমগুলোর কাজ খুব আশাপ্রদ বলে মনে হ'চ্ছে। মধ্য ক'লকাতার ঈশ্বরচন্দ্র হোমের পাঠক সংখ্যা এই ছয় মাসেই ন্যূনাধিক ৩৫০এ দাঁড়িয়েছে। ডিসেম্বর মাসে বছরের শেষে অনেক ছাত্রই যেমন ক'রে হোক্ তাদের সমস্যার একটা সমাধান ক'রে নিয়েছিল। সুতরাং তাদের অনেকেই অপরিচিত পরিবেশের পরীক্ষা ক'রতে যায়নি। কলেজের বছর এই সবে সুরু হ'চ্ছে। মনে হয় নতুন বছরে ডে হোমগুলোর পাঠক সংখ্যা বহুগুণ বেশী হ'য়ে যাবে।

ঈশ্বরচন্দ্র হোমের সংগৃহীত পুস্তকসংখ্যা এখন মোটামুটি ২৫০০। হিসাব ক'রলে দেখা যাবে ছাত্র পিছু ৮খানা বই মোটামুটি গ্রন্থাগারে সংগৃহীত আছে। ব'সে পড়ার ব্যবস্থাই যে গ্রন্থাগারের প্রধান লক্ষ্য তার পক্ষে এই সংখ্যা খুব খারাপ নয়—তবে মনে হয় নতুন বছরে পাঠক সংখ্যা বাড়লে গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যাও দ্রুত বাড়াতে হবে।

আমাদের দেশের কলেজ লাইব্রেরীগুলোর অবস্থা বিবেচনা ক'রলে ষ্টুডেণ্টস্ হোমের গুরুত্ব আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। ছাত্র সংখ্যার তুলনায় কলেজের গ্রন্থাগার আয়োজন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতি সামান্য। অপরিসর গ্রন্থাগার কক্ষে স্বল্পসংখ্যক

কয়েকখানি বই নিয়ে যে গ্রন্থাগার কলেজের অঙ্গ হিসাবে বিরাজ করে তা' ছাত্রদের পাঠস্পৃহাকে কোন মতেই জাগিয়ে তুলতে পারে না। সুতরাং আর্থিক দুরবস্থায় প্রপীড়িত ছাত্রদের সাহায্য দেওয়াই ডে হোমগুলোর একমাত্র সার্থকতা নয়। সহরের প্রান্তভাগে অবস্থিত দুরধিগম্য জাতীয় গ্রন্থাগার ছাড়া সাধারণের ব্যবহার্য কোন নিঃশুল্ক ভাল গ্রন্থাগার ক'লকাতা সহরে নেই। প্রথম অবস্থায় ছাত্রদের কাছে ডে হোমগুলো যে সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজও অনেক পরিমাণে ক'রবে এ আশা খুবই করা যায়। বস্তুতঃ অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান্ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে-সব ছাত্রের বাড়ীতে পড়াশুনার স্থানের খুব অভাব নেই, কিংবা সরকারী আনুকূল্যে খাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজনও যাদের খুব বেশী নয় তাদের জন্যও উপযুক্ত গ্রন্থাগার-সাহায্যের অনেকখানি ডে হোমগুলো দিতে পারবে। গ্রন্থাগারে বসে পড়াশুনা করার অভ্যাস একটা ভাল শিক্ষা। এ শিক্ষা ধীরে ধীরে অর্জন করতে হয়। এখানকার যান্ত্রিক যুগে পড়া শুনার ক্ষেত্রেও যখন আমাদের অনেক বিষয়ে এমন সব যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া দরকার হ'য়ে প'ড়ছে যে সব যন্ত্র আমাদের সকলের বাড়ীতে সংগ্রহ করা সম্ভব নয় তখন গ্রন্থাগারে ব'সে পড়ার অভ্যাস করা আমাদের সকলেরই দরকার। সে হিসাবে ডে হোমগুলোর বাড়ীতে আদান প্রদানের ভাল ব্যবস্থা না থাকলেও গ্রন্থাগার হিসাবে এর মূল্য কিছুমাত্র কম হয় না।

ডে হোমগুলো যে সুন্দর কাজ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে তাকে সাথক ক'রতে হ'লে কিন্তু আরও বেশী সংখ্যক উপযুক্ত কর্মী নিযুক্ত ক'রতে হবে। ইংলণ্ড আমেরিকার সাধারণ গ্রন্থাগারে পর্যন্ত পাঠকদের সাহায্য করবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষিত কুশল কর্মী নিযুক্ত থাকেন—আমাদের দেশে প্রধানতঃ ছাত্রদের জন্য প্রতিষ্ঠিত ডে হোমগুলোতে যে এ আয়োজন অপরিহার্য একথা প্রতিপাদনের অপেক্ষা রাখে না।

ডে হোমগুলোতে একজন ক'রে গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা দরকার সমস্ত বিভাগের কাজগুলোর সমন্বয় সাধনের জন্য। এই গ্রন্থাগারিক যদি গ্রন্থাগার-সম্প্রসারণের (extention work) কাজ যথাবিধি ক'রতে পারেন তাহ'লে ছেলেদের পাঠস্পৃহা নিয়মিত কলেজী পাঠ্যের বাঁধা খাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না—তা'ছাড়া কলেজী পাঠ্যগুলোকেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ছেলেরা দেখতে শিখবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার-বিষয়ক পরিকল্পনার মধ্যে ডে ষ্টুডেন্ট্‌স্ হোমের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। আমরা আশা করি ক'লকাতায় আরও বেশী সংখ্যক এবং মফঃস্বল অঞ্চলেও এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হবে।

চিঠিপত্র

গ্রন্থ-সমালোচনার প্রতিবাদ

[মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন। স্থানাভাব হেতু এ বিষয়ে আর কোনও বাদানুবাদ প্রকাশ করা হইবে না]

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীঅজিত কুমার মুখার্জী মহাশয়ের "Manual of Reference Work" বইখানি সমালোচনা "গ্রন্থাগারের" পূর্ববর্তী এক সংখ্যায় ক'রতে গিয়ে সমালোচক শ্রীআদিত্য কুমার ওহদেদার মহাশয় কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করাতে সাধারণ চক্ষে বইখানার তাৎপর্য্য হয়তো হেয় প্রতিপন্ন হোতে পারে, এই আশঙ্কায় সামান্য দু'এক কথার অবতারণা করার প্রয়োজন মনে করি। অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার প্রধান কারণ যে ওহদেদার মহাশয় বইখানা আদ্যন্ত পড়ার পূর্বেই "উহাতে কি ছিল বা কি আশা করা যায়"—এই নিয়ে বিলাপের সূত্রপাত করেছেন।

বইখানা মূলতঃ ভারতীয় গ্রন্থাগারিক ছাত্রছাত্রীদের পাঠের উপযোগী করে লেখা হয়েছে—একথা লেখক নিজেই মুখবন্ধে সকলকে বলে দিয়েছেন। দীর্ঘকাল গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক বিদ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন বলে তিনি ভারতীয় গ্রন্থাগারিক ছাত্রছাত্রীদের অভাবগুলির বিষয় সম্যক্ অবহিত আছেন। একথা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী ও গ্রন্থাগারিক নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। ভারতীয় গ্রন্থাগারিক ও ছাত্রছাত্রীরা Reference বইগুলির ব্যাপারে বিদেশী লেখকদের নিকট যা পান—তাতে Manual বা বিরাট ব্যাপারকে সঙ্কুচিত করে অল্পের মধ্যে সমস্ত চাহিদা মেটানোর মত বই একটিও নেই। সেজন্য সাধারণ লোকদের বিদেশী বইগুলির গোলক ধাঁধায় ঘুরে মরতে হয়। সে জাতীয় প্রয়োজন অভিজ্ঞ শিক্ষক অজিত বাবু সাবধান ক'রেছেন। এ পর্যন্ত কি তিনি মৌলিকত্বের দাবী করতে পারবেন না?

খুব সম্ভব, সমালোচকের গ্রন্থাগারিক পরীক্ষার ব্যাপার তেমন সম্যক্ উপলব্ধি নেই। নয়তো তিনি এমনভাবে হতাশ হতেন না। যেমন ধরুন—বলা

যায় না কি, Roberts, Mudge, Winchell, প্রভৃতিও লেখকের অনুসরণে লিখিত হয়ে গোটা বই তৈরী হয়েছে ? ১০০টী সমাহরণ গ্রন্থের যে অপ্রয়োজনীয়তা আছে, সে কথা কি কেউ বলতে পারবে ? যে কোন গ্রন্থাগারের Reference গ্রন্থাগারিকের পক্ষে এগুলি যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এ কথা প্রতিটি গ্রন্থাগারিকই কি স্বীকার ক'রতে বাধ্য হবেন না ?

সমালোচনার ২৭৯ পৃষ্ঠার তৃতীয় অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে যে শেষ-গ্রন্থের বিবরণ এবং বর্গীকরণ নাকি ভুল হয়েছে। সমালোচকের বক্তব্য এ বিষয়ে খুবই অস্পষ্ট। গ্রন্থাগার কোষ-গ্রন্থের সংজ্ঞা, বর্গীকৃত ভাগ প্রভৃতি বিষয়ে পুরোপুরি নির্ভর করেছেন A. L. A.'র "Glossary of Library terms", এবং Robert, Wyer, Winchell এবং Shores'র নির্দিষ্ট ব্যবস্থার উপর। লেখক তার পুস্তকে নিজস্ব কিছু নির্দেশ না দিয়ে উপরিউক্ত authorityদের বক্তব্যের সমন্বয় করেছেন মাত্র।

পরের অনুচ্ছেদে সমালোচক ভারতে প্রকাশিত কোষগ্রন্থের বিষয়ে আলোচনায় দেখেছেন শুধু লেখকের "উপেক্ষা করা দু'চার কথা"। লেখক নিছক তালিকাটী দিয়ে বুঝিয়েছেন যে আমাদের যথেষ্ট শক্তি ও রসদ আছে। বিভিন্ন পর্যায়ের ভালো ভালো কোষ-গ্রন্থ সমাহরণ করার। উদ্যোগ আয়োজনের অভাবের দিকেই লেখক আমাদের বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবিষয়ে যেটুকু সংঘবদ্ধ আয়োজন হয়েছে বা হচ্ছে। গ্রন্থগুলির বর্গীকৃত পরিচয় এবং তাদের ব্যাখ্যা ও Title থেকে বিষয়বস্তু জানা সাধারণের পক্ষে দুঃসাধ্য নয়। তা'ছাড়া লেখক ১০০টী সমাহরণ গ্রন্থের যে বিবরণ দিয়েছেন তার মধ্যেই ভারতে প্রকাশিত ভারতীয় তথ্য সম্বলিত দশখানি কোষগ্রন্থের পরিচয় দেওয়া আছে।

এরপরে সমালোচক ১০০টী বর্ণিত কোষ-গ্রন্থের মধ্যে থেকে ৩টীর ত্রুটী বিচ্যুতি সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এবিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে—লেখক "Index Translationums"'র কাজ যে বন্ধ হয়ে গেছে একথা কোথাও বলেন নি। দ্বিতীয়তঃ "Indian Annual Register" যে মৃত, জীবিত নয় সে কথা লেখকই বলেছেন "Publication suspended since partition of India" এই লাইনটিতে। অবশ্য "Statistical Abstract for India"'র বিষয়ে সমালোচক যা বলেছেন তা' ঠিক।

পরিশেষে ; সমালোচক ৫ খানা ভারতীয় মূল্যবান কোষ-গ্রন্থ 'নিছক তালিকায়' বাদ পড়েছে বলে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। লেখক প্রথমেই বলেছেন, "An

attempt has been made in this chapter to take an inventory of reference tools of *Indian origin*. The list given below *would not be* comprehensive or exhaustive." লেখক আবার বলেছেন, "the above list contains only those items which have been published in India." সুতরাং ৫ খানি কেন অনেক গ্রন্থই তালিকাভুক্ত না হওয়ার সঙ্গত কারণ রয়েছে। তা'ছাড়া সমালোচক যে ৫ খানি গ্রন্থের নাম দিয়েছেন তার মধ্যে Walt and Nando Lal Deyর বই দুটী প্রকৃত বাদ গেছে ধরা যেতে পারে। যদিচ জোর করেই তা' বলতে হয়। Buckland এবং Malalasekera ভারতে প্রকাশিত পুস্তকই নয়। এ দুটির একটি হচ্ছে Londonএর Sonnenscheinএর এবং অপরটি Londonএর Murrayর প্রকাশিত বই। সুতরাং কোন ক্রমেই লেখকের উদ্দেশ্য অনুযায়ী এ তালিকার মধ্যে আসতে পারে না। Visva-Kosha (Hindi)র আলাদা কোনও উল্লেখ নেই বটে, কিন্তু লেখক Visva-Koshaর বর্ণনা যেখানে দিয়েছেন তাতে পরিস্কার জানিয়েছেন যে—"Hindi edition of the same in also available."

সমালোচকের প্রত্যেকটি বক্তব্য ক্রমিকভাবে আলোচনা করে আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি যে—তাঁর ত্রুটী-সন্ধানী মন নিজেই ভুলের জালে জড়িয়ে গেছে। ভাষার জোরে গোটা বইটাকে হেয় প্রতিপন্ন করার কোনও প্রয়োজন ছিল না সমালোচক মহাশয়ের। সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি সব গ্রন্থেরই থাকে, এমনকি বিলিতী সমৃদ্ধ গ্রন্থেও। ইতি—

গোবিন্দ ভূষণ ঘোষ

সমালোচকের উত্তর

শ্রীগোবিন্দ ভূষণ ঘোষ মহাশয় আমার সমালোচনার যে প্রতিবাদ করেছেন তাতে আর কিছু স্পষ্ট না হলেও এটা স্পষ্ট হয়েছে যে আমার সমালোচনা তাঁর মনে যথেষ্ট ক্ষোভ ও উষ্মা উৎপাদন করেছে।

গোবিন্দবাবুর এ কথাগুলির উত্তর দিতে গেলে মেয়েলি কোঁদলে প্রবৃত্ত হতে হয়। কারণ এ হল 'হ্যাঁ' এবং 'না'র কথা। একপক্ষ বলবে 'হ্যাঁ' অন্যপক্ষ বলবে 'না'। এ হ্যাঁ-নার মীমাংসা একমাত্র তৃতীয় পক্ষই করতে পারে। আমি তাই আমাদের তৃতীয়পক্ষ, অর্থাৎ পাঠকবর্গের হাতে এ মীমাংসা ভার ছেড়ে দিলাম।

শুধু বইখানির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে গোবিন্দবাবু যে কথাগুলি বলেছেন তার উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

গোবিন্দবাবু বলেছেন, "খুব সম্ভব, সমালোচকের গ্রন্থাগারিক পরীক্ষার তেমন সম্যক্ উপলব্ধি নেই। নয়তো তিনি এমনভাবে হতাশ হতেন না।" স্বীকার করলুম গ্রন্থাগার বিদ্যার পরীক্ষা সম্বন্ধে খুব সম্ভব আমার তেমন সম্যক উপলব্ধি নেই। কিন্তু সে উপলব্ধির অধিকারী না হয়েও তো আমি আমার সমালোচনায় বলেছিলাম যে "গ্রন্থাগার বিদ্যার ছাত্রদের পরীক্ষার আশু প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যের প্রতি লেখকের দৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে নিবদ্ধ ছিল মনে হয়।" আমি যা বলেছি গোবিন্দবাবুও তো তাই স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ, বইখানি 'গ্রন্থাগারিক পরীক্ষার' ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্য লিখিত।

কিন্তু গোবিন্দবাবু নিজেও নিশ্চয় জানেন যে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যা লেখা হয় তা এক পর্যায়ে লেখা—তাকে গ্রন্থ বলে না, তা হল নোটস্। বিষয় সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান ও ঔৎসুক্য উদ্রেকও পুষ্ট করার মানসে যা লেখা হয়—তার ধরণ-ধারণ আলাদা—তাকেই বলা হয় গ্রন্থ। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলি, অজিতবাবু যা লিখেছেন তা নোট বই পর্যায়ের উর্ধ্বে উঠতে পারে নি। একশটি সমাহরণ গ্রন্থ যে-ভাবে সাজান এবং বিবৃত হয়েছে তার ধরণধারণ নিছক নোটবইয়ের—এই কথাই আমি বলেছি। একশটি সমাহরণ গ্রন্থের যে অপ্রয়োজনীয়তা আছে, এমন কথা আমিই কি বলেছি?

শেষ-গ্রন্থের বিবরণ এবং বর্গীকরণ ভুল হয়েছে আমি বলি নি; বলেছি, শেষ-গ্রন্থের বিবরণ যথেষ্ট সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে এবং বর্গীকরণ সম্বন্ধে লেখক সতর্ক হন নি। কোনো বিষয়কে কি form অর্থাৎ ঢঙএ লিখলে তা কোষ গ্রন্থের রূপ নেয় সে কথা জানা যায় Encyclopaedias, Dictionaries, Manuals, Guides ইত্যাদির পরিচয় দ্বারা। কিন্তু এরা তো কোষ গ্রন্থের form অর্থাৎ রূপ, বিষয় নয়। গ্রন্থ-বর্গীকরণের যে নিয়ম, অর্থাৎ "classify first by Subject, then by form," কোষ-গ্রন্থের বেলাতেও সে নিয়ম প্রযোজ্য। ভারতে প্রকাশিত কোষ গ্রন্থগুলির তালিকা form হিসাবে সাজাবার যুক্তি কি? কোনো কোষ গ্রন্থের তালিকা কিংবা কোনো গ্রন্থাগারের কোষগ্রন্থ সংগ্রহ এইভাবে বর্গীকৃত হয় কি?

কোষ-গ্রন্থগুলির বিবরণ যথেষ্ঠ সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে—একথা কি জন্য বলেছি তা গোবিন্দবাবুর নিজের কথাতেই স্পষ্ট হয়েছে। একশটি সমাহরণ

গ্রন্থের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ভারতে প্রকাশিত দশটি কোষ-গ্রন্থের বিবরণ আছে। সংখ্যাটি কি যথেষ্ট সীমাবদ্ধ নয়? গোবিন্দবাবু অবশ্য বলেছেন, ভারতে প্রকাশিত কোষগ্রন্থগুলির "বর্গীকৃত পরিচয় এবং তাদের আখ্যা বা Title থেকে বিষয়বস্তু জানা সাধারণের পক্ষে দুঃসাধ্য নয়।" দুঃসাধ্য না হতে পারে, কিন্তু সহজ সাধ্য যে নয় এটা ঠিক। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক: ' Manual Handbooks" এ বর্গীকৃত Guide to Current Official Statisticsএর আখ্যা থেকে কোনো পরিচয় মেলে কি গ্রন্থটি কী জাতীয়? গ্রন্থটির বর্গীকরণও ভুল হয় নি কি? গ্রন্থটি যে একটি bibliographical sourcebook এমন ধারণা লাভ করা যায় কি?

ত্রুটি-সন্ধানী মন নিয়ে সমালোচনা করলে তো বইখানির ভুলত্রুটি অনেক বার করা যায়। Reference work এ দক্ষতা অর্জন করার একটা মূল সূত্র হল কোষগ্রন্থ সম্বন্ধে অনুসন্ধানী হওয়া, সে সম্বন্ধে সঠিক খবর রাখা, গ্রন্থগুলির সর্বশেষ সংস্করণের সম্বন্ধেও সজাগ থাকা। লিখিতভাবে কোষগ্রন্থের পরিচয় দিতে গেলে সে পরিচয় cataloguing rule সম্মত হওয়াও বাঞ্ছনীয়। আলোচ্য গ্রন্থে এ সব বিষয়েই বেশ শিথিলতা দেখা যায়। যেমন, Guide to Current Official Statistics সম্বন্ধে দেখানো হয়েছে এটি 3 volsএর বই এবং এর প্রকাশ কাল 1943-49; কিন্তু তাই কি? Hindi Sabda Sagarএর শুধু নাম করা হল, কিন্তু গ্রন্থটি ৮ খণ্ডে কিংবা বর্তমানে ৪ খণ্ডে সমাপ্ত, একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণও আছে—সে সম্বন্ধে কিছু বলা হল না। গ্রন্থটির গুরুত্ব সম্বন্ধেও কিছু বলা হয় নি। বাংলা চলন্তিকার ৬ষ্ঠ সংস্করণ উল্লেখ করা হল, "অর্থটি" ওর ৮ম সংস্করণ চলছে। যে কোষগ্রন্থের বর্তমান আখ্যা হল The Times of India Directory and Yearbook including who's who তাকে তার পুরানো নামে চালানো হল। Indian Year Book and Who's Who তো ও গ্রন্থের অনেক পুরানো নাম। ভারতীয় Encyclopaediaর তালিকা থেকে বাদ পড়ল মারাঠি, তেলেগু, কানাড়া, ওড়িয়া ও মলয়ালাম গ্রন্থগুলি। হিন্দী বিশ্বকোষের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। এদের মধ্যে মারাঠি গ্রন্থটি ২৩ খণ্ডে সমাপ্ত প্রকাশকাল ১৯২০-২৭। তেলেগু গ্রন্থটি ৭ খণ্ডে, প্রকাশকাল ১৯৩৮-৫১। কানাড়া গ্রন্থটি আমাদের শিশু-ভারতী জাতীয়। অন্যগুলির কাজ এখনো অসমাপ্ত। ভারতীয় গ্রন্থপঞ্জীর ক্ষেত্রে দাতের 'মারাঠি গ্রন্থ-সূচী' একটি বিখ্যাত অবদান। মাতাপ্রসাদ গুপ্তর হিন্দী পুস্তক সাহিত্যও নাম করা। কিন্তু

এদের উল্লেখ নেই এ গ্রন্থে। Catalogus Catalogorumএর supplement প্রকাশিত হয় নি, ওকে নতুন সংস্করণ বলা যায়। ওর নাম এখন New Catalogus Catalogorum, প্রথম খণ্ড মাত্র বেরিয়েছে। অনেক অভিধানের নাম করা হয়েছে, অথচ পরিভাষায় কাজে Dr. Raghu Viraএর গ্রন্থের নাম করা হল না। আর কতো বলব? আমি Index Translationum ও Indian Annual Registerএর নাম করেছিলাম এই ত্রুটি দেখাতে যে কোষ-গ্রন্থ দুটির পরিচয় দেবার সময় "closed entry" ও "open entry"র খেয়াল করা হয় নি। Index Translationumএর open entry হওয়া উচিৎ ছিল, Indian Annual Registerএর closed entry, গোবিন্দবাবু আমার বক্তব্যটি ধরতে পারেন নি। "দেখান হয়েছে জীবিতরূপে"—এ কথার অর্থ, open entry দেওয়া হয়েছে। Index Translationumএর entry যে-ভাবে দেখান হয়েছে তাতে স্পষ্ট মনে হয় যে ও গ্রন্থ ১৯৫০-৫২ সাল ধরে প্রকাশিত চার খণ্ডের বই। অথচ ওর কাজ শুরু হয়েছে ১৯৩২ থেকে। একটু কষ্ট করে National Library (Calcutta) Catalogue of Periodicals দেখলেই বিষয়টির সম্বন্ধে জানা যেত। এ কাজের বর্তমান ধারা শুরু হয়েছে ১৯৪৮ থেকে, বই বেরিয়েছে '১৯৪৯ সনে। লেখক বোধ হয় গ্রন্থটির ১ম খণ্ড দেখেন নি, নইলে এমন ভুল হত না। ১ম খণ্ডের ভূমিকায় সব বিবরণ দেওয়া আছে।

ভারতীয় তথ্য সংক্রান্ত কোষ-গ্রন্থের উল্লেখ করতে গিয়ে শুধু ভারতে প্রকাশিত গ্রন্থগুলির সন্ধান করা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ তাতে অনেক বই বাদ পড়ে। ভারতীয় সন্ধানের কাজে চাই ভারতীয় তথ্য সংক্রান্ত কোষগ্রন্থ —তা সে যেখানেই প্রকাশিত হোক না কেন। আমি যে মূল্যবান গ্রন্থগুলি বাদ পড়েছে' বলে উল্লেখ করেছিলাম, সেগুলি যে ভারতে প্রকাশিত—একথা তো আমি বলিনি। আমি বলেছিলাম সেগুলি ভারতীয় তথ্য সংক্রান্ত কোষগ্রন্থ। সুতরাং তাদের মধ্যে কোনগুলি ভারতে প্রকাশিত নয়—সে খবর গোবিন্দবাবু অত কষ্ট করে না দেখালেও পারতেন। কারণ তাতে আমার কথার খণ্ডন হয় না। আমি বলব, Buckland ও Malalasekara ভারতে প্রকাশিত গ্রন্থ, তালিকায় নাই বা স্থান পেল, অন্য কোথাও তার উল্লেখ থাকা উচিৎ ছিল।

পরিশেষে গোবিন্দবাবু বলেছেন, "ভাষার জোরে গোটা বইটাকে হেয় প্রতিপন্ন করার কোনও প্রয়োজন ছিল না সমালোচক মহাশয়ের।"

(শেষাংশ ১১৪ পৃষ্ঠায়)

গ্রন্থ সমালোচনা

দেবায়তন ও ভারতসভ্যতা ॥ শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ কলিকাতা ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় , ১৯৫৭ ॥ মূল্য ২০৲ টাকা ॥

মহা-ভারতের অন্তস্তলে যুগযুগান্ত ধরিয়া প্রবহমান তাহার আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার অভিব্যক্তি রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার প্রাচীন দেবালয়ের স্থাপত্যে। স্থাপত্যবিশারদ শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সত্যাগ্রয়ী ব্রহ্মচারীর ন্যায় সশ্রদ্ধ অন্তরে দীর্ঘদিন ভারতের বিভিন্নস্থান পর্যটন করিয়া তাহার সাংস্কৃতিক জীবনের এই শাশ্বত ধারাটিকে উপলব্ধি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সদ্যঃ-প্রকাশিত 'দেবায়তন ও ভারতসভ্যতা' গ্রন্থ তাঁহার এই ঐকান্তিক নিষ্ঠার স্বাক্ষর বহন করে। এই ধরণের গ্রন্থ-প্রণয়ণে শ্রীশবাবুর অধিকার সর্বজনস্বীকৃত।

বহুচিত্র-শোভিত এই গ্রন্থ তথ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। আলোচিত বিষয়বস্তু ব্যাপক পরিধিতে পরিব্যাপ্ত। এই বহুধাব্যাপ্ত আলোচ্যবস্তু গ্রন্থকারের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে।

আপাতঃদৃষ্টিতে গ্রন্থখানিকে যতটা বৃহৎ মনে হয় বস্তুতঃ ততটা নহে। গ্রন্থের প্রারম্ভে 'প্রস্তাবনা', 'ভূমিকা', 'অবতরণিকা', 'গ্রন্থকারের পরিচয়' প্রভৃতি প্রশংসাপত্রগুলি এবং দীর্ঘ 'গ্রন্থকারের নিবেদনের' কথা বাদ দিলে এবং গ্রন্থ শেষে চিত্র-বিবরণী ও নির্ঘণ্টপত্রের কথা ছাড়িয়া দিলে গ্রন্থের মূল অংশ ১৪৬ পৃষ্ঠার বেশী নহে। এই স্বল্প-পরিসরের মধ্যে গ্রন্থকার এত অধিক বক্তব্যের স্থান-সংকুলান করিতে যাইয়া সাধারণ পাঠকের পক্ষে কিঞ্চিৎ জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছেন।

'বৈদান্তিক ভারতের ধর্মময় কর্মজীবনের বর্তমান যুগোপযোগী নববিকাশ-প্রয়াস' এই গ্রন্থরচনায় গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ ধরণের জনপ্রিয় গ্রন্থ রচনা নয় ; আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহা নয়ও। অথচ কল্পনা, প্রবাদ, কিংবদন্তী

ইত্যাদি ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যের সহিত এমন জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে যে—গ্রন্থখানি সর্বাংশে প্রামাণ্য-গ্রন্থের মর্যাদায় উন্নীত হইতেও পারে নাই।

বর্তমান ভারতে প্রাচীন হিন্দুযুগের মহান্ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও তাহার স্থাপত্যকলা, নগর-নির্মাণপদ্ধতি ও উদ্যান পরিকল্পনা পুনরুজ্জীবিত করিবার একাগ্র বাসনা গ্রন্থখানিকে যদিও স্থানে স্থানে প্রচারধর্মী করিয়া তুলিয়াছে তথাপি এই গ্রন্থ প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের এক গৌরবমণ্ডিত অধ্যায়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি নিশ্চিতভাবে আকর্ষণ করিবে। এই সুমহান্ দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল গ্রন্থকার পাঠকের শ্রদ্ধা সহজেই আকর্ষণ করিবেন সন্দেহ নাই। (অরুণ চৌধুরী)

(১১২ পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু কী ভাবে তা বুঝিয়ে বলেন নি। যাই হোক, আমার শেষ বক্তব্য হল এই যে আমি গোটা বইটিকে Reference work সম্বন্ধে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত জ্ঞান অন্বেষক গ্রন্থ হিসাবে বিচার করেছিলাম, এবং সেই কারণেই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকক্রমে এই বিষয় অবতারণা করেছিলাম যে ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরণের গ্রন্থের কি আদর্শ হওয়া উচিত। গ্রন্থের মুখবন্ধে যদি জানানো হত যে এ বই ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা পাশোপযোগী ক্লাস-নোটস্, তাহলে আমিও বইটিকে সেইভাবে বিচার করতাম।

আদিত্য ওহদেদার

সম্পাদকীয়

৫ পাউণ্ডে কত টাকা ?—৬৬৲ টাকার কিছু বেশী। গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়ে তাগাদা পাবার সাত দিনের মধ্যে যদি সে-বই ফেরত না আসে তবে যদি সে-পাঠককে ৫ পাউণ্ড, এবং তার পরবর্তী প্রতিদিনের জন্যে ১ পাউণ্ড হারে জরিমানা দিতে হয়—তা'হলে কেমন হয় বলুন ত ?

আপনি যদি উদারপন্থী হোন তো বলবেন—এ বড্ড বাড়াবাড়ি। যে-যুগে আমরা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সেবাকে আপামর জন-সাধারণের মধ্যে অবাধভাবে ছড়িয়ে দিতে চাইছি, যে-যুগে গ্রন্থব্যবহারের সুযোগকে সকলের পক্ষে সহজলভ্য করে তুলবার ব্রত গ্রহণ করেছি—বিংশতিশতাব্দীর সেই, উদার দৃষ্টিভঙ্গীর যুগে বাস করে পাঠকের এই সামান্য' ত্রুটিটুকুর জন্যে এত বড় শাস্তির ব্যবস্থা করা কোনও মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। এটা মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

পাঠক পাঠের প্রেরণায় গ্রন্থাগার থেকে বই নেবেন; পড়বেন; পড়া হয়ে গেলে ফেরত দেবেন। তাঁদের পাঠের এটুকু স্বাচ্ছন্দ্য বিধান না করলে তাঁদের শুভবুদ্ধির উপর এটুকু আস্থা না রাখলে গ্রন্থাগারের প্রতি তাঁদের সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠবে না, সার্থক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পথ সুগম হবে না।

সব বই তো আর মাপজোখ করা সময়ের মধ্যে পড়ে শেষ করা যায় না। তারাশঙ্করের 'কবি' পড়ে শেষ করতে আপনার যে-সময় লাগে নীহার রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' নিশ্চয়ই সে-সময়ে পড়ে শেষ করতে পারবেনা না। পাঠের দ্রুততা একদিকে যেমন গ্রন্থের আকৃতি ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, অপর দিকে তেমনি নির্ভর করে পাঠক বিশেষের সময়-সুযোগ এবং অভ্যাসের উপর। আপনি পাঁচটা কাজ নিয়ে থাকেন, রুজি রোজগারের ধান্দা আছে, ছেলে-পুলের সংসারে হাজার রকমের ঝামেলা আছে; এরই মধ্যে আপনার মনে জ্ঞানআহরণের যে ক্ষুধা রয়েছে তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা না করে দাবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করাটাই কি যুক্তিসহ ? মোটা জরিমানার ভয় দেখালে আপনি ছোট খাটো উপন্যাস ছাড়া অন্য বই নেওয়া প্রায়ই নিরাপদ বোধ করবেন না; এমন কি প্রয়োজনবোধে আপনাকে পরীক্ষার্থী ছাত্রের মত রাত জেগে পড়ার অভ্যাসও হয়ত আয়ত্ব করতে হতে পারে; আর তা' সম্ভব না হলে গ্রন্থাগারের বই নেওয়াই ছেড়ে দিতে হবে।

অতএব, এত মোটা হারে জরিমানা ধার্য করা তো উচিৎ নয়-ই বরং যেসব

গ্রন্থাগারে দু-পয়সা—এক আনা হারে জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে সম্ভবমত তা-ও বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

এ-ই যখন আপনার মত। তখন স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার ২১-৮-৫৭ তারিখের সম্পাদকীয় স্তম্ভে ইংল্যাণ্ডের লণ্ড ঈটন পাবলিক লাইব্রেরীতে বর্তমানে প্রচলিত সপ্তাহে ১ পেনি হারের পরিবর্তে ৫ পাউণ্ড হারে জরিমানা ধার্য করার সংবাদ পড়ে আপনি নিশ্চয়ই মর্মাহত হয়েছেন।

গ্রন্থাগার সম্পর্কে ইংরেজ জাতির উদারতা তো নেহাৎ উপেক্ষনীয় নয়। তবুও কত তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে যে আজ লণ্ড ঈটন পাবলিক লাইব্রেরীই শুধু নয় ইংল্যাণ্ডের অন্য আরও অনেক গ্রন্থাগার দীর্ঘ দিনের প্রচলিত জরিমানার হারের পরিবর্তনের কথা ভাবছে তা' সহজেই অনুমেয়।

এই ধরণের তিক্ত অভিজ্ঞতা শুধু ইংল্যাণ্ডে কেন, আমাদের দেশের গ্রন্থাগারিকদের ভাণ্ডারেও ইতিমধ্যে কম জমা হয়নি। আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারের কথাই ধরুন: গ্রন্থাগারিক শ্রীকেশবন কারুর চেয়ে কম উদারপন্থী নন। জাতীয় গ্রন্থাগারে এসে কিছুদিনের মধ্যে তিনি এই জরিমানা আদায়ের 'মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা' রদ করে দিলেন। ফল হ'ল চমৎকার! রাতারাতি বহু পাঠকের গ্রন্থ-প্রীতি এমনই বেড়ে গেল যে—যে-বই যায় মাসের পর মাস তা' আর ফেরত আসে না! তাগাদার পর তাগাদা দিয়েও যখন কোনই ফল হল না—তখন জরিমানা পদ্ধতি পুনর্বহাল হল। সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজির মত বই সব ফেরত হতে লাগলো!

জাতীয় গ্রন্থাগারের বর্তমান জরিমানার হার যাঁদের খুব বেশী গায়ে লাগেনা এমন দু'একজন পাঠকের কথা শুনেছি: তাঁরা পরীক্ষার মুখে দামী দামী বই নেন; মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও ফেরত দেননা, বলেন—জরিমানা দু'চার টাকা যা' লাগে দেওয়া যাবে, কিন্তু পরীক্ষা শেষ না হতে বই কিছুতেই ফেরত দেওয়া চলবে না।

এ-সব দেখে শুনে কাল যদি আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারও লণ্ড ঈটন পাবলিক লাইব্রেরীর পদাঙ্ক অনুসরণের কথা ভাবতে শুরু করেন তাহলে কেমন হয়?

গ্রন্থাগার

৭ম বর্ষ] ভাদ্র : ১৩৬৪ [৫ম সংখ্যা

বইএর আঙ্গিক বিভ্রাট

বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে নূতনত্বের এবং বৈচিত্র্যের আমদানি করেছে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা। সস্তা দামের বই থেকে মনোহর গ্রন্থ সবেতেই কত রকমের কারিকুরি। শুধু বাঁধাই এর অভিনবত্ব কিম্বা চটকদার মলাটেই নয়, অঙ্গ-সজ্জার রকমারি কেরামতি দেখেও অবাক। এই বৈচিত্র্যের ঢেউ এসে অন্ততঃ বাংলা বইএর বাজারে লেগেছে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে ছোটদের বইএ এই মার্কিনী জমকালো ঢং লক্ষ্যনীয়। পুরানো ধাঁচে কিম্বা নূতনতম কায়দায় অক্ষর ঢালাই করে চিত্রে বর্ণে অভিনব ধারা আবিষ্কার করে তাঁরা পাঠক মহলের মনোরঞ্জন করতে চান। অনেক সময়ে অভিনবত্বের জোয়ার গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের 'একটা নতুন কিছু করো'র পর্যায়ে ঠেকে। সেদিন একখানা বই হাতে এল, নাম-ধাম-গোত্র নিম্নরূপ :

You and atomic energy and its wonderful uses, By John Lewellen, drawings by Lois Fisher. Children's Press, Inc. (copy right 1949)। লক্ষ্যনীয়, বইটিতে প্রকাশকের নাম এবং কপি রাইট তারিখ দেওয়া থাকলেও কোন শহর থেকে প্রকাশিত তার উল্লেখ নেই। (অবশ্য Printed in U. S. A. লেখা আছে)। কিন্তু উল্লেখযোগ্য, বইটিতে পৃষ্ঠাঙ্ক নেই,—সমগ্র বইএর কোনও অংশেই নয়। এ সবের নির্দেশ আছে জ্যাকেটে ;—শিকাগো, ৪২ পৃষ্ঠা, বোর্ড (বাঁধাই), (মূল্য) ৬০ সেন্ট। দামটা জ্যাকেটে লেখা তাবৎ ইংরেজি বইএর রেওয়াজ। হয়তো এই অনুকরণেই বিশ্বভারতী প্রকাশিত বইএর দাম আজকাল পুস্তকের শেষে বাঁধাইএর পিছন দিকে লেখা হয় ; এতে চট করে দামটা দেখে নিতে সুবিধে হয়, বিশেষ করে বিক্রেতার পক্ষে।

উক্ত বইটির বেলায় কিন্তু অসুবিধা অনেক, বিশেষ করে গ্রন্থাগারের পক্ষে এবং দপ্তরীর তরফে। ক্যাটালগ করার সময়ে না হয় আপনি জ্যাকেটের নির্দেশ

অনুযায়ী লিখে রাখলেন কোথায় প্রকাশিত, কত পৃষ্ঠা ; যে কোনও বইএর বেলাতেই তা করতে হয়। পড়ুয়ার তরফ থেকে খুঁটিনাটি জানতে হলে সাধারণত বই ছেড়ে ক্যাটালগের স্মরণ নিতে হয় না,—যেটা এ বইটির বেলায় অনিবার্য। অসুবিধা হয় পাতার হিসাব করতে গিয়ে। পড়ুয়ার কাজের জন্য পত্রাঙ্ক দরকার। আপনি যদি বইএর কোনও অংশ উল্লেখ করতে চান তবে পৃষ্ঠাও উল্লেখনীয়। এক্ষেত্রে যদি সে রকম দরকার পড়ে তবে পংক্তি গুণে নেবার মতো পৃষ্ঠাও গুণে নিতে হবে। কিম্বা ধরুন আধুনিক কায়দায় বইএর পৃষ্ঠা না কেটে বই বার করা হয় বলে যেমন গ্রন্থাগার কর্মীর কর্তব্য পাতা কেটে রাখা, তেমনি তাঁকে পত্রাঙ্কও লিখে রাখতে হবে সারা বই জুড়ে। সবচেয়ে অসুবিধা বাঁধাবার বেলায়, কারণ বইটিতে পত্রাঙ্ক যেমন নেই, সিগনেচার চিহ্নও নেই। তবে মার্কিনী পকেটের অনুপাতে বইটির যা দাম তাতে আবার বাঁধানোর থেকে নূতন আরেকটা কিনে নেওয়া অনেক সস্তা। কিন্তু এই নূতন কায়দা অন্য কোনও বৃহৎ গ্রন্থে সংক্রামিত হতেই বা কতক্ষণ ?

বইএর আইন অনুযায়ী বই প্রকাশিত না হলে একটু অস্বস্তি ভোগ করতে হয় বৈকি, বিশেষ গ্রন্থাগারিককে। বাংলা বইএর বাজারে একটা নূতন ধারা আজকাল চালু হয়েছে। বইএর ধরণ বা গড়নের একটা যে সাধারণ নিয়ম আছে সেটা সব সময়ে মেনে চলা হয় না। ইংরেজি বইএর বাজারে এটা তত বেশি চোখে না পড়লেও এই অভিনবত্বের সূত্রপাত সাগরপারে। প্রকাশ বিজ্ঞানের ঢালা পথে চললে আমরা বই খুললেই নামপত্র, পরিচয়পত্র এবং প্রকাশনার খুঁটিনাটি, সূচীপত্র ইত্যাদি যেভাবে পাবার ভরসা রাখি, নূতনত্বের দাবীতে সেই বাঁধা সড়ক ছেড়ে একটু এপাশে ওপাশে চলতে হচ্ছে। প্রকাশকের লক্ষ্য বইটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে সকলের নজরে ধরে দেওয়া, যাতে প্রথম দর্শনেই বইটি ক্রেতার ভাল লেগে যায়। কিছুকাল আগেও বই খুললেই দেখা যেত গ্রন্থের যাবতীয় বিবরণ মায় মূল্য সমেত সবই পরিচয় পত্রে বা টাইটেল পৃষ্ঠায় উল্লিখিত। এখন সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য নানারকমভাবে বইএর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাজানো হচ্ছে। সিগনেট প্রেসই বোধ হয় প্রথম ব্যাপকভাবে এটা শুরু করে, এবং দেখতে পাই আজকাল বাজারের বেশির ভাগ বইএরই তথ্যপঞ্জী থাকে পরিচয়পত্রের অপর পৃষ্ঠায়। এবং সেখানে প্রকাশক, শিল্পী, মুদ্রক থেকে শুরু করে দপ্তরী পর্যন্ত পরম্পরাক্রমে স্বীকৃতি পেয়েছে। বইএর তথ্য সন্ধানে এটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। ক্রমে বইকে আরও সুন্দর করবার দিকে

প্রকাশকদের নজর গেল এবং কে কত সুন্দর অঙ্গসজ্জা করতে পারে তার প্রতিযোগিতা শুরু হ'ল প্রকাশকমহলে। প্রচ্ছদসজ্জায় বৈচিত্র এবং রুচি বিকাশের পথ খুঁজল। আপনি বই হাতে নিয়ে এখন আন্দাজেই বলতে পারেন এটি সিগনেটের বই, এটি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড অথবা বেঙ্গল পাবলিশার্সের, ওটি ক্যালকাটা বুক ক্লাব বা নাভানার। অঙ্গসজ্জার বহু পুরস্কার এল বাংলা দেশে।. আমাদের ভাল লাগল সিগনেটের রুচি তার বহুবিধ বইএ, "প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প" প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে নাভানার উৎকর্ষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের "চেনামহল", "মলাটের রঙ", শচীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের "সমুদ্রের গান" প্রভৃতি ক্যালকাটা বুক ক্লাব প্রকাশিত বইএর প্রচ্ছদসজ্জাব অভিনবত্ব,—যার জন্য মনীন্দ্র মিত্র প্রমুখ উৎসাহী শিল্পী এবং সত্যজিৎ রায় প্রমুখ রুচিবান থাকিয়ে প্রশংসাহ'।

বই সম্বন্ধে আজকালকার সমালোচককে একথা অন্ততঃ বলতেই হ'বে, ছাপা, বাঁধাই উৎকৃষ্ট—অঙ্গসজ্জা নিখুঁৎ। নূতনত্বের বন্যায় কি রকম বই আমাদের হাতে ভেসে আসছে, ইতস্ততঃ অনায়াস দৃষ্টিপাতেই তার নজির মিলবে। এবং দেখতে পাব, এর ফলে বইএর থেকে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ পড়তে বসেছে ; পাঠক দেখছেন, কষ্ট করে না পড়লে বিষয়ের বোধ লাভ হয় না। বিভ্রান্ত বোধ করেন গ্রন্থাগারিক। যেমন ধরুন, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের দু'টি গল্পগ্রন্থ, 'প্রচারিক' প্রকাশিত 'একূল ওকূল' এবং ক্যালকাটা বুক ক্লাব প্রকাশিত 'মলাটের রঙ' ; বই দু'টিতে সূচীপত্রের বালাই নেই, ভিতরের কোনও পাতায় বইএর বা গল্পের নাম, অর্থাৎ রানিং টাইটেল নেই। কিম্বা ধরুন, নতুন সাহিত্য-ভবন প্রকাশিত সমুদ্রগুপ্তের 'শহর কলকাতার আদি পর্ব' - যা'তে অধ্যায় বিভাগ থাকলেও সূচীপত্র বা রানিং টাইটেল নেই। সতারত লাইব্রেরী প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'উষালগ্ন' অথবা রমাপদ চৌধুরীর 'ভ্রমরা ঝিনির মেলা', ন্যাশনাল পাবলিশার্স প্রকাশিত সরোজ আচার্যের প্রবন্ধগ্রন্থ 'বই পড়া' ;—এগুলিতে পত্রাঙ্কবর্জিত সূচীপত্র আছে, কিন্তু বইএর ভিতরে টানা নামাঙ্ক (রানিং টাইটেল) নেই। সুতরাং গল্পবিজ্ঞপ্তি ছাড়া সূচীপত্রের সার্থকতা নেই। আবার দেখুন, সিগনেট প্রেসের বই জীবনানন্দ দাশের 'কবিতার কথা' এবং সুকুমার রায়ের 'বর্ণমালা তত্ত্ব', অথবা 'স্বাক্ষর' প্রকাশিত অশোক মিত্রের 'পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলা' এবং 'ভারতের চিত্রকলা',—এই বইগুলিতে সূচীপত্র আছে, তা'তে পত্রাঙ্ক নির্দেশও আছে, কিন্তু টানা নামাঙ্ক (রানিং টাইটেল) নেই।

ইংরেজি বইতেও এ ধরণের নজির আছে। যেমন লণ্ডনস্থ Secker &

Warburg প্রকাশিত George Orwellএর বই Animal Farm, যা'তে রানিং টাইটেল নেই। মস্কো এবং পিকিং থেকে আজকাল বাজারে যে সব বই আসে তার মধ্যে বেশির ভাগ বই খুললেই দেখা যায় সূচীপত্রাদি পরিপাটিভাবে থেকেও রানিং টাইটেল নেই। ফরাসী বা অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষার বইএর বেলায় এ ব্যাপার আরও ব্যাপক। টাইটেল পৃষ্ঠা ছাড়া আর কোথাও পুস্তকের নাম গন্ধ পাই না। যেমন, রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে Amsterdam থেকে W. Versluys প্রকাশিত Frederik Van Eeden কৃত Huis en Wareld ; Editions du Seuil, Paris প্রকাশিত Pierre Teilhard de chardin এর La Vision du Passe, ইত্যাদি। ইংরেজি উল্লেখযোগ্য বইএর মধ্যে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত Doubleday & Co.-র বই Andre Malraux—কৃত 'The Voices of Silence', Museum of Modern Art-এর বই Alfred J. Barr, Jr., কৃত 'Matisse, his art and his public', লণ্ডন থেকে প্রকাশিত Themes & Hudson-এর 'Picasso', প্রভৃতি বহু পুস্তকে এই ধরণের অসঙ্গতি দেখা যায়। Perkins প্রকাশিত সুখ্যাত বই Berthold Laufer কৃত 'Jade' দেখুন,—সূচীপত্র আছে, কিন্তু রানিং টাইটেলে শুধু মূল বইএর নাম, অধ্যায় নির্দেশ নেই। নিউইয়র্ক Pynson Printers প্রকাশিত Dard Hunter-এর বই Papermaking by hand in India গ্রন্থাগারবিশারদের লেখা হলেও টানা নামাঙ্ক বর্জিত। এধারে ১৯৪৮এ প্রকাশিত লখ্নৌ ঐতিহাসিকপরিষদের বই বাসুদেব অগ্রবালের Gupta Art বইটিতে ভিতরে কোনও টাইটেল পৃষ্ঠাই নেই। একমাত্র প্রচ্ছদ ভরসা।

নানাবিধ গ্রন্থের নাম করতে গেলে তালিকা লম্বা হ'তে থাকবে। এই সব বই হাতে এলে দেখতে বেশ ভাল লাগে, একটু কষ্ট করে গ্রন্থাগারকর্মী ক্যাটালগও করে ফেলেন। কিন্তু রেফারেন্সের প্রয়োজন হলে মুশকিলে পড়তে হয়। আপনি যদি নির্দিষ্ট কোনও গল্প প্রবন্ধ বা পরিচ্ছেদের বিশেষ কোনও অংশ দেখতে ন তবে খুঁজে বার করতে হ'বে। কিম্বা নিজেই একটা নির্দেশিকা বা পাঠসূচী তৈরী করে নিতে হ'বে। আপনি উল্লেখ করবার সময়ে একবার খুঁজে নিয়ে হিসাব করবেন, পাঠক তা পড়বার সময়ে আরেকবার খুঁজে নেবে। আরেক বিপদ, টাইটেল পৃষ্ঠা যদি কোনও ক্রমে একবার নষ্ট হয়ে যায় তবে বই পঙ্গু।

মানুষ একঘেয়েমি এড়িয়ে চলতে চায়, নূতনত্বের আমদানি করে। নূতনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার জন্য অনেক নূতন নিয়ম চালু করতে হয়। বই-এর বাজারেও অভিনবত্বের আমদানি হ'তে থাকবে, পরীক্ষা নিরীক্ষা চলবে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে গ্রন্থের মর্জি বুঝে গ্রন্থাগারিক ক্যাটালগিঙের নব নব সূত্র তৈরী করবেন।

বই পড়ায় নিষেধাজ্ঞা

মুরারি ঘোষ

এ খবর শুনলে হয়তো আশ্চর্য হবেন যে একদা চীনদেশে লুই ক্যারলের অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যাণ্ড বইটা বেআইনী করে দেওয়া হয়। ১৮৬৫ সালে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ইংলণ্ডে। আর ১৯৩১ সালে চীনদেশের হোনান প্রদেশের রাজ্যপাল আবিষ্কার করলেন যে এমন বই লেখা এবং পড়া দুই-ই মানুষের পক্ষে সমান হানিকর। নিষেধাজ্ঞা জারী করে রাজ্যপাল কারণ হিসাবে বিবৃতি দিলেন: "মানুষের মুখে জন্তুর ভাষা শোভা পায় না এবং মানুষ ও জন্তুকে সমপর্যায়ে তুলে ধরাও বিশেষ ক্ষতিকর।" (১) ১৮৯৮ সালে লুই ক্যারল মরজগৎ ত্যাগ করেছেন। বেঁচে থাকলেও এ ঘটনায় তাঁর হয়তো সবিশেষ ক্ষোভের কারণ জন্মাত না। বরঞ্চ তিনি হয়তো কিঞ্চিৎ গর্ববোধও করতেন। কেননা হিসেব নিয়ে দেখা গেছে দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের তালিকার মধ্যে এমন নাম সাতিশয় বিরল যাঁর কোন বই কোন না কোন সময়ে দুনিয়ার একস্থানে নিষেধাজ্ঞার পরোয়ানা লাভ করে নি। এ কোনো অত্যুক্তি নয় কেননা নিষেধাজ্ঞার পরোয়ানা সেক্সপিয়ার, গ্যয়টে, টলষ্টয়কেও বাদ দেয় নি। (২) এমন একটি বিধি নিষেধের পাকে বার্ণাড শ'ও একবার পড়েছিলেন ইটালিতে। ইটালির প্রচার দপ্তর থেকে ১৯৩৯ সালে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল শ'এর বই। শ' একা ছিলেন না। সেক্সপিয়রও ছিলেন, তাঁর সংগী। এমন খবর বার্ণাড শ' এর কাছে অতিশয় মুখরোচক। তিনি খবর জেনে বললেন যে এমনতর সংগী পেয়ে তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করছেন।

কখন যে কোন বই পৃথিবীর কোন দেশে বে-আইনী হয়ে যায় সে এক বিশেষ গবেষণার ব্যাপার। ১৯৫৩ সালেই যুক্তরাষ্ট্রের ইণ্ডিয়ানার এক টেক্সট্ বুক কমিশনার রবিনহুডের গল্প নিয়ে লেখা যাবতীয় বই স্কুল পাঠ্যের তালিকা থেকে তুলে দিলেন। অদ্ভুত এক কারণ দেখালেন, এই সমস্ত বই কমিউনিস্ট কার্যকলাপের সহায়তা করবে। সমাজ রক্ষক, ধর্ম রক্ষক আর রাষ্ট্র অধিনায়কেরা যে সরষের মধ্যেও ভূত দেখেন এমন উদাহরণ পৃথিবীর প্রতিটি দেশে সংখ্যায় সংখ্যায় মিলবে। ছাপার অক্ষরের মধ্যে কি যে মারাত্মক বিষ লুকিয়ে থাকে

যুগে যুগে একমাত্র তাঁরাই তা সশঙ্কিত চিত্তে আবিষ্কার করে এসেছেন। নইলে গালিভার্স ট্রাভেলের মত এমন উপাদেয় বই যখন ইংলণ্ডে প্রথম বেরুলো তখন তাতে লেখকের নাম অজ্ঞাত রাখতে হয়েছিল, আর তা ছাপাও হয়েছিল চুপিসাড়ে অপরিচিত এক-ছাপাখানা থেকে। ছাপার পর যা হবার তা হোল। কেননা সুইফ্‌ট্ সাহেব তাঁর রচনায় রাজসভা, রাজনৈতিক দল আর তাদের অধিনায়ক পণ্ডিতম্মন্য রাজনীতিবিদ নেতাদের যে অপরূপ চিত্র তুলে ধরেছিলেন তাহাই যথেষ্ট। ইংলণ্ডে যদি তখনো সেন্সরশিপ আইন চালু থাকতো তা হ'লে এ বইয়ের নিশ্চিত নির্বাসন ঘটতো। ইংলণ্ডের অভিজাতমণ্ডলীর সমস্ত অংশ থেকে প্রতিবাদের তীব্র ঝড় উঠেছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে ১৬৯৫ সালে ইংলণ্ডে বই সেন্সর করার আইন পার্লামেন্টে নাকচ হয়ে যায়।

ইংলণ্ডে এই বই প্রকাশনায় নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পেছনে যাঁরা উদ্যোগী ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান পুরুষ হলেন মিল্টন। মিল্টন এক বিরাট বিবৃতি তৈরী করেছিলেন পার্লামেন্টের উদ্দেশে। Areopagitica নামে তা প্রকাশিত। ইংলণ্ডের প্রথম মুদ্রাকর ক্যাক্সটনের ছাপাখানার কাজ সুরু হওয়ার সংগে সংগেই রাজকীয় নিষেধাজ্ঞা ছাপাখানার জগতে স্থায়ী হয়ে বসেছিল (১৪৭৬)। রাজকীয় নির্দেশ ব্যতিত কোন বই ছাপা হতে পারবে না এমন বিধিনিষেধ ইংলণ্ডে প্রায় দুশো বছর ছাপার জগতে অটুট ছিল। মিল্টন বিবৃতি তৈরী করেছিলেন Areopagitica, ১৬৪৪ সালে। বই লেখায় কণ্ঠরোধ করা স্বাধীনতার অভাব যে কোন লেখকের অপমৃত্যুর প্রধান হাতিয়ার। তাই মিল্টনের বক্তব্যের অনেক কঠিন কঠিন যুক্তি প্রয়োগের মধ্যে এমন কথাও বলা হয়েছিল: "And yet on the otherhand unlesse wariness be used, as good almost kill a man as kill a good Book; who kills a man kills a reasonable creature, God's Image; but he who destroys a good Booke, will kill Reason itselfe, kills the Image of God, as it were in the eye."

এমন কঠিন ভাষা সেদিন স্বাধীনতার পূজারী ক্রমওয়েলের সহ্য হয়নি। পার্লামেন্টকে লক্ষ্য করে এমন তথ্যপূর্ণ, যুক্তিপূর্ণ উপদেশ আর কখনো বর্ষিত হয়নি। তবু ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট আর ক্রমওয়েলের পরিষদ বর্গ এ বইয়ের ওপর নিন্দাসূচক প্রস্তাব নিয়েছিলেন। এই আশ্চর্য বিবৃতি রচনায় মিল্টন উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এর আগের আর এক ঘটনায়। মিল্টনের The Doctrine and Discipline of Divorce বইটা প্রকাশিত হবার সংগে সংগে পার্লামেন্ট কর্তৃক মিল্টনের ওপর সেন্সর করার নির্দেশ জারী হল। মিল্টনকে বলা হোল: as

one of the transgressors of law. এই আঘাতের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিলেন মিল্টন Areopagiticaয়। রচনার স্বপক্ষে তিনি বলেছিলেন : I wrote my Areopagitica, in order to deliver the press from the restraints with which it was encumbered.* ধর্ম, নীতি, সমাজ এমন কি রাজানুগত্যের যুক্তি দিয়ে সেন্সর করার সপক্ষে যে সমস্ত তত্ত্ব খাড়া করা চলে মিল্টন তা খান্ খান্ করে ভেঙে দিলেন। মিল্টনের এই 'ডিফেন্স' তখন কার্যকরী হয়নি বটে কিন্তু আরো পঞ্চাশ বছর বাদে এক অদ্ভুত পরিবেশে তা কাজে লাগলো। মিল্টনের এই রচনার পরেও তাঁর দুটো বই Eikonoklastes (১৬৪৯) আর Pro populo anglicano defensio (১৬৫১) লণ্ডনে উন্মুক্ত স্থানে সরকারী উদ্যোগে পুড়িয়ে দেওয়া হোল। প্রায় পঞ্চাশ বছর বাদে চার্লস ব্লাউন্ট নামে বৃটিশ পার্লামেন্টের এক হুইপ সদস্য বেনামে মিল্টনের রচনা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে ছোট ছোট দুটো পুস্তিকায় প্রকাশ করলেন। ১৬৯৩ সালে তখন এই চুরি ধরা পড়ে নি। তবু ব্লাউন্টের এই কাজে যথেষ্ট ফল দেখা দিল। ইংলণ্ডের মুদ্রাকর আর এই ব্যবসায়ীরা এক এক করে অনেক প্রতিবাদ পত্র পার্লামেন্টে দাখিল করলেন। দুবছর পরে লর্ডস্ সভার বিরোধিতা সত্ত্বেও ইংলণ্ডে কলমের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হোল। এই ঘটনাকে লক্ষ্য করে মেকলের বিখ্যাত উক্তি : "...... ......which was done more for liberty and for civilization than the great charter or the bill of rights."

কলমের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত থাকলে সংস্কৃতির অপমৃত্যু না হয়ে একটা জাত কেমনভাবে জেগে উঠতে পারে মিল্টন Areopagiticaয় তা অনবদ্য ভাষায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "Methinks I see in my mind a noble and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep, and shaking her invincible locks : Methinks I see her as an Eagle muing her mighty youth and kindling her undazzled eyes at the full midday beams. এমন কথা এমন সুরে মিল্টনের আগে কখনো শোনা যায় নি। মিল্টনের এই প্রত্যাশা ইংলণ্ডের ইতিহাসে কত গভীরভাবে সার্থক হয়েছে তা আমরা জানি।

কিন্তু কলমের এই স্বাধীনতা কোনকালেই ধর্মরক্ষক, সমাজরক্ষক বা জাতির অভিভাবকেরা ভালো চোখে দেখতে পারেন নি। এমন কি প্লেটোর মত মুক্তবুদ্ধি দার্শনিকও ডিমোক্রিটাসের সমস্ত রচনা পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এমন ঘটনা প্রাচীন ভারতেও ঘটেছে। আজ আমাদের বার্হস্পত্য দর্শনের

কোনো পুঁথি নেই। চার্বাকের দর্শন কথা জানতে হলে তাঁর বিরোধী পক্ষের মতবাদ থেকে পড়ে নিতে হয়। কিংবা লোক মুখে প্রচারিত কিছু প্রবাদবাক্যে তা বিকৃতভাবে কেমন করে ছড়িয়ে আছে তা জানতে হয়। ধর্মবিরোধী কথা যখনই উচ্চারিত হয়েছে সে যুগে তখনই ধর্ম তার উদ্যত তর্জনী খাড়া রেখে মূক করেছে সমস্ত বিরোধী মুখরতা। কণ্ঠরোধ করেছে বাক্যের স্বাধীনতার। প্রয়োজন হলে নিঃশেষ করেছে সমস্ত চিন্তাসম্পদ। কথিত আছে ডিমোক্রিটাস নাকি ৮০টা বই লিখেছিলেন। আজ তার একটারও অস্তিত্ব নেই কেন?

গ্যালিলিওর প্রথম বই বেরিয়েছিল Letters on the Sollar Spot ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে। কোপার্নিকাসের তত্ত্ব সমর্থন করে গ্যালিলিওর রচনা। কিন্তু সংগে সংগে গ্যালিলিওকে খৃষ্টধর্মবিরোধী মতবাদ প্রচারের জন্য অভিযুক্ত করা হোল। আর আশ্চর্য, ধর্মশাস্ত্র থেকেই উদ্ধৃতি দিয়ে গ্যালিলিও স্বমত সমর্থন করতে গেলেন। শাস্ত্রের যুক্তি ব্যবহার করতে তাকে নিষেধ করে দেওয়া হোল। পোপের আদেশে কার্ডিনাল বেলারমাইন গ্যালিলিওর বিচার করলেন। পাগলা কাজীব বিচারে ঠিক হোল, কোপার্নিকাসের বই আর সাধারণকে পড়তে দেওয়া হবে না। এ বইয়ের সংস্কার দরকার। খুব সম্ভব সে বই ১৫৪১ সালের লেখা কোপার্নিকাসের De Libris Revolutionum Narratio Prima। খৃষ্টীয় পণ্ডিতেরা সেই সব জায়গায় বিশুদ্ধ পাঠ দিলেন, 'পৃথিবী নিশ্চল—তার কোনো গতি নেই', যেখানে যেখানে পৃথিবীর গতিময়তার কথা কোপার্নিকাস বলেছিলেন। গ্যালিলিওর প্রথম বিচারের চার বছর বাদে এই বিশুদ্ধ বই বেরুলো। তবু আগুন আর কতদিন ছাই চাপা থাকে। ১৬ বছর যেতে না যেতেই গ্যালিলিও প্রকাশ করলেন তাঁর মারাত্মক বই: Dialago Sopra i due Massimi Sistemi del Mondo, 1632। এই বইয়ের তিন চরিত্র গভীর বিতর্কে মগ্ন। একজন কোপার্নিকাসের তত্ত্বে বিশ্বাসী, আরেকজন ভয়ানকভাবে কোপার্নিকাস বিরোধী, অন্যজন এক নিরপেক্ষ ব্যাখ্যাতা মাত্র। বিতর্কে লেখক দেখিয়েছিলেন যে আসলে কোপার্নিকাস বিরোধী পণ্ডিতটি এক অত্যন্ত নির্বোধ মূর্খ যিনি অতি সাধারণ যুক্তিও অনুধাবন করতে পারেন না। এই চরিত্রের মুখে তিনি পোপের যুক্তি বসিয়েছিলেন। ফলে গ্যালিলিওর জীবনে সেই দুর্ভাগ্য নেবে এল। পোপের আদেশে নিষেধাজ্ঞার পরোয়ানা নিয়ে সেই বই সম্পূর্ণ বেআইনী হয়ে গেল। সত্তর বছরের পক্ককেশ বৃদ্ধ অমানুষিক শাস্তির ভয়ে কাঠগড়ায়

হাঁটু গেড়ে বসে বললেন : 'পৃথিবী কখনোই সূর্যের চারিদিকে ঘোরেনি, ঘুরবেও না'।

বই পড়ায় নিষেধাজ্ঞা মোটামুটি তিন রকমের। নৈতিক, রাজনৈতিক ধর্মসংক্রান্ত। মধ্যযুগে প্রবল প্রতাপ ছিল ধর্মের। তারও আগে নৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছিল স্পার্টায়। খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতকে স্পার্টায় কবিতা পাঠের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। অদ্ভুত যুক্তি ছিল, কবিতা পাঠ নাকি উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অসংযম বাড়িয়ে তোলে। অ্যাসকাইলাস, ইউরিপিডিস, আর অ্যারিস্টোফিনিসও স্পার্টার রাজকীয় বিরোধিতার মুখে পড়েছিলেন। এমন কি প্লেটোও অভিযোগ তুলেছিলেন : হোমারের ওডিসি অপরিপক্ক ছেলেদের চরিত্র নষ্ট করার মত বই।

মধ্যযুগে সাধারণের নৈতিক চরিত্রের ভার নিল চার্চের। যতদিন মুদ্রণযন্ত্র চালু হয়নি ততদিন চার্চ কর্তৃপক্ষের খাটুনি খুব বেশী ছিল না। প্রায় সমস্ত বইয়ের অনুলিপি করা হোত চার্চের Scriptorium গুলো থেকে। গীর্জার অনেক সাধু সন্ন্যাসী লিপি ধারণ করেই জীবন কাটিয়ে দিতেন। শিক্ষার প্রয়োজনে দরকারী সমস্ত বই, ধর্ম প্রচারের উপযোগী সাহিত্য সব কিছুই লেখা হোত চার্চের লিপিখানায়। দু একটা বিশ্ববিদ্যালয়েরও বই প্রকাশ করার ক্ষমতা ছিল। তাও কিন্তু সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল চার্চের। সেখানে বিশপের বা কার্ডিনালের অনুমোদন প্রয়োজন হত। এ ব্যবস্থা মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার হবার পরেও প্রায় তিনশো বছর সারা ইউরোপে চালু ছিল।

মধ্যযুগে কোন অ্যাসকাইলাস, ইউরিপিডিস বা ডিমোক্রিটাসের আবির্ভাবেরও সুযোগ ছিল না। চার্চের উদ্যত তর্জনী সমস্ত ধর্ম নিরপেক্ষ সাহিত্যকে দমিয়ে রেখেছিল। গুটেনবার্গের সাধ্য ছিল না যে বাইবেল ছাড়া তিনি অন্য কোন বই ছাপেন। ব্যবসার দিকে তাকিয়ে তাঁকে এমন বই বেছে নিতে হয় যা নাকি কোনদিন সেন্সরের কবলে পড়বে না। এবং যার নিত্য বাজার খোলা সমস্ত ইউরোপ জুড়ে। নইলে গুটেনবার্গ এমন কোন পরমপুরুষ ছিলেন না। বাইবেল ছাপার জন্যে বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া অর্থ ঋণ সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে নিতে তাঁর বিবেকে বাধে নি। তবে গুটেনবার্গ কোনদিন হয়তো ভাবতে পারেন নি তাঁর এই যন্ত্র একদা ধর্মের অধিকর্তাদের অনেক ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ মুদ্রণযন্ত্রের আবির্ভাব জ্ঞান চর্চার প্রসারে যে ভূমিকা নিয়েছে একদা মিশনারী ধর্মপ্রাণদের তা কাম্য ছিল না। ধর্ম

নিরপেক্ষ সাহিত্যের প্রসার সম্ভাবনায় তাঁরা সত্যিই শংকিত হয়ে পড়েছিলেন। ছাপা বইয়ের ওপর প্রথম সেন্সর অফিস বসলো গুটেনবার্গের শহরেই। মেইনৎসে, চার্চের উদ্যোগে। জার্মানীর সমস্ত মুদ্রণযন্ত্র চার্চের খবরদারীর মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করে দিলেন আর্চবিশপ বার্থোল্ড ফন হেনেবার্গ (১৪৮৪-১৫০৪)। তাঁরই নির্দেশে ছাপা বইয়ের ওপর প্রথম সেন্সর করা হোল ফ্রাঙ্কফুর্টে আর মেইনৎসে। ফ্রাঙ্কফুর্টে বসতো বইয়ের বিরাট মেলা চার্চ কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিতেন কোন কোন বই এই আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করা যাবে।

মুদ্রণযন্ত্রের প্রসারে জ্ঞানের দ্রুতবিকাশ সম্ভাবনায় চার্চেরই শংকিত হবার কথা আগে। কেননা মুদ্রণযন্ত্র চার্চকেই আঘাত করেছে বেশী। মুদ্রণযন্ত্র এ পর্যন্ত যত ধর্মীয় সাহিত্য ছেপেছে তার চেয়ে ঢের বেশী প্রকাশ করেছে ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য। সাধারণ মানুষের অধর্ম প্রবণতায় চার্চ ফাদাররা কোনদিন সুস্থির থাকতে পারেন নি। ইভের পতন থেকে সমগ্র মানবজাতির অধঃপতন সুরু হয়েছিল তার পরের ধাপই বোধ হয় এই মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার। না হলে গ্যালিলিওর Dialago যেদিন ছেপে বেরুলো সেদিন সারা ইউরোপে সাড়া পড়ে গিয়েছিল কেন? এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ভাষায়: A tumult applause from every part of Europe followed its publication and it would be difficult to find in any language a book in which animation and elegance of style are so happily combind with strength and clearness of scientific exposition (vol. 9)। কিন্তু এই tumult applauseএর কি মূল্য সেদিন দিয়েছিল চার্চ? কাঠগড়ার প্রাণান্ত প্রহসন থেকে গ্যালিলিওকে মুক্তি দিতে পারে নি ইউরোপ। এমন কি এই ডায়লাগোর ইংরাজি অনুবাদ যখন তিরিশ বছর পরে ইংলণ্ডে প্রকাশিত হোল তার কয়েক বছর বাদে লণ্ডনের বিরাট অগ্নিকাণ্ডে (১৬৬৬) এ বইয়ের প্রায় গুদামজাত সমস্ত কপিই পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। এ ঘটনাকে কি কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা বলে ব্যাখ্যা দেওয়া চলে? অনেক কিছু পুড়ে যাওয়ার সংগে পোপের নিষেধাজ্ঞা বহনকারী এই বইটাই একমাত্র বই যা সেদিন প্রায় সমস্ত খণ্ডই ভস্মীভূত হয়েছিল। অবশ্য ইংলণ্ডে প্রকাশিত হওয়ার পক্ষে এ বইয়ের কোন বাধা সেদিন ছিল না। ইংলণ্ড প্রোটেষ্টাণ্ট। এই প্রোটেষ্টাণ্ট ইংলণ্ড পরেও কেন এ বই পুনর্মুদ্রণ করার তাগিদ অনুভব করেনি।

মুদ্রণযন্ত্র হাতে থাকায় মধ্যযুগে সব চেয়ে সুবিধে হয়েছিল মার্টিন লুথারের। চার্চের সংস্কারে তাঁর বলিষ্ঠ মতবাদ সারা ইউরোপে ছড়িয়ে দিয়েছিল এই

মুদ্রণযন্ত্র। হাতের কাছে ছাপাখানা না থাকলে লুথারের পক্ষে সংস্কার আন্দোলন কতখানি সফল হোত তা আজ নিশ্চয়ই সন্দেহের বিষয়। লুথারের চার হাজার কপি Address to the German Nobility ৩ মাসে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল বাজার থেকে। আর নিউ টেস্টামেন্টের জার্মান অনুবাদ পাঁচ হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল নাকি ৫ দিনেই। একদিকে লোকপ্রিয়তা কিন্তু অন্য দিকে এর বিপরীত চিত্রও আছে। সেই একই বছরে পোপের আদেশে লুথারের যাবতীয় বইয়ের বহ্ন্যুৎসব হয়েছে ইটালীতে। এমন কি জার্মান সম্রাট ৫ম চার্লসও লুথারের বই গুদামজাত করতে আদেশ দিয়েছিলেন। সে যুগের 'বেষ্ট সেলার' লুথারের সমস্ত সাহিত্যের সামগ্রিক ফলশ্রুতি তাঁর সংস্কার আন্দোলনের সাফল্য। সুতরাং ছাপাখানা পোপের এবং সমগ্রভাবে অপ্রতিহত ক্ষমতা আর প্রভাব যতখানি ক্ষুণ্ন করেছে এমনটি আর কোথাও করে নি। খৃষ্টধর্ম আন্দোলনের একেবারে গোড়ার দিকে ধর্মের অধিনায়কেরা যথেষ্ট সচেতন হয়েছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ বাজে বইয়ের প্রকাশ যেন না ঘটে।

হয়তো খৃষ্টানরা আমাকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবেনা, কিংবা যদি মধ্য যুগ হোত তা হলে নিশ্চয়ই Witch craft এর অভিযোগে আমার শূলদণ্ড হোত যদি আমি বলতুম Apostlic Constitution মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় যতখানি হস্তক্ষেপ করেছে বা সাধারণের জ্ঞানার্জন স্পৃহায় যতখানি অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এমন দীর্ঘ, বিলম্বিত ও মারাত্মক বিরোধিতার কাহিনী ইতিহাসে আর মিলবে না। মোট ৮টা সংস্করণে এই Apostlic Constitution সমগ্র খৃষ্টীয় জগতের আচার অনুষ্ঠান, নিয়মনীতি, দৈনিক জীবনযাপন প্রণালী বেঁধে দিয়েছে। খৃষ্টীয় জগতে অবশ্য পালনীয় এই Apostlic Constitution এর নির্দেশ। এরাই নির্দেশ মানুষের চিন্তার স্বাধীনতায় সীমারেখা টেনে দেবার সর্বচেয়ে কার্যকরী যন্ত্র। চার্চের সীমানার বাইরের জগৎকে Apostlic নির্দেশ যতখানি ঘৃণা করে ভয়ও করে ততখানি। কেননা ধর্মের মহৎ শিক্ষার প্রয়োগে আর নিয়ত ধর্মহানির আশংকায় সাধারণ মানুষের কি অবস্থা হয়েছিল Bury তাঁর বিখ্যাত History of the Freedom of Thought বইতে তা বলেছেন : Men believed that they were surrounded by friends watching for every opportunity to harm them, that pestilences, storms, eclipses and famines were the work of devil, but they believed as firmly that ecclesiastical rites were capable of coping with these enemies.……(History of the Freedom of Thought : ৪৯ পাতা)।

সাধারণ মানুষকে বশ করার নানারকম কৌশল আছে ; তার সব কটাই বোধ হয় মধ্যযুগের চার্চ কাজে লাগিয়েছিল। কখনো পুণ্যার্জনের লোভ দেখিয়ে, কখনো বা পাপের ভয়, শাস্তিদানের ভয়, এমন কি অশরীরী প্রেতাত্মা ও ডাইনী জুজুর ভয় দেখিয়েও কাজ গুছিয়ে নিতে চার্চের কষ্ট পেতে হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য সহজেই সাধারণ মানুষকে চার্চের অধিকারের বাইরে টেনে নিয়ে যাবে ; নাস্তিক করে তুলবে ; এমন দুর্ভাবনায় বলপ্রয়োগের নীতিও বাইবেল থেকে উদ্ধৃত করা চলতো যা সাধু অগাস্টীন করেছিলেন : "Compel them to come in." তাই "অ্যাপস্টলিক কনস্টিটিউসনে" সরাসরি নির্দেশ ছিল খৃষ্টীয় ধর্ম সংঘের বাইরে রচিত কোন বই পড়া চলবে না। কেননা, "Since the scriptures suffice for the believer"। আর খৃষ্টীয় প্রথম শতকে এই কনস্টিটিউসন তৈরী। সাধু ক্লিমেন্ট (৯৫ খৃষ্টাব্দ) ছিলেন এর উদ্যোগী। আর এই উদ্যোগী পুরুষ প্রবরের পথানুসরণ করে চার্চ ফাদাররা বিভিন্ন দেশে কালে কালে নিষেধাজ্ঞার বিরাট বিরাট তালিকা প্রকাশ করেছেন। সেই তালিকায় স্থান পেয়েছে যাবতীয় ধর্মবিরোধী, ধর্ম-নিরপেক্ষ সাহিত্য কিংবা বিধর্মী রচিত সাহিত্য এবং পৃথিবীর আরো অনেক আশ্চর্য সাহিত্য কীর্তি। শুধু তালিকা প্রকাশ করেই তাঁরা দায় সেরে দিতেন না, বেআইনী সাহিত্য পাঠে নির্যাতনের ভয় দেখাতে হোত। রোম সম্রাট কনস্টানটিন, মধ্যযুগের দুই সাহিত্যিক Arius আর Porphyry রচিত বই রাখার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড বহাল করেছিলেন। পোপ প্রথম লিও (৪৪৬ খৃঃ) বেআইনী বইয়ের এক লম্বা তালিকা তৈরী করে আদেশ জারী করেছিলেন যে "Whoever owns or reads these books is to suffer extreme punishment." (Encyclopaedia of Social Science : Vol III)। পোপের কাছ থেকে যে সব নিষেধাজ্ঞার নির্দেশ এসেছে সময়ে সময়ে তার ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য তালিকা হোল পোপ জিলাসিয়াসের ৪৯৯ খৃষ্টাব্দের পরোয়ানা। এতদিনে চার্চ কর্তৃপক্ষ নিষেধাজ্ঞা জারী করার ব্যাপারে কিছুটা অ্যানার্কিক ও ইর্‌রেগুলার ছিলেন। ৪৯৯ খৃষ্টাব্দের নিষেধাজ্ঞা প্রথম 'প্যাপাল ইনডেক্স' নামে অভিহিত। তার পুরোনাম হ'ল : 'ইনডেক্স লাইব্রোরাম প্রহিবিটোরাম" (Index Librorum Prohibitorum), বিশুদ্ধ বাংলা অর্থ, 'বেআইনী বইয়ের তালিকা'।

এই 'ইনডেক্স প্রহিবিটোরাম' থেকেই বইয়ের জগতে পোপের অনুশাসনের এক কলঙ্কময় ইতিহাস আরম্ভ হল। এই ইনডেক্স এক অদ্ভুত তালিকা। সময় ও সুযোগমত বিশেষ নীতি মেনে কি না মেনে তার পছন্দ অপছন্দের কাহিনী

সমস্ত খৃষ্টান জগতে জড়িয়ে দিয়েছে। সমস্ত ইউরোপ জুড়ে ধর্মের সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্খা ছিল। এক নিটোল সাংস্কৃতিক ঐক্যে তার একান্ত প্রয়োজন। সংস্কৃতি জগতে একই মাপের জামা প্রত্যেকের গায়ে উঠবে। কেননা মননশীলতার দায় সাধারণ মানুষের নয়। গীর্জার স্ক্রীপটোরিয়ামে (লিপিখানার) তা চার্চ ফাদারদের সম্পত্তি। চার্চের নির্দেশ অমান্য করে বেআইনী মতবাদ যারা প্রচার করবে তাদের বিচারের জন্য ইন্‌কুইজিসন (Inquisition) প্রতিষ্ঠিত হোল। এ রকম একটি ইন্‌কুইজিসনে গ্যালিলিওর বিচার হয়েছিল।

চার্চের অধিকারে প্রথম আঘাত পড়লো, যেদিন ইউরোপে ছাপার অক্ষর নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু হল। বাইবেল দিয়ে সুরু হয়েছিল বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাইবেলের নিরঙ্কুশ একাধিপত্য ভেঙে চিন্তার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেই ছাপাখানার সার্থকতা। এতখানি অপ্রত্যাশিত ভবিষ্যতের কথা সেদিন চার্চ ফাদাররা ভাবতে পারেননি। নইলে গীর্জার স্ক্রীপটোরিয়ামের বাইরে সাহিত্য তৈরীর আদিম চেষ্টায় তাঁরা উদাসীন থাকতেন না। ইন্‌কুইজিসনের কাঠগড়ায় কষ্টার বা গুটেনবার্গকে নিশ্চয়ই হাজির করা হোত। ছাপার সমস্ত আয়োজন যখন তাঁদের মুঠোর বাইরে চলে গেছে, দেশে দেশে ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশে ছাপাখানার দেশীয় কাজ সুরু হয়েছে, ছাপা বইয়ের অপেক্ষাকৃত সুলভ সরবরাহ বণিকবন্ধু বাজার গড়ে তুলছে—তখনই কর্তৃপক্ষের নজর পড়লো এই নতুন আবিষ্কারের ওপর। দেখা গেল, কেবল বাইবেল তৈরী করার মহৎ উদ্দেশ্যেই এর ব্যবহার হয়তো হবে না—কেননা দুনিয়াতে তখনো দৈত্য-দানো আর অশরীরী প্রেতাত্মাদের প্রবল প্রতাপ। ১৪৮৫ সালে আর্চবিশপ বার্থোল্ড যে রাস্তা দেখালেন রোমের পোপ তা সাদরে গ্রহণ করলেন। ১৫ বছর বাদে পোপ আলেক্সাণ্ডার এক নির্দেশ দিয়ে সারা ইউরোপে ছাপা বইয়ের সেন্সর জারী করতে উদ্যোগী হলেন। বই ছাপা হবার আগে সমস্ত বই স্থানীয় চার্চের অনুমোদন লাভ করবে—এমন একটা বিধান সারা ইউরোপে চালু হোল। আর এই বিধান বাইবেলকেও রেহাই দেয়নি। ফ্রাঙ্কফুর্ট সেন্সরে প্রথম যে পরোয়ানা জারী হল তা বাইবেলের ভাষান্তর নিয়েই। ষষ্ঠদশকে রোম সম্রাট জাস্টিনিয়ান একবার নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন, গ্রীক আর ল্যাটিন ব্যতীত বাইবেলের অন্য ভাষান্তর চলবে না, তাকেই আবার নতুন করে প্রয়োগ করা হোল ১৫০১ খৃষ্টাব্দে। বাইবেল পড়তে হলে গ্রীক কিংবা ল্যাটিন ভাষাতেই পড়তে হবে।

ইংলণ্ডে কিন্তু উইলিয়ম টিণ্ডেল টেস্টামেন্টের অনুবাদ সুরু করে দিলেন।

চার্চ ফাদাররা রেহাই দিলেন না। টিণ্ডেল ইংলণ্ড ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে কোলোনে (Cologne) তাঁর বই ছাপার ব্যবস্থা করলেন। চার্চের লম্বা হাত তাঁকে সেখানেও তাড়া করে ফিরলো। জার্মাণীর ভর্মস (Worms) নগরীতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন তিনি। লুথারের সাহায্য পেলেন। সেখান থেকে ছাপা হয়ে টেস্টামেণ্টের অনুবাদ যখন পৌঁছালো তার সমস্ত ৬ হাজার কপির একটিও বইয়ের দোকানে গিয়ে উঠলো না কিংবা প্রথম ছাপা ইংরিজি বই হিসাবে আদৃতও হোলো না। অগ্নিদেবের লেলিহান জঠরে তার আশ্রয় হোল। তারপর দশবছর ধরে চার্চ খুঁজেছে টিণ্ডেলকে। টিণ্ডেল পালিয়ে বেড়িয়েছেন। এক বিশ্বাস ঘাতকতায় ধরা পড়লেন অ্যান্টওয়ার্পে। তাঁর বাইবেলের যে গতি হয়েছিল, আদেশ বিরোধীতার ফলে তাঁর সেই সাজাই হোল। প্রথম ছাপা ইংরিজি বইয়ের লেখককে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

তবু বাইবেলের বিভিন্ন ভাষানুবাদ দেশে দেশে চার্চ কর্তৃপক্ষকে উত্যক্ত করে তুলেছিল। ১৫৩৫ সালে কভারডেলের (Coverdale) ওল্ড টেস্টামেণ্টের ইংরিজি অনুবাদের সেই একই অগ্নিগর্ভ সমাধি ঘটলো। ফ্রান্সে রেনল্টের (Regnault) বাইবেল—কিংবা রোমে লুথারের বাইবেল অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়নি। পরে অবশ্য চার্চের অধিকার দেশে দেশে যখন সংকুচিত হ'য়ে গেছে তখন ধর্মের অনুমতি ব্যতিরেকেই বাইবেলের বিভিন্ন ভাষান্তর ঘটেছে। বাইবেলের বিভিন্ন অনুবাদ হয়েছে সংখ্যায় সংখ্যায়, লাখে লাখে। পৃথিবীতে অনুদিত বিশ্বস্ত বইয়ের মধ্যে বাইবেলের রেকর্ড আজো কেউ ভাঙতে পারেনি। সবচেয়ে আশ্চর্য যে এমন এক কর্মের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল সবচেয়ে কঠোর পরিশেষে পৃথিবীর জনমানসে তারই আবেদন সবচেয়ে মনোরঞ্জক হোল। বাইবেলের বিভিন্ন ভাষান্তর যখন আর কোন অনুমতির অপেক্ষায় ছিল না, তখন (হয়তো conscience clear রাখার জন্যেই) বিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে পোপ ত্রয়োদশ লুই এক ঘোষণায় প্রকাশ করলেন, বাইবেলের ভাষান্তর চলতে পারে।[৫]

বই পড়ার ওপর এমন অদ্ভুত সব নিষেধাজ্ঞার কাহিনী পাওয়া যাবে খৃষ্টীয় ইনডেক্সের ইতিহাসে। এমন সব বই ইনডেক্সের বেআইনী তালিকায় স্থান পেয়েছে যারা পৃথিবীর সেরা সাহিত্য কীর্তির অন্যতম। কয়েকটা নাম তুলে ধরলেই হয়তো ইনডেক্সের বিচার বোধের চরিত্র ধরা পড়বে। যেমন, বোক্কাসিওর দেকামেরণ, দান্তের মোনার্কিয়া, রেবেলের গারগাণ্টুয়া, বেকনের অ্যাডভান্সমেণ্ট

অব লার্নিং, দেকার্তের মেটাফিজিক্স, মিল্টনের প্যারাডাইজ লস্ট, লকের হিউম্যান আণ্ডারস্টাণ্ডিং, রিচার্ডসনের পামেলা, রুশোর সোশ্যাল কনট্রাক্ট, দিদেরোর এনসাইক্লোপিডিয়া, কাণ্টের ক্রিটিক, টমাস পেনের সমস্ত বই, হুগোর নোতরদাম, আর মার্ক্সের যাবতীয় বই। ১৫৫৯ সাল থেকে ইনডেক্সের বিস্তারিত খবরদারী আরম্ভ হয়। বইয়ের জগতে তার অভিভাবকত্ব অনেকদিনই চালু ছিল। আমাদের নিশ্চিত সৌভাগ্য যে ইনডেক্সের বিচার বুদ্ধির ওপর নির্ভর করেই কলমের অগ্রগতি থেমে থাকেনি। চিন্তার স্বাধীনতা ছাপাখানার মাধ্যমে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ইনডেক্সের নির্দেশ-সাধারণে না মানলেও এখনো তার তালিকা বেরোয়। তবে এ তালিকা অসম্পূর্ণ। কেননা, দুনিয়ায় আজ পাঁচশো কোটির ওপর বই ছাপা হচ্ছে এক বছরেই। আর এই বই একবছরে কেন দশবছরে প্রতিজনে প্রতিবছরে পাঁচশোটা বই পড়েও হাজার পণ্ডিতে তা শেষ করতে পারবে না। তবু যতদূর সম্ভব নিষেধাজ্ঞার নোটিশে তাদের নাম ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। কিছু কিছু ঢালাও নির্দেশ দেওয়া আছে, যেমন, মার্ক্সীয় সাহিত্য ধর্মমতে বেআইনী, তাদের নাম না তোলাই ভাল।

ধর্মকে নাকচ করেছে মার্কসবাদ। অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বুদ্ধিবাদের পথানুসরণ করেই মার্কসবাদের চরম আঘাত ধর্মের ওপর। তাই মার্কসবাদের দেশ রাশিয়াতেও ধর্মীয় সাহিত্যের ওপর বিশেষ নিষেধাজ্ঞা জারী। অবশ্য রাশিয়ার সেন্সরের মূল কাঠামো রাজনৈতিক। আধুনিক বইয়ের জগতের বিশেষ সমস্যা হোল রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা। রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞার রীতি এবং প্রকৃতি দুইই জটিল। এবং সময়ে সময়ে বিশেষ কারণে তা অপরিহার্যও বটে। রাশিয়ার সপক্ষে ওকালতী করতে বসে এ কথা আমি বলছি না। আধুনিক পৃথিবীর রাজনৈতিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব, রাজনীতির জটিল প্রকৃতি প্রায় সমস্ত সমাজ সম্পর্কিত ধারণা জটিলতর করে তুলেছে। অবশ্য মার্কসবাদ কথিত র‍্যাশানালিজমের পথে চলতে গিয়ে অনেক সামাজিক মূল্যায়ণ দুর্বোধ্য করে তোলার দায়িত্ব রাশিয়ার ওপরেই পড়ে। তবু রাশিয়ার বর্তমান সেন্সরশিপ এক বিশেষ রাজনৈতিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি যার উৎপত্তি অষ্টাদশ শতকেই এবং এর সুরুর কথা বলতে গিয়ে স্টাইনবার্গ বলেছেন : The American and French Revolution naturally increased the uneasiness of the ruling powers, and books and pamphlets dealing with those revolutionary movements were usually forbidden with dis-

crimination as to the political attitude of the writer.* বিশেষ করে Montesque, Rousseu, Voltair আর Rebelai রচিত সাহিত্য সামন্ত প্রধানদের অস্বস্তি বাড়িয়ে তুলেছিল ঠিক যেমন ধনতান্ত্রিক প্রধানদের সবিশেষ বিরক্তির কারণ হোল মার্কসবাদ ও রাশিয়ার সাহিত্য। আর এ নিয়ে বিকট উন্মাদের মত আচরণ করেছেন হিটলার।

১৯৩৩ সালের দশই মে বার্লিনের সেই কলঙ্কময় রাত্রি। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি-পাতের মধ্যে ৪০ হাজার দর্শক সমবেত এক বিরাট বহ্ন্যুৎসব প্রত্যক্ষ করার জন্যে। জড়ো করা হয়েছে ২৫ হাজার বই। যাদের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব বার্লিন থেকে নিশ্চিহ্ন করা হবে। সেই সব হতভাগ্য লেখকেরা হলেন: গোর্কী, স্টিফান্‌ৎসোয়াইগ্‌, মার্কস্‌, লেনিন, ষ্টালিন, ফ্রয়েড, জ্যাক লণ্ডন, ভীসারমান, লুডভিগ্‌, ট্রট্‌স্কি, লেসিং, হাইনে, টমাস্‌মান্‌, আইন্‌ষ্টাইন্‌, বারবুসে, লাক্সেমবার্গ, আপ্টন সিন্‌ক্লেয়ার এবং আরো অনেকে। ঘটনার শেষে জার্মানীর গণশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ গোয়েবল্‌স্‌ এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় জনতার প্রতি আবেদন জানিয়ে বললেন: "অ-জর্মান সাহিত্য যে আগুনে আজ পুড়ে ছাই হোলো—সেই আগুন তোমাদের হৃদয়ে স্বদেশপ্রীতির নিদর্শন হয়ে প্রজ্জ্বলিত থাকুক।" আর এই উন্মাদের কাণ্ড সমস্ত জার্মানীতে সংক্রামকের মত ছড়িয়ে পড়লো। মিউনিকের স্কুলছাত্রেরা দোকানে দোকানে হানা দিয়ে সেই সব হতভাগ্য লেখকদের বই টেনে বার করে পুড়িয়ে দিতে সুরু করলো। সারা জার্মানী জুড়ে বই বিক্রেতাদের ওপর জেস্টিশ-মন্ত্রী করে অবাঞ্ছিত সমস্ত বই নষ্ট করে দেওয়ার আদেশ হোল। বইয়ের ওপর এ রকম সামগ্রিক যুদ্ধ ঘোষণা এর আগে পৃথিবীতে কখনো দেখা যায় নি।

হিটলারকে কোনদেশের অন্য কোন দলীয় রাজনীতিকরা হয়তো ক্ষমা করবেন না। কিন্তু কলমের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায় কোনো রাজনৈতিক দল আজ বিশ্বাসী নয়। এমন কি ভল্টেয়ারের এই ঘোষণা যতই শুনতে ভালো লাগুক: I disapprove of what you say, but I shall defend to the death your right to say it—এমন মতবাদের কার্যকারীতায় সায় দেওয়া দুনিয়ার রাজনৈতিক নেতাদের মুস্কিল হয়ে পড়ে। তবুও আজ যাঁরা স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী, র‍্যাশান্যালিজমের সমর্থক, তাঁদের কাছে সেন্সরশিপের যা সমস্যা পুরোপুরি তা তুলে দেওয়ার সমাধান নেই। স্থান কাল পাত্র ও আবহাওয়া বিচার করে মুদ্রণযন্ত্রকে কতখানি 'কনসেশন' দেওয়া যায় সেখানেই তাঁদের চিন্তা। এই নীতি নির্ধারণ করতে গিয়ে সময়ে সময়ে অনেক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব

হয়। এমন কি লেলিনের এক মূল্যবান রচনা স্বপ্রাধান্য নষ্ট হবার ভয়ে স্টালিনকেও চেপে রাখতে হয়েছিল। পৃথিবীর সৌভাগ্য আজ আবার রাশিয়ার তা প্রকাশ করা হচ্ছে। লেখক ও পাঠকের মধ্যে একমাত্র মিডলম্যান রাষ্ট্র হওয়ায় রাষ্ট্রের নির্দেশমত সমস্ত সাহিত্য এমন কি কল্পনাপ্রধান (Imaginative) সাহিত্যেও রাষ্ট্রের খবরদারী একমাত্র কার্যকরী ছিল রাশিয়ায়। লেলিনের নির্দেশে অবশ্য Proletcult তুলে দিতে হয়েছিল, স্টালিনের আমলে আবার তা নতুন করে দেখা দিল সোস্যালিস্ট রিয়ালিজমের মনোহারিত্বে। এ কথা বলা যায় যে সোস্যালিস্ট রিয়ালিজমে সৎসাহিত্য রচনা হতে পারে না। ফাদায়েভ, শোলোকভ বা অস্ত্রোভস্কির রচনা এ ধারণা নিশ্চয় খণ্ডন করবে। তবু সমাজতন্ত্রে সৎসাহিত্যের একমাত্র উপাদান হবে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা, আজকের রাশিয়ার রাজনৈতিক সমবায় নেতৃত্ব তা স্বীকার করে না। এ খবরে পৃথিবীর মুক্তবুদ্ধি মানুষেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারেন। অন্ততঃ মাও সে তুঙের আধুনিক ঘোষণা, : "চিন্তার ক্ষেত্রে একই ফুল নয় শত শত ফুল প্রস্ফুটিত হয়ে উঠুক", সমাজতন্ত্রের জগতে এই ঘোষণায় সেন্সরশিপের সীমানা আরো দূরে দিগন্তে স্থাপিত হবে বলে আশা করা যায়।

রাশিয়ার যে সমস্যা সে সমস্যা আজকের ধনতান্ত্রিক জগতে নেই। ধনতান্ত্রিক জগতে আছে "লেসে-ফেরে'র" বাজার। সেখানে কাগজে কলমে হয়তো এক বিরাট উদারনীতির আদর্শ তুলে ধরা আছে। কিন্তু এ আদর্শই আজ আর যথেষ্ট নয়। কেননা এমন সাহিত্য প্রকাশক সম্প্রদায় নিশ্চয়ই প্রকাশ করছেন না যাতে তাঁদের বাজার নেই কিংবা বাজার সংকুচিত। না হলে আমেরিকায় আজ অশ্লীল যৌন সাহিত্যের এত ছড়াছড়ি কেন। "লেসে-ফেরে'র" ক্রিয়াশীলতা নিছক আর্থিক লাভ ক্ষতির টানা পোড়েনেই। এর ওপর সরকারী হস্তক্ষেপ অনেক সময়ে নাও থাকতে পারে কিন্তু সমাজ প্রগতির পক্ষে আজ আর তা যথেষ্ট নয়।* নতুন কোন সেন্সরের বিভীষিকার কথা আমি বলছি না। রাশিয়ার দিকেও তাকাতে বলছি না। কেননা সমাজ প্রগতির সেখানেও অবাঞ্ছিত কর্তৃত্ব অনেকখানি কঠোর হয়েছিল। ক্রুশ্চেভের রাশিয়া হয়তো আজ তা স্বীকার করছে।

* Social progress is no longer possible by "Laissez-faire". it is a difficult possibility which depends on our capacity for Rational Control ·······(Epilogue by Blackham : History of the Freedom of Thought : Bury)

কলমের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা না হোক প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা এখনও পরীক্ষার স্তরে। এই পরীক্ষার প্রশ্ন তুলতে হচ্ছে এই কারণে যে অ-কমিউনিস্ট চিন্তাবিদ ম্যাকহ্যাম বিউরির বইতে Rational Controlএর কথা তুলেছেন। র‍্যাশান্যাল কন্ট্রোলের সবচেয়ে বড় সমস্যা হোল কলমের স্বাধীনতার বা ছাপাখানার স্বাধীনতার সঠিক দিগন্তরেখা নির্দেশ করে দেওয়া আর এই কন্ট্রোলের চরিত্র এমন হওয়া দরকার যাতে ছাপাখানার জগত যেন সম্পূর্ণ বাজারের ওপর নির্ভরশীল না হয়। বাজার নেই, এই অজুহাতে অনেক সৎসাহিত্য আজো আমাদের দেশে অপ্রকাশিত থাকে। সুতরাং, বই পড়ায় নিষেধাজ্ঞা হয়তো পৃথিবী থেকে কোনদিন উঠে যাবে না। নানা আকারে, নানা সমস্যায় তা দেখা দেবে। এবং বিশেষ অবস্থায় এর বিশেষ সমাধান করতে গিয়ে আবার নতুন রকমের নিষেধাজ্ঞা নতুন দিগন্তরেখা নির্দেশ করবে। মনে হয় হ্যারোল্ড লাসওয়েলের এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যুক্তিযুক্ত: It does not follow that Censorship is necessaryly doomed to failure ; but it is evident that the problem is more difficult, and the technique required more subtle, than believers in Censorship will admit. [৭]

(১) Banned Books : A. L. Haight.
(২) ঐ ঐ
(৩) Works of Milton : Vol IV : Columbia Univ. Press.
(৪) Five hundred years of Printing : Steinberg.
(৫) Banned Books ; A. L. Haight.
(৬) Five hundred years of Printing.
(৭) Encyclopaedia of Social Science : Censorship : Vol III.

পরিষদ কথা

টেকনিক্যাল উপদেষ্টা উপ-সমিতির কার্যক্রম

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের টেকনিকাল উপদেষ্টা উপ সমিতি বাংলা দেশের গ্রন্থাগার সমূহের উপযোগী গ্রন্থ সূচীকরণের একটি সহজ নীতি (simplified cataloguing code) প্রনয়ণের সিদ্ধান্ত করেছেন।

এতদ্ব্যতীত এদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ এবং জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এদেশীয় গ্রন্থাগারের বিশেষ করে সরকারী প্রচেষ্টায় যে সব জেলা ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সংগঠিত হচ্ছে তার উপযোগী নানা ধরণের আদর্শ গ্রন্থাগার গৃহের সুপরিকল্পিত নক্সা প্রস্তুতির কাজেও হাত দেওয়া হয়েছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়।

পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবারও সমিতি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ব্যবহৃত যে-সকল শব্দের বাংলা পরিভাষা অসম্পূর্ণ রয়েছে সেগুলি সমাপ্ত করার সিদ্ধান্তও করেছেন।

বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন

আগামী ২০শে অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অপরাহ্ণ ৪টায় পরিষদের ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং পরবর্তী বছরের সংসদ (Council) ও কার্য-নির্বাহক সমিতির (Executive Committee) নির্বাচন হবে।

১৯৫৭ সালের চাঁদা (ব্যক্তিগত ৩৲; প্রতিষ্ঠানিক ৮৲) যাদের বাকি রয়েছে তাঁরা নির্বাচনে পরিষদ সংবিধান অনুযায়ী অংশ গ্রহণে সক্ষম হবেন না। এজন্য তাঁদের অনতিবিলম্বে পরিষদ কার্যালয়ে চাঁদা জমা দেবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

মনোনয়ন পত্র জমা দেবার শেষ তারিখ ১৪ই অক্টোবর।

গ্রন্থাগার-সংবাদ

মুলাজোড় ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগার ॥ শ্যামনগর ॥ ২৪ পরগণা ॥

গত ৭ই জুলাই গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপক সমিতি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে :—

শ্রীনরেন্দ্র ভৌমিক (সভাপতি), শ্রীঅজিত ঘোষ (সহঃ সভাপতি), শ্রীসুবোধ মুখার্জী (সম্পাদক), শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্ত (সহঃ সম্পাদক), শ্রীঅনিল রায় (কোষাধ্যক্ষ), শ্রীদুলাল বাগচী (গ্রন্থাগারিক), শ্রীদীপক ঘোষ (সহঃ গ্রন্থাগারিক), শ্রীভোলানাথ ব্যানার্জী (সদস্য-কৃষ্টি বিভাগ), শ্রীতারা চ্যাটার্জী ও শ্রীঅনিল চ্যাটার্জী (সদস্য, কিশোর বিভাগ), এবং শ্রীদিলীপ ব্যানার্জী, শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ, শ্রীসীতারাম ব্যানার্জী, শ্রীশৈল চ্যাটার্জী ও শ্রীবীরেশ্বর চ্যাটার্জী (সাধারণ সভাবৃন্দ)।

বৈতা তরুণ সংঘ ॥ যশপুর ॥ ঝাড়গ্রাম ॥ মেদিনীপুর ॥

স্বাধীনতা শতবার্ষিকী উপলক্ষে বৈতা তরুণ সংঘ গত ১৫ই আগষ্ট এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ভোর পাঁচ ঘটিকায় শঙ্খধ্বনি সহকারে প্রভাত ফেরী, সকাল ৭ ঘটিকায় পতাকা উত্তোলন ও অভিবাদন। শহীদ বেদীতে মাল্যার্পণ। স্থানীয় গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় গ্রামের পথঘাট পরিস্কার প্রভৃতি। বিকাল ৫ টায় সংঘ ভবনে স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের উপস্থিতিতে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস ও ভূমিকা সম্পর্কে এক আলোচনা সভা হয়। সভার শেষে একটি কীর্তনানুষ্ঠান বিশেষ উপভোগ্য হয়।

পাড়হাট গ্রাম্য উন্নতি পরিষদ ও অ্যাডাল্ট এডুকেশন লাইব্রেরী ॥
॥ মাহাচাঁদা ॥ বর্ধমান ॥

বিদ্যাসাগর তিরোভাব দিবস উপলক্ষে লাইব্রেরীর উদ্যোগে গত ১৩ই শ্রাবণ শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা হয়। মহাপুরুষ বিদ্যাসাগরের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা করিয়া সর্বশ্রী নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু রায়, শ্রীধর পাল, নবকুমার বৈরাগ্য, তপন রায়, সমরেন্দ্র গোস্বামী, নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথ রায় প্রভৃতি বক্তাগণ তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

আজাদ হিন্দ্ পাঠাগার ॥ জলপাইগুড়ি ॥

কবিরাজ শ্রীসতীশ চন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের সভাপতিত্বে গত ৩০শে জুন তারিখে উক্ত পাঠাগারের বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পাঠাগারের নূতন গৃহ ক্রয় ও বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব আলোচনান্তে গৃহীত হয় এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ১৯৫৭ সালের জন্য কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হয় :—

শ্রীসতীশ চন্দ্র লাহিড়ী (সভাপতি), শ্রীঅবনীধর গুহ রায়, শ্রীবীরেন্দ্র নাথ মজুমদার ও শ্রীশুভ্রেশ্বর সান্যাল (সহঃ সভাপতি), শ্রীশিশির কুমার মৈত্র (সম্পাদক), শ্রীধীরেন্দ্র মোহন রায় (সহঃ সম্পাদক), এবং শ্রীসুরজিৎ সান্যাল, নিবারণ নাথ, রেবতী কর্মকার, মর্ণাল্ল নাগ, সুরেশ ঘোষ, প্রমোদ ব্যানার্জী, বাদল সমাদ্দার, সুনীল রায় ও মোহিত সান্যাল (সভ্যবৃন্দ)।

গোপীনাথ লাইব্রেরী ও হৃদয়কৃষ্ণ ফ্রি রিডিং রুম ॥ উল্টাডাঙ্গা ॥ কলিকাতা ॥

গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উৎসবের বিভিন্ন অংশ হিসাবে পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদান, কিশোর কবি সুকান্ত জন্মোৎসব ও শ্রীঅরবিন্দ জন্মোৎসব পালন করা হয় এবং গ্রন্থাগারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হৃদয় কৃষ্ণের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শ্রীমতিলাল পাল নিজ ভাষণে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রীঅরবিন্দ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে শ্রীভূপাল সুরাট জাতীয় সংস্কৃতি চিন্তাক্ষেত্রে অরবিন্দের অবদানের কথা আলোচনা করেন। গ্রন্থাগারের সভ্য শ্রীমান সুখময় ভট্টাচার্য এ বৎসর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকার করায় গ্রন্থাগারের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন ও উপহার প্রদান করা হয়। শ্রীনারায়ণ ঘোষ সভাপতির আসন অলংকৃত করেন।

বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির ॥ গড়জয়পুর ॥ পুরুলিয়া ॥

গড়জয়পুর বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দিরে গত ১৫ই আগষ্ট সাহিত্য মন্দিরের ১১শ জন্মবার্ষিকী ও প্রজাতন্ত্র দিবস মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জমিদার শ্রীরঘুনন্দন সিংদেও সভাপতি ও ডাঃ প্রমথ নাথ দাশগুপ্ত প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। অভ্যাগতদের অভিভাষণ ব্যতিরেকে স্থানীয় তরুণদের আবৃত্তি অনুষ্ঠান বিশেষ আকর্ষণীয় হয়।

হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘ ॥ ৪, চার্চ্চ রোড, হাওড়া ॥

হাওড়া জেলা পাঠাগার সংঘের উদ্যোগে গত ১৯শে হইতে ২৯শে জুন তারিখ পর্য্যন্ত হাওড়া গার্লস্ স্কুল ভবনে চতুর্থ বার্ষিক পুস্তক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন হাওড়ার পৌরপ্রধান শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ। মোট ৩২টি প্রকাশক প্রদর্শনীতে যোগ দিয়াছিলেন। প্রায় ১৩ হাজার টাকা মূল্যের পুস্তক প্রদর্শনী হইতে নগদ মূল্যে বিক্রীত হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

বজবজ পাব্লিক লাইব্রেরী ॥ বজবজ ॥ চব্বিশ পরগণা

গত ১৮ই আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিধান চন্দ্র রায় বজবজ পাব্লিক লাইব্রেরীর নব-নির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ভবন সম্মুখস্থ মহাত্মা গান্ধী রোডটি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয় ও তাহার উপর এক বিরাট সুদৃশ্য মণ্ডপ তৈয়ারী করা হয়। প্রধান অতিথি ডাঃ রাধাবিনোদ পাল মহাশয় তাঁহার ভাষণে বলেন যে, এই গ্রন্থাগারের দ্বার সর্বজনের সেবায় যেন চিরকাল উন্মুক্ত থাকে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁহার ভাষণে গ্রন্থাগারের আবশ্যকতা বর্ণনা করিয়া আশা প্রকাশ করেন যে এই গ্রন্থাগার যেন সার্থক গ্রন্থাগার হয় এই তাঁর ইচ্ছা।

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী ॥ ২ কে সি বোস রোড ॥ কলিকাতা-৪

— লাইব্রেরীর সাংস্কৃতিক বিভাগের উদ্যোগে প্রতি শনিবার পাঠচক্র ও কথিকার আয়োজন হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা-মালায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সিপাহী বিদ্রোহের ভূমিকা ও ইতিহাস প্রসঙ্গে শ্রীনরহরি কবিরাজ ও শ্রীমণি বাগচি বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা দেন। নাট্য-সাহিত্যে গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্র সাহিত্যে বর্ষা বিষয়ক দুটি আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ও শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। শরৎ জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক জনসভা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। লাইব্রেরীতে একটি স্বতন্ত্র শিশু বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিভাগটি শীঘ্রই আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করা হবে।

অন্যান্য রাজ্যের খবর :

দিল্লীতে প্রথম গ্রন্থাগার সম্মেলন

দিল্লী রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে গত মার্চ মাসের শেষে দিল্লীতে প্রথম গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রী। উপ-শিক্ষা মন্ত্রী ডক্টর কে, এল, শ্রীমালী উদ্বোধন ভাষণে বলেন যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রন্থাগার শিক্ষণের জন্যে এক বিশেষ সংস্থা স্থাপনের পরিকল্পনা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষণ বিভাগের সহিত সহযোগিতা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থাও থাকবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৭০ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে বর্তমান গ্রন্থাগারগুলির সুসংগঠনের জন্যও অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে।

লোকসভার মাননীয় স্পীকার শ্রীঅনন্তশয়নম আয়েঙ্গার সভাপতির ভাষণে বলেন যে গ্রন্থাগার অতীত ও উত্তরকালের সেতুবন্ধন, শুধু মুষ্টিমেয় মানুষের জন্যে নয়, সমগ্র সমাজোন্নয়নে ও জাতীয় জাগরণে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিমেয়।

ডক্টর এস, আর, রঙ্গনাথন গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সরকারী প্রচেষ্টার প্রশংসা করে বলেন যে সরকার প্রবর্তিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাফল্য সর্বাংশে নির্ভর করছে জন-সংযোগ ও সহযোগিতার উপর।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার শিক্ষণের নবপর্য্যায়

বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা যে-সব গ্রন্থাগার সংস্থা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ দান করে থাকেন সেগুলির কোনটিরই পূর্ণ সময়ের জন্য কোনও অধ্যাপক (whole time lecturer) নিয়োজিত নেই। জানা গেল আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় একজন পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক নিয়োগ করেছেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষণ ব্যবস্থা বহু পূর্ব হতেই ছিল এবং স্বল্পকালীন শিক্ষণেরও এক ব্যবস্থা যাঁরা স্নাতক নন তাঁদের জন্যে বছর দুয়েক পূর্বে প্রবর্তিত হয়েছিল। শেষোক্ত ব্যবস্থায় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীরা বিনা বেতনেই শিক্ষা দান করতেন। সম্প্রতি কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ায় ও অন্যান্য অসুবিধার জন্যে একটি নতুন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও একটি পূর্ণ সময়ের ডিগ্রি কোর্স বর্তমানে কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন রয়েছে।

বিবিধ বার্তা

পুস্তক পাঠকদের সততা

পশ্চিমবংগ সরকার রাজ্যবাসীদের সততা পরীক্ষা করিতে গিয়া এক ব্যাপারে বিশেষ সুফল পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাধীনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ২৫০টি জেলা ও থানা গ্রন্থাগার পরিচালিত হইতেছে। গ্রন্থাগারগুলির কাজকর্ম সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব গ্রন্থাগারের বইয়ের র‍্যাকগুলির ঢাকনা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলিয়া দেওয়া হয়। গ্রন্থাগারগুলিতে পর্যবেক্ষক রাখার নিয়মও তুলিয়া দেওয়া হয়। পাঠকগণও ইচ্ছামত বই ব্যবহার করিতে থাকেন। এইরূপে কড়াকড়ি বিধি-ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার ফলে বই চুরিও একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কড়াকড়ি ব্যবস্থা থাকাকালীন কিছু বইপত্র চুরি যায়। ঐ ২৫০টি গ্রন্থাগারের জন্য অনুমান ৪ লক্ষ পুস্তকের সরবরাহ ব্যবস্থা হইয়াছে। (আনন্দ বাজার—৬।৮।৫৭)

ডক্টর রঙ্গনাথনের অর্থদান

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল যে ডক্টর এস, আর, রঙ্গনাথন তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত একলক্ষ টাকা পরিমাণ অর্থ কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিষয়ে অধ্যাপক পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দান করবার ইচ্ছা জানিয়েছিলেন। জানা গেল যে তিনি উক্ত পরিমাণ অর্থ গত শতবার্ষিকী উৎসবের সময় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছেন। ডক্টর রঙ্গনাথন দীর্ঘকাল যাবৎ মাদ্রাজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ছিলেন।

গ্রন্থাগার-কর্মীর বিদেশ যাত্রা

জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী সম্প্রতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণে রওনা হয়েছেন। তিনি জাতীয় গ্রন্থাগারের একজন টেকনিক্যাল এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট। ভারত-মার্কিণ গমঋণ শিক্ষা পরিকল্পনাধীন ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে তিনি গ্রন্থণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে বিশেষ অধ্যয়ন ও শিক্ষণ গ্রহণ করবেন।

সম্পাদকীয়

শিবির শিক্ষণ

নবদ্বীপের গত শিক্ষণ শিবিরকে নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তিনটি শিবির পরিচালনা করলেন। কোনোও দশক বা শিক্ষার্থীর কাছ থেকে এই পরিকল্পনা যতই প্রশংসা লাভ করে থাকুক না কেন, একটু পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্ব বিচারের প্রয়োজন এখনও রয়ে গেছে। কারণ গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিশারদদের কারো কারো কাছে শিবির-শিক্ষণ পরিকল্পনা শুভেচ্ছা লাভ করলেও নিরঙ্কুশ সমর্থন লাভের সৌভাগ্য পায়নি। উচ্চারিত বা অনুচ্চারিত একটি অসুবিধার কথা অনেককেই অনেক সময়ে দ্বিধাগ্রস্থ করে রেখেছে দেখেছি, তা হচ্ছে শিবির মাধ্যমে বিতরিত জ্ঞানকে উত্তরকালে পরিপূর্ণভাবে সঞ্জীবিত রাখার প্রশ্ন। কারণ এ বিদ্যার যদি অনুশীলন না হয় তবে শিক্ষালাভের পর থেকেই তা' মনের অনেক পলিমাটির তলায় চাপা পড়ে যেতে থাকবে এবং এক কালের শিক্ষিত বন্ধুকে আবার এক নতুন শিবিরে শিক্ষা লাভ করতে আসতে হবে।

এ চিন্তা শিবির পরিচালকদের মনে প্রায় প্রথম থেকেই এসেছিল। তাঁদের কল্পিত সমাধানের কথাটা তাই সকলের কাছে নিবেদন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বলা বাহুল্য এ কথাগুলো শিবিরের সমাপ্তি দিবসে উদ্যোক্তাদের এবং শিক্ষার্থীদের কাছেও আমরা জানিয়ে থাকি আমাদের সমগ্র চিন্তার অংশীদার করবার জন্য।

পরিষদ কর্ম্মীদের এই সমাধানের পথ নির্দ্দেশের কথাটা বোঝাবার আগে শিবির শিক্ষণ পরিকল্পনার আসল লক্ষ্যটি কি তা' আর একবার মনে করে নেওয়া দরকার। শিবির শিক্ষণ কেবলমাত্র অন্যতম পন্থায় কতকগুলি নূতন বৃত্তি-কুশলীর সৃষ্টি করা নয়। এর মূল লক্ষ্য যাঁরা বাংলা দেশের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে থাকা জনপ্রচেষ্টায় পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলোকে চালাচ্ছেন তাঁদের হাতে-কলমে নিজেদের গ্রন্থাগারগুলিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগঠিত করার উপায় সম্বন্ধে

অভিহিত করা। কাজেই আহৃত জ্ঞান অবিলম্বে কাজে লাগানো যাবে এ কল্পনা করে নিয়েই শিক্ষণ পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হয়েছে। তাছাড়া এইসব গ্রন্থাগারের পক্ষে উপযুক্ত মূল্যে শিক্ষিত বৃত্তিকুশলীদের নিয়োগ করা সম্ভব নয়; আর তাদের গ্রন্থাগারিকদের পক্ষেও প্রধানতঃ আর্থিক ও তার সঙ্গে অন্যান্য কারণে পরিষদের অন্য শিক্ষা ব্যবস্থা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করাও সম্ভব হয়ে উঠছে না এ সত্যকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

অথচ দেশের এই ছড়ানো গ্রন্থাগারগুলিকে, তাদের একান্ত অসংগঠিত অবস্থা থেকে একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাংগঠনিক সমতায় আনা আশু প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। প্রথমতঃ নিজেদের সামাজিক কর্ত্তব্যকে যথাযথভাবে পালন করবার জন্য এ সংগঠন অবশ্য প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়তঃ সরকারী যে-কোনও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনাকে তা যতই অল্প খরচের বা ছোট এলাকা নিয়ে হোক না কেন—সার্থক করতে হলে ঐ গ্রন্থাগারগুলিকে সংগঠিত করা প্রাথমিক কর্ত্তব্য। কারণ ঐ গ্রন্থাগার ও তার কর্মীদের উপর নির্ভর করেই সরকারী পরিকল্পনা সার্থকতার পথে এগিয়ে চলতে পাবে, অন্য পথ অপব্যয়ের পথ, অসাফল্যের পথ।

প্রশ্ন উঠতে পারে বৃত্তিকুশলীদের প্রয়োজন যদি এতই বেশী বলে বোধহয় তবে এই ধরণের স্বল্পশিক্ষিত কুশলীদের সৃষ্টি না করে পরিষদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আরোও অধিক সংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা করে আর বিশ্ববিদ্যালয়কে আরো অধিকসংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষিত করার অনুরোধ জানিয়ে এর সমাধান করা যায় না কি? প্রথম উচ্ছ্বাসে মনে হবে—যায়, একটু চিন্তা করলেই জানা যাবে যে সম্ভব নয়। কারণ ঐ ব্যবস্থায় যে বৃত্তিকুশলীদের সৃষ্টি হবে তাঁরা জীবিকান্বেষণে সহরে আটকে থাকতে বাধ্য হবেন। ফলে গ্রামের গ্রন্থাগারের অভাব মিটবে না, কিন্তু সহরে বেকার সমস্যা তীব্র হয়ে উঠবে। আমাদের পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রথম ধাপে তাই গ্রন্থাগারগুলির বর্ত্তমান কর্মীদের দিয়েই প্রাথমিক কাজগুলো সেরে ফেলতে হবে। পরিকল্পনা অল্পে অল্পে কার্যকরী হতে থাকলে বহু নিপুণতর কর্মীর প্রয়োজন ঘটবে। তা অভাব মিটবে বর্ত্তমানের গ্রন্থাগার কর্মীদের আরোও বিশদভাবে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা করে, আর পরিষদ আর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসার করার মধ্য দিয়ে।

এবার আমাদের প্রথম প্রশ্নে ফিরে আসা যাক। গ্রন্থাগার পরিকল্পনার রূপায়ণে শিক্ষণ শিবিরের ভূমিকাকে স্বীকার করা গেলেও, তার মাধ্যমে যাঁরা

শিক্ষিত হচ্ছেন তাঁরা কতদূর সার্থকভাবে তাঁদের জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারছেন বা তাঁদের আহৃত জ্ঞানকে পরিপূর্ণভাবে সঞ্জীবিত রাখার ব্যবস্থা করতে পারছেন, এ কথা ভাববার।

আহৃত জ্ঞানকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্র এখন পর্যান্ত অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। কারণ আমাদের গ্রন্থাগার এখনও সমাজ জীবনে, শিক্ষা সংস্কৃতি বিতরণের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসাবে পরিপূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি, মৌখিক স্বীকৃতি যতই পেয়ে থাকুক না কেন। ফলে যে সামাজিক চাপের ফলে কোনও সংগঠনের কর্মীরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্য নিতে বাধ্য হন সে চাপ এখনও এক্ষেত্রে মুখ্যতঃ অনুপস্থিত। কাজেই সামাজিক চাহিদার ফলে উন্নত ধরণের সংগঠনের চিন্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগার পরিচালকদের দুশ্চিন্তার অঙ্গীভূত হয়ে যায়নি। ফলে নিজেদের গ্রন্থাগারকে সংগঠিত করার ইচ্ছার তাগিদ পরিচালকদের দিক থেকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই খুব জোরালো নয়। শুধু গ্রন্থাগারিক, যাঁকে প্রতিদিন অসংগঠনের নানা অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়, তাঁর অনুভূতিই ভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। আমরা শিক্ষিত করি এই গ্রন্থাগারিককেই। কিন্তু ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি-সম্পন্ন না হলে অধিকাংশ পরিচালকবৃন্দের পক্ষেই এই সংগঠনের আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কারণ ঘটে না। কাজেই সমাজ জীবনে এখনও যখন সময়ের অপব্যয়ের জন্য কোনও প্রয়োজনীয় তথ্য না পাওয়ার জন্য কোনও প্রতিবাদ নেই— তখন অনর্থক এ খরচের ঝুঁকি নেওয়া কেন? এই হয় তাঁদের মনের অবস্থা।

কাজেই এই অংশতঃ আর্থিক আর অংশতঃ মানসিক অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বাইরের কোনও শক্তির দরকার।

আর্থিক দিক দিয়ে সে শক্তির যোগান দিতে পারেন,—সরকার স্বায়ত্ত শাসন মূলক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। তাঁরা তাঁদের দানের সঙ্গে আর কিছু টাকা সংগঠনের সর্ত্তে দান করতে পারেন বা সংগঠনের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি (কার্ড ইত্যাদি) কিনেও দিতে পারেন। তাতে সম্পূর্ণ না হোক আংশিক অভাব কমবে এবং হয়তো পরিচালকদের এদিকে উদ্বোধিত করবে। মনের জড়ত্ব কাটাটাই বড় কথা এবং সে জড়তা অল্প সাহায্যেই কেটে যেতে পারে বলে মনে করবার কারণ আছে। মনের দিক থেকে সে শক্তির যোগান দিয়ে চলবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। পরিষদ তার একান্ত সীমিত লোকবল এবং অর্থবল সত্ত্বেও সাধ্যমত বিভিন্ন জেলায় শিবির সংগঠন করে চলেছে। এই কাজের উপর দাবী বর্ত্তমানেই

অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতেই বেড়ে চলেছে। পরিষদের কল্পনা অনুসারে এ কাজ রূপ গ্রহণ করতে থাকলে বার বার শিবির সংগঠন করে নিশ্চয়ই সমস্ত প্রচেষ্টাকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু সব সময়েই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে এ শিক্ষণ পদ্ধতি আশু কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য নিয়েই স্থির করা হয়েছে, কাজেই অবিলম্বে কাজে লাগানো না গেলে তার উদ্দেশ্য অসার্থক হতে চলেছে বলে ভাববার কারণ ঘটবে।

এ পথে বিতরিত জ্ঞানকে সঞ্জীবিত রাখার সবচেয়ে সার্থক উপায় তার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। প্রয়োজন মত আমরা বারে বারে নিশ্চয়ই বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্ন স্তরের শিক্ষণ শিবিরে মিলিত হবো। কিন্তু সমস্ত শিক্ষার আশু প্রয়োগের দিকটাকে উপেক্ষা করা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সমান হবে। আমাদের গ্রন্থাগারগুলির পরিচালকবৃন্দের কাছে তাই আমরা অনুরোধ জানাব যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করে আপনারা নিজেদের গ্রন্থাগারকে স্বচেষ্টায় সংগঠিত করুন। এর জন্য আপনারা প্রস্তুত হোন। অন্যের আর্থিক সাহায্য লাভ করেন-আনন্দের কথা, কিন্তু না হলেও নিজেদের গ্রন্থাগারকে সংগঠিত করার কথা যেন আপনাদের আগামী দিনের শপথ হয়।

গ্রন্থাগার

৭ম বর্ষ] আশ্বিন : ১৩৬৪ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

পুস্তকের জাত-বিচার

সতীশচন্দ্র গুহঠাকুর

'জাত পাত-তোড়ক-মণ্ডল' অর্থাৎ জাতি-বর্ণ-নিষেধক-সংস্থা মনুষ্যজাতির শ্রেণী বিভাগ উপবিভাগ তুলে দিয়ে যতই একাকার করুক না কেন, বিদ্যা বা শাস্ত্রের বেলা, অথবা লিখিত গ্রন্থাদি বিষয়ে জাত-বিচার রাখতেই হয়। নৈলে, শাস্ত্রের গহন অরণ্যে প্রবেশ লাভে বাধা জন্মে।

পুস্তকের জাত বিচার সম্বন্ধে অনেক স্মৃতিশাস্ত্র বা পদ্ধতি রচিত হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে ডিউই প্রবর্তিত 'দশমিক বর্গীকরণ' Decimal Classification (সংক্ষেপে D. C.), কাটার সাহেবের 'বিস্তারশীল বর্গীকরণ' Expansive Classification (E. C.), ব্রাউন রচিত 'বিষয় বর্গীকরণ' Subject Classification (S. C), প্রভৃতি এতদ্‌বিষয়ের স্মৃতিশাস্ত্র রয়েছে। আবার অনেক ব্যক্তিবিশেষের প্রণীত শাস্ত্র ব্যতীত সমষ্টিগতভাবেও কোন কোন সংস্থা, গোষ্ঠী বা পঞ্চায়েত বিভিন্ন পদ্ধতি প্রকাশ করেছেন; যেমন আমেরিকার 'লাইব্রেরী-অব্‌-কংগ্রেস পদ্ধতি' (L. C. C)। এই সকল পদ্ধতি থেকে পণ্ডিতেরা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বর্গীকরণ বিষয়ে ব্যবস্থা বা 'পাতি' দিয়ে থাকেন। গ্রন্থাগারিক একটি পদ্ধতি বেছে নিয়ে তদনুসারে পুস্তকের শ্রেণী বিভাগ করেন।

আমাদের ভারতবর্ষেও এই আধুনিক যুগেই এবংবিধ স্মৃতিশাস্ত্র রচিত হয়েছে; যথা, রঙ্গনাথনের 'কোলন বর্গীকরণ' Colon Classification (C. C.) এবং বর্তমান লেখকের 'প্রাচ্য-বর্গীকরণ পদ্ধতি বা Oriental Classification (O. C.)। শেষোক্ত পদ্ধতিদ্বয়ের উৎপত্তি বিষয়ে একটু ইতিহাস রয়েছে।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীনেট হলে সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ডক্টর মিসেস এনি বেসান্ট সভানেতৃত্ব করিবেন কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণে তিনি উপস্থিত হতে না পারায় ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ শেষকালে সভাপতি নির্বাচিত হন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভ্যর্থনা সমিতির পুরোধা ছিলেন।

এই ষষ্ঠ অধিবেশনে স্থিরীকৃত হয় যে, বর্গীকরণ বিষয়ে পাশ্চাত্য কোনো পদ্ধতি-ই ঠিক্ ঠিক্ আমাদের দেশের পক্ষে খাপ খায় না বলে, ভারতবর্ষ এবং প্রাচ্য দেশ সমূহের জন্য একটি উপযুক্ত পদ্ধতি প্রণয়ন করতে হবে এবং সেই জন্য এক বিশেষজ্ঞ সমিতি (Committee of Experts) গঠিত হয় চতুর্দশ জন গ্রন্থাগারিককে নিয়ে। সম্মেলনের প্রকাশিত বিবরণীতে বিশেষজ্ঞদের নাম পরিচয় যথাক্রমে এবংবিধ :—

(১) সতীশচন্দ্র গুহ, গ্রন্থাধ্যক্ষ, রাজ দারভাঙ্গা, (২) প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন; (৩) লাভু রাম, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়; (৪) চন্দ্রশেখর আয়্যা, বাঙ্গালোর সাবজনিক গ্রন্থালয়; (৫) অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ; (৬) রামকৃষ্ণ রাও, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়; (৭) রাজগোপাল রাও, মাদ্রাজ; (৮) এস, আর, রঙ্গনাথন, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়; (৯) নুটন মোহন দত্ত, কুারেটর, বরোদা; (১০) পুষ্করনাথ রৈনা, ইটানা বিদ্যাপীঠ, (১১) মহম্মদ শাফী, লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়; (১২) য়ুসুফুদ্দীন আহমদ, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, এবং (১৩-১৪) ত্রিবিক্রম রাও ও বেঙ্কট রমণায্যা, আন্নামালৈ।

এই বিশেষজ্ঞ সমিতি কোনো কালে বৈঠকে মিলিত না হইলেও ব্যক্তিগতভাবে দুইজন সদস্য (সংখ্যা ১ এবং ৮) নিজ নিজ গবেষণা উপলব্ধ পদ্ধতি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন যথাক্রমে ১৯৩২ ও ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে; একটি বর্তমান লেখকের 'প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি'। অপরটি রঙ্গনাথন-কৃত 'কোলন পদ্ধতি'। প্রথমোক্তটি সর্বপ্রথম ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের 'সরস্বতী ভবন গবেষণ পর্যায়' Saraswati Bhavana Studies নামক বার্ষিকবৃত্তপত্রের নবম খণ্ডে, কাশীস্থ রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় আচার্য ডক্টর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের সম্পাদনে এবং তাঁহারি ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়েছিল এবং পরে ১৯৩২ সনে পুস্তকাকারে বাহির হয়।

দেশস্থ এই দুইটি পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান আমাদের গ্রন্থাগারিকগণের থাকা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়, দুইটি পদ্ধতির-ই আলোচনা হওয়া উচিত। এতদুভয়ের সম্বন্ধে পুস্তিকাকারে একটি সমালোচনাত্মক রচনা করেছিলেন পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি এককালে স্টেট্ লাইব্রেরিয়ানরূপে বিকানীর রাজ্যের লাইব্রেরী ট্রেনিং কোর্সের অধিকর্তা ছিলেন, পরে প্রয়াগে পাব্লিক লাইব্রেরিয়ান হয়ে আসেন, এবং সর্বশেষে উত্তর প্রদেশের রাজকীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত থাকার সময় দেহরক্ষা করেন। পুস্তিকাটি

প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সনে। পূর্বে উহা Journal of the B.H.U.র সপ্তম খণ্ডে বাহির হয়েছিল। শিরোনামা India's Contribution to the Science of Classification. ভূপেন্দ্রনাথ উক্ত পুস্তিকায় ডক্টর রঙ্গনাথনের Colon Classification এবং গুহ-কৃত 'প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি' (Oriental Classification) উভয়ের বিস্তৃত আলোচনা ক'রে শেষোক্তটির প্রাধান্য দিয়েছেন।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ানরূপে রঙ্গনাথন সেখানে কোলন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন, অন্যত্র-ও অনেকস্থানে উহা ব্যবহৃত হয়।

'প্রাচ্য-বর্গীকরণ-পদ্ধতি'টি দাক্ষিণ ভারতে তিরুপতি নগরে শ্রীবেঙ্কটেশ্বর গবেষণাগারে (বর্তমানে তিরুপতি বিশ্ববিদ্যালয়) পঞ্চদশ বৎসর যাবৎ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। উত্তর ভারতে ইহা কাশীস্থ রাজকীয় সংস্কৃত কলেজ সংশ্লিষ্ট সরস্বতী ভবনে কযেক বৎসর পর্যন্ত ডক্টর শ্রীসুভদ্র ঝা মহাশয়ের গ্রন্থাধ্যক্ষতায় প্রবর্তিত হয়। বারাণসীর 'ভারতীয় জ্ঞানপীঠে' এবং পার্শ্বনাথ জৈনাশ্রমেও প্রাচ্যবর্গীকরণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। সংপ্রতি প্রয়াগ হরিজনাশ্রমে 'গান্ধী সাহিত্য-ভবন' ঐ পদ্ধতি অনুসারে বর্গীকৃত হয়েছে।

এই উভয় পদ্ধতি (C C এবং O C.) আমাদের গ্রন্থাগারিকগণ আলোচনা করে দেখুন, যদি পাশ্চাত্য D.C. E.C, S.C. বা L.C.C. অপেক্ষা অধিক উপযোগী মনে করেন, তবে এতদুভয়ের যে কোন একটি গ্রহণ বা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

'প্রাচ্যবর্গীকরণ সম্বন্ধে' পরে বিস্তৃত আলোচনার বাসনা রইল। ইহার কতকগুলি বিশেষত্ব রয়েছে, যা ঠিক্ ঠিক্ অপর কোনো পদ্ধতির মধ্যে একসঙ্গে পাওয়া যায় না, যথা বর্গনির্ণয়ের অতিরিক্ত ইহাতে 'কায়-নির্ণয়' (form divisions বিস্তৃতরূপে common sub-divisions) 'দেশ-নির্ণয়' (geography region), 'কাল-নির্ণয়' (পারম্পর্য, date, chronology) 'বাঙ্-নির্ণয়' (বাক্ speech), 'দিঙ্-নির্ণয়' (দিক view-point), 'নৃ-গোষ্ঠি-নির্ণয় (anthropology, human branch), 'কর্তৃ-নির্ণয়' author-translator-commentator) প্রভৃতি "চক্র" বা "পীঠিকা" রয়েছে, যার সাহায্যে বিষয়বস্তুর গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করে তার সরল প্রতীক (symbol) গঠন করা যেতে পারে, যা দেখে বিষয়ের নাম-ধাম, কদাচিৎ বা ঠিক্ ঠিক্ গ্রন্থনাম (title) টি পর্যন্ত, উপলব্ধ হয়ে যায়।

গ্রন্থাগার ও স্থানীয় সংগ্রহ

সুপ্রকাশ গুপ্ত

হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনের মাকড়দহ অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব ক'রেছিলেন। তাঁর অভিভাষণে তিনি গ্রামের গ্রন্থাগারগুলোকে স্থানীয় বিষয় সংগ্রহের দিকে মন দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের খিদিরপুর অধিবেশনেও তিনি একই বিষয়ে গ্রন্থাগারিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা ক'রেছিলেন। তাঁর বক্তৃতায় অন্য ফল কতদূর কী হ'য়েছে ব'লতে পারিনা, তবে অনেককে ব'লতে শুনেছি আমাদের দেশে বাছ বিচার না ক'রেও দেশের কোন জায়গার কাজে লাগবে এমন উপাদানই জোগাড় করা কঠিন, তায় নির্দিষ্ট-সসীম এলাকার আগ্রহের বিষয় সংগ্রহ ক'রতে ব'ললে আমরা পাবো কোথা থেকে।

যাঁদের মুখ থেকে এই রকম অসুবিধার কথা শুনেছি তাঁরা যদি আরও উপদেশ চেয়ে প্রভাতবাবুকে চিঠি দিতেন আর সেই পত্র যদি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হোত তা' হ'লে আমায় আজ এই অকিঞ্চন চেষ্টার বিড়ম্বনা সহ্য ক'রতে হোত না। প্রভাতবাবু এ বিষয়ে নিশ্চয়ই এমন আলোক সম্পাত ক'রতে পারতেন যাতে এই প্রশ্নের আনুষঙ্গিক অজানা কথার সবগুলিরই সমাধান হোয়ে যেত। কিন্তু আমার বন্ধুরা সোজাসুজি প্রভাতবাবুর কাছে প্রশ্ন করেন নি'। তাই আমার সামান্য বুদ্ধিমত তাঁদের কথার কিছুটা উত্তর দেবার চেষ্টা ক'রছি।

আমাদের দেশের জাতীয় ইতিহাস লেখার উপাদান খুব বেশী সংগৃহীত নেই। স্বীকার করি, যা' উপাদান আছে ভাল ঐতিহাসিকের হাতে তা সোনা ফলাতে পারে তবুও তার সঙ্গে আরও বেশী উপাদান যে নেই এ কথা ত' অস্বীকার ক'রতে পারি না। জাতির ইতিহাস লেখার উপাদান সংগ্রহ করার দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় গ্রন্থাগারগুলোকে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা এ বিষয়ে আমাদের খুব সাহায্য ক'রতে পারত সন্দেহ নেই, কিন্তু ঐ পত্রিকাগুলোর উপর মৃত্যুর খাঁড়া সব সময় ঝুলতে থাকে। কত পত্রিকা শৈশব কাটিয়ে ওঠবার আগেই যে পৃথিবীর বুক থেকে অন্তহিত হ'তে বাধ্য হ'য়েছে তার খবর রাখবে কে? তার উপর আর এক সমস্যা হ'চ্ছে পত্রিকাগুলোর সূচী নির্মাণের। ঠিকমত সূচী তৈরী না থাকলে পত্রিকার গন্ধমাদনের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় বিশল্যকারণীটুকু খুঁজে বের করা খুব সহজ

কথা নয়। ইতিহাসের উপাদানের জন্য সূচীবিহীন, অনিশ্চিত-জীবন পত্রিকাগুলোর উপর তাই নির্ভর করা যায় না। সুতরাং এই দায়িত্ব নিতে হবে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে—এবং আমাদের দেশে গ্রন্থাগার যে এই কাজের ভার নেবার পক্ষে সব চেয়ে যোগ্য এই কথা প্রতিপন্ন করার জন্যই এই প্রচেষ্টা।

যে কোন অঞ্চল সম্বন্ধে খবর নিতে হ'লে মানুষ সব চেয়ে প্রথম খোঁজ নেয় সেখানের কোন প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের, তার পরে খোঁজ নেয় প্রাচীন মানুষের। হয়ত কোন অঞ্চলের গ্রন্থাগার খুব প্রাচীন নয়—সেই গ্রন্থাগারে যে অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের লেখা বই পত্তর সংগ্রহ ক'রে রাখা সম্ভব হয় নি', সেই অঞ্চলের প্রাচীন কিম্বদন্তী, প্রচলিত ছড়া, স্থানীয় গল্প বা কাহিনী কখনও মুদ্রাকরের যন্ত্রের মধ্যে ধরা পড়ে নি'। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যধারার সঙ্গে আমরা যেমন দ্রুতভাবে যোগাযোগ হারাচ্ছি তাতে সামান্য দু চার জন বুড়ো বুড়ী যাঁরা এই সব প্রাচীন বিষয়ের কিছু খোঁজ রাখেন তাঁরা গত হ'লে এ সবের খোঁজ আর পাওয়া যাবে না। যশোর জেলার নিভৃত পল্লী অঞ্চলের কোন্ সিলিমা গ্রাম একদিন সীতারামের সৈনা আর নবাবী পল্টনের হানাহানির ক্ষেত্র হ'য়েছিল আজকের দিনে তার সন্ধান দেবার লোক খুব বেশী নেই। সতীশ মিত্রের মত প্রাচীন জিনিষ আবিষ্কারের আলো হাতে ধ'রে বেড়াবার লোক সব সময় খুব সুলভ নয় —তাই হারিয়ে যায় আমাদের ছড়াগুলোর মানে, হারিয়ে যায় আমাদের দেশের ইতিহাস।

আমাদের দেশের গ্রন্থাগারিক এখনও নেশায় মশগুল মানুষ। তিনি কাজ করেন পেশা ব'লে নয় নেশা বলে। কাজ ক'রে আয় নেই এক পয়সাও—লাভ শুধু অকাজে সময় কাটানোর জন্য বাড়ীতে প্রিয়জনের গালমন্দ আর বৎসরান্তে সভায় নানারকমের সমালোচনা—আরও ভাল ক'রতে না পারার অপরাধে। তবু তিনি কাজ ছাড়েন না কাজ করেন। কাজ করেন দেশকে ভালবাসেন ব'লে—লেখাপড়া পছন্দ করেন ব'লে। তাঁকে যদি একবার বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে আমাদের ছোট্ট গ্রামের ছোট্ট প্রদীপ যদিও আমাদের সামনের সমস্ত অন্ধকার নিঃশেষে দূরীভূত ক'রতে পারছেনা—তবুও দূরে পথহারা অরণ্যচারীর কাছে তাই হয়ত লোকালয়ের সঙ্কেতের মত একদিন পরম মূল্যবান্ ব'লে মনে হবে। তাই ঐ আলো ও আমাদের গৌরব—ওর দীপ্তিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। বাস্তবিক দেশের কাজের নেশায় উদ্বুদ্ধ অপেশাদার গ্রন্থাগারিকের দলকে একটু দেশ-গৌরবে অনুপ্রাণিত ক'রতে পারলে আপাতঃ অকিঞ্চিৎকর উপাদানগুলোর মহত্ত্ব তাঁদের কাছে এমন ভাবে ফুটে উঠবে যে তাঁরা এদিকে নজর না দিয়ে পারবেন না।

আমাদের দেশে আঞ্চলিক সংগ্রহের দিকে মনোনিবেশ ক'রতে গেলে সংগ্রহকারককে অনেকাংশেই নিজের উদ্যোগ আয়োজনের উপর নির্ভর করতে হবে। ছাপান বই বা সংগ্রহের উপযুক্ত জিনিষ খুব বেশী অঞ্চলে পাওয়া যাবে না। গুরুত্বপূর্ণ জিনিষগুলো অঞ্চলের সীমা অতিক্রম ক'রে খুব উপযুক্তভাবেই নামকরা সংগ্রহশালায় স্থান পেয়ে থাকে। তাই আঞ্চলিক সংগ্রহের কাজ খুব অনায়াস সাধ্য নয়। তবুও মনে হয় চেষ্টা ক'রলে নিম্নলিখিত উপায়ে আঞ্চলিক সংগ্রহ সব গ্রন্থাগারই গড়ে তুলতে পারে।

একটা অঞ্চলের ধর্ম মন্দির প্রভৃতির বিবরণ সংগ্রহ করা খুব কঠিন নয়। বাংলা দেশে এমন গ্রাম খুব কমই আছে যেখানে কোন শিবমন্দির, কালীমন্দির, বা নিদেন পক্ষে ঠাকুর দেবতার গাছ পাথর নেই। এই সমস্ত সম্বন্ধে যা বিবরণ পাওয়া যায় গ্রন্থাগারিক ভাল হাতের লেখায় সেগুলো লিখিয়ে রাখতে পারেন। অনেক সময় অনেকের গৃহদেবতা সম্বন্ধে এমন সব বিবরণ প্রচলিত থাকে যা' জানতে অনেকেরই আগ্রহ হয়। তা'ছাড়া ঐ সব গৃহদেবতার বিবরণের সঙ্গে জড়িত থাকে সেই অঞ্চলের এমন লোকদের কাহিনী যাঁদের কথা জানবার আগ্রহ অজানা থাকলেও পরে একদিন হওয়া অসম্ভব নয়। এই সব মন্দির বৃক্ষাদির ছবিও এই সংগ্রহে স্থান পেতে পারে।

আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থা দ্রুত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চ'লেছে। রাষ্ট্র সম্পর্ক বিহীন সজীব স্বদেশী সমাজ রাষ্ট্র যন্ত্রের বিপুল তাড়নে সম্পূর্ণ রূপে অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হ'চ্ছে। কিছুদিন বাদে আমাদের প্রাচীন সমাজের কোন সন্ধানই খুঁজে পাওয়া যাবে না। পল্লী সমাজের সব কিছুই ভালো এ কথা কোন বাতুলেও বলে না—তবুও যে সমাজ রাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতীতও তার অন্তর্ভুক্ত লোকদের দীর্ঘকাল শাসন রক্ষণ ক'রেছিল তার পেছনে সত্যের বল যে খানিকটা ছিলই এ তথ্য অস্বীকার করাও বাতুলতা। যে সমস্ত ঘটনা পল্লী-সমাজে একদিন আলোড়ন এনে দিয়েছিল সেগুলোকে লিপিবদ্ধ করেও গ্রন্থাগারিক তাঁর সংগ্রহকে সমৃদ্ধ ক'রতে পারেন।

কোন অঞ্চলের প্রধান উপজীবিকা ও বৃত্তিগুলোর বিবরণ গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করা নানাদিক দিয়ে ফলপ্রসূ হতে পারে। রেশমের গুটীপোকা সংগ্রহ করা যে গ্রামের উপজীবিকা সেখানে এই ব্যবসায়ের ইতিহাস, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, নানারকমের চিত্র দেখতে পাওয়ারআশা করা খুবই উচিত। বাংলা দেশে বৃত্তির সঙ্গে সমাজ ও জাতির এমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল ওআছে যে বৃত্তিগুলোর ইতিবৃত্ত সমস্ত বাঙালী জাতির ইতিবৃত্ত সংগ্রহের রাজপথে ওঠার গলি বলে মনে হতে পারে।

তারপরে অবসর বিনোদনের অনুসৃত পন্থাগুলোর বিবরণ, চারুকলা, চারুশিল্পের বিবরণ এ সবও সংগ্রহ ক'রে লিখে রাখতে হবে গ্রন্থাগারিককে। প্রচলিত ছড়া ও গল্প সব তাঁকে জোগাড় করতে হবে।

আমাদের উপরের আলোচনার থেকে কিন্তু একটা ভুল ধারণা জন্মাতে পারে। মনে হ'তে পারে আমরা বুঝি গ্রন্থাগারিককে ব'লছি তাঁর অঞ্চলের ইতিহাস লিখতে। কিন্তু একথা আমরা মোটেই ব'লছিনা। গ্রন্থাগারিক ঐতিহাসিক হ'তে পারেন আপত্তি নেই—কিন্তু সব গ্রন্থাগারিককে ঐতিহাসিক হতেই হবে এ দাবী করা যায় না। সব গ্রন্থাগারিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ক'রবেন এইটুকুই মাত্র আশা করা যায়। তাই সংগৃহীত উৎপাদনগুলো বিচ্ছিন্ন হবে—একের সঙ্গে আরের যোগাযোগ থাকবে না—কোন কোন বিবরণ কারোর মুখ থেকে শুনে হুবহু লিখে নেওয়া হবে—হয়ত তার সঙ্গে আর একটা বিবরণের সঙ্গতি থাকবে না- এমন হ'লেও আমাদের সংগ্রহের মূল্য ক'মে গেল না। ঐ বিচ্ছিন্ন উপাদানের মধ্য থেকেই অনাগত দিনে সুসঙ্গত সিদ্ধান্তগুলো টেনে বের করার সম্ভাবনা র'য়ে গেল।

আঞ্চলিক সংগ্রহের সব চেয়ে প্রধান জিনিষ হবে সেই অঞ্চলের প্রধান লোকদের বিবরণ। এই বিবরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে সেই লোকদের নিজেদের বা তাঁদের আত্মীয়দের কাছ থেকে। এই বিবরণ সংগ্রহ ক'রলেই ঐ সব লোক গ্রন্থাগারের অনুরক্তও হ'য়ে প'ড়তে পারেন।' যদি এমন হয় তবে গ্রন্থাগারের বাড়তি লাভ নেহাৎ কম হবে না। এমন না হ'লেও এই সংগ্রহগুলো ভবিষ্যতের জাতীয় জীবনী সংগ্রহ রচনার পথ প্রশস্ত ক'রে দেবে। কেননা সারা দেশের কাছে যে লোকের মূল্য খুব বেশী নয়, নিজের অঞ্চলে তিনিই প্রধান লোক। যদি কোন দিন এই অজ্ঞাত লোকটি জাতীয় গুরুত্ব অর্জন করেন তখন তাঁর সব বিবরণ সংগৃহীত পাওয়ার একটা স্থল থাকে।

হাতে লিখে, ফটো তুলে আঞ্চলিক সংগ্রহ গ'ড়ে তোলার কাজ অনেকখানি করতেই হবে। কিন্তু এ গুলোকে পূর্ণ করে তুলতে হবে ঐ অঞ্চলের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মুদ্রিত কার্য বিবরণী প্রভৃতি দিয়ে। অঞ্চল সম্বন্ধে কোন পত্র-পত্রিকায় কোন বিবরণ প্রকাশিত হ'লে তার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু সংগ্রহ ক'রে রাখা একান্ত প্রয়োজন। আঞ্চলিক সংবাদ জোগাড় করার দিকে গ্রন্থাগারগুলোকে নজর রাখতেই হবে।

বইয়ের চাহিদা

মুরারি ঘোষ

চীনের আশ্চর্য প্রাচীরের চেয়েও আশ্চর্যতর হোল 'হাজারবুদ্ধের গুহার' গুপ্ত সম্পদ। এক তাওপন্থী সাধু বিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে তুর্কীস্থান ও চীনের সীমান্ত প্রদেশে এক লুপ্তপ্রায় মন্দিরের সংস্কারে মন দিয়েছিলেন। দেওয়ালের আবর্জনা সরিয়ে তাঁর চোখে পড়লো আশ্চর্য সব দেওয়াল-চিত্র। বিরাট পাহাড়ের শীর্ষদেশে কঠিন পাথর কেটে কেটে যে গুহা তৈরী হয়েছে তারও ভেতর আবার ইঁটের দেওয়াল গেঁথে ছোট ছোট ঘর বাঁধানো আছে। আর, এই ঘরগুলোয় থরে থরে সাজানো ছিল পৃথিবীর আশ্চর্য-সম্পদ। সাধু দেখলেন চারিদিকে রাশিরাশি পুঁথি। খবর পেয়ে দেশবিদেশের প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এলেন। এলেন স্বনামখ্যাত ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিক অরিয়েল স্টাইন। প্রায় তিন হাজার পুঁথি আর কাগজপত্র নিয়ে স্টাইন বিটিশ মিউজিয়মের সংগ্রহ শালা পূর্ণ করলেন। এই পুঁথিপত্রের মধ্যে আমাদের সেই পরম বিস্ময় লুকিয়েছিল—তা হোল পৃথিবীর প্রথম ছাপা বই। মুদ্রাকর হলেন ওয়াং চিয়ে (Wang Chieh)। বিংশ শতকের আগে এ সম্মান প্রাপ্য ছিল ইউরোপের। প্রাপ্য ছিল গুটেনবার্গের। তবু ওয়াং চিয়ে যে পৃথিবীর আদিমতম গ্রন্থের মুদ্রাকর এমন কথাও বলা যায় না। বৌদ্ধ সূত্রের চৈনিক অনুবাদ হোল এই গ্রন্থ। মুদ্রিত অক্ষরে তার প্রকাশের সন্-তারিখও উল্লেখ করা আছে বইয়ের প্রথমে: "৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মুদ্রিত": ভাষান্তরে তার এই অর্থই দাঁড়ায়। ওয়াং চিয়ের দু এক শতাব্দী আগে থেকেই চীনদেশে কাঠের ব্লকে ছাপানো ছবি কিংবা নানান উপদেশমালা মুদ্রিত আকারে অজস্র পাওয়া গেছে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে একটা নমুনা আছে, তাহোল একই ছবির পাঁচশোটি প্রতিলিপি। একই কাঠের ব্লক থেকে তা ছাপানো হয়েছে। এরকম অজস্র টুকরো টুকরো কাগজে ছাপানো নানান উপকরণ পাওয়া যাবে। কেবল ছবি নয়, ছবির সংগে লেখাও। তাই ওয়াং চিয়েকে পৃথিবীর আদিম মুদ্রাকর বলা চলে না। এমন কি আদিমতর মুদ্রিত গ্রন্থ হয়তো কোন লুপ্তপ্রায় ঐশ্বর্যের মধ্যে আজো আত্মগোপন করে আছে। মুদ্রণের ব্যাপক প্রসার সপ্তম, অষ্টম শতাব্দীতে চীনের উল্লেখ যোগ্য কৃষ্টিবিকাশ ছিল।

চীনদেশে তখন শিক্ষা ব্যবস্থায় রাজকীয় উদ্যোগ বিশেষ কার্যকরীছিল। শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। নিম্ন-মধ্য ও উচ্চশিক্ষার অনেক কেন্দ্র ছিল বড় বড় শহর-নগরে। সাধারণের কাছে যথেষ্ট উন্মুক্ত ছিল শিক্ষার প্রশস্ত দুয়ার। আর তার কারণ বর্ণনায় তাং বংশের রাজত্বকালের (৬১৮ থেকে ৯০৭ খৃষ্টাব্দ) ইতিহাস অনুসরণে এক ঐতিহাসিক বলছেন[১]: "প্রত্যেক ব্যক্তিই, যিনি সরকারী চাকুরীপ্রার্থী হতেন তাঁকেই প্রাচীন শাস্ত্র পরীক্ষায় পাশ করতে হোত, মন্ত্রী থেকে ট্যাক্স-কালেক্টর এমন কি রাজ্যপাল নিয়োগের এ এক অদ্ভুত রীতি।" অন্য কোনো দেশে এমন কাহিনী শোনা যায় না। এর অর্থই হোল, যে, চীনদেশে বিদ্যার আদর সবচেয়ে বেশী, রাজকার্যে তারা এই জ্ঞানীগুণীদের সমাবেশ আশা করতো, এবং আরো-এক সুন্দর অর্থে এর ব্যাখ্যা হয় যে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে যোগ্যতার বলে যে কেউ রাজকার্যের শীর্ষদেশে আরোহন করতে পারতো।"

সরকারী চাকুরীর চাহিদায় শিক্ষার এই উল্লেখযোগ্য প্রসার আর শিক্ষার যথাযোগ্য সম্মানও স্বীকৃত ছিল। এ হেন পরিবেশে সাধারণের পাঠস্পৃহা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। অন্তত Academic শিক্ষার প্রয়োজনে উল্লেখযোগ্য ছিল পুস্তক চাহিদাও। তাই এ খবর পেলে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবেন না, যে, চীনদেশে হাতের লেখার বাঁধুনি সুন্দর করার জন্যে যতগুলি স্কুল ছিল তার চেয়ে সংখ্যায় বেশী ছিল Calligraphy School[২]. এই স্কুল থেকেই ছাত্ররা পাঠ সমাপ্ত করে নানান পুঁথি পত্রের প্রতিলিপি তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করতো। পুঁথিপত্রের চাহিদা প্রয়োজন মত এঁদের দ্বারাই মিটতো। তারপর একদিন আবিষ্কার হোল কাঠের ব্লক। কাঠের ব্লক অক্ষর সাজিয়ে ছবির সংগে লেখাও মুদ্রিত হোতে লাগলো। হাতের লেখা পুঁথির সংগে কাঠের ব্লকে মুদ্রিত পুঁথিও এল। প্রথম মুদ্রিত পুঁথির সন্ধান যা পাওয়া গেছে তা এই ৮৬৮ সালের। এর আগেও হয়তো চীনদেশে মুদ্রিত পুঁথি ছিল, এ অনুমান অন্যায় নয়। হাতের লেখার সংগে ছাপাখানার এই যোগসূত্র এক সামাজিক পরিবেশের খবর বয়ে আনে। তা হোল, শিক্ষার প্রসার আর বইএর চাহিদা।

(১) The Pageant of Chinese History : Elizabeth Seeger : পৃঃ ১৮৮।
(২) History of Chinese Education, vol-1 : H. S. Galt পৃঃ ৩৬১।

বইএর এই চাহিদা মোটামুটি ভাবে অ্যাকাডেমিক। আর এই অ্যাকাডেমিক প্রয়োজনে যাবতীয় বই লেখা চলতো। বিদ্যালয় সংক্রান্ত কি ধর্ম সংক্রান্ত শিক্ষাব্যবস্থায়, স্কুলে বা মঠেই, বইয়ের প্রকৃত প্রয়োজন ছিল। নিছক জ্ঞানের খাতিরে বিদ্যার্জন বা চিত্ত বিনোদনে বইয়ের চাহিদা এ কল্পনা তখন নিরর্থক। কেননা ছাপার পদ্ধতি চালু হলেও তার প্রথম যান্ত্রিক ব্যবস্থা বইয়ের সরবরাহ যথেষ্ট করার পক্ষে উপযোগী ছিল না। আর বিদ্যাচর্চার সামাজিক পরিবেশ মোটামুটি রাষ্ট্রিয় প্রয়োজন অনুযায়ী—এ ক্ষেত্রে এক সর্বাত্মক জ্ঞান অর্জনের সমস্যা ছিল না, প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্র কাঠামো চালু রাখার। সরকারী কর্মচারী তৈরী করা। তবু যে জয়েন সাং বা ফা হিয়েনের মত পণ্ডিতদের আবির্ভাব সে তো সকল যুগে সকল দেশেই আছে। এঁরা হলেন ব্যতিক্রম। প্রচলিত যুগ-ধারা অতিক্রম করে যুগাতীতে এঁদের পদচারণা। এঁরা অবশ্যই নানান ধর্মের, শাস্ত্রের, নানান বিদ্যার পুঁথি সংগ্রহ করেছেন। এঁদের পাঠস্পৃহা নিশ্চয়ই মুদ্রিত পুঁথি রচনার ব্যারোমিটার নয়।

আসলে ছাপাখানার আবির্ভাব ব্যাপক পুস্তক পাঠের চাহিদায় নয়। বরং ছাপা বইয়ের সুলভ সরবরাহ সর্বাত্মক বই পড়ার আগ্রহ ব্যাপকতর করে তুলেছে। স্কুল কলেজে পাঠ্য বইয়ের চাহিদা অতিক্রম করেও Non Academic স্তরে আজ যে বিদ্যার সম্প্রসারণ, তার ঐতিহাসিক কারণ হোল ছাপাখানার প্রসার। চৈনিক পণ্ডিত 'ফেঙ তাও'কে, (দশম শতক) চীনদেশের গুটেনবার্গ বলা হয়। বলা হয় চীনদেশে বই ছাপার ইতিহাসে তিনি যুগান্তর আনেন। তাঁর আগেও চীনদেশে মুদ্রাকর ছিল। তবু তিনি বই ছাপার ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগের প্রথম কর্মকর্তা ছিলেন। মূলতঃ তাঁরই চেষ্টায় বই ছাপার ব্যাপক উদ্যম সারা চীনে ছড়িয়ে পড়ে। হাতের লেখা পুঁথির বদলে ছাপা বইয়ের সুলভ সরবরাহ বেড়ে যায়। এ সরবরাহ কিন্তু স্কুল কলেজ বা ধর্ম সংক্রান্ত গণ্ডী ছাপিয়ে উঠতে পারে নি। নন্-অ্যাকাডেমিক স্তরে সম্প্রসারিত হয় নি। কেননা সে ধরণের যান্ত্রিক ব্যবস্থা কিংবা প্রয়োজন মত সাদা কাগজের সরবরাহ যথেষ্ট ছিল না। মুদ্রণের প্রথম প্রয়োজন হয়েছিল শাস্ত্রের সঠিক প্রতিলিপি সংরক্ষণে। সঠিক প্রতিলিপির সমস্যা দেখা দিয়েছিল এই জন্যে যে, পুঁথির অনুলিপিকারকদের অমনোযোগিতায় অনেক অশুদ্ধ পাঠ রচনায় লিপিবদ্ধ হয়ে যেত। পণ্ডিতদের কাছে এ এক বিষম সমস্যা ছিল। বিশেষ করে ছাত্রেরা ঠিক করতেই পারতো না কোন্‌টা

শুদ্ধ বা কোনটা অশুদ্ধ পাঠ। অশুদ্ধ পাঠ নেই এমন অনুলিখিত পুঁথি খুব কমই পাওয়া যেত। তাই 'ফেং তাও' প্রসংগে প্রখ্যাত Dougls. C. Mcmurtrie বলেছেন : Feng Tao was not at all interested in printing except as a means to an end. His object was the establishment of an accurate and officially authenticated text of the ancient Chinese classics. (The Book, Story of printing and Book making : D. C. Mcmurtrie, পৃষ্ঠা ৯০).

ইউরোপে গুটেনবার্গের আবির্ভাবের বেশ কিছু আগে থেকেই ব্লক মুদ্রণের নানা রকম প্রচেষ্টা চলছিল। হল্যাণ্ডের হারলেমে, কি জার্মাণীর মেইনৎসে কাঠের ব্লক আর কাঠের টাইপে ছাপার কাজ চালু ছিল। তবে তা থেকে বড় কিছু ছাপা হয় নি। কথিত আছে, প্রথম বই মুদ্রিত করলেন গুটেনবার্গ, তাঁর বাইবেল (১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে)। এবং এই বাইবেল ছাপার পেছনেও নিশ্চিত করে কোনো গণদাবী ছিল না, এ কথাও বলা চলে। হস্তলিখিত বাইবেল তখন বিশ্বৎ সমাজে বেশ চালু ছিল। কিছু মূল্যদানে তা সংগ্রহ করা কষ্ট সাধ্য ছিল না। পেশাদার অনুলিপিকারেরা বাইবেল লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। বাইবেল কোনদিন দুষ্প্রাপ্য ছিল না। কেননা আজকের মত ইউরোপের ঘরে ঘরে তখনও তার প্রধান আসন সংরক্ষিত হয় নি। শুধু বাইবেল বলে নয় ইউরোপের তখন প্রায় প্রতিটি বড় গীর্জাতেই সকল শাস্ত্রের অনুলিপি করে রাখার ব্যাপক প্রয়াস ছিল। চার্চের সাধুদের কিছু অংশ এই অনুলিপি রচনায় নিযুক্ত থাকতেন। গীর্জায় রচিত বই অবশ্য গীর্জার চৌহদ্দির বাইরে যেতে পেত না। কেবল কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি যাঁরা আবার গীর্জার সঙ্গে ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে সংযুক্ত ছিলেন কিংবা চার্চে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র-সম্প্রদায় চার্চের ভেতরেই গ্রন্থাগারে বসে পাঠস্পৃহা নিবৃত্তি করতেন। এ অবস্থায় সাধারণের পাঠস্পৃহা চরিতার্থ হবার কোনো প্রশ্নই উঠে না। আর সে চাহিদাও ছিল না। তবে গুটেনবার্গের এই প্রচেষ্টার পেছনে কোন্ ঐতিহাসিক সত্য সহায়ক ছিল? এ প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে। এর জবাবেও আমরা এক বিশেষজ্ঞের মতামত তুলে ধরতে পারি। এনসাইক্লোপিডিয়া অব সোস্যাল সায়েন্সে আর, এল, ডুফাস * লিখেছেন :

(৩) R. L. Duffus : Printing and Publishing : Encyclopaedia of Social Sciences : Vol ; 12

"জ্ঞানের প্রসার ও প্রচারে মুদ্রণের যে মহৎ সম্ভাবনা তা প্রথমে কিন্তু চীন কিংবা ইউরোপে কোথাও ধরা পড়ে নি। সাধারণভাবে হস্তলিখিত অনুলিপির অশুদ্ধ পাঠ নিরাকরণে এর প্রাথমিক উপযোগিতা স্বীকৃত ছিল; এ ভুল, বিশেষ দক্ষ অনুলিপিকারকেরও হতে পারে। ভুল-ত্রুটিহীন সঠিক (standard) পাঠ্য রচনার তাগিদেই মুদ্রণের দরকার পড়লো।"

স্টাণ্ডার্ডাইজড পাঠ্য রচনার গুরুত্বে মুদ্রণ স্বীকৃতি পেল। মূল গ্রন্থের যে কোন হস্তলিখিত অনুলিপিতে অশুদ্ধ পাঠ অবশ্যম্ভাবী ছিল, এমন কি খুব দক্ষ অনুলিপিকারের কাজেও কিছু না কিছু ভুল থেকে যেত। এ ভুল এড়িয়ে চলার উপায় ছিল না। মুদ্রণ ব্যবস্থায় যথাসম্ভব কম ভুল করে অনুলিপি তৈরী করা যায় এবং তার সংখ্যাও হয় উল্লেখযোগ্য। তখন পুঁথি পত্রের চাহিদা ছিল কেবল নানান বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, আর বড়বড় গীর্জার গ্রন্থাগারে। ব্যক্তিগত গ্রন্থ সংরক্ষণে বিশেষ বিশেষ বই সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। কেননা অসম্ভব চড়া ছিল হাতের লেখা পুঁথির দাম। অনেককে গীর্জায় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমতি সংগ্রহ করে সেখানকার পুঁথি থেকে অনুলিপি করে আনতে হোত। অনেকে অনুলিপিকার সংগে করে গ্রন্থাগারে যেতেন। এতটা কড়াকড়ি অনুশাসন আর পুস্তকের সহজলভ্যতার অভাব বই পড়ার সাধারণ আগ্রহ দমন করে রেখেছিল। এক রাজকার্য-সংক্রান্ত বা ধর্মপ্রচারের মহৎ উদ্দেশ্য ছাড়া বিদ্যার্জনের বিশেষ মূল্য ছিল না। সুতরাং সাধারণ মানুষের কাছে বই পড়া প্রতিদিনকার নিত্যকর্ম নয়। পণ্ডিতদের কাছেই ছিল বইয়ের আদর—গীর্জা, বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বইয়ের চাহিদা তাঁরাই জীইয়ে রেখেছিলেন।

বইয়ের চাহিদা যত কমই হোক, তবু তা সরবরাহ করে দু পয়সা আসতো বই-বিক্রেতাদের হাতে। অনুলিপিকারদের যথোচিত মূল্য দিয়ে অনেকে এ ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করলেন। বইয়ের চাহিদা বাড়ানোর জন্যে প্রথম বই-বিক্রেতারা অনেক পরিশ্রম করেছেন। তাঁরা বই নিয়ে দেশবিদেশ ঘুরেছেন, বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিদের সংগে সাক্ষাৎ করেছেন—বাড়ীবাড়ী নিয়ে গেছেন বইয়ের পশরা। মধ্যযুগের ইউরোপে ছিল এই অবস্থা। বইয়ের বড় বাজার ছিল তখন দেশবিদেশের বিখ্যাত মেলাগুলো। অন্য কেনা বেচার মধ্যে নানান দেশের বইয়ের হাট বসে যেত। দেশবিদেশ থেকে পণ্ডিতেরাও আসতেন তাঁদের অজ্ঞাত সব বইয়ের খোঁজে। ফ্রাঙ্কফুর্টে এ রকম বছরে দুটো মেলা বসতো কেবল বই নিয়েই আন্তর্জাতিক বইয়ের বাজার। বাণিজ্যের নিয়মেই বইয়ের স্বাভাবিক চাহিদা

মিটিয়ে এই রকম Stimulated চাহিদা সৃষ্টি করার কাজে খুব সচেষ্ট থাকতে হোত বিক্রেতাদের। শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণে তখনকার বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা গীর্জার শিক্ষকদের চেয়েও বই বিক্রেতাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা বেশী ছিল তা স্বীকার করতেই হবে। সাধারণের মনে পাঠস্পৃহা জাগাবার কাজে তাদের কার্যকলাপই বেশী কাজের হয়েছে। পাবলিক না থাকলেও পাবলিক লাইব্রেরীর প্রাথমিক দায়িত্ব তাঁরাই বহন করেছিলেন। বিভিন্ন বইয়ের খবর তাঁরা সাধারণের নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছিলেন। অবশ্য এ কেবল খবর টুকুই। বই সংগ্রহ করতে হোত বিশেষ মূল্য দিয়েই। এমন কি ছাপা বইয়ের প্রথম কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসে অবিশ্বাস্য দামে বই বিক্রি করা হয়েছে। বইয়ের সুলভ সরবরাহ অনেক পরের ইতিহাস।

আজকের যুগে বই পড়ার আগ্রহকে আমরা এক মোটা মাজিন টেনে দুভাগে ভাগ করে দিতে পারি। আজকের পাঠস্পৃহা মোটামুটি দুধরণের প্রয়োজন থেকে জন্ম নিচ্ছে। অ্যাকাডেমিক ও নন্-অ্যাকাডেমিক। অ্যাকাডেমিক প্রয়োজনে পাঠ্য পুস্তকের প্রসার বেড়েছে—কেনাবেচা প্রভূত বেড়েছে। স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এ চাহিদাও ক্রম বর্ধিত হারে মিটিয়ে চলেছে। আর নন-অ্যাকাডেমিক প্রয়োজন হল আজকের সভ্যতার বিশেষ Intuition। শুধু সভ্যতার উপকরণ নয়—আধুনিক যুগের বইয়ের চাহিদায় সভ্যতার বিশিষ্ট সংজ্ঞা গড়ে উঠেছে। চরিত্র গড়ে উঠেছে। আজকের সমাজে মানুষের মূল্যায়ণ অনেকটা অর্থকরী হলেও অর্থবান মানুষকেও বই সংগ্রহ করে রাখতে হয়। পড়ার স্পৃহা না থাকলেও বিত্তবানকে অভিনয় করতে হয় তার স্বল্পতম পাণ্ডিত্য নিয়েও। লোকচক্ষুর গোচরে থরে থরে সাজিয়ে রাখতে হয় বইয়ের মেলা—বন্ধু বান্ধবেরা চাহিলে উপহারও দিতে হয়। আর, বিভিন্ন কাজে কর্মে বই উপহার দেওয়া সাধারণের নাগালে আজ সবচেয়ে সুলভ উপায়। বইয়ের মধ্যে দিয়েই আজকের সমাজ ও ব্যক্তি মানসের সর্বোত্তম বিকাশ সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু মধ্যযুগে বইয়ের নন-অ্যাকাডেমিক প্রয়োজন বলে কিছু ছিল না। যা ছিল দু একজন পণ্ডিত ব্যক্তির সংগ্রহে, তাও কাজে লেগে যেত তাঁর শিক্ষকতায়—গীর্জায় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এমন কি অধিকাংশ বইয়ের বাজার নিয়ন্ত্রণ করতো স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। প্যারীতে চতুর্দশ শতকে আন্ত-র্জাতিক বইয়ের বাজার গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল প্যারী

বিশ্ববিদ্যালয়ের। প্যারীর বই বিক্রেতারা লেখকদের বই বিক্রি করে শতকরা ২ কি ৩ ভাগ মাত্র কমিশন পেতেন। কোন্‌ বইয়ের কি দাম হবে তা ঠিক করে দিতেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। লেখকেরা তাঁদের মূল বই জমা রেখে দিতেন এদের কাছে। সে বইয়ের অনুলিপি করে প্রকাশকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতেন। বিশ্ববিদ্যালয় সেই অনুলিপির পাঠ যথাযথ সংরক্ষিত আছে কিনা দেখে নিয়ে তার দাম ঠিক করে দেন। সেই দামে বাজারে বই ছাড়তে প্রকাশকেরা বাধ্য ছিলেন।⁴ এই ধরণের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ইটালীর প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল। এমন কি অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজেও ছিল। তাঁরা সময়ে সময়ে বই বিক্রি করার নানারকম আইন জারী করতেন। এর থেকে বোঝা কষ্টকর নয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বহির্ভূত বইয়ের আমদানী সম্ভব ছিল না এই সব বাজারে। বইয়ের এই সরবরাহ সম্পূর্ণ অ্যাকাডেমিক। নন অ্যাকাডেমিক প্রয়োজন এখনও গড়ে ওঠেনি—সে চাহিদা থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নাগালের বাইরে চলে যেত বইয়ের ব্যবসা।

এমন চাহিদা ইউরোপে বই মুদ্রিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তেও ছিল না। গুটেনবার্গ কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মুদ্রণযন্ত্র নির্মাণে অগ্রসর হন নি। এ কাজে হাত দেওয়ার আগে হল্যান্ডের হার্লেম এমন কি গুটেনবার্গের জন্ম শহর মেইনৎসেও কাঠের ব্লকের অক্ষর আর ছবি নিয়ে নানারকম ছাপাই কাজ চলছিল। ভগবানকে ধন্যবাদ যে তিনি আয়না তৈরী করার ব্যবসায়ে গুটেনবার্গকে অকৃতকার্য করেছিলেন। বিফল মনোরথ গুটেনবার্গ ভাগ্য পরীক্ষায় নাবলেন মুদ্রণযন্ত্র নিয়ে। আর তাঁর এই ভাগ্য নিয়ে অ্যাডভেঞ্চার ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে চিরদিন ঋণী করে রেখেছে। গুটেনবার্গের এ ঋণ নিশ্চয়ই পৃথিবী কোনদিন শোধ দিতে পারবে না। তবু প্রথম প্রথম মুদ্রণযন্ত্রের যা সম্ভাবনা তা তার আবির্ভাবের একশো বছরেও দেখা দেয় নি। মুদ্রণযন্ত্রের কাছ হতে আজ আমরা কি আশা করি? বইয়ের সহজলভ্যতা আর সুলভ সরবরাহ। প্রথম দিককার মুদ্রিত বইয়ের দাম প্রায় হাতের লেখার পুঁথির মতই ছিল। তবু ছাপাখানা থেকে যে বই বেরিয়ে আসতো তার আসল মূল্য ছিল মূল গ্রন্থের যথাযথ পাঠ সংরক্ষণে, যা লিপিকারের অনুলিপিতে প্রায়ই পাওয়া যেত না। অনেক অধ্যবসায় আর নিষ্ঠা নিয়ে কাঠের বা ধাতুর অক্ষর (type) সাজিয়ে শব্দ তৈরী করে এক একটা বই ছাপতে অনেক সময়

(৪) Publishing and Bookselling : F. A. Mumby

লেগে যেত। যাকে ইউরোপে প্রথম ছাপা বই বলে সম্মান দেওয়া হয় সেই গুটেনবার্গের বাইবেল অক্ষর সাজিয়ে ছাপা হতে প্রায় দু বছর লেগেছিল। বই ছাপার যা খরচ, বিক্রির মূল্য থেকেও তা অনেক সময়ে উঠে আসতো না। কেননা ক্রেতার অভাবের তখনও সুরাহা হয়নি। কথার খেলাপ করতে হয়েছিল গুটেনবার্গকেও। বন্ধু জোহানেস ফাস্টের (Johannes Fust) কাছ থেকে যে টাকা নিয়েছিলেন বাইবেল ছাপাবার পুঁজি হিসেবে তাও তিনি তুলে নিতে পারেন নি বাইবেল বিক্রি করে। হাতের লেখা পুঁথির সংগে ছাপা বইয়ের তখন প্রতিযোগিতাই চলতো। প্রথম যুগে গীর্জা কিংবা ধনী পৃষ্ঠপোষক কিছু কিছু মুদ্রাকর প্রকাশকদের উদ্ধারে নেমেছিলেন। বাইরের অর্থ সাহায্যের ওপর নির্ভর করে প্রথম প্রথম বই ছাপতে এগিয়ে আসতেন মুদ্রাকরেরা, এ সম্বন্ধে Mumby তাঁর Publishing and Bookselling বইতে দেখিয়েছেন যে প্রথম যুগের প্রকাশকদের অসহায় অবস্থার উন্নতি বিধানে প্রধান সহায়ক ছিল বিভিন্ন চার্চ গোষ্ঠী। অবশ্য বিনা স্বার্থে চার্চের অর্থসাহায্যের উদ্যোগ ছিল না, তাঁরা প্রচুর টাকাকড়ি দিয়ে ধর্ম সংক্রান্ত বই ছাপাতেন আর সস্তায় জনে জনে পৌছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। চার্চ গোষ্ঠি ছাড়াও দেশ বিদেশের রাজা জমিদারেরা ছাপাখানার পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন। তাঁরা হয় টাকা দিতেন নয়তো ছাপা বইয়ের অধিকাংশ কিনে নিতেন। ইংলণ্ডের প্রথম মুদ্রাকর ক্যাক্সটন (William Caxton : জন্ম ১৪২০ খৃষ্টাব্দ) খোদ ইংলণ্ডেশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তাঁর ছাপাখানার স্বামী গোরীসেন ছিলেন, আর্ল অব আরুণ্ডেল। সমুদ্রিত Legends of Saints নামের বইতে ক্যাক্সটন কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে গেছেন।

"I have submysed [Submitted] myself to translate into English the Legend of Saints, Called "Legenda area" in Latin ; and William, Earl of Arundel, desired me and promised to take a reasonable quantity of them and sent me a worshipful gentleman, promising that my said lord should during my life give and grant me a yearly fee, that is to note, a book in Summer and a doe in Winter.

প্রকাশকেরা সাহস করে এগোতে পারতেন না যে-কোনো বই ছাপার ব্যাপারেই। এগোলে নির্ঘাত অপব্যয়। আগে গোরীসেন ঠিক করে তবে তাঁরা কোমর বাঁধতেন। তাই প্রথম যুগে যা ছাপা হয়েছিল তা সবই ধর্ম

সংক্রান্ত আর অ্যাকাডেমিক প্রয়োজনে। প্রথম ছাপা বইগুলোর মধ্যে ছিল, কিছু মধ্যযুগীয় পাঠ্যপুস্তক, ক্লাসিক জাতীয় গ্রন্থ, ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত বই, আর রোমান আইনের বই।[৫] এ সবই হয় গীর্জা নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে। নন-অ্যাকাডেমিক প্রয়োজনে উদ্যোগ ব্যয় করা নিরর্থক ছিল। এ ধারণার পরিবর্তন করতে গীর্জা বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনেক শতাব্দী কেটে গিয়েছিল। যতদিন তাদের হাতে নিরংকুশ ক্ষমতা ছিল ততদিন মুদ্রণযন্ত্রের অশেষ সম্ভাবনা মুক্তি পায়নি। লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষুধার উপকরণ ছাপাখানার অন্ধকারে লুকিয়েছিল। এ অন্ধকার সৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্ররোচনা ছিল বিভিন্ন চার্চ গোষ্ঠির। মধ্যযুগে রাজশক্তির ওপরেও তাদের প্রভূত ক্ষমতা ছিল। কি বই ছাপা হবে না-হবে সেখানেও তারা খবরদারী করেছে। এমন কি গুটেনবার্গের নগরে বসেই ছাপাখানার পঞ্চাশ বছর যেতে না যেতে আর্চবিশপ বার্থোল্ড ভন হেনেবার্গ (১৪৮৪—১৫০৪) ফ্রাঙ্কফুর্টে বইয়ের হাটে আইনজারী করার নির্দেশ দিলেন। আর্চবিশপের উপদেশে মেইন্‌ৎসে আর ফ্রাঙ্কফুর্টে সেন্সর অফিস তৈরী হল। ছাপা বইয়ের ওপর প্রথম সেন্সর অফিস। গীর্জার নির্দেশ মেনে ঠিক করা হবে কোন্ বই আইন সংগত আর কোন্ বই বেআইনী। ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যের স্থান হোল না ছাপা বইয়ের জগতে। এমন আশ্চর্য গোঁড়ামীও ছিল, যে, বাইবেলকে ভাষান্তরিত করা চলবে না।[৬] ইউরোপের দেশে দেশে রেনেশাঁসের পরেও অজস্র সেন্সর বসেছে মুক্ত জ্ঞানের রাজ্যে। নন-অ্যাকাডেমিক স্তরে বইয়ের স্বাধীন চাহিদা সমস্ত রকমভাবে বাধাপ্রাপ্ত ছিল। ফ্রান্সের আশ্চর্য খবর দিয়ে স্টাইনবার্গ বলছেন :

Nearly all the Great works by which French Eighteenth Century creative literature is remembered had to be printed outside France or under a feignd imprint.

(S. H. Steinberg : Five Hundred Years of Printing : পৃ ১৮১)

এমন কি ভল্টেয়ারকে পর্যন্ত কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

তখনকার মানুষের সময় ছিল অল্প। দিনের অধিকাংশ সময় কেটে যেত জীবিকার্জনে। আর জীবিকার্জনের তাগিদেই যা কিছু বিদ্যার্জনের স্পৃহ। এমন তাগিদ তখনকার ইউরোপে কজন মানুষেরই বা ছিল? নিরক্ষর থেকেও উদয়াস্ত

(৫) R. L. Duffus : Encyclopædia Of Social Sciences.

(৬) S. H. Steinberg : Five Hundred years of Printing পৃঃ ১৭৯

পরিশ্রম করে কৃষির কল্যাণে দু'পয়সা আয় করা যেত। কিছুটা সরকারী চাকরীর মোহে বা দূরদুরান্তে বাণিজ্যে লক্ষ্মী লাভের আশায় বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম লেখাতে হোত। পণ্ডিত হবার বাসনা যাদের ছিল তাদের টানেই মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা আসে নি। তাঁরা এমন কোনো চাহিদার সৃষ্টি করতে পারেন নি যাতে রাতারাতি, ছাপাখানায় বিপ্লব ঘটে যেতে পারে। ছাপাখানায় বিপ্লব ঘটেছে অষ্টাদশ— ঊনবিংশ শতকে। এক পরিবর্তিত সামাজিক পরিবেশে। সাহিত্য যেদিন রাজসভা কি ধর্মসভার মুখাপেক্ষী ছিল সেদিন লক্ষ মানুষের উপায় ছিল না ছাপাখানার দায়িত্ব গ্রহণ করা। সাহিত্য জনসভায় স্থান করে নিল এই সেদিন, যেদিন থেকে শিল্প বিপ্লবে সামাজিক পরিবেশে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হোল। মাটির কঠিন আকর্ষণ মুক্ত হয়ে নতুন দুনিয়ায় হাজার হাজার মানুষ বেরিয়ে পড়লো বিচিত্র জীবিকা সন্ধানে। কলে কারখানায়, ব্যবসা বাণিজ্যে কিংবা হঠাৎ খোঁজ পাওয়া সোনার আশায় স্বদেশ-স্বভূমি যারা ছেড়ে গিয়েছিল তাদের বংশধরেরাই এক স্বর্ণময় যুগের আকস্মিক আবির্ভাবে উদ্বাস্নান করলো।

শিল্প বিপ্লব যেন আলাদীনের প্রদীপ। নতুন জীবিকাপ্রয়াসী মানুষের স্বচ্ছলতা যেমন বাড়িয়েছিল তেমনি দিয়েছিল অবসর সময়। মানুষের হাতে কিছু নিশ্চিন্ত অবসর। যে সুযোগে মানুষ চিন্তা করে—কিংবা চিত্তবিনোদনের উপায় খোঁজে। তা ছাড়াও নতুন জীবিকার তাগিদে বিদ্যার্জনের প্রয়োজনীয়তাও অপরিহার্য হয়ে উঠলো। চাহিদা বাড়লো অনেক গুণ। জ্ঞানের নানান ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হোল। সে চাহিদায় সৃষ্টি হোল নতুন যুগের নতুন পাঠ্য পুস্তক। অ্যাকাডেমিক প্রয়োজন ছাড়াও নবযুগের জীবনধারা, নবযুগের কৃষ্টি স্বরূপ বুঝে নেওয়ার প্রয়োজনে সে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক নন অ্যাকাডেমিক জগতেও গৃহীত। এই প্রথম এমন এক শ্রেণীর উদ্ভব হোল যারা বিদ্যালয়ের গণ্ডীর বাইরে বইয়ের আগমনকে স্বাগত জানালো—যারা ধর্মচর্চার গম্ভীর পরিবেশ ছিন্ন করে নিছক চিত্তবিনোদনে বইয়ের স্বার্থকতা প্রমাণ করলো। রাজসভা, ধর্মসভা আর অভিজাততন্ত্রের করুণার আশ্রয়চ্যুত করে জনসভায় রাজসিংহাসন দিল।

শিল্প বিপ্লবের অনেক সুফল। উন্নত যান্ত্রিক শক্তির সংগে ছাপাখানায় যেদিন যোগাযোগে ঘটলো সেদিন ইতিহাসের আর এক স্মরণীয় মুহূর্ত। এতদিন কাগজ যা পাওয়া যাচ্ছিল তা হস্ত-শিল্পে। হ্যাণ্ডমেড পেপার। শিল্প বিপ্লবে যন্ত্র এল—যন্ত্রের কল্যাণে কাগজের সুলভ সরবরাহ। মুভেবল্‌ টাইপ আর সহজলভ্য সাদা কাগজের যোগাযোগে সম্পূর্ণ এক নতুন জগতের প্রতিশ্রুতি।

এক নবতর জন্ম-সম্ভাবনা। স্টাইনবার্গ বলেছেন : The Industrial Revolution had created a new public of great wealth who, in the second generation, were eager to fill the gaps in this intellectual and literery education (Steinberg : পৃ: ১৮৯)। ফলে এক বুদ্ধিদীপ্ত সংস্কার মুক্ত জগতের উদ্বোধন হোল। মানবজীবনের নতুন সংগীত সুরু হোল। সে সংগীতের প্রধান যন্ত্র হোল ছাপাখানা। অষ্টাদশ শতক থেকে উনিশ শতকের আগমন নতুন দিনের প্রভাতে কোনো গতানুগতিক সূর্যোদয় নয়। এ যেন এক অতুলনীয় লাফিয়ে চলা। স্টাইনবার্গ বলেছেন : It was not a break but rather a certain leap forword. It affected the technique of printing, the methods of publication and distribution, and the habit of reading. (Steinberg : পৃ ১৮৮)

শিল্প বিপ্লবের প্রধানতম সুফল নিশ্চয়ই এই habit of reading, বই পড়ার আগ্রহ। নতুন আবিষ্কার তখন বই তৈরীর খরচ কমিয়ে এনেছে। বই বাঁধাই সুলভ করেছে। আর মানুষের অবসর বেড়েছে, বেড়েছে জ্ঞানস্পৃহাও। অক্ষর পরিচয় থেকে সাধারণ মানুষ আরো বেশীদূর অগ্রসর হয়েছে। আমরা জানি, সমাজ· প্রগতির উপকরণ প্রধানত দুটি জিনিষের ওপর নির্ভরশীল। Institution আর Innovation, সামাজিক পরিবেশ আর সমাজ প্রগতির নয়া হাতিয়ার। বইয়ের দুনিয়াও এই দুটি জিনিষের সাহায্য পেয়েছিল। নতুন বুদ্ধিজীবী মানুষের সমাজ আর power press। নতুন মধ্যবিত্ত মানুষের দল অ্যাকাডেমিক চাহিদার সংকীর্ণ বেড়া ভেঙে দিল। জলোচ্ছ্বাসের আহ্বান ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে। গীর্জা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের খবরদারী টুটলো। সেন্সরশিপের যখন তখন গলা টিপে ধরা ঘুচলো। জার্মানীর প্রকাশকেরা এই প্রথম (১৮২৫ শতকে) দৃপ্তকণ্ঠে শোনালেন : Since the book trade is the territory of the republic of letters, only a free constitution is suitable to the book trading profession (Steinberg : পৃ: ২১১)।

বই প্রকাশ করার স্বাধীনতা চাই; কেননা, মানুষের অবসর বেড়েছে— জ্ঞানস্পৃহা বেড়েছে হাতে তার উদ্বৃত্ত অর্থও আছে। প্রায় চারশো বছর তাকে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বসে থাকতে হয়েছিল গীর্জা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের করুণাপ্রার্থী হয়ে। সাধারণ মানুষ কখনও তার ডাকে সাড়া দিতে পারেনি। সাধারণের মনের মত খোরাকও জোটে নি। বইয়ের অসম্ভব দামে সখ করে তার কাছে ঘেঁসাও যেত না। বই পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব-মুদ্রণযন্ত্রের। শিল্প

বিপ্লবে তাই তার ঝড়ের চাঞ্চল্য। তার কর্মচাঞ্চল্য পাঠককুলের আগ্রহ বাড়িয়েছে। বাড়িয়েছে তার সংখ্যাও। অ্যাকাডেমিক পরিবেশের বাইরে তার বাজার আগের চেয়ে সহস্র গুণে বেড়ে গেছে। গুটেনবার্গের স্বপ্নেরও যা অতীত ছিল তার থেকেও স্বল্পতর মূল্যে আর লক্ষগুণ সংখ্যায় বইয়ের সরবরাহ বেড়ে গেছে।

গুটেনবার্গ কি উত্তর দিতেন জানিনা যদি তাঁকে জিজ্ঞেস করা হোত, তাঁর মুদ্রণযন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি? সেদিনের কোন প্রকাশক-মুদ্রাকর নিশ্চয়ই এ প্রশ্নের সম্মুখীন হন নি। আজকে এ প্রশ্ন নির্মম হয়ে এক উত্তুংগ সমস্যার মত আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। অবশ্য এ প্রশ্নের জবাব দেবার দায় আজ আর গ্রন্থকার, প্রকাশক কি মুদ্রাকরের নেই। বই পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি করার দায়িত্ব নিয়েছে গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার আজ মুদ্রাকর প্রকাশকদের সহায়ক এবং মুক্তিদাতাও বটে। কেননা, বই যত সুলভ আর সহজলভ্য হোক না কেন, পৃথিবীর সকল শিক্ষিত মানুষ তার প্রয়োজনমত সমস্ত বই কোনদিনই তার নিজস্ব সংগ্রহ শালায় কিনে রাখতে পারবে না। এমন একটা মারাত্মক সম্ভাবনার কথা নিশ্চয়ই প্রকাশক মুদ্রাকরেরা ভাবছেন না। যাঁদের ভাবিয়ে তুলেছে তাঁরা হলেন গ্রন্থাগারিক। কেননা মানুষের চাহিদামত বই সংগ্রহ করে দেওয়ার দায়িত্ব আজ তাঁদের। মুদ্রণযন্ত্র পাঁচশো বছর আগে যে ক্ষুধার সৃষ্টি করেছিল তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও আজ তার স্বপ্নেরও অগোচর। শিক্ষিত দুনিয়ার দিকে তাকালে দেখতে পাবো মানুষের চাহিদা কি দ্রুতগতিতে বেড়ে গেছে। এ যেন মন্ত্রের বলে "অ্যারাবিয়ান নাইট্‌সের" সেই দৈত্য; যে বোতলের ছিপি খুলে বেরিয়ে পড়েছে—আর যাকে বোতলে ভরে রাখার চাবিকাঠি গেছে হারিয়ে। ভগবানকে ধন্যবাদ যে আজ প্রকাশক-মুদ্রাকরেরা নিজেরাই এক একজন গৌরীসেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র নাকি কোনও স্বদেশী প্রকাশককে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করেছিলেন, যিনি তাঁর কালে এদেশেতেই বই বিক্রি করে মোটর গাড়ী চড়ার সংগতি করেছিলেন। জীবিত থাকলে আচার্য রায় হয়তো এর চেয়ে আরও চমকপ্রদ ঘটনাও দেখে যেতে পারতেন।

কিন্তু সেই চমকপ্রদ ঘটনাগুলো যতই ঘটতে থাকবে আমাদের সমস্যা ততই বাড়বে। আমরা অবশ্যই প্রকাশকদের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতে ঈর্ষা করি না। মানুষের বই পড়ার ক্রমবর্ধমান আগ্রহের দিকে তাকিয়ে— ভবিষ্যৎ চাহিদার কথা ভেবে আমরাও পুলকিত। তবু নিশ্চিত, চাহিদামত বই যোগানোর বৈজ্ঞানিক

ব্যবস্থায়—যে কথা আগেই বলেছি—বই পড়ায় বিশাল চাহিদা আজ সাধারণ মানুষের অর্থ সামর্থ্যের বাইরে। এবং আগামী নতুন দুনিয়ার হিসেবমত অর্থ স্বাচ্ছল্য ঘটলেও বই পড়ার চাহিদা বেড়ে যাবে আরো ঢের বেশী। একথা ঠিকই যে জল সরবরাহ কি বিদ্যুৎ সরবরাহ আজকের সভ্যতার অপরিহার্য অংগ। চাহিদামত বই যোগানোও কি আজকের সমাজের এক অত্যাবশ্যক দাবী নয়? তবে জল বা বিদ্যুৎ চাহিদার চেয়েও বইয়ের চাহিদা ঢের দ্রুতগতি সম্পন্ন। এবং কোনদিনই হয়তো তা static হবে না। তাই সাধারণের দায়িত্বের সংগেও সরকারের দায়িত্ব আমরা কামনা করি। পৃথিবীর অনেক সভ্যদেশে অজস্র গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব আজ সরকার নিয়েছে। (দোহাই আপনার। আমি স্বদেশী সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রচার কার্য চালাচ্ছি না। আমি শুধু ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারগুলির অবস্থার কথা বিবেচনা করছি।) ভবিষ্যতে এ চাহিদা কি আকার নেবে তার এক সম্ভাব্য রূপ চিন্তা করেছেন ডেভিড ক্লিণ্ট যিনি অধুনা আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিশনের এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী। ভবিষ্যতের কথা তিনি এই রকম ভেবেছেন: "আগামী দশকে আমাদের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে ছাত্র সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। এর সংগে যদি শিল্প ব্যবস্থায় অটোমেশন চালু হওয়ার সম্ভাবনা যোগ দিই, তাহলে আমাদের শিল্পকার্যে নতুন দক্ষতা অর্জনের জন্যে আরো জ্ঞানার্জন করতে হবে। তখন আর মানুষকে যন্ত্রের পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকতে হবে না। যন্ত্রের পরিচর্যা যান্ত্রিক নিয়মেই হবে। ফলে মানুষের আগের থেকে পড়াশুনোর প্রয়োজন বেড়ে যাবে। প্রচুর অবসর জুটবে। আমাদের লোক সংখ্যাও বাড়বে এবং আমরা হয়তো অনেকদিন পর্যন্ত বাঁচবো।" (A L. A. Bulletin : June 1957)।

বিংশ শতাব্দীর নতুন শিল্প যুগে তিনি অটোমেশনের কথা ভেবেছেন। অটোমেশন চালু হলে আরো কম পরিশ্রমে মানুষের জীবিকা নির্বাহ হবে। অর্থাৎ মানুষের হাতে জমবে আরো উদ্বৃত্ত অবসর। শিল্পব্যবস্থার ক্রমজটিলতায় তার ত্রুটিহীন পরিচালনার জন্য ক্রমাগত শিক্ষা ও পুনর্শিক্ষার প্রয়োজন হবে। এমনিতেই স্কুল কলেজে ছাত্র সংখ্যা বাড়ছে। শিক্ষার প্রসার ঘটছে, প্রসার ঘটছে জনসংখ্যারও। চিকিৎসাবিজ্ঞার কল্যাণে আমাদের আয়ুষ্কালও বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং জনসংখ্যার সংগে তার অবসর সময়ও বেড়ে চলেছে। শিল্পব্যবস্থা অনেক উন্নত বলেই আজকের আমেরিকা নিকটাগত এই ভবিষ্যতের চিন্তায় মগ্ন। কিন্তু একটা দেশের পক্ষে আজ যা সত্য পৃথিবীর সমস্ত দেশেও একদিন তা বাস্তব

হয়ে দেখা দেবে। অবসর যাপনে বা শিক্ষার সার্থকতায় পুস্তকের এই সম্ভাব্য চাহিদার কথা ভেবে আমেরিকায় আজ Library Services Act আইনে পরিণত হতে চলেছে। ডেভিড ক্লিফ্‌ট বলছেন : "লাইব্রেরী সার্ভিসের আইনের বলে গ্রামে গ্রামে যেখানে কোনো লাইব্রেরী নেই, বা যেখানকার ব্যবস্থা পর্যাপ্ত বলা চলেনা সেখানেই গ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে। প্রাদেশিক সরকার যেখানে অর্থাভাবে সংগতিহীন, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার তার সমস্ত সমস্ত সামর্থ্য নিয়ে অগ্রসর হবে।" (A. L. A, Bulletin : June 1957)।

বইয়ের চাহিদার কথা ভেবে বিরাট এক যুগোপযোগী রাজসূয় যজ্ঞে মার্কিন সরকার হাত দিতে চলেছেন। আমরা কল্পনাই করতে পারিনা কতখানি দুরুহ এই দায়িত্বভার। কত গুরুত্বপূর্ণ এই কল্পনা, আমাদের শিল্পব্যাবস্থায় অটোমেশন চালু হতে হয়তো দেরী আছে। তবু আজ পুস্তকের সামান্য চাহিদা, এমনকি বড় বড় শহরেও, অসহ্য পরিকল্পনাহীন সরবরাহে দুর্বল। লাইব্রেরী করা তো দূরের কথা (ভবিষ্যতের কথা) এমন কি Delivery of Books Actও এদেশে কার্যকরী নয়। কেননা আইন মানা না মানা প্রকাশক মুদ্রাকরদের হাতে—এমন অভিজ্ঞতা আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারের নিশ্চয়ই আছে।

'কেও ভাও' কি গুটেনবার্গ যা ভাবেন নি, আজ আমাদের তা ভাবতে হচ্ছে। এ ভাবনাকে আমরা আশীর্বাদ স্বরূপই ধরে নিয়েছি। কেননা বই না পড়ে আমরা সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে পারবো না; বই আমাদের নিত্যসংগী অপরিহার্য সংগী। এবং বই আমাদের এমনতরো বন্ধু যে কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। একথা মেনে নিয়েই আমাদের বইয়ের বিশাল চাহিদা আর সরবরাহের কথা যথেষ্ট ভাবতে হবে। এবং সংগে সংগে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব প্রসংগে স্মরণ রাখতে হবে ডেভিড ক্লিফ্‌টের এই সুন্দর কথাগুলো : The library must be prepared to change as society changes; it must improvise, it must constantly study its community in order to anticipate and meet its needs. Perhaps in the broadest concept the role of the library is to serve as the memory and conscience of the mankind, to record his failures and his triumphs, to keep for all to see his errors and tragedies, his goodnesses and even his crimes; to serve freely the inquiring mind; to lend the solace of great thoughts and to give guidance in practical affairs, to record mankind's experiments so that the next generation does not have to start all over again; to remind man of his heritage while helping him create the heritage he leaves behind.

পরিষদ কথা

বার্ষিক সাধারণ সভায় নূতন সংসদ নির্বাচন

গত ২০শে অক্টোবর অপরাহ্ণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও ১৯৫৭ সালের সংসদ ও কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত হন। পরিষদ সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু পৌরোহিত্য করেন।

বিগত বছরের কার্যবিবরণী ও হিসাব পরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও উদ্বর্ত পত্র পরিষদ সচিব শ্রীফণিভূষণ রায় সভায় উপস্থাপিত করিলে তাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পরবর্তী বছরের সংসদ সদস্য-পদগুলির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। কোনও কর্মকর্তা পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় নি। নিম্নলিখিত সদস্যগণ নির্বাচিত হয়েছেন:

সভাপতি

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু

সহ-সভাপতি

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীতিনকড়ি দত্ত
শ্রীজে, এম, মজুমদার ও শ্রীবি, এস, কেশবন

সচিব

শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস

যুগ্ম সচিব:
শ্রীঅরুণকান্তি দাশগুপ্ত

সহঃ সচিব:
শ্রীগনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

কোষাধ্যক্ষ:
শ্রীফণিভূষণ রায়

গ্রন্থাগারিক:
শ্রীঅশোক বিশ্বাস

পত্রিকা সম্পাদক

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সংসদের ব্যক্তিগত সদস্য, দাতা ও আজীবন সদস্যগণের প্রতিনিধি

শ্রীঅমল সরকার
শ্রীআশীষকুসুম ঘোষ
জনাব আসাদআলি
শ্রীমতী বাণী বসু
শ্রীবিজয় সেনগুপ্ত
শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়
শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিরঞ্জন সান্যাল
শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু
শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশিবরঞ্জন ঘোষ

প্রতিষ্ঠানিক সদস্যগণের প্রতিনিধি

বাঁকুড়া (১টি আসন)—সমদর্শ নেতাজী লাইব্রেরী, পাত্রসায়র
বীরভূম (১টি আসন)—অনুশিলী লাইব্রেরী সিউড়ি
বর্ধমান (১টি আসন)—জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, জাড়গ্রাম
কলিকাতা (২টি আসন)—মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী, খিদিরপুর
সুবোধবন রিডিং ক্লাব, বেলিয়াঘাটা
কুচবিহার (১টি আসন) প্রিন্স ভিক্টর নৃপেন্দ্রনারায়ণ ক্লাব, ভলনিবাড়ী
হুগলী (২টি আসন)—গুরুপদ সুরেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার
ইয়ং মেনস এসোসিয়েসন বৈদ্যবাটি
২৪ পরগণা—(১টি আসন) দমদম লাইব্রেরী ও লিটারারী ক্লাব, দমদম
মুর্শিদাবাদ (১টি আসন)—লালগোলা এম, এন, লাইব্রেরী
হাওড়া (১টি আসন)—মাধব মেমোরিয়াল লাইব্রেরী
মেদিনীপুর (১টি আসন)—রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার
মালদহ—(১টি আসন) তরুণ সঙ্ঘ, কোতোয়ালি, ওল্ড মালদা
দার্জিলিঙ—(১টি আসন) ব্লুমফিল্ড পাবলিক লাইব্রেরী, দার্জিলিং

সভায় বিবিধ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন ও আলোচনা করেন সর্বশ্রী বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রমোদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতির প্রতিনিধি, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি দত্ত, মনোমোহন লাহিড়ী, অভয়কুমার সরকার, গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

গ্রন্থাগার-সংবাদ

কিশোর কল্যাণ পাঠাগার পরিষদ ॥ কলিকাতা।

গত ১৫ই আগষ্ট হতে ১৮ই আগষ্ট পর্যন্ত কিশোর কল্যাণ পাঠাগার পরিষদের উদ্যোগে একটি সেমিনার ও তদুপলক্ষে শিশু ও কিশোর গ্রন্থের এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীচারুচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীঅসিতকুমার ঘোষ যথাক্রমে সেমিনার ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্বশ্রী বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, নিখিলরঞ্জন রায়, কালীমোহন ভাদুড়ী প্রভৃতি উপস্থিত থাকেন। প্রতিনিধি হিসাবে বহু কর্মী সেমিনারে যোগদান করেন। সংগীত, আবৃত্তি, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ছাড়াও এতদুপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকাটি সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

জীবন মিলন লাইব্রেরী ॥ ২০ ডবল্যু, সি, ব্যানার্জী রোড ॥ কলিকাতা।

গত ২২শে সেপ্টেম্বর কেশব একাডেমী ভবনে বিধান সভা সদস্য শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থের পৌরোহিত্যে গ্রন্থাগারের ৪২তম বার্ষিক সভা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। অনুষ্ঠানে সমবেত সুধীজনদের স্বাগত জানিয়ে সম্পাদক শ্রীরামচন্দ্র ভড় দেশের সাংস্কৃতিক সঙ্কটের উল্লেখ করে বলেন যে মানুষের মধ্যে নতুন আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধের মূলমন্ত্রে দেশে নব জাগরণের প্রয়োজন। সম্পাদক বার্ষিক কার্যবিবরণ সভায় উপস্থাপিত করেন। গ্রন্থাগার সভাপতি শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে তাঁর ভাষণে গ্রন্থাগারের ক্রমবর্ধমান কার্যক্রমের সাফল্যের জন্যে সককের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। সভার শেষে আয়োজিত এক বিচিত্রানুষ্ঠানে বহু প্রখ্যাত শিল্পী ছাড়াও স্থানীয় উদীয়মান শিল্পীরাও যোগদান করেন। এতদুপলক্ষে শ্রীনীলরতন বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত স্মরণী পত্রিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সভায় ১৯৫৬-৫৭ সালে পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

দক্ষিণ কলিকাতা তরুণ সমিতি ॥ ৬সি, ইন্দ্র রায় রোড ॥ কলিকাতা।

সমিতি বর্তমান বছরে বত্রিশে পদার্পন করল। সমিতির বার্ষিক কার্য বিবরণীতে জানা গেল গৃহ নির্মাণ তহবিলে ১১৩০।৵০ সংগৃহীত হয়েছে। বই ও পত্র পত্রিকা বাবত সমিতি গত বছর ৫৮৭।০ খরচ করেন। সমাজ সেবা ও নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে বন্যার্তদের সাহায্য, হাতে লেখা পত্রিকার প্রকাশ, শিশু চিত্র প্রদর্শনী ও তিন দিন ব্যাপী এক সাহায্য অনুষ্ঠানের আয়োজন বিগত বছরের কার্যবলীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত সমিতি একটি কিশোর বিভাগ পরিচালনা করেন।

মহাজাতি পাঠাগার ॥ ১১৬এ, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা।

গত ৯ই আগস্ট মহাজাতি পাঠাগারের ৪র্থ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। বার্ষিক কার্যবিবরণী ও আয়ব্যয়ের হিসাব দান প্রসঙ্গে সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ দত্ত জানান যে পাঠাগার বর্তমান বছর হতে বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদ কর্তৃক শিক্ষা ও পরীক্ষা কেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এতদুপলক্ষে ৮ই আগস্ট এক চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও ৯ই আগস্ট প্রত্যূষে শহীদ বেদীতে মাল্যার্পণ ও সন্ধ্যায় শ্রীগোপীনাথ সেনের সভাপতিত্বে জাতি গঠনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিষয়ে এক আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

যতীন দাস স্মৃতি পাঠাগার ॥ ১৮৪এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড ॥ কলিকাতা।

কালীঘাট তরুণ সংঘের (যতীন দাস স্মৃতি পাঠাগার) সভ্য সভ্যাবৃন্দ অত্যন্ত গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে ১৩ই সেপ্টেম্বর শহীদ যতীন দাস দিবস পালন করেন। সকালে শহীদ যতীন দাস পার্কে শহীদের মর্মর মূর্তিতে সংঘ সভাপতি অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য মাল্যদান করেন। কেওড়াতলা শ্মশানে স্মৃতি মন্দিরে কলিকাতার মেয়র ডক্টর ত্রিগুণা সেনের সভাপতিত্বে এক স্মৃতি সভায় সংঘের সভ্য সভ্যারা যোগদান করেন।

সন্ধ্যায় শহীদের স্মৃতি বিজড়িত সংঘ পাঠাগারে একটি স্মারক সভায় সংঘ সভাপতি অধ্যাপক ভট্টাচার্য সভাপতিত্ব করেন। শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তিনি বলেন, তরুণ সংঘ অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত শহীদের আদর্শকে জাগিয়ে রেখেছেন। শ্রীহরিদাস মিত্র সভায় বক্তৃতা করেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীরবি রায়

১৩ই সেপ্টেম্বরের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া ১৯২৯ সালের ঘটনাবলী বর্ণনা করেন। নির্বাচিত সভাপতি শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ অসুস্থতা হেতু সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁর লিখিত ভাষণে তিনি যতীন দাসের স্মৃতি যজ্ঞে তরুণদের সত্যকার জীবন দানের সংকল্প গ্রহণ করিতে বলেন।

সুবারবন রিডিং ক্লাব ॥ ৩৩, তালপুকুর রোড ॥ কলিকাতা।

ক্লাবের গত ২৪শে ফেব্রুয়ারীর বার্ষিক কার্য বিবরণীতে প্রকাশ যে বিগত বছরে প্রায় ২২ হাজারের মত বই ইস্যু করা হয়। তন্মধ্যে ১৭ হাজার ছিল উপন্যাস ও ডিটেকটিভ বই। ক্লাবের কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায় উপন্যাস ব্যতীত অন্যান্য পুস্তকের চাহিদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তদনুযায়ী গত বছর গ্রন্থনির্বাচন করা হয়। আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে গ্রন্থাগারের গ্রন্থ বর্গীকরণ ও লেনদেন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে।

নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার ॥ নবদ্বীপ ॥ নদীয়া।

পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ১৪ই আগস্ট হতে চারদিন ব্যাপী এক উৎসবানুষ্ঠান হয়। প্রথম দিন পৌরোহিত্য করেন শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারের ইতিহাস প্রসঙ্গে সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি দত্ত এ জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলন কার্যে নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। অন্যান্য দিনের অনুষ্ঠানে সংগীত প্রবন্ধ-পাঠ ও নানাবিষয়ে বক্তৃতা ও জয়ন্তী উপলক্ষে স্থানীয় খ্যাতনামা লেখকদের গ্রন্থাদিসহ একটি গ্রন্থ ও প্রাচীরপত্র প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। চতুর্থ দিনে নবদ্বীপ থানার গ্রন্থাগার কর্মীরা এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে নানা সমস্যা ও নিজেদের মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্কের বিষয় আলোচনা করেন।

বিবেকানন্দ পাঠাগার ॥ ধর্মদা ॥ নদীয়া।

গত ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এক উৎসবানুষ্ঠান হয়। সভাপতিত্ব করেন ডাঃ সদানন্দ মজুমদার। উক্ত দিনে পাঠাগারে একটি নৈশ বিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সাহা। বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে গড়ে দৈনিক ১৫ জন অধ্যয়ন করে।

বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির ॥ গড়জয়পুর ॥ পুরুলিয়া।

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে নতুন কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। সম্পাদক উমাপদ হালদার; সহকারী সম্পাদক: মনোরঞ্জন দাসগুপ্ত, পর্যবেক্ষক: বীরেন্দ্রনারায়ণ সিং দেও; গ্রন্থাগারিক: বদনচন্দ্র ভাণ্ডারী; সহঃ গ্রন্থাগারিক কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার। বিগত ৬ঠা অক্টোবর শ্রীরঘুনন্দন সিং দেও-এর সভাপতিত্বে এক বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার ॥ জাড়গ্রাম ॥ বর্ধমান।

পাঠাগারের উদ্যোগে শারদোৎসব উপলক্ষে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর হতে ৯ই অক্টোবর পর্যন্ত পঞ্চম বার্ষিক কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মহিলা ও বালক-বালিকাগণের হস্তশিল্প ও অঙ্কিত চিত্র ছাড়াও কৃষিজাত দ্রব্য, পত্র পত্রিকা, প্রাচীন গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রাদি, আলোকচিত্র ও প্রাচীর পত্রে প্রদর্শনীটি সুশোভিত হয়। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন শ্রীশান্তিপ্রকাশ ব্রহ্মচারী। বিভিন্ন দিনে লোকনৃত্য, সংগীত ও অভিনয়াদির আকর্ষণে উৎসবে বহু জন-সমাগম হয় - আনন্দ-মুখরিত হয়ে ওঠে সমগ্র অঞ্চল। উৎকৃষ্ট শিল্প নিদর্শনের জন্য কয়েকজন শিল্পীকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

বাসুদেব গ্রন্থাগার ॥ সোনামুখী ॥ বাঁকুড়া।

বাসুদেব আশ্রম প্রাঙ্গণে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর গ্রন্থাগারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রচনা প্রতিযোগিতার পারিতোষিক বিতরণ করা হয়। সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন সর্বশ্রী সুখচন্দ্র রায় ও বিশ্বেশ্বর দাস, শ্রীমতী ভারতীরাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশিশিরকুমার আচার্য ও শ্রীদিলীপকুমার সামন্ত রচনা প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভাষণ ছাড়াও সভায় সংগীতানুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা হয়।

জুবিলী লাইব্রেরী ॥ সিউড়ি ॥ বীরভূম।

গত ২৫শে আগস্ট জুবিলী গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌর ভবনের ৫৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। বক্তৃতা নৃত্য ও সংগীতে উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হয়। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের ৮১তম জন্মবার্ষিকী উৎসব গত ৩১শে

ভাদ্র গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন জেলার বিচারপতি মাননীয় শ্রীফটিকচন্দ্র রায় চৌধুরী। এদিনের অনুষ্ঠানেও প্রধান আকর্ষণ ছিল সমাগত সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ভাষণ ও সংগীত পরিবেশন।

মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ॥ বহরমপুর ॥ মুর্শিদাবাদ।

৮ই অক্টোবর মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার সমিতির লাইব্রেরী কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভা গ্রন্থাগারের হল ঘরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তা শ্রী এ, কে, দত্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। জেলা সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিক ও জেলা গ্রন্থাগারের সেক্রেটারী শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত সম্পাদকের বিবরণী পাঠ করেন এবং গত বৎসরের আয়ব্যয়ের হিসাব নিকাশ এবং বর্তমান বৎসরের বাজেট উপস্থাপিত করেন। বর্তমান বৎসরের জন্য শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী সহ-সভাপতি পুনঃ নির্বাচিত হন। গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা বৃদ্ধি ও কয়েকটি বিষয় লইয়া আলোচিত হয় এবং কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাপতির ভাষণের পর সভা ভঙ্গ হয়।

গুড়াপ সুরেন্দ্র-স্মৃতি পাঠাগার ॥ গুড়াপ ॥ হুগলী।

গত ২২শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে রমণীকান্ত বিদ্যায়তন প্রাঙ্গণে গুড়াপ সুরেন্দ্র-স্মৃতি পাঠাগারের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবানুষ্ঠানে প্রায় দেড় হাজার লোকের উপস্থিতি বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। স্থানীয় রমনীকান্ত বিদ্যায়তনের প্রধান-শিক্ষক শ্রীভবানীশঙ্কর ভট্টাচার্য সমাগত অতিথিবর্গকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। পাঠাগারের সভাপতি শ্রীসন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে পাঠাগারের সাধারণ ও কিশোর বিভাগের মোট সদস্য সংখ্যা ২০৩ জন, মোট পুস্তক সংখ্যা ১৫০৮ এবং বার্ষিক আয় মোট টা. ১২২৯৵০ আনা। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পরিচালনায় প্রায় সাড়ে তিনঘণ্টা ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল। শ্রীপূর্ণ দাস বাউলের কণ্ঠ-সংগীত, শ্রীসবিতাব্রত দত্তের আবৃত্তি ও গান, শ্রীজ্ঞান মজুমদারের 'তবলায়

শব্দানুকরণ', শ্রীশম্ভু ভট্টাচার্যের পরিচালনায় 'দুন্দুভির আহ্বান', 'রামলীলা', 'রাণার', 'পৌষপার্বন' প্রভৃতি নৃত্য-বিচিত্রা এবং কুমারী স্নিগ্ধা মজুমদারের 'তেলের শিশি' ও 'ইস্কাপনের দেশে' নৃত্যানুষ্ঠান বিমুগ্ধ দর্শকবৃন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় অভিনন্দিত হয়।

অন্যান্য রাজ্যের খবর :

মহারাষ্ট্রে গ্রন্থাগার আন্দোলন

বোম্বাই রাজ্যের মারাঠা অধ্যুষিত অঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংহত ও সংগঠিত করে তোলার জন্যে গত ১৯৪৯ সালে মারাঠী গ্রন্থালয় সঙ্ঘ, পুনা গ্রন্থালয় সঙ্ঘ ও কোলাবা জেলা বাচনালয় সঙ্ঘ নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলোপ করে মহারাষ্ট্র গ্রন্থালয় সঙ্ঘ নাম দিয়ে এক শক্তিশালী ও নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন। বর্তমান বছরে শোলাপুরে মহারাষ্ট্র গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্ঘ পরিচালিত গ্রন্থাগারিক শিক্ষণে প্রতি বছর প্রায় তিন শতাধিক ব্যক্তি শিক্ষণ গ্রহণ করেন। গ্রামীন গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘ স্বল্পকালীন শিক্ষণ শিবির পরিচালনা করেন। কোলাবা, সাতারা ও নাসিকে সঙ্ঘের তিনটি শাখা কার্যালয় আছে। গ্রামীন গ্রন্থাগারের নানারূপ উন্নতির প্রচেষ্টা ও গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের চেষ্টা চলছে। সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে সঙ্ঘ প্রণীত গ্রন্থাগার আইন বোম্বাই সরকার কর্তৃক নিকট ভবিষ্যতেই গৃহীত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্ঘের সদস্য সংখ্যা সাড়ে তিন শত। 'সাহিত্য সহকর' নামে সঙ্ঘের একটি মাসিক মুখপত্র প্রকাশিত হয়।

বোম্বাই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অব্যবস্থা

বছর তিনেক পূর্বে ভারতের লোকসভায় গৃহীত Delivery of Books (Public Library) Act 1954 অনুযায়ী ভারতবর্ষের সকল প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত পত্র পত্রিকা ও পুস্তকের একটি করে কপি কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও দিল্লীতে চারটি জাতীয় গ্রন্থাগারে পাঠানো বাধ্যতামূলক করা হয়। তার একখানা কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার পেয়ে থাকেন, যার উপর নির্ভর করেই Indian National Bibliography প্রকাশনের তোড়জোড় চলছে। কিন্তু অন্য

তিনটি সহরে সংগৃহীত বইগুলির কি গতি হয় তা আমাদের ভাল জানা নেই। কারণ প্রেরিত সমুদয় বইপত্তর যোড়ক খুলে শুধু মাত্র একটি কাঁচা ফর্দ তৈরী করে সেগুলির যথাযথ সংরক্ষণ করতে ন্যূনতম যে কর্মীদল ও সাংগঠনিক তৎপরতার প্রয়োজন তা অন্যত্র এখনও অবিদ্যমান।

বোম্বাইতে এ কাজের পক্ষে উপযোগী কোনও সরকারী গ্রন্থাগার নেই। কর্তৃপক্ষ সেখানকার এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে তাঁদের বার্ষিক অর্থ বরাদ্দের বিনিময়ে এক বন্দোবস্ত করে নিয়েছেন যে এসিয়াটিক সোসাইটিই আপাততঃ বইগুলি রাখবেন ও তাঁদের পাঠকক্ষটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখবেন। কিন্তু সোসাইটির স্থান, কর্মী ও অর্থ সঙ্গতি সীমাবদ্ধ। তাই সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রেরিত পর্বতপ্রমাণ হাজার হাজার পুস্তক পত্রিকা স্তূপাকার করে যে অবস্থায় এসেছে সে অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। ১৪টি ভাষায় প্রকাশিত বই আলাদা করে রাখাও অসম্ভব কারণ স্থানীয় ভাষা ছাড়া কর্মীদের ভিন্ন ভাষা জ্ঞান নেই। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বইগুলি রাখতে হলে যে বিরাট স্থানের প্রয়োজন, ভিন্ন ভাষাভাষী কর্মী ও আনুসঙ্গিক আসবাবপত্র, সাজ সরঞ্জাম ও বৃহৎ অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন তা এসিয়াটিক সোসাইটির সাধ্যাতীত। বোম্বাই সরকারও তাতে অগ্রণী হবেন কিনা সন্দেহ। যথাযথ ব্যবস্থা যতদিন না অবলম্বিত হচ্ছে ততদিন বোম্বাই প্রভৃতি সহরে বহুমূল্যের পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রেরণ কার্য স্থগিত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

অন্যান্য দেশের খবর ঃ

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

আয়তনের দিক থেকে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের সমান হলেও জনসংখ্যা তার মাত্র ৭ লক্ষ। রুক্ষ ও উষ্ণ বিশাল ভূখণ্ড—চাষবাস ও পশুপালই লোকের লোকের প্রধান জীবিকা। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জনপদগুলির লোকসংখ্যা দু'চার শ'র বেশী নয়। অথচ গ্রন্থাগার তথা সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত।

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার লাইব্রেরী বোর্ডের প্রধান কাজ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিচালন ও রাজ্যব্যাপী ক্রমবর্দ্ধমান নিঃশুল্ক গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিত গ্রন্থ

যোগান দেওয়া। বোর্ডের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫৩ সালে। বোর্ডেরই উদ্যোগে রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিকল্পনা রচিত হয়। সারা রাজ্যে আদর্শ ও উন্নত ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনই ছিল প্রধান লক্ষ্য। রাজধানী পার্থে অবস্থিত রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি আদর্শস্থানীয়। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে গ্রন্থযানের সাহায্যে বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রন্থ সরবরাহ করা হয়।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অধীনে বিভিন্ন অঞ্চলে একটি করে গ্রন্থাগার সংস্থা আছে, সেখানে জনসংখ্যা অনুযায়ী সর্বসমেত জন পিছু একটি করে বই রাখা হয়, বাকি বই কেন্দ্র থেকে আসে। এ ছাড়াও বিভিন্ন এলাকার গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে গ্রন্থ-ঋণের ব্যবস্থাও আছে। প্রতি গ্রন্থাগারের এক-তৃতীয়াংশ গ্রন্থ শিশুদের জন্যে ও বড়দের মোট বইয়ের শতকরা ৬০ ভাগ কেবলমাত্র গল্প ও উপন্যাস জাতীয়। কেন্দ্র হতে ব্যক্তি বিশেষকে সরাসরি বই দেবার নিয়ম না থাকলেও প্রয়োজনে সুদূর অঞ্চলে এই বিলির সরাসরি ব্যবস্থা আছে। সূত্র সন্ধান সহায়তার যে ব্যবস্থা প্রবর্তিত তা সত্যই অপূর্ব। হাতের কাছে বই না থাকলেও যে কোন আঞ্চলিক গ্রন্থাগার টেলিফোন অথবা আলোক চিত্রর সাহায্যে কেন্দ্র থেকে জ্ঞাতব্য তত্ত্ব ও তথ্য আহরণ করে দেয় পল্লীবাসীদের প্রয়োজনে। রাজ্যব্যাপী সুপরিকল্পিত ও সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সার্থক ও সফল হয়েছে।

ফিলিপাইনে গ্রন্থাগার সম্মেলন

এবছরে এপ্রিল মাসে ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত ফিলিপাইন জাতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল গ্রন্থাগার-গৃহ, আর্থিক সঙ্গতি ও কুশলী কর্মী সৃষ্টির পর্যালোচনা।

অধ্যাপক গ্যাব্রিয়েল বার্ণার্ডো ও শ্রীমতী ইসাবেল সুনিও ফিলিপাইন গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ও সহসভাপতির পদে নির্বাচিত হন। সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিরা ফিলিপাইনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অসন্তোষজনক ধারার সমালোচনা করেন। কুশলী কর্মীর অভাব, শিশু গ্রন্থাগার পরিচালনে অসুবিধা, অর্থের অসচ্ছলতা, উপযোগী সাজ সরঞ্জাম ও গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের অভাব, সরকারী সাহায্যের অসঙ্কুলনতা ও পরিকল্পনাহীন কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা ও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিবিধ বার্তা

শ্রীতিনকড়ি দত্তের সম্বর্ধনা

বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা শ্রীতিনকড়ি দত্তের ষষ্টিতম জন্মদিন উপলক্ষে গত ২৮শে সেপ্টেম্বর তাঁর বালির বাস-ভবনে অনুষ্ঠিত এক প্রীতি সম্মেলনে বহু গ্রন্থাগার কর্মী ও সমাজসেবী সমবেত হন। পৌরোহিত্য করেন ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বাবুর নানাবিধ গুণাবলীর উল্লেখ করে তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করে বক্তৃতা দেন সর্বশ্রী প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, ললিত মুখোপাধ্যায়, যাদব মুরলীধর মুলে, পবিমল আচার্য, প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয়েন্দ্র দেবরায়, অনাথনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। শ্রী বি, এস, কেশবন তাঁর নীরব কর্মসাধনার সহিত অন্ধ্রের হরি সর্বোত্তম রাওয়ের সাধনার তুলনা করেন। শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু তিনকড়ি বাবুর নিরবচ্ছিন্ন সেবা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রারম্ভিক অবস্থায় তাঁর নিরলস ও ঐকান্তিক কর্মনিষ্ঠা ও উদ্যমের উল্লেখ করেন। সভাপতির ভাষণের পর শ্রীদত্ত পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুপস্থিতির জন্যে প্রেরিত কয়েকটি পত্র ও কবিতা সভায় পাঠ করা হয়। সংগীত ও নৈশভোজ অনুষ্ঠানের আনন্দ বর্ধিত করে। সমাগত গ্রন্থাগার-সেবীদের পক্ষ হতে তাঁকে শ্রীবিনয় ঘোষ লিখিত 'পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি' বইটি উপহার দেওয়া হয়।

তিনকড়ি দত্ত

পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ পরিসমাপ্তি পরীক্ষার ফলাফল

(সার্টিফিকেট কোর্স)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত সংতাহান্তিক ও গ্রীষ্মকালীন শিক্ষণ পরিসমাপ্তি পরীক্ষায় যে সব পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল। এবছর ১১৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮৪ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন।

বিশেষ-মানসহ যাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছেন

(২৩) বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়
(৩৩) প্রবীর রায় চৌধুরী
(২৬) সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (শেঠবাগান রোড, কলিকাতা)

সাধারণভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন

(রোল নম্বর অনুযায়ী বিন্যস্ত)

(১) ইরা বন্দ্যোপাধ্যায়
(২) কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়
(৪) রেখা বর্মণ
(৫) অনুভা বসু
(৬) সুশীলকুমার বসু
(৭) রমা ভাদুড়ী
(৯) গীতা ভট্টাচার্য
(১৩) প্রণবকুমার চক্রবর্তী
(১৪) অরুণা দত্ত
(১৬) সন্তোষকুমার দেব
(১৭) অলকা ধর
(২০) সুশীলকুমার খাঁ
(২১) ব্যোমকেশ মাইতি
(২৪) নৃসিংহলাল মুখোপাধ্যায়
(২৫) সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কেদারদাস লেন)
(২৭) কমলেশ নন্দী
(২৮) অববুদ্ধ রায়
(২৯) অমূল্যচন্দ্র রায়
(৩১) কৃষ্ণা রায় (এক নম্বর) (সদানন্দ রোড)
(৩৪) সমীরকুমার রায় চৌধুরী
(৩৫) সুকমল রায় চৌধুরী
(৩৬) প্রকাশচন্দ্র সেন
(৩৭) রণমিত্র সেন
(৩৮) সন্তোষকুমার সেন
(৩৯) মিনতি সেনগুপ্ত
(৪২) ধ্রুবতারা মুখোপাধ্যায়
(৪৩) জগতবন্ধু ঘোষাল
(৪৪) সুখরঞ্জন ভট্টাচার্য
(৪৭) লালকৃষ্ণ সিংহ
(৪৮) রণপতি শীল

(৫০) মিহিরকুমার ভট্টাচার্য
(৫২) নারায়ণ রঙ্গনাথন
(৫৩) সুধীন্দ্রকুমার রায়
(৫৫) নকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(৫৬) রাধিকাপ্রসাদ দত্ত
(৫৭) সুভাষচন্দ্র বসু
(৫৯) কৃষ্ণা দত্ত
(৬০) শংকরনাথ ভাদুড়ী
(৬২) সলিলকুমার পাল
(৬৪) সমীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ
(৬৫) নরেশচন্দ্র শেঠ
(৬৮) সন্ধ্যা বসু
(৬৯) অনিন্দ্যকুমার সেন
(৭০) ইলা বসু
(৭৩) ননীগোপাল রায় চৌধুরী
(৭৪) সন্তোষকুমার ঘোষ
(৭৫) হাসি ভট্টাচার্য
(৭৭) প্রতিভা সরকার
(৭৯) গৌরী সেনগুপ্ত
(৮৩) মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়
(৮৪) শচীন্দ্রনাথ দে
(৮৫) বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য
(৮৬) দেবীগোপাল দত্ত
(৮৭) কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য
(৮৮) প্রীতি দত্ত
(৮৯) মোহনলাল পোদ্দার
(৯০) রাধাবিনোদ সুরাল
(৯৩) ক্ষৌনিষচন্দ্র বিশ্বাস
(৯৪) নিভা দাশ
(৯৬) হরিমাধুরী বিশ্বাস
(৯৮) সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
(৯৯) অমরেন্দ্রকুমার সেন
(১০০) গোপীকাপ্রসাদ ঘোষ
(১০১) নৈবেদ্য ঘোষাল
(১০২) শেফালী ঘটক
(১০৪) জয়ন্তী চক্রবর্ত্তী
(১০৭) মীরা সরকার
(১০৮) কৃষ্ণদেও নারায়ণ
(১০৯) সত্যেন্দ্রনাথ মৌলিক
(১১২) বিশ্বনাথ বসাক
(১১৫) নীলিমা মুখোপাধ্যায়
(১১৭) সুরেন্দ্রপ্রসাদ
(১১৯) জগদীশপ্রসাদ মণ্ডল
(এন-১২০) সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস
(এন-১২৩) সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়
(এন-১২৭) চিত্রা বসু
(এন-১২৮) সতীশচন্দ্র অধিকারী
(এন-১৩৪) প্রভাসরঞ্জন রায়
(এন-১৩৫) বিমলেন্দু গুহ
(এন-১৩৮) রঞ্জিতকুমার ঘোষ
(এন-১৩৯) নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ পরিসমাপ্তি পরীক্ষার ফলাফল—

(ডিপ্লোমা কোর্স)

আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের নাম গুণানুসারে বিন্যস্ত হল :

প্রথম বিভাগ

(১) সুজ্ঞানন্দ রায়, (২) অনিমা দাশ, (৩) কুমকুম মুখোপাধ্যায়, (৪) বিধুভূষণ ভৌমিক, (৫) গীতা গুপ্ত, (৬) নগেন্দ্রনাথ মহান্তি।

দ্বিতীয় বিভাগ

(১) শান্তিপদ ভট্টাচার্য, (২) সমীরণ চন্দ্র, (৩) নিতাই সুন্দর বসু, (৪) নারায়ণ বালকৃষ্ণ মারাঠে, (৫) সুবল চন্দ্র চৌধুরী, (৬) হিমাংশু কুমার মজুমদার, (৭) যূথিকা বসু, (৮) প্রভাত রঞ্জন আচার্য গোস্বামী, (৯) জেনা এবকাশ, (১০) সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়।

তৃতীয় বিভাগ

(১) সৈয়দ মকিদুল হাসান, (২) অমরপতি রায়চৌধুরী, (৩) আরতি মুখোপাধ্যায়, (৪) কালিপদ চট্টোপাধ্যায়, (৫) রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসন অব স্পেশাল লাইব্রেরীজ এণ্ড ইনফরমেশন সেন্টারের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন ও সাধারণ সভা

আগামী ৭ই, ৮ই ও ৯ই ডিসেম্বর পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের স্থান শীঘ্রই ঘোষিত হবে। উক্ত দুই দিনে শিল্প পরিকল্পনার্থ সূত্র সন্ধান সহায়তা ব্যবস্থা এবং বিশেষ গ্রন্থাগারের উপযোগী কুশলী কর্মীদের শিক্ষণ সম্পর্কে দুটি বিশেষ অধিবেশন হবে।

আগামী গ্রন্থাগার দিবস

পূর্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও ২০শে ডিসেম্বর তারিখটি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার দিবসরূপে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপিত হইবে।

এতদুপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রন্থাগার এবং বিভিন্ন সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতায় একটি সপ্তাহব্যাপী কেন্দ্রীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইতেছে। এই প্রদর্শনীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে :—

● কলিকাতাস্থ বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা ও ক্রমোন্নতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বলিত প্রাচীর চিত্র, পরিসংখ্যান ইত্যাদি, এবং গ্রন্থাগার সমূহের মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য পুঁথি পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি।

● বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা ও ক্রমোন্নতির ইতিহাস এবং বহুমুখী কর্মধারার পরিচয়জ্ঞাপক প্রাচীর পত্র ইত্যাদি।

● প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা।

● ভারতের অন্যান্য রাজ্য এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের গ্রন্থাগার উন্নয়নের পরিচয়।

● ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বাংলা পুস্তক, এবং প্রতি গ্রন্থাগারে রাখিবার উপযুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের বাংলা পুস্তক।

● আধুনিক গ্রন্থ মুদ্রণ ও গ্রন্থ প্রস্তুত পদ্ধতির পরিচয়।

● গ্রন্থন শিল্পের পরিচয়।

● গ্রন্থাগারের সাজসজ্জা ও সরঞ্জাম।

সদস্যদের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত এই প্রদর্শনীর আয়োজন সম্ভব নহে। অতএব আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ সকলে এই প্রদর্শনীতে প্রেরণের জন্য তাঁদের গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা, ক্রমোন্নতি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যের পরিচয় জ্ঞাপক প্রাচীর চিত্র ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া ১০ই ডিসেম্বরের পূর্বে আমাদের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং তাঁহাদের গ্রন্থাগারের মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, পত্র, পত্রিকা ইত্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন। প্রদর্শনের জন্য কি কি বস্তু প্রেরণ করা সদস্যদের পক্ষে সম্ভব হইবে তাহা অনতিবিলম্বে জানাইলে আমাদের পক্ষে প্রদর্শনীর পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপদান সহজ হইবে।

গ্রন্থ সমালোচনা

কর্মবীর রাসবিহারী ॥ বিজনবিহারী বসু ॥ শ্রীমতী ইলা বসু কর্তৃক গোমো, মানভূম হইতে প্রকাশিত ॥ ১৩৬৩ ॥ ৮+৩৪৪ পৃঃ ॥ সচিত্র ॥ মূল্য ৫৲ ॥

ভারতের মুক্তি যুদ্ধের যে-সব যোদ্ধা জাতির ইতিহাসে শোণিত স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁদের পৃথক কোনও পরিচয় কিংবা জীবন চরিতের প্রয়োজন জাতির ইতিহাসে আছে কিনা তা ঐতিহাসিকরা বিচার করুন। সাধারণ মানুষের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা কর্মময় জীবনের কথা জেনেই নিবৃত্ত হয় না—তারা খোঁজে পূর্ণাঙ্গ জীবন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্নিযুগের অবদান অপরিমেয়। সেই অগ্নিযুগের একজন অগ্রদূত ছিলেন রাসবিহারী বসু। সে-যুগের অনেক তথ্য আজও অজ্ঞাত। লেখককে ধন্যবাদ রাসবিহারীর জীবন চরিত লিখতে বসে অগ্রজকে তিনি সার্থকরূপেই উপস্থিত কোরেছেন। রাসবিহারী সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য জীবন-কথা এতদিন পর হলেও প্রকাশ যে হয়েছে এটা মস্ত বড় কথা। সাধারণ পাঠক আগ্রহ সহকারেই আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা এবং জাতির এক অধিনায়কের পূর্ণাঙ্গ জীবন-কথা এ গ্রন্থ থেকে লাভ করবেন। গ্রন্থটি তথ্যপূর্ণ। বিপ্লবী অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত পরিশিষ্ট যোজনায় পুস্তকটির মূল্য বর্ধিত হয়েছে। উচ্ছ্বাস ও ভাবপ্রবণতা ছাড়াও লেখনী জড়তাগ্রস্ত। তাহলেও প্রামাণ্য ও 'ডকুমেণ্টারী' হিসেবে আলোচ্য গ্রন্থটি সমাদর লাভ করবে। আর্ট প্লেটে মুদ্রিত ছবিগুলি গ্রন্থের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

শৈলপুরী কুমায়ুন ॥ চিত্তরঞ্জন মাইতি ॥ কলিকাতা; অভিজিৎ প্রকাশনী ১৯৫৬ ॥ সচিত্র ॥ মূল্য ৪৲

হিমালয় ভ্রমণ-সাহিত্যে বইটি একটি নতুন সংযোজন। নৈনিতাল, আলমোড়া, রাণীক্ষেত প্রভৃতি স্থানের বর্ণনাগুলি প্রাণবন্ত ও হৃদয়স্পর্শী। খ্যাতি না থাকলেও লেখকের বলিষ্ঠ ও সাবলীল লেখনী প্রতিভার পরিচায়ক। অধুনা প্রকাশিত অনেক ভ্রমণ কাহিনীর মতই এ বইটি কিছুটা রম্য-রচনা গোত্রীয়। বোধহয় একঘেঁয়ে ভ্রমণ কথা সরস করে তোলার এ এক প্রয়াস। তাই বইটি সুখপাঠ্য। ম্যাপ ও আর্টপ্লেটে মুদ্রিত আলোকচিত্রে বইটি সমৃদ্ধ। মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ মনোরম। (প, ভ,)

সম্পাদকীয়

পে-কমিশন

১৯৪৬ সালে তৎকালীন ভারত সরকার যে 'পে-কমিশন' সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের কাছ থেকে গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগারকর্মীগন সুবিচার পাননি। কমিশনের সুপারিশ কেবলমাত্র দিল্লীস্থ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর-সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের কর্মীগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ; এবং সে সুপারিশও ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং দুর্বল। বহু পৃষ্ঠাব্যাপী বিশাল রিপোর্টের একটিমাত্র পৃষ্ঠায় কমিশন এই হতভাগ্য কর্মচারীগণের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি লিপিবদ্ধ করেছেন বটে, কিন্তু তাদের সম্পর্কে কোনও কার্যকরী সুপারিশ করা সম্পর্কে তাঁদের অক্ষমতার কথাও সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞাপন করেছেন। তাঁরা বলেছেন :

"Much as we sympathise with this class of officers we are unable to think of a feasible method in which their position can be substantially improved unless the Government of India are prepared to reorganise their library system in Delhi."

গ্রন্থাগারকর্মীগণের অবস্থা সম্পর্কে কমিশন ব্যাপকভাবে কোনও তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি—একথা সুস্পষ্ট। তাঁদের বক্তব্য রচিত হয়েছিল শুধুমাত্র দিল্লীস্থ কয়েকটি সরকারী গ্রন্থাগারের কর্মীগণের সীমাবদ্ধ অভিযোগকে ভিত্তি করে ; এবং তার স্বীকৃতি রয়েছে তাঁদের রিপোর্টেরই প্রথম কয়েকটি ছত্রে :

"There are a number of libraries in Delhi attached to various departments of the Government of India....... The staff on these libraries complained that......."

দিল্লী ছাড়া অন্যত্রও যে কেন্দ্রীয়-সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগার রয়েছে, এবং সে-সকল গ্রন্থাগারের কর্মীগণের অবস্থাও যে একই সঙ্গে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন - একথা কমিশন বিবেচনা করেননি।

যা-ই হোক, প্রথম 'পে-কমিশন' স্থাপনার পর প্রায় দীর্ঘ ১১ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সমাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের বহুমুখী পরিকল্পনার অপরিহার্য অঙ্গরূপে আজ দেশব্যাপী সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা স্থাপনের পরিকল্পনা স্থান পেয়েছে। আজকের এই পরিবর্তিত পটভূমিকায় কেন্দ্রীয় সরকার আবার নতুন করে যে 'পে-কমিশন' স্থাপন করেছেন—সমগ্র গ্রন্থাগারকর্মীগণ তাঁদের কাছ থেকে যথাযোগ্য বিবেচনা লাভ করবার দাবী অবশ্যই করতে পারেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ কর্মচারীগণের অবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করাই এই নতুন 'পে-কমিশনের' মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁদের সুপারিশ কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীগণের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনার ভিত্তিতেই রচিত হবে না। তাঁরা একদিকে যেমন দেশের ঐতিহাসিক পটভূমিকা, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার (Developmental Planning) রূপায়ণ প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করবেন, অপরদিকে তেমনি লক্ষ্য রাখবেন যেন তাঁদের সুপারিশের ফলে '...the disparities in the standard of remuneration and conditions of service of the Central Government employees on the one hand and of the employees of the State Governments, Local Bodies and aided institutions on the other'—বিরাট অসন্তোষের সৃষ্টির কারণ না হয়ে ওঠে।

অন্যান্য শ্রেণীর কর্মচারীগণের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক,—তারা নিজ নিজ দাবী কমিশনের নিকট অবশ্যই পেশ করেছে; আমাদের বক্তব্য হতভাগ্য গ্রন্থাগার-কর্মীগণ সম্পর্কে। আজ সরকার দেশে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগারব্যবস্থা (Integrated Library Service) স্থাপনাকে তাঁদের 'Development Planning'-এর অন্যতম অঙ্গরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন; এবং এই 'Development Planning'-এর প্রতি কমিশন যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করবেন—এই প্রতিশ্রুতি সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে।—এটা খুবই সুবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত সন্দেহ নেই। আমরা তাই আশা করি এই নব-সৃষ্ট কমিশন শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ গ্রন্থাগারকর্মীগণের মধ্যেই তাঁদের সুপারিশ সীমিত না রেখে দেশের সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার পরিকল্পনার সফল রূপায়ণের জন্য সর্বস্তরের গ্রন্থাগারকর্মীগণের অবস্থার সামগ্রিক বিবেচনার ভিত্তিতে তাঁদের সুপারিশ রচনা করবেন। কারণ—'Integrated Library System'—একই সূত্রে গ্রথিত একটি মালার মতো;

বিবেচনার মধ্যে কোনও অসামঞ্জস্য যদি থাকে তবে এই সুবিন্যস্ত মালা ছিন্ন হয়ে যাবে, সমগ্র Development Planning-এর সার্থক রূপায়ণ ব্যাহত হবে।—আর এই যুক্তিতেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 'পে-কমিশনের' নিকট যে দাবী পেশ করেছেন তাতে রাজ্যস্থিত বিভিন্ন শ্রেণীর এবং স্তরের গ্রন্থাগারকর্মীগণের অবস্থার প্রতি কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

পদ্মশ্রী ডক্টর রঙ্গনাথন

গ্রন্থাগার পত্রিকায় পূর্বেই ঘোষিত হয়েছে যে গত সাধারণতন্ত্র দিবসে ভারত সরকার ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ ডক্টর এস, আর, রঙ্গনাথনকে পদ্মশ্রী উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। গত ২৮শে অক্টোবর আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁকে এই উপাধি দেওয়া হয়। ডক্টর রঙ্গনাথনকে অভিনন্দন জানিয়ে আমরা তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি এবং আশা করি ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সেবা ও পথ-প্রদর্শন অক্ষুন্ন থাকবে—তাঁর সাহায্য ও উপদেশ সারা ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে উন্নত করে তুলতে সহায়তা করবে।

গ্রন্থাগার

·ম বর্ষ] কার্তিক : ১৩৬৪ [৭ম সংখ্যা

গ্রন্থবিদ্যা

আদিত্য ওহদেদার

'গ্রন্থাগার'-এর বিগত একটি সংখ্যায়* গ্রন্থবিদ্যার যে ভূমিকা উপস্থাপিত করেছি, তাতে গ্রন্থবিদ্যার স্বরূপ ও প্রতিপাদ্য বিষয়টা কি, তা জানিয়েছি। গ্রন্থের উপাদান সম্পর্কিত জ্ঞান নিয়েই গ্রন্থবিদ্যা। গ্রন্থের উপাদানগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হল কাগজ। কারণ কাগজ না হলে লিখব কিসে, ছাপাই বা হবে কিসে, এবং গ্রন্থের উৎপত্তিই বা হবে কি ক'রে।

কাগজ হল লেখবার আধার। আধুনিক সভ্য জগতে একচ্ছত্র তার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে তাকে বিবর্তনের অনেক সোপান অতিক্রম করতে হয়েছে। এই বিবর্তনের ইতিহাসটা জানা দরকার।

সংস্কৃত ভাষায় লেখবার আধারকে বলা হয় পত্র। রঘুনন্দনের জ্যোতি-স্তত্ত্বে আছে—

> ষাণ্মাসিকে তু সংপ্রাপ্তে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ।
> ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা।।

অর্থাৎ ছয়মাস কাল কেটে গেলে ভ্রম উপস্থিত হয় দেখে বিধাতা অক্ষর সৃষ্টি করে তাকে পত্রারূঢ় করলেন। এই শ্লোক থেকে এইটাই জানা গেল যে ভ্রান্তি ও বিস্মৃতি থেকে কথাকে রক্ষা করবার জন্যই কাগজ ও অক্ষর সৃষ্টি হয়েছে।

---

*অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩।

কাগজের আদি রূপ

সভ্যতার ইতিহাস একটু নাড়াচাড়া করলেই জানা যায় যে আজ যাকে আমরা কাগজ বলি তা খুব বেশীদিনের জিনিষ নয়। কাগজের পূর্বে লেখ্য দ্রব্য হিসেবে অনেক রকম জিনিস ব্যবহৃত হয়েছে। সে জিনিসগুলির একটা মোটামুটি বিবরণ দেওয়া গেল।

(১) পাথর ও কাঠ: এই দুটি বস্তু লেখবার আধার হিসেবে মানুষ সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছে। ব্যাবিলন ও কালদীয় (Chaldea) দেশের প্রাচীন স্তম্ভ এবং মিশরের পিরামিডে খোদাই করা অক্ষরমালা আজও তার নিদর্শন বহন ক'রে চলেছে।

(২) ইঁট: ব্যাবিলনের অধিবাসীরা নিজেদের জ্যোতিষবিদ্যার পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছে ইঁটের উপর। ইঁটের উপর উৎকীর্ণ করেছে তাদের জ্যোতিষিক পর্যবেক্ষণের ফলাফল। এই রকম কয়েকখানি ইঁট মিলে একটা বই হ'ত সেকালে। এই বইকেই ইংরেজিতে বলে Cuneiform book. য়ুরোপের কোনো কোনো যাদুঘরে এইরকম ইঁটের বই রাখা আছে।

(৩) সীসা: সীসা পিটিয়ে পাতে পরিণত ক'রে তাতে লেখা খোদাই করা হত। দলিল ইত্যাদি খোদাই করবার জন্যে এই রকম পাত ব্যবহার করার প্রথা ছিল। রোম নগরে এই রকম একটি সীসার দলিলপত্র পাওয়া যায় যা দৈর্ঘ্যে চার ইঞ্চি ও প্রস্থে তিন ইঞ্চি। প্রাচীন মিশরীয় অস্পষ্ট অক্ষর এতে খোদাই করা আছে।

(৪) পিতল: পিতলের ওপর খোদাই করে লেখার চলন ছিল প্রাচীন রোমে। সৈনিকরা পিতলের বগলসে কিংবা তলোয়ারের খাপে নিজেদের 'উইল' লিখে রাখত। Twelve Tables নামে অভিহিত রোমান আইনগুলি খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে পেতলের উপরেই খোদিত হয়েছিল। সম্রাট ভেস্পেসীয়ানের রাজত্বকালে যে বিরাট অগ্নিকাণ্ডে রোম রাজধানী পুড়ে যায় তাতে প্রায় তিন হাজার পিতলের পাত ধ্বংস হয়ে যায়। এই সব পাতে রোমের অনেক ইতিহাস লিখিত ছিল।

পেতল ছাড়াও অন্যান্য ধাতুর পাতে লেখার রেওয়াজ ছিল। সিরিয়ার এক প্রাচীন মঠে ডক্টর বুকানন ছয়খানা ধাতুফলক পান। এগুলি মিশ্র ধাতুর পাত।

(৫) কাঠের পাত বা তক্তা: প্রাচীন গ্রীস, ব্যাবিলন ও চীনে কাঠের পাতের ওপর মোম মাখিয়ে তাতে ধাতুনির্মিত খুন্তি দিয়ে আঁচড় কেটে

লিখবার রীতি ছিল। এই রকম পাত কতকগুলি একত্র করে যে বই হ'ত তাকেই গ্রীক ভাষায় বলা হ'ত কোডেক্স্ (codex)। এখনো পশ্চিম প্রদেশের লোকেরা একখণ্ড ১ ফুট × ১॥ ফুট কাঠের তক্তায় লিখে থাকে। অর্থাৎ কাঠের তক্তাগুলির ব্যবহার ছিল আমাদের ছেলেবেলার শ্লেটের মতো।

(৬) গাছের পাতা : গাছের পাতাকে লেখ্য দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করার প্রথা বেশ প্রাচীন। আফ্রিকার মিশরীয়েরা সর্বপ্রথম তালপাতা ব্যবহার করতে শেখে। জলপাই গাছের পাতাকে লেখ্যরূপে ব্যবহার করতেন সিরাকিউসের (সিসিলি) জজেরা। তাঁরা এই পাতায় লিখে রাখতেন নির্বাসনদণ্ড প্রাপ্ত আসামীদের নাম। ভারতে, সিংহল ও ব্রহ্মদেশে তালপাতা যথেষ্টরূপে ব্যবহৃত হ'ত। আমাদের বহু প্রাচীন পুঁথি তালপাতার ওপর লেখা।

(৭) হাতীর দাঁত : হাতীর দাঁতকে পাতে পরিণত করে তার ওপর লেখার প্রচলন ছিল ব্রহ্মদেশে। ভালো সুদৃশ্য বই লিখবার বেলা হাতীর দাঁত ছিল অপরিহার্য। পাতাগুলি কালো রঙে রঙ করে তার ওপর সোনা বা রূপোর জলে কলাই করে অক্ষর লেখা হ'ত।

(৮) গাছের ছাল : গাছের ছালকে কাগজের মতো ব্যবহার করার চলন এক সময় পৃথিবীর সর্বত্র ছিল। প্রাচীন কালদীয়েরা গাছের ভেতরের ছালকে বলত লেবার (Leber) এবং তাকে লেখ্য দ্রব্যরূপে ব্যবহার করত। এই Leber শব্দই পরে Libre হ'য়ে বই অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং আজও সে অর্থ চলছে। Library কথাটার মধ্যে Libre স্পষ্ট হয়ে বিরাজ করছে। ইংলণ্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরীতে মেক্সিকোদেশীয় অস্পষ্ট সাংকেতিক অক্ষরে লিখিত একখানা বই আছে, সে বই লেখা হয়েছে গাছের ছালে। আমাদের দেশে মালাবার উপকূল-বাসীরা আজও গাছের ছাল যথেষ্ট ব্যবহার করে লেখাপড়ার কাজে।

(৯) রেশমের বস্ত্রখণ্ড : রেশমের টুকরো কাপড়ে দলিলপত্র ইত্যাদি লেখা হ'ত। প্লিনি এর উল্লেখ করে গেছেন। মিশরে এর চলন বেশ ছিল।

(১০) জীবজন্তুর চামড়া : অনেক স্থানে জীবজন্তুর চামড়াকে লেখ্যদ্রব্য রূপে ব্যবহার করা হত। খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে কনস্টানটিনোপলে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়, তাতে একরকম সাপের পেটের চামড়া পুড়ে যায়- এই সব চামড়ায় গ্রীক মহাকাব্য 'ইলিয়াড' ও 'অডেসি' স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল।

(১১) পার্চমেণ্ট : পার্চমেণ্ট হল ছাগল ও ভেড়ার চামড়ার ভেতরের দিকটা যাকে এমন ভাবে তৈরী করা হ'ত যাতে ছাপার মতো ক'রে লেখা যায়।

কথিত আছে যে প্রাচীন মিসিয়ার (Mysia) রাজা এক বৃহৎ গ্রন্থাগার গড়ে তোলার মানসে মিশরের রাজার কাছে প্যাপিরাস্ গাছ চেয়ে পাঠান, কিন্তু মিশরের রাজা তা সরবরাহ করতে রাজী না হওয়ায় মিসিয়া-রাজ পার্চমেন্ট তৈরি করে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন।

(১২) ভেলম্ : পার্চমেন্টের ঘষা-মাজা রূপ হল ভেলম্। কিন্তু উৎকৃষ্ট ভেলম্ কেবলমাত্র অকালপ্রসূত বাছুরের চামড়া থেকে তৈরি হয়। য়িহুদীরা এতে আইনাদি লিখত। পারস্যে গল্প ইতিহাস লেখা হত ভেলমে। ভেলমের চল এখনো শৌখিন দ্রব্য হিসাবে আছে।

(১৩) প্রস্তুত করা চামড়া : অর্থাৎ লোম তুলে ফেলে ও পিটে পরিষ্কার করে যে চামড়াকে কার্যোপযোগী করা হয়েছে। আরব দেশে এই চামড়ার খুব চল ছিল।

কাগজের সৃষ্টি

পেপিরি

আজকাল যে উপায়ে কাগজ তৈরি হয়, প্রথমেই সেরকম ভাবে হ'ত না। কাগজ-তৈরির প্রাথমিক অবস্থা হল তৃণ ও গাছপালার অংশ বিশেষ থেকে তৈরি কাগজের মতো একরকম পদার্থ। ঐতিহাসিকদের মতে পেপিরস্ (Papyrus) বা বাইবেল মতে ইংরেজি 'বুলরাস' (Bulrush) নামক তৃণের মূলদেশ থেকে তৈরি কাগজই সব চাইতে প্রাচীন। এই কাগজের নাম ছিল পেপিরাস্ পেপার বা পেপিরি। খৃঃ পূঃ ১৪০০ বৎসর পূর্বেও নাকি পেপিরির প্রচলন ছিল।

এই তৃণ শরের ন্যায় জলাভূমিতে জন্মে থাকে। মিশরদেশে, সিরীয়ায় ও সিসিলি দ্বীপে এর জন্ম। সিরীয়ায় একে বেবির (Babeer) এবং গ্রীসে একে বিব্লস্ (Biblos) বলা হত। এ গাছ প্রায় ৮ থেকে ১২ ফুট দীর্ঘ হয়। আমাদের দেশী ঝাউ গাছের পাতার যেমন ধরণ, এই গাছের আগাতেও সেই ধরণের ৮টি মাত্র পাতা হয়। এর সর্বাঙ্গে পাতা থাকে না বা শরের মতো গাঁট থাকে না। ওলের ডাঁটার মতো গাছটি সরল হয়ে ওঠে ও মাথার ওপর ওল পাতার মতো ৮টা পাতা ছাতা হয়ে ঘিরে ফেলে এবং সেই পাতার গা দিয়েই ঝাউ পাতার মতো ছোট ছোট পত্রাংশ ঝুলে পড়ে। এর গোড়ার দিকের যে অংশ জল ও কাদার মধ্যে থাকে, তার ছাল খুব পাতলা ও মোচার খোলার মতো। তাতে ১৯।২০টি খোলার ভাঁজ থাকে। এইগুলিই সাবধানে খুলে নিয়ে আড়ভাবে পরস্পর জুড়ে সেকালের পেপিরি কাগজ তৈরি হত।

এই পেপিরি কাগজ তৈরি করার কাজটা মিশর দেশেরই একচেটিয়া ছিল। গ্রীক কিংবা রোমকরা বহুদিন এ কাগজ তৈরির প্রণালী জানতে পারে নি। তারা প্রথমে ভাবত যে পেপিরি তৈরির জন্যে নীল নদের জল একান্ত দরকার, কারণ তাদের ধারণা ছিল যে নীলনদের জলে এমন এক রকম আঠার মতো পদার্থ আছে যা দিয়ে পেপিরির ছালগুলি জোড়া যেত। অর্থাৎ পেপিরির ছালগুলি ছেঁটে সমান করে ধারে ধারে মিলিয়ে একটা টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখে নীলনদের জল ছিটিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ রোদে শুকিয়ে নিলেই পেপিরি তৈরি হত। কিন্তু এ ধারণা ভুল ছিল। আসলে পেপিরি ছাল ভিজলেই ওর থেকে এক রকম আঠা বেরয় এবং শুকলে তাতেই ছালগুলি জুড়ে যায়।

পেপিরস্ তৃণের গোড়া মানুষের হাতের মতো মোটা হয়। অতএব যে গাছের গোড়া যত মোটা ঐ পেপিরি কাগজও তত চওড়া হত। আবার এর ছাল যত ভেতরের হবে তত পাতলা হতে থাকে, এই কারণে ছালের পুরুত্ব অনুযায়ী নানা রকম পুরু ও পাতলা পেপিরি তৈরি হত। সব চেয়ে পাতলা পেপিরিকে গ্রীকরা বলত 'হেরিটিকা'। এই কাগজ কেবলমাত্র মিশরের যাজকরাই ব্যবহার করতেন, সাধারণ লোকেরা বা বিদেশী বণিকরা কিনতে পারতেন না। এই কাগজে যাজকরা ধর্মকথা লিখে বিক্রি করতেন।

কিন্তু গ্রীক ও রোমকদের এই হেরিটিকা কাগজের প্রতি খুব লোভ ছিল। শেষকালে রোমকরা একটা উপায় বার করেছিল। যাজকদের লিখিত হেরিটিকা পেপিরি কিনে নিত এবং একরকম ওষুধ দিয়ে ঐসব লেখা মুছে ফেলত। ওষুধটা অবশ্য ওদেরই আবিষ্কৃত। তখন রোমের সম্রাট আগস্টাস্। আর এই কাগজের ঠিক পরের স্তরের কাগজের নাম দেয় 'লেভিয়ানী'— অগস্টাস্-পত্নীর নামানুসারে।

পেপিরি কাগজের ব্যবহারের উল্লেখ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের পরও পাওয়া যায়।

আধুনিক কাগজের ইতিহাস

পেপিরি পর্যন্ত যে কাগজের রূপ আমরা আলোচনা করলাম তাতে দেখা গেল যে, এ যাবৎ কাগজ তৈরীর কোন সূক্ষ্ম কৌশল উদ্ভাবিত হয় নি। প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যকে কেটে ছেঁটে জোড়া দিয়ে কাজে লাগানো হয়েছে।

কিন্তু কাগজ তৈরির কৌশল সূক্ষ্ম হল যবে থেকে মানুষ জৈব (organic) পদার্থকে মণ্ডে পরিণত করে তার থেকে কাগজ তৈরি করতে শিখল। সেই দিন থেকেই আধুনিক কাগজের সৃষ্টি।

এই কৌশল মানুষ কী করে শিখল ?

সুধীগণ অনুমান করেন কীট পতঙ্গের কাছে মানুষ শিখেছে এই কৌশল। বোলতা ভীমরুল ও মৌমাছির চাক দেখতে অনেকটা কাগজের মতো এবং তা গাছপালাজাত পদার্থ থেকেই তৈরি। এই সব পতঙ্গেরা যে সব উপায়ে বৃক্ষাংশ বিশেষকে তরলাকারে পরিণত ক'রে একটু একটু মুখে ক'রে এনে বড় বড় চাক তৈরি করে, সেই উপায় পর্যবেক্ষণ করেই সম্ভবত মানুষ কাগজ তৈরি করতে শিখেছে।

চীনের গৌরব

সে যাই হোক, আধুনিক কাগজ সর্বপ্রথম তৈরি করার গৌরবটা চীনকেই দেওয়া হয়। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মতে চীনেরাই প্রথম জৈবপদার্থকে মণ্ডে পরিণত করে কাগজ তৈরির উপায় উদ্ভাবন করে। খৃঃ ১০৫ সালে Tsai Lung নামে এক ব্যক্তি তদানীন্তন সম্রাটকে সরকারিভাবে জানিয়ে দেন যে কাগজ তৈরির নূতন উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। Tsai Lung নিজেই এ আবিষ্কার করতে পারেন কিংবা অন্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারেন। তবে জানা যায় যে তিনি সম্রাট কর্তৃক যথেষ্ট পুরস্কৃত হন, এবং চীন ইতিহাসে তাঁকেই কাগজ তৈরির জনকরূপে অভিহিত করা হয়েছে।

চীনের এ আবিষ্কারের কথাটা যে সত্য তা প্রমাণিত হয়েছে তুর্কিস্থান থেকে প্রাপ্ত খৃষ্টীয় তৃতীয় থেকে অষ্টম শতাব্দীর কাগজ পরীক্ষা করে। Dr. Stein তাঁর তুর্কিস্তান ভ্রমণ-অভিযান কালে এই কাগজ প্রাপ্ত হন।

ভারতবর্ষ

কাগজের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের নামও ইতিহাসে জড়িত আছে। এই ইতিহাসকে নিয়ে যদি ভালো ক'রে নাড়াচাড়া করা যায়, এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার পরিশ্রম স্বীকার করা হয়, তাহলে হয়ত চীনের গৌরবকে ভারতবর্ষ ম্লান করে দিতে পারে। গ্রীক ইতিহাসে জানা যায় যে আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি নিয়ারকাস্ লিখে গেছেন যে সে সময় ভারতে উত্তম, মসৃণ, চিক্কণ ও দীর্ঘকালস্থায়ী একরকম 'তুলা-চাপড়ান' জিনিসের ওপর ব্যবসাবাণিজ্যের

আদান-প্রদানের হিসেবপত্র লেখার খুব প্রচলন ছিল। এই তুলা-চাপড়ান সম্ভবতঃ তুলাত বা তুলট কাগজের মতো হবে। আলেকজাণ্ডার ভারতে এসেছিলেন খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে। সুতরাং তারও আগে ভারতবর্ষে তুলটের ন্যায় কোনো কাগজের প্রচলন ছিল, এটা নিশ্চয়। আগে মালদহ জেলায় এই তুলট কাগজের খুব প্রস্তুত করা হত। দেশ বিদেশে এ কাগজের আদর ছিল, এবং মালদহ থেকে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হত। একসময় ইংরেজরাই চীনদেশীয় একরকম কাগজের নাম দেয় India proof। এর থেকে মনে করে নিতে পারি যে প্রথমে চীনদেশে এ কাগজ প্রস্তুত হত না, ভারতবর্ষ থেকেই তা চীনে যায়, এবং এই আমদানির স্মৃতি কাগজের নামকরণের মধ্যে জড়িয়ে আছে। চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের আন্তর্বাণিজ্যের যোগ যে বহু অতীতের তার প্রমাণ তো যথেষ্টই আছে।

অতএব প্রথম কাগজ তৈরী করার গৌরব চীনের কতোখানি প্রাপ্য সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নিশ্চয়ই খুব অমূলক নয়।

দেশে দেশে কাগজের প্রসার

প্রথম কাগজ প্রস্তুত চীনে না ভারতে হয়েছিল—এটা একটা ঐতিহাসিক সমস্যা হ'তে পারে। কিন্তু চীন থেকেই যে কাগজ অতি দ্রুত পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কাগজের এই বিশ্ব-পরিক্রমার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত নেওয়া যাক।

জাপান

কাগজ তৈরি করার কৌশল আবিষ্কার ক'রে সে কৌশল চীনেরা নিজেদের মধ্যে গোপন রেখেছিল বহুদিন। প্রায় পাঁচশ' বছর পরে, অর্থাৎ খৃঃ ৬১০ সনে এই কৌশল জাপানের লোকেরা আয়ত্ত করে। ডোকিও (Dokyo)' নামে এক বৌদ্ধ শ্রমণ যিনি জাপান সম্রাজ্ঞীর প্রধান চিকিৎসক হন, তিনিই কোরিয়া থেকে এই কৌশল শিখে জাপানে প্রচার করেন। তবে জাপানে কাগজ তৈরি করার একটা বিশেষত্ব ছিল, তা হল এই যে এখানে চীনের মতো কাগজ বস্ত্রখণ্ড থেকে তৈরি হত না, হত মালবেরি অর্থাৎ তুঁত গাছের ছাল থেকে।

তুর্কিস্থান

জাপানের পর তুর্কিস্থানের লোকেরা কাগজ তৈরি করতে শিখল। চীনের সঙ্গে তুর্কিস্থানের যুদ্ধে মূরেরা এমন কয়েকজন চীনাকে বন্দী করে যারা ছিল খুব ভালো কাগজ প্রস্তুতকারক। তাদের সাহায্যে কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠিত

হল সমরকন্দে (খৃঃ ৭৫১ সন) এবং তারপর বাগদাদে (খৃঃ ৭৯৩ সন), এখানে রেশমী বস্ত্রখণ্ড থেকে কাগজ তৈরি হল, এবং শীঘ্রই সারা তুর্কিস্থানে এ কাগজ বিশ্বময় হয়ে উঠল।

ইয়োরোপ

চীনেদের মতো মুরেরাও কাগজ তৈরির কৌশল বেশ কিছুদিন নিজেদের মধ্যে সীমিত রেখেছিল। অবশেষে তাদেরই মারফৎ খৃঃ ১১৫০ সনে স্পেনে টোলেডো (Toledo) নগরে ইয়োরোপের প্রথম কাগজের কারখানা স্থাপিত হয়। তারপর ইতালিতে ফাব্রিয়ানো (Fabriano) নগরে প্রায় ১২৭৬ খৃষ্টাব্দে কাগজের কল বসে। জার্মেণীতে প্রথম কাগজ তৈরি হয় নুরেমবার্গ সহরে ১৩৯০ খৃষ্টাব্দে।

ইংলণ্ড

ইংলণ্ডে কাগজ তৈরি হয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে। তৎকালীন লণ্ডনের লর্ড মেয়রের পুত্র জন্ টেট্ (John Tate) হার্টফোর্ড নামক স্থানের কাছাকাছি কাগজের কল বসান। কলের নাম Sele Mill, এবং এর কাজ শুরু হয় অনুমানিক ১৪৯০ থেকে ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে।

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষে কাগজের পত্তন হয় কবে? সুধিগণ অনুমান করেন খৃঃ ১৪২০-৭০ সালে। কাশ্মীরের বাদশা নাকি ভারতে প্রথম কাগজ প্রস্তুত করান। তিনি সমরকন্দ থেকে লোক নিয়ে আসেন এবং তাদের নৌশারা নামক স্থানে বসবাস করতে দেন। এখনো এই স্থান কাগজ তৈরির একটা বড় ঘাঁটি। কাশ্মীর থেকে এই শিল্পকলা বিস্তার লাভ করল শিয়ালকোট, লাহোর, দিল্লী, মুলতান ও মথুরায়। তারপর ছড়াল বাংলাদেশে ও হায়দ্রাবাদে। এখানে প্রসংগতঃ একটা কথা বলা যায় যে ভারতে কাগজ তৈরির ব্যাপারটা মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দুরা এ কাজে হাত দিত না, কারণ তাদের কাছে ময়লা বস্ত্রখণ্ড ঘাঁটাঘাঁটি করা অপবিত্র ছিল। তাছাড়া মুসলমান-দ্বারা আনিত এ শিল্পকলায় হাত দেওয়া তৎকালীন হিন্দুদের ছুতমার্গে বাধত।

[ক্রমশঃ]

সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিচালকদের প্রতি

অভয়কুমার সরকার

আমার আজকার বক্তব্য বিশেষ ক'রে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালকদের উদ্দেশে। বর্তমান প্রবন্ধ যেহেতু সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, সেইজন্য সমগ্র বিষয়টি সাধারণ-গ্রন্থাগার নিয়ন্ত্রাদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আশু প্রয়োজন।

সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে এখন নানা খাতে টাকা আসছে। সদস্যদের চাঁদা ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের দান ছাড়া সরকারের নানা দপ্তর থেকে সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে। এভিন্ন, পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির কিছু কিছু সাহায্যও আছে। সুতরাং সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি আগের চেয়ে পাঠক সমাজকে বেশী সেবা করতে পারছে ব'লে আমরা আশা করতে পারি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কী তাই হ'য়েছে?

হাওড়া জেলার কথা নিয়েই আরম্ভ করি। গত ১৯৫৫-৫৬ সালে সাধারণ পাঠাগারগুলিতে নিম্নলিখিত সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল:

সরকারের সমাজশিক্ষা বিভাগ	—২০,০০০৲
হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি	—৫৪,৬০০৲
বালী মিউনিসিপ্যালিটি	— ৫,৪২৫৲
৫টি ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার	৩,০০০৲
	৮৩,০২৫৲
জেলা পাঠাগারের বার্ষিক বরাদ্দ	১৫,১৪০৲
	৯৮,১৬৫৲

এ ছাড়া রাজ্য সমাজ কল্যাণ পরিষদের কাছ থেকে এবং ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ডের কাছ থেকেও কিছু সাহায্য এসেছে, তার মোট পরিমাণ আমাদের জানা নেই। এর সঙ্গে বিভিন্ন পাঠাগারের সদস্যদের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে পাওয়া চাঁদার অঙ্ক (আঃ ৫২,০০০৲) যোগ দিলে সমগ্র গ্রন্থাগারের মোট আয় দাঁড়ায় ১,৫০,০০০৲ টাকার মত। জেলার সাক্ষর লোকের সংখ্যা সাড়ে চার লক্ষ। এর মধ্যে নামমাত্র লেখাপড়া জানা ও বয়স্কদের ও সবে পড়া সুরু করেছে এমন শিশুদের বাদ দিলে আন্দাজ ৩ লক্ষ জনসংখ্যা নিয়ে আমাদের

পাঠক সমাজ ব'লে ধরতে পারি। সেই হিসাবে মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় আট আনা। ইংলণ্ড, আমেরিকার তুলনায় এই অংক খুব অল্প হলেও, যখন আমরা স্মরণ করি যে এই অর্থ 'গ্রন্থাগার কর' ছাড়াই পাওয়া গিয়াছে, সাধারণের জন্য প্রকাশিত গ্রন্থ আমাদের দেশে খুব প্রচুর নেই এবং গ্রন্থাগারের বেশীর ভাগ কাজই স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে তখন এই অর্থ একেবারে অপ্রতুল বলা বোধ করি চলে না। হাওড়া জেলায় সর্বসমেত দুই শতের কিছু বেশী সাধারণ গ্রন্থাগার রয়েছে। এর মধ্যে অবশ্য ২০।২৫টি বাদ দিলে অবশিষ্ট গ্রন্থাগারগুলি গ্রন্থাগার পদবাচ্য নয় এবং বেশীর ভাগই কোন ক্লাবের একটি বিভাগ হিসাবে পরিচালিত। জেলার বিভিন্ন পাঠাগারগুলি এক একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী ও পৌর প্রতিষ্ঠানের সাহায্য বণ্টনের সময় উপযোগিতা বিচার ক'রে পৃথক পৃথক ভাবে এক একটি প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। কথাটি হাওড়া জেলা সম্বন্ধে বলা হলেও সমস্ত জেলাতে এই একই অবস্থা।

আজ ২৫ বৎসর কাল ধরে সরকারী তহবিল থেকে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে অর্থ সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। এতে ফল কি রকম পাওয়া গেছে, উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছে তা সমীক্ষা করে দেখার সময় এসেছে। Community projectএর evaluation report মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হতে দেখেছি, কিন্তু গ্রন্থাগারগুলি সম্বন্ধে এই রকম report-এর কথা জানা নেই। যাঁরা জনসাধারণের অর্থ ব্যয় করছেন, তার ফল কি পাওয়া যাচ্ছে সে কথা জনসাধারণকে জানানোর দায়িত্ব তাঁদের। যে পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারী সাহায্য দেওয়া হচ্ছে তার আখ্যা দেওয়া হয়েছে improvement of library service. কথাগুলি লক্ষণীয়। পৃথক ভাবে গ্রন্থাগারের কাজের উন্নতির কথা চিন্তা না ক'রে সমগ্রভাবে গ্রন্থাগারের কাজের উন্নতির কথা বলা হয়েছে। বিষয়টি পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখতে হবে।

সরকারী সাহায্যের ফলে পাঠাগারে নতুন নতুন বই কেনা যাচ্ছে। নতুন প্রাণের জোয়ার, নতুন করে কাজের উৎসাহ। সরকারী সাহায্য পাবার আশায় নতুন নতুন গ্রন্থাগার গড়ে উঠছে, যদিও এলোমেলোভাবে এবং হয়ত কিছুটা প্রয়োজনাতিরিক্তভাবেও। কোন বছর এ পাঠাগার কোন বছর ও পাঠাগার সরকারী সাহায্য লাভে পুষ্ট হচ্ছে। যে ভাবে উপদেষ্টা বোর্ডগুলি গঠিত হয়েছে, তাতে সব সময় হয়ত বন্টন ব্যাপারে রাজনীতি নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব

হচ্ছে না, কিংবা যেহেতু আমাদের গ্রন্থাগারগুলি প্রায়শই ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সেই জন্য তাদের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে সকল সময় সুনিশ্চিত হওয়া যায় না। সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত গ্রন্থাগারের বিলুপ্তির দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নয়।

সবচেয়ে বড় কথা, বর্তমান ব্যবস্থামত সরকারী সাহায্যের দ্বারা গ্রন্থাগারগুলি পাঠকদের খুব বেশী সাহায্য করতে পারবে না। সাধারণভাবে বলতে গেলে সাহায্যের অঙ্ক গ্রন্থাগার প্রতি ১০০।২০০ টাকা অর্থাৎ ৩০ থেকে ৬০ খানা বই সারা বছরে। পল্লী অঞ্চলে আমরা দেখেছি সরকারী সাহায্যে যে বই কেনা হয় তা ৩।৪ মাসে স্থানীয় পাঠকদের পড়া হয়ে যায়, তারপর সেগুলি আলমারীজাত হয়ে দিনের পর দিন পড়ে থাকে। এদের বাঁধিয়ে ব্যবহারোপযোগী করে রাখবার মত অর্থও খুব বেশী গ্রন্থাগারের নেই, তারপর বই রাখার আলমারীর প্রশ্ন তো আছেই। ফলে বইগুলি অল্প সময়ের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে—তা ছাড়া পাঠক নেই এমন বই রাখার সার্থকতাই বা কোথায়? অর্থ সাহায্যের পরিবর্তে যদি পুস্তক-ঋণের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে পাঠক সমাজ বেশী উপকৃত হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। একই অর্থে অন্ততঃ ৮।১০ গুণ বই প্রতি পাঠাগারে আসবে এবং নানা রকমের চাহিদামত বই পাবার সুযোগ থাকবে। আমার প্রস্তাব তাই, বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে পৃথক পৃথক অর্থ সাহায্য আর না দিয়ে সাহায্যের বরাদ্দ মোট অর্থে একটি চলমান গ্রন্থভাণ্ডার গঠন করা হোক এবং সেখান থেকে বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে নিয়মিতভাবে গ্রন্থ-ঋণ দেবার ব্যবস্থা করা হোক। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থাই জেলা গ্রন্থাগার থেকে করা হয়। কিন্তু জেলা গ্রন্থাগারের হাতে এর জন্য বরাদ্দ অর্থ যথেষ্ট নয়। গ্রন্থাগারের জন্য সাহায্যের অর্থ এর সঙ্গে যুক্ত হলে আরো সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থঋণ দেওয়া সম্ভব হবে। এতে করে এক একটি গ্রন্থাগার যেমন একদিকে ৮।১০ গুণ বেশী বই পাবেন, চাহিদামত ও প্রয়োজনমত, অন্যদিকে তেমন সংরক্ষণ, ইত্যাদির সমস্যা তাঁদের থাকবে না, গ্রন্থাগার হঠাৎ উঠে গিয়ে সরকারী অর্থের অপচয়ের আশঙ্কাও থাকবে না। স্থানীয় গ্রন্থাগারের চাঁদা, দান ইত্যাদি আয় থেকে, standard works, quick reference books, সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্র, ক্রয় করা যেতে পারে এবং ঘর ভাড়া, আসবাব পত্র, অফিস খরচ ইত্যাদির জন্য ব্যয় করা যেতে পারে। আমাদের সরকারের অর্থ খুব সীমাবদ্ধ সুতরাং সেই অর্থের পূর্ণতম ব্যবহার কাম্য।

আপত্তি উঠতে পারে উল্লিখিত ব্যবস্থায়,—এখন যে ভাবে জেলা গ্রন্থাগার বোর্ড গঠিত—তাতে সরকারী কর্তৃত্বাধীনে সবটাই চলে যাবে। যাঁরা এতদিন গ্রন্থাগার পরিচালনায় অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তাঁদের কিছু হাত থাকবে না। জেলা গ্রন্থাগার বোর্ড আরো ভাল ক'রে গঠন করা যেতে পারে যাতে পাঠকদের সুবিধা আরো বেশী হয় কিন্তু সেটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন, যদিও জরুরী প্রশ্ন। এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষদের বই কেনা ছাড়া অন্য সব কাজ তো রইলোই, সেগুলো আরো ভাল ভাবে করা যাবে। পাঠক সমাজকে গ্রন্থাগার মনা করা, নতুন নতুন পাঠক তৈরী করা, নিরক্ষর লোকেদের জন্য নানা ব্যবস্থা করা এ সব কাজ নতুন উৎসাহে করা যাবে। কেউ এমন কথা বলতে পারেন যে হাতের কাছে বই থাকলে পড়তে ইচ্ছা হ'তে পারে, কিন্তু বইয়ের খবর রেখে সে বই কেন্দ্র থেকে আনিয়ে পড়ার মত উৎসাহ কজন পাঠকের থাকবে, এর জন্য প্রচারকার্য ভালভাবে চালাতে হবে। নানা বইয়ের খবর পাঠকদের দিতে হবে, মধ্যে মধ্যে গ্রন্থ প্রদর্শনী ক'রে পাঠকদের সামনে ধরতে হবে, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন করবার জন্যও পাঠকদের উৎসাহিত করতে হবে।

সরকারের "পল্লী গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা" অনুযায়ী প্রতি থানায় একটি করে কেন্দ্র পল্লী গ্রন্থাগার সংগঠন করা হচ্ছে, তা খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। কিন্তু এই সব গ্রন্থাগারের সঙ্গে জেলার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের যোগাযোগ না থাকলে সমস্ত ব্যবস্থাটাই পঙ্গু হ'য়ে যাবে। আমাদের মতে এই সব আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শাখা হিসাবে কাজ করবে এবং সমগ্র পুস্তক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ক্রয় করা হবে, তাদের সূচী ইত্যাদি তৈরী করা হবে এবং তারপর তার থেকে এই সব (আঞ্চলিক) পল্লী গ্রন্থাগারে গ্রন্থগুলি বন্টন করা হবে। পল্লী গ্রন্থাগারের নিজস্ব স্থায়ী পুস্তক ভাণ্ডারে কিছুটা থাকবে এবং অবশিষ্টগুলি এলাকাস্থিত সদস্য গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঋণ দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে স্থায়ী ভাণ্ডার কিছু থাকবে। প্রয়োজনমত যে কোন পাঠক বা গ্রন্থাগার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে সরাসরি বই আনিয়ে নিতে পারবেন, সে ব্যবস্থাও থাকবে।

এতক্ষণ আমরা যে-সব কথা বললাম সেগুলি পল্লী গ্রন্থাগারগুলির সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু সহরেও বিচ্ছিন্ন স্ব স্ব গ্রন্থাগারগুলি পাঠকের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। আমাদের মতে এক একটি মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে এক একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সংগঠন করে যে সমস্ত গ্রন্থাগার এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের

নেতৃত্বে শাখা গ্রন্থাগার হিসাবে কাজ করতে ইচ্ছুক তাদের নিয়ে সংঘবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা উচিত। সরকারী ও মিউনিসিপ্যাল সাহায্য এই কেন্দ্রীয় মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগারে দিতে হবে।

আপাততঃ হয়ত ঠিক এমন ব্যবস্থা করায় অসুবিধা থাকতে পারে তবে পল্লী অঞ্চলের বরাদ্দ টাকা সরাসরি জেলা গ্রন্থাগারে এবং সহরাঞ্চলের টাকা সহরের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে এখনই বণ্টন করা যেতে পারে।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের জন্য জেলা গ্রন্থাগারগুলি স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থাগারগুলির জন্য রাজকোষ থেকে এবং স্থানীয় পৌরপ্রতিষ্ঠান থেকে যে অর্থ প্রতি বছর ব্যয়িত হচ্ছে, তাতে জেলা গ্রন্থাগারের কোন দায়িত্ব নেই একথা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। অর্থ সাহায্য ব্যাপারে আবার সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে এবং পৌর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ না থাকায় ফল সর্বদা ভাল হয় না। এক একটি অঞ্চলের পাঠক সমাজকে সমগ্রভাবে না দেখে টুকরো টুকরো ক'রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে তাকে সেবা করতে যাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালক-দের এ বিষয়ে মতামত আহ্বান করে প্রবন্ধ শেষ করছি।

অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থার উপযোগিতা

অজিত নারাণ রায়

সহকারী গ্রন্থাগারিক, দক্ষিণ কলিকাতা তরুণ সমিতি

বর্ত্তমানে কলিকাতার মত শহরেও কয়েকটি গ্রন্থাগার ব্যতীত কোথাও অবাধ অধিগম্য ব্যবস্থার সুযোগ দিতে কর্ত্তৃপক্ষরা রাজী নন। তাঁহারা মনে করেন ইহাতে পুস্তকের ক্ষতি হইবে অথবা পুস্তক চুরি যাইবে। কিন্তু আমার মনে হয় গ্রন্থাগারে যদি এই সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যে সন্দেহ বা আশঙ্কা পোষণ করেন, তাহা অচিরেই দূরীভূত হইবে। ছোট ছোট গ্রন্থাগারে কর্ম্মীর সংখ্যা কম। এক সঙ্গে যদি বেশী সদস্য পুস্তক বদল করিবার জন্য আসেন, তাহা হইলে সেই অল্প সংখ্যক কর্ম্মীর উপর বিশেষ চাপ পড়ে, এবং তাহাতে কর্ম্মীদেরও বড়ই বিব্রত হইতে হয়।

অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থার সুযোগ না দেওয়ার ফলে সাধারণতঃ গ্রন্থাগারের সদস্যদের মনে এমন একটা সন্দেহ আসে, যাহাতে সদস্যদের ধারণা হয়, যে চাহিদা মত পুস্তক না পাওয়ার কারণ হইতেছে, গ্রন্থাগারের কর্ত্তৃপক্ষরা সেই সব

পুস্তক নিজেদের খেয়ালখুশীমত ব্যবহার করেন অথবা তাঁহাদের মনোমত সদস্যদের সেই সব পুস্তক পড়িতে দিয়া থাকেন, অথচ সেই সব পুস্তক গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকায় আছে। তাহার ফলে হয় সদস্যদের সহিত গ্রন্থাগারের সম্বন্ধ শুধু দায় সারা গোছের। আর ইহার শেষ পরিণাম হয়, অল্প কিছুদিন সদস্য থাকার পর পুস্তক না পাওয়ার অজুহাতে তাঁহারা সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া যান। কিন্তু সেই সব গ্রন্থাগারে যদি অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থার সুযোগ থাকে, তাহা হইলে এই সন্দেহ কিছুতেই হইবে না, বরঞ্চ সদস্যরা নিজে থেকেই চেষ্টা করিবেন যাহাতে গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

শুধু পুস্তক চুরি যাওয়া অথবা অসংযত ভাবে পুস্তক নাড়াচাড়া করিবার জন্যেই যে অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া হয় না তাহা নয়। তাহার অন্য কারনও আছে এবং আমার মনে হয় ইহাই মূল কারন। খুব অল্প সংখ্যক গ্রন্থাগার ব্যতীত বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা খুবই কম। তাহার ফলে যখন কেহ গ্রন্থাগারের সদস্য পদের জন্যে আবেদন করেন এবং কৌতূহল বশে জিজ্ঞাসা করেন গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা কত ? তখন বাধ্য হইয়া কর্ম্মী অথবা পরিচালকদের বলিতে হয় অনেক বেশী করিয়া। তাহা যদি না বলা হয়, তাহা হইলে সেই পাঠক হয়ত সদস্য নাও হইতে পারেন। এই আশঙ্কা তাঁহাদের মনে থাকে। এবং ইহার জন্যে গ্রন্থাগারে পুস্তক যেখানে থাকে, সেখানে লিখিয়া রাখিতে হয় পুস্তকে হাত দেওয়া নিষেধ।

একদিক থেকে তাঁহারা হয়ত মিথ্যার আশ্রয় লইতেছেন, অপর দিক থেকে দেখিতে যাইলে দেখা যাইবে তাঁহারা সত্য কথাই বলিতেছেন। কারণ যখন কোন গ্রন্থাগার কর্পোরেশন অথবা সরকারের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করে, তখন পরিচালকদের গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যার হিসাব পেশ করিতে হয়। যদি পুস্তক সংখ্যার হিসাব কম হয়, তাহা হইলে সাহায্য দাতারা হয় কম সাহায্য করিবেন অথবা আদৌ সাহায্য করিবেন না। এই দোটানার ফলে গ্রন্থাগারের পরিচালকদের মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয়। এবং ইহার ফলে গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য হয় ব্যাহত। সাহায্যদাতারা যদি এ বিষয়ে একটু উদার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসেন তাহা হইলে গ্রন্থাগারকে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয় না।

বেশীর ভাগ সদস্যদের ধারণা গ্রন্থাগারে পছন্দ মত পুস্তক পাওয়া যায় না। গ্রন্থাগারে অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থার সুযোগ থাকলে যে এই অভিযোগ

আসবেনা তাহা নয়, তবে এর অনেক সুরাহা হবে। আমি দেখিয়াছি আমাদের পাড়ার গ্রন্থাগারে এই অভিযোগ করিতে সদস্যদের, কিন্তু অনেক আলাপ আলোচনা করিবার পর যখন গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষরা অবাধ অধিগম্য ব্যবস্থার সুযোগ দিলেন, তখন আর ঐ অভিযোগ আসে না।

গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য যেখানে শিক্ষা বিতরণ করা, সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন করা, সদস্যদের গঠন মূলক কাজে উৎসাহিত করা প্রভৃতি সেখানে এই সব করিতে হইলে গ্রন্থাগারে অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থার সুযোগ দিতেই হইবে। এবং ইহার মাধ্যমে সে সব সম্ভব হইবে। তবে সে জন্যে প্রয়োজন উপযুক্ত কর্ম্মীর। গ্রন্থাগারে কর্তৃপক্ষদের এ বিষয়ে তৎপরতা দেখাইতে হইবে এবং উদার মনো ভাবের পরিচয় দিতে হইবে। যে সব গ্রন্থাগারে অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থার সুযোগ নাই, তাঁহাদের অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থাগারে অবাধ অধিগম্য ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করুন সহযোগীতার মনোভাব লইয়া যখন কোন গ্রন্থাগারে অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া হইবে, তখন গ্রন্থাগারের পরিচালকদের সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির দিকে। যে সমস্ত গ্রন্থাগারে শিশু বিভাগ আছে, সেখানে অবাধ-অধিগম্য ব্যবস্থা বিশেষ-প্রয়োজন। অবাধ অধিগম্য ব্যবস্থার সুযোগ যেখানে নাই, সেখানকার কর্তৃপক্ষরা তাঁহাদের কিছু সংখ্যক কর্ম্মীকে, যে-সব গ্রন্থাগারে এই ব্যবস্থার প্রচলন আছে, সেখানে পাঠাইতে পারেন হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করিবার জন্য অথবা তাঁহারা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাছেও এই প্রস্তাব করিতে পারেন। পরিষদও এই বিষয়ে নিশ্চয়ই তাঁহাদের পরামর্শ দিতে পারেন। গ্রন্থাগারে অবাধ অধিগম্য ব্যবস্থার সুযোগ দিতে গিয়া হয়ত সেখানকার কর্ম্মীদের একটু বেশী পরিশ্রম প্রথমে করিতে হইবে। গ্রন্থাগারের উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে পাঠকের সহিত পুস্তকের যদি দূরত্ব কমিয়া যায় ঘটে এবং তাহাতে যদি সদস্যরা অবাধ অধিগম্যর ব্যবস্থার সুযোগ পান, তবে এই সামান্য কষ্ট স্বীকার করা বাঞ্চনীয়।

গ্রন্থাগারে হাতেলেখা পত্রিকা

মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত

সহঃ সম্পাদক, বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির, গড়জয়পুর, পুরুলিয়া

অভাব নেই হাতেলেখা বাংলা সাহিত্য-পত্রিকার সুদূর গ্রামের গ্রন্থাগার সমূহে। গ্রন্থাগারে দু চারজন আগ্রহী জড় হোলেই সুরু করা হয় একখানি হাতেলেখা সাহিত্য-পত্রিকা। নানা দিক থেকে এগুলো টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা এবং অসুবিধা দুই ই আছে। গ্রন্থাগারে সাহিত্যামোদীরা আসেন এবং চেষ্টা করেন নিজেদের গল্প, কবিতা ইত্যাদি গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সভ্যদের মধ্যে প্রচার করার। তাছাড়া গ্রন্থাগার সমূহেরও এইরূপ মাধ্যম হওয়ার দরকার আছে কারণ স্রেফ বই পড়ানো আর ইসু-সংখ্যা বাড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে জনকল্যাণের বিস্তৃত ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু করা যায় না। কিন্তু গ্রামে এ সমস্ত পত্রিকার সমস্যা অনেক। অভাব এদের পাঠক এবং লেখক দুয়েরই। লেখক থাকেন জন কয়েক আর পাঠকবাহিনী ডিটেকটিভ উপন্যাস ও হালফিলের দু চারটে রোমাঞ্চকর গল্প উপন্যাস প'ড়তে উদগ্রীব। এক একটা ছোট গল্প প'ড়তে নাকি একটা বিড়িও শেষ হয় না আর কবিতা নাকি বুঝা যায় না। দু চারজন এর ব্যতিক্রম আছেন বটে কিন্তু তাঁদের সংখ্যা এত নগণ্য যে আঙুলে গোনা যায়। পাঠক যদি না জুটলো, কেউ যদি না প'ড়ল তবে কাগজ পত্রিকা বের করার ইচ্ছা যাবে কার? বিশেষ ক'রে যাঁরা গল্পটল্প লেখেন তাঁদেরত যাবেই না, কারণ লেখক মাত্রেরই লেখার পর যে ইচ্ছা প্রবলভাবে দেখা দেয় তা নিজের লেখা অন্যকে পড়ানোর ইচ্ছা। এমন হয় যে পাঠকের অভিরুচি মত ডিটেকটিভ বা অন্য কিছু দেওয়া গেল না ফলে পত্রিকা তাঁদের কাছ থেকে স্বীকৃতিও পেল না। দেওয়া গেল না পাঠকের ইচ্ছামত কিছু কেবল লেখকের অভাবে। দু' চারজন লেখকের দ্বারা তো আর সব কিছু লেখা সম্ভব নয়। অতএব পত্রিকা বেরিয়েও রইলো অপঠিত। এ এক দারুণ ট্রাজেডী।

এ ছাড়াও আসে সর্ব্বাংগসুন্দর একখানি পত্রিকা বের করার কথা। সাজিয়ে গুছিয়ে সভ্যভব্য একখানি পত্রিকা বের করার জন্য যা দরকার তার সব কিছু গ্রামের ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে পাওয়া যায় না। কোন জায়গায় গল্প লেখক আছেন, কবিতা লেখক বা প্রবন্ধকার নেই আবার কোন জায়গায় বা গল্প কবিতা পাওয়া গেলেও ছবি পাওয়া যায় না। তাই পত্রিকার জন্য আমাদের অন্য জায়গা

থেকেও অনেক কিছু দেওয়া নেওয়ার দরকার আছে। যেমন যাঁদের কবিতার দরকার তাঁদের কবিতা দিয়ে আমাদের প্রবন্ধ নেওয়া উচিত ইত্যাদি। দূরের সংগে যোগাযোগ না থাকলে একের পর এক পত্রিকার মৃত্যু ঘটতে থাকবে আমাদের চোখের সামনে উৎসাহীদের উৎসাহের অপচয় ঘটিয়ে। প্রশ্ন উঠবে যোগাযোগ কি ক'রে করা যায়? এর সদুত্তর দিতে পারব কিনা জানি না তবে একটা প্রস্তাব ক'রতে পারি অনায়াসে যা গ্রহণ ক'রলে হয়তো পল্লী অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলো উপকৃত হবে। হাতেলেখা পত্রিকা একটার বেশী কপি করা কষ্টকর। সুতরাং কোন চালু পত্রিকায় সমালোচনা বের করার দাবী সম্পাদকরা আইনের অজুহাতে নস্যাৎ ক'রে দিতে পারেন সহজেই।

বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার'। পাঠাগারের সাহায্যার্থ নূতন কিছু ক'রতে তাঁদের (গ্রন্থাগার গোষ্ঠীর) দ্বিধা থাকার কথা নয়। সুতরাং আইন কানুনের কথা চিন্তা না ক'রেও তাঁরা পাঠাগারগুলো থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর সমালোচনা বের ক'রতে পারেন এর জন্য 'গ্রন্থাগারে' একটা নূতন বিভাগ খুলে। অবশ্য পত্রিকা পাঠানো বা ফেরৎ দেওয়ার ব্যয় বহন ক'রতে হবে পত্রিকাগুলোকে। এতে বিভিন্ন জায়গার হাতেলেখা পত্রিকাগুলোর সংগে যোগাযোগের পথ যেমন সুগম হবে তেমনি হবে পত্রিকার বেঁচে থাকার পরিষ্কার পথ। আশা করি পাঠক সমাজ আমার প্রস্তাব সহানুভূতির সংগে বিবেচনা করে দেখবেন।

ডেলিভারি অব বুক্স টু পাবলিক লাইব্রেরীজ (১৯৫৪) এ্যাক্ট

৩০শে এপ্রিল ১৯৫৭ তারিখ অবধি প্রাপ্ত পুস্তকের সংখ্যা

জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা	৪৭,২৯৮	(পুস্তক)	১৪৯০	(পত্রিকা)
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বোম্বাই	১৯,৩৫৫	”	৮৫	”
কোনেমারা সাধারণ গ্রন্থাগার, মাদ্রাজ	১৭,৭১৩	”	৩৩০৪	”
	৮৪,৩৬৬		৪৮৭৯	

পরিষদ কথা

সংসদের প্রথম সভা ও নূতন উপ-সমিতি নির্বাচন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নবনির্বাচিত সংসদের প্রথম সভা পরিষদ কার্যালয়ে গত ১০ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। কোষাধ্যক্ষ শ্রীফণিভূষণ রায় চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট সভায় উপস্থাপিত করেন ও তাহা গৃহীত হয়। সংসদ হতে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন:

সর্বশ্রী অভয় সরকার, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, শিবরঞ্জন ঘোষ ও সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

সভায় পরবর্তী বছরের জন্য নিম্নলিখিত উপসমিতিগুলি গঠিত হয়:

সংযোগ ও সংগঠন উপসমিতি

সর্বশ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (সভাপতি), বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় (আহ্বায়ক) ও সংসদের বিভিন্ন জেলার প্রতিষ্ঠানিক সদস্যগণ।

গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ উপসমিতি

সর্বশ্রী বি, এস, কেশবন (সভাপতি), প্রমোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বায়ক), শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আদিত্য ওহদেদার, বিমল মজুমদার, সুবোধ মুখোপাধ্যায়, বিনয় সেনগুপ্ত, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থাগার পত্রিকা উপসমিতি

সর্বশ্রী যতীন্দ্র মোহন মজুমদার (সভাপতি), সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় (আহ্বায়ক), মুরারি ঘোষ, আদিত্য ওহদেদার, বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়।

ডাইরেক্টরী প্রকাশন উপসমিতি

সর্বশ্রী তিনকড়ি দত্ত (সভাপতি), গণেশ ভট্টাচার্য (আহ্বায়ক), গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল বসাক, প্রবীর রায়চৌধুরী।

গ্রন্থ-নির্বাচন উপসমিতি

সর্বশ্রী চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সভাপতি) বিজয়ানন্দ সেনগুপ্ত (আহ্বায়ক), অমল সরকার, সুনীল ঘোষ, বিমল মজুমদার ও বাণী বসু।

টেকনিক্যাল উপদেষ্টা উপসমিতি

সর্বশ্রী সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় (সভাপতি), অরুণকান্তি দাশগুপ্ত (আহ্বায়ক), এ, বি, সেনগুপ্ত, বিনয় সেনগুপ্ত, হিরণ্ময় গুপ্ত ও বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থাগার উপসমিতি

সর্বশ্রী প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সভাপতি), অশোক বিশ্বাস (আহ্বায়ক), পরিমল আচার্য, পূর্ণেন্দু প্রামাণিক, সুবোধ চন্দ্র দে।

অর্থ ও হিসাব উপসমিতি

সর্বশ্রী গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি), ফণিভূষণ রায় (আহ্বায়ক), ইন্দ্রনাথ মজুমদার, অজয় হৃদয় মিত্র, পূর্ণেন্দু প্রামাণিক।

সভায় নন্দনঘাট রামপুরিয়া এইচ, ই, স্কুল ও বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজকে সংসদে যথাক্রমে স্কুল ও কলেজ প্রতিনিধি হিসাবে নেওয়া হয়।

গ্রন্থাগার দিবসের খসড়া কর্মসূচী

২০শে ডিসেম্বর তারিখটি বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও স্মরণীয় দিন। বত্রিশ বৎসর পূর্বে ঐ দিনটিতে বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন সুসংগঠিত রূপ প্রাপ্ত হয়—প্রতিষ্ঠা হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের। বিগতকালের কর্মধারার বিচার-বিশ্লেষণের, বর্তমান কার্যকলাপের পর্যালোচনা ও আগামী দিনের কর্মপন্থা নির্ধারণ ও সংকল্প গ্রহণের এক বিশেষ দিন। পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি তাই সকল প্রতিষ্ঠানকে সাধ্য ও সুযোগমত ঐ দিনটি পালন করবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন।

সম্ভব না হলে ঐ দিন হতে এক সপ্তাহকালের মধ্যে সুযোগ সুবিধামত পালন করলেও চলবে। যথাযথরূপে পালনের জন্যে একটি খসড়া কর্মসূচী প্রদত্ত হল :

● নিজ নিজ গ্রন্থাগারের পরিচ্ছন্নতা বিধান।

● শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র সর্বস্তরের মানুষের গ্রন্থাগারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ।

● স্থানীয় পুঁথি, গ্রন্থ ও চারুকলা নিদর্শনের প্রদর্শনীর আয়োজন।

● নিজ গ্রন্থাগারের উন্নতি বিধান কল্পে অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহ।

● সমাজ-সেবা ও গ্রন্থাগার কর্মীদের আলোচনা বৈঠকের আয়োজন ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে সহযোগিতার কর্মপন্থা নির্ধারণ।

● জনসভার আয়োজন।

● চলচ্চিত্র, অভিনয় ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন।

● নিজ গ্রন্থাগারের উন্নতি তথা স্থানীয় জনসাধারণকে গ্রন্থাগার-মনা করে তোলার জন্যে অন্যান্য কর্মসূচী পালন।

॥ হাওড়ায় আঞ্চলিক পল্লী পাঠাগার ॥

গত ২৬শে অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিযুক্ত হাওড়া জিলা সমাজ শিক্ষা পরিষদের এক সভায় এই জেলায় ১৩টি পাঠাগারকে 'আঞ্চলিক পল্লী পাঠাগার' নির্বাচিত করা হয়। এই সকল পাঠাগারের গৃহনির্মাণে সরকার প্রত্যেক পাঠাগারকে ৩,০০০৲ টাকা অর্থ সাহায্য করিবেন ও তাহাদের গ্রন্থাগারিক ও একজন করিয়া সাইকেল পিয়নের মাসিক বেতনের ব্যয়ভার বহন করিবেন। জিলা শাসক শ্রীবিনয় মণ্ডল এই সভা পরিচালনা করেন। শ্রীকালোবরণ ঘোষ, শ্রীগোষ্ঠবিহারী চ্যাটার্জি, শ্রীধনঞ্জয় ব্যানার্জি ও শ্রীরতনমণি চ্যাটার্জি সভায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। মাজু পাবলিক লাইব্রেরী, দফরপুর রামকৃষ্ণ, দেউলপুর পাবলিক লাইব্রেরী, রাজগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী, শ্যামপুর প্রিয়নাথ পাঠাগার, উলুবেড়িয়া 'আনন্দম', ভট্টনগর প্রগতি, বাকসাড়া তরুণ সঙ্ঘ, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, চন্দ্রভাগ শ্রীকৃষ্ণ পাঠাগার, বাঙ্গালপুর রবীন্দ্র পাঠাগার, আমতা সাধারণ পাঠাগার ও নিজবেলিয়া সবুজ সঙ্ঘ পাঠাগার 'আঞ্চলিক পল্লী পাঠাগার' নির্বাচিত হইয়াছে। আনন্দবাজার—২৮।১০।৫৭

গ্রন্থাগার সংবাদ

গ্রন্থ সংহতি ॥ বাদসী ॥ বাঁকুড়া।

আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে গত ৬ঠা কার্তিক সংহতি ভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে জেলা সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিক শ্রীবিশ্বেশ্বর দাশ ও অধ্যাপক সুধীর রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। বাংলা ভাষা ও ভারতীয় জ্যোতিষে আচার্যদেবের গবেষণা কার্য ও অবদান সম্পর্কে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় আলোচনা করেন। ব্যক্তি ও পন্ডিত হিসাবে আচার্যদেব সম্বন্ধে প্রধান অতিথি শ্রীদাশ এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীকিরীটি ভূষণ গাঙ্গুলী স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। এতদুপলক্ষে সংহতি ভবন সুসজ্জিত করা হয়।

আদর্শ সংঘ পাঠাগার ॥ মদনপুর ॥ নদীয়া।

দশম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস ও অঙ্কুর পত্রিকার ৩য় বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে গত ২৭শে অক্টোবর স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয় ভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিশ্বাস। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীমতী আরতি দাশ। এতদুপলক্ষে আয়োজিত কবিতা প্রতিযোগিতায় সর্বশ্রী মুক্তি মুখোপাধ্যায়, নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য ও ভবানী সরকার যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় মহিলাদের মধ্যে থেকে সর্বশ্রী আরাধনা চট্টোপাধ্যায়, আরতি সরকার ও জ্যোতি মুখোপাধ্যায় এবং পুরুষদের মধ্য হতে সর্বশ্রী রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় বিশ্বাস ও মধুসূদন ঘোষ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। সভায় আয়োজিত সাংগীতিক অনুষ্ঠান বিশেষ উপভোগ্য হয়। অনুষ্ঠানে বহু জন-সমাগম হয়।

নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার ॥ নবদ্বীপ ॥ নদীয়া।

গত ২৭শে অক্টোবর গ্রন্থাগারের সমাজ শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে এক বিচিত্রানুষ্ঠান ও নাটকাভিনয় হয়। পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক মনোরঞ্জন স্মৃতিতীর্থ মহাশয়। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সমাজ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি বাগচী আলোচনা করেন এবং এ কাজে অংশ গ্রহণের জন্যে ছাত্রদের আহ্বান জানান। স্বল্প সময়ে নাটকানুষ্ঠানের জন্য পরিচালকদ্বয় শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র কুন্ডু ও শ্রীগীতগোবিন্দ গোস্বামী সকলের প্রশংসা অর্জন করেন।

মিলন মন্দির ॥ ১৭ লাইব্রেরী রোড ॥ খড়্গপুর ॥ মেদিনীপুর।

বিগত ১৩ই অক্টোবর, খড়্গপুরে মিলন মন্দির প্রাঙ্গণে মিলন মন্দির পাঠাগারের ত্রয়োদশ প্রতিষ্ঠা দিবস বিশেষ সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন সদর মহকুমা হাকিম (দক্ষিণ) শ্রীঅশোক কুমার রায় ও প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সমাজ-শিক্ষা প্রাধিকারিক শ্রীসুধাময়ী দত্ত। সভাপতি সেবাদল, মহিলা বিভাগ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ও নাট্যবিভাগের উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথি তাঁহার ভাষণে মহিলা বিভাগের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা ও বর্ত্তমানে দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কথা আলোচনা করেন। সম্পাদক শ্রীসুনীল দাস পাঠাগারের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করেন। সভায় বিভাগীয় সম্পাদকদের বিবৃতি পঠিত হয়। স্থানীয় তরুণ লেখক ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে পাঠাগারের পক্ষ থেকে মানপত্র দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করা হয়। সভায় ভাষণ দেন অধ্যাপক পুলিনবিহারী পাল, বিজয় মাল, নন্দদুলাল রায়চৌধুরী ও তারাকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর সভার কাজ শেষ হয়।

বৈদ্যবাটী ইয়ং মেনস এ্যাসোসিয়েসনের পঞ্চাশৎ প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

গত ২০শে অক্টোবর হুগলী জেলার জনপ্রিয় সমাহর্ত্তা শ্রীঅবনীমোহন কুশারী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এ্যাসোসিয়েসনের পঞ্চাশৎ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এক প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় শিল্পীগণ কর্তৃক একটী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর শ্রীঅমিয় কুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং সভাপতি মহাশয় হুগলী

জেলার এই প্রাচীন গ্রন্থাগার এবং জ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের কার্যাবলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়া ভাষণ দেন।

গত ২৪শে অক্টোবর শ্রীরামপুর মহকুমার প্রচার অধিকর্তার পরিচালনায় গ্রন্থাগারে "রাষ্ট্রসংঘ দিবস" প্রতিপালিত হয়। বহু বিশিষ্ট নাগরিক এবং ছাত্র "রাষ্ট্রসংঘ" বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

হাওড়া জেলা পাঠাগার সঙ্ঘ ॥ ৪ নং চার্চ রোড ॥ হাওড়া ॥

গত ২৫শে অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ডিউক পাবলিক লাইব্রেরী ভবনে সঙ্ঘের পরিচালিত পঞ্চম গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থার শিক্ষোত্তীর্ণ কর্মীদের অভিজ্ঞান-পত্র বিতরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জেলা শাসক শ্রীযুক্ত বিনয় ভূষণ মণ্ডল, এবং অভিজ্ঞান-পত্র বিতরণ করেন শ্রীযুক্তা মণ্ডল।

প্রারম্ভে সঙ্ঘ-সভাপতি শ্রীরত্নমণি চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। সম্পাদক মহাশয়ের বিবরণে জানা যায় যে এ বৎসর মোট উত্তীর্ণ ২২ জনের মধ্যে ৯ জন প্রথম বিভাগে, ৭ জন দ্বিতীয় বিভাগে ও ৬ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে এই শিক্ষণ ব্যবস্থা পূর্ণ এক মাস কাল চালু রাখা হইয়াছিল। তারপর শিক্ষার্থীগণকে দুইমাসকাল স্ব স্ব গ্রন্থাগারে কার্যনিরত থাকিতে হয়।

অন্যান্য রাজ্যের খবর

জলন্ধরে সর্বভারতীয় গ্রন্থ পার্বণ

ভারতের সকল ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের পাঠ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে সংগঠিত ইন্ডিয়া বুক কাউন্সিলের উদ্যোগে সম্প্রতি জলন্ধর মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরী ভবনে এক গ্রন্থ পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রাচীন পুঁথি ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বইগুলি প্রদর্শিত হয়, বিভিন্ন বৈদেশিক দপ্তর ও রাজ্য কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনেক নিদর্শন সংগৃহীত হয়।

পাতিয়ালায় গ্রন্থাগার সেমিনার

নয়া দিল্লীস্থ ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের উদ্যোগে গত মে মাসে পাতিয়ালায় উত্তর ভারতের কয়েকটি রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীদের এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিন ব্যাপী এই সেমিনারে পাঞ্জাব, দিল্লী, উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থানের প্রায় ২০ জন গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারসেবী সমবেত হন। বিভিন্ন দিনে দুটি করে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়—সেগুলি পরিচালনা করেন যথাক্রমে আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপি, কে, বন্দ্যোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরীয়ান সম্পাদক শ্রীসন্তরাম ভাটিয়া, শ্রীগিরিজা কুমার প্রভৃতি। গ্রন্থাগারিকদের বৃত্তিশিক্ষণ ও তাঁদের পদমর্যাদা; সমাজ শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও অন্যান্য দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে সেমিনারে আলোচনা হয়। সেমিনারের প্রতিদিনের অধিবেশন বিশেষ হৃদয়স্পর্শী হয় এবং বিভিন্ন রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীগণের মধ্যে পারস্পারিক চিন্তা ও ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ ঘটে।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় মাদ্রাজের অগ্রগতি

ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় মাদ্রাজের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অনেক উন্নত ও সুসংগঠিত। রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুপরিচালনের জন্যে রাজ্যে একটি রাজ্য গ্রন্থাগার কমিটি আছে। রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী তার সভাপতি। ডাইরেক্টর অব লাইব্রেরীজের ক্ষমতাসম্পন্ন উক্ত কমিটির সম্পাদক রাজ্যের ডি, পি, আই। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে কমিটির দপ্তর অবস্থিত। প্রতি জেলায় একটি করে জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও তার উপদেষ্টা সমিতি আছে এবং ছোট সহরগুলিতে যেখানে জনসংখ্যা ৫ থেকে ৫০ হাজার সেখানে স্থানীয় পরিচালক সমিতির অধীনে শাখা গ্রন্থাগার আছে। শেষোক্ত সমিতিগুলি বছরে ২ হাজার টাকার মত বই কিনতে পারেন। এছাড়াও গ্রন্থযানের সাহায্যে দূর গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থ সরবরাহের সুব্যবস্থা বিদ্যমান। প্রতি স্থানে স্বল্প বেতনের বিনিময়ে কোনও শিক্ষক গ্রামাঞ্চলের কাজে নিযুক্ত আছেন। সময় বিশেষে উক্ত কর্মী নিজেও সরবরাহ শাখা থেকে বই নিয়ে আসেন কিংবা সাইকেলে করেও গ্রামে বই দিয়ে যায়।

১৯৪৮ সালে গৃহীত গ্রন্থাগার আইনের বলে সংগৃহীত গ্রন্থাগার কর এবং অন্যান্য আয় থেকে রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিচালনের ব্যয় নির্বাহ হয়। রাজ্য সরকারও যত টাকা সংগৃহীত হয় তত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেন।

বিবিধ বার্তা

পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় রাজ্যব্যাপী সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

বিভিন্ন রাজ্যে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় ৯টি রাজ্যে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবং ৩২০টি জেলার মধ্যে ৯৬টি জেলায় জেলা-গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এজন্যে মোট খরচ পড়েছে ৮,৮৯১,৪৯৯৲ টাকা।* তন্মধ্যে ২৮টি জেলা গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও পূর্বেকার গৃহের সংস্কার কার্যও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্যে। এর অর্ধেক দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার। বৃত্তিকুশলী কর্মী সৃষ্টির জন্যে একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষণ সংস্থা সংগঠনের উদ্দেশ্যে আরও ১০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে।

ভারত সরকার একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি নিয়োগ করেছেন। বিহারের ডি পি আই শ্রী কে, পি, সিংহ উক্ত কমিটির সভাপতি ও ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের সহ পরামর্শদাতা শ্রীসোহন সিং কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন। কমিটি বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য পর্যটন করেছেন। কমিটির বাকি সদস্যগণের নাম গ্রন্থাগার পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। দেশের বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও জনসাধারণের পঠন পাঠনের অভাব অসুবিধা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে কমিটি উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং কর্মীদের শিক্ষণ ও বেতন সম্পর্কে বিবেচনার জন্য সুপারিশ করবেন।

আন্তর্জাতিক গ্রন্থপঞ্জী উপদেষ্টা সংস্থার অধিবেশন

ইউনেস্কোর উদ্যোগে সংস্থাপিত আন্তর্জাতিক গ্রন্থপঞ্জী উপদেষ্টা সংস্থার এক অধিবেশন আগামী ডিসেম্বর মাসে প্যারীতে অনুষ্ঠিত হবে। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ও জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক অন্যতম সদস্য হিসাবে অধিবেশনে যোগদান করবেন।

সম্পাদকীয়

বইয়ের ব্যবসায় বনাম গ্রন্থাগার আন্দোলন

সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি কি বইয়ের ব্যবসায়ের ক্ষতি করছে? সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা বিভিন্ন দেশে ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে, তার ফলে কি প্রকাশকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন? কোন কোন দেশে আজ এই প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে। পাঠকেরা সাধারণতঃ বই কিনে পড়েন, বইয়ের জন্য তাঁদের কিছু খরচ করতে হয়। কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা যেখানে হয়েছে সেখানে বিনা পয়সায় বই ধার পাওয়া যায়। বিনা পয়সায় যখন বই পড়তে পাওয়া যায় তখন তার জন্য সামান্য দুই এক টাকা খরচ করাও বাহুল্য মনে হয়। প্রকাশকেরা তাই আশঙ্কা করছেন যে সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা যদি দ্রুতহারে বেড়ে চলে তবে বই বিক্রির সংখ্যা কমে আসবে, ফলে লাভের অংক কমে গিয়ে ব্যবসায়ে সংকটজনক পরিস্থিতি উদ্ভব হবে।

সম্প্রতি ডেনমার্কে এই সমস্যা নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে। ডেনমার্ক খুব ছোট দেশ হলেও সেখানে সাধারণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা খুবই চমৎকার। ১৯২০ সালে প্রথম সেখানে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়। আজ সেখানে দেড় হাজারেরও বেশী সাধারণ গ্রন্থাগার আছে। ১৯৫০ সালে এই গ্রন্থাগারগুলিতে মোট বইয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচলক্ষ। ৭৮২,০০০ জন পাঠক এই বছর এককোটি আশী লক্ষ বইয়ের লেনদেন করেন। ১৯৫৫ সালে বইয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় আশী লক্ষ এবং পাঠকের সংখ্যা বেড়ে হয় ১,০২৩,১০০। বর্তমান বছরে তা দাঁড়িয়েছে দুই কোটি ষাট লক্ষ। সেখানকার প্রকাশকরা বলেন গ্রন্থাগারে পাঠকের সংখ্যা যেমনি বেড়েছে বই বিক্রির সংখ্যা তার থেকে অনেক বেশী কমেছে। উপরন্তু ১৯৫০ সালের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ছিল ৩,৮৯৬, ১৯৫৫ সালে সেই সংখ্যা ২,৬২৪ এ দাঁড়িয়েছে। বই বিক্রি কমে যাওয়ায় যে আর্থিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারের সংগে তাল রেখে নতুন বইয়ের সৃষ্টি হয়নি।

এ সমস্যার সমাধান কি? ডেনমার্কের প্রকাশকদের তরফ থেকে প্রস্তাবিত হয়েছে যে প্রকাশিত হবার সংগে সংগেই গ্রন্থাগারগুলি তা কিনে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারবেন না। অন্ততঃ ১৫ থেকে আঠার মাস একটা সময় বেঁধে দিতে হবে যে পর্যন্ত বই শুধু কিনেই পড়া যাবে—গ্রন্থাগারে গিয়ে নয়।

এই সময়ের ভিতর প্রকাশকেরা বই বিক্রি করে আর্থিক সমস্যার সুরাহা করে নিতে পারবেন। উপরন্তু গ্রন্থাগারকে বই কিনতে হ'লে প্রত্যেক বইয়ের জন্য লাইসেন্স জোগাড় করে নিতে হবে। এই লাইসেন্স ফি হবে বইয়ের দামের সমান—অর্থাৎ গ্রন্থাগারকে বই কিনতে হ'লে তার জন্য দ্বিগুণ দাম দিতে হবে।

প্রকাশকরা যে প্রশ্ন তুলেছেন এবং সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা সমীচীন কিনা তা যাচাই করার সময় সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ও চরিত্রকে ভুললে চলবে না। বিনা পয়সায় দেশের আপামর জনসাধারণের হাতে বই তুলে দেওয়া সাধারণ গ্রন্থাগারের আদর্শ। কারো আর্থিক বা সামাজিক অবস্থা বই পড়ায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, মূলতঃ এই নীতিকে মেনে নিয়ে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্ম। আজ এই নীতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাই গ্রন্থাগার মারফৎ বই পরিবেশনের ধারাকে ব্যাহত করা অসমীচীন। ডেনমার্কের লোকসংখ্যার স্বল্পতা হেতু প্রকাশকেরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন সেখানকার সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ সেজন্য তাদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল এবং সেজন্য প্রকাশকদের সাথে তাঁরা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। কিন্তু তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন যে গ্রন্থাগারগুলি যেমন প্রতি বৎসর বিভিন্ন ধরণের পরিসংখ্যান প্রকাশ করেন, প্রকাশকেরা কি বই বিক্রি সম্বন্ধে অনুরূপ পরিসংখ্যান প্রকাশ করতে প্রস্তুত আছেন? কারণ উভয় পক্ষের যথোপযুক্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতেই এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা ও সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দ্ধারণ করা সম্ভব।

নতুন পাঠক সৃষ্টি করতে সাধারণ গ্রন্থাগারের অবদানকে কোন মতেই অস্বীকার করা চলেনা। জনসাধারণের পাঠস্পৃহাকে গ্রন্থাগার যেভাবে বাড়িয়ে তুলেছে তার ফলেই আজ নতুন নতুন বই মুদ্রিত প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এর ফলে কি প্রকাশকেরা লাভবান হননি? আমাদের মত শিক্ষায় অনগ্রসর দেশগুলিতে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি বিভিন্ন কর্মক্রমের মারফৎ মানুষের পঠনপাঠনের অভ্যাস সৃষ্টি করেছেন। বইয়ের ব্যবহার বৃদ্ধি করছেন। ফলে বইয়ের বাজারের সম্প্রসারণ ঘটছে। এমনকি যে ডেনমার্কের কথা আজ উঠেছে সেই দেশেই সম্প্রতি গ্রন্থাগারিক ও প্রকাশকদের যুক্ত উদ্যোগে "শিশু সাহিত্য সপ্তাহ" উদ্‌যাপিত হয়েছিল, যার ফলে ছোটদের বইয়ের বিক্রি বেড়ে যায়। বড়দেরও তেমনি যেসব বই ভাল লাগে তার সবই তাঁরা কিনতে পারেন না। কিন্তু গ্রন্থাগার তাঁদের চাহিদা মত বই সরবরাহ করে তাঁদের পাঠস্পৃহা অব্যাহত

রাখে, এবং গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বইয়ের সংস্পর্শে এসেই তাঁরা বই কেনবার প্রেরণা পান।

ডেনমার্কের গ্রন্থাগারিকদের বই কেনার, বিশেষ করে গল্প উপন্যাস এবং নাটকের বেলায়, সময় বেঁধে দিতে আপত্তি নেই। কারণ বই কেনার আগে বই বাছাই করতে কিছু সময় লাগে। কিন্তু দ্বিগুণ দামে বই কিনতে তাঁরা রাজী নন। কারণ গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ বাড়াবেন না। ফলে বেশী দামে কম সংখ্যক বই কিনতে হবে। তাহলে কি ওখানকার প্রকাশকদের বিক্রি বাড়বে ?

'আরো বই পড়ুন' ও 'আরো বই কিনুন' এই দুই 'স্লোগানের' মধ্যে কি মূলতঃ কোনো প্রভেদ আছে ? গ্রন্থাগার তার পাঠকদের বেশী বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করেন। পক্ষান্তরে প্রকাশকরা ব্যবসা চালানোর জন্যে পৃষ্ঠপোষকদের আরো বই কিনতে বলেন। দু'জনই বইয়ের কারবারী। উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও মিল তাদের এই যে উভয়েই জ্ঞানের পরিবেশক।

আমাদের দেশে এ সমস্যা অবশ্য নেই। জনসংখ্যা যেখানে আড়াই কোটি সেখানে আড়াই হাজার বই ছাপতেও প্রকাশকদেরও যথেষ্ট ঝুঁকি নিতে হয়। কারণ পড়ুয়াতো দূরের কথা সাক্ষরের সংখ্যাই ক্ষীণ; তাই আমাদের সমস্যা ভিন্ন। নিরক্ষরতা নিরসনে পরোক্ষে সহায়তা ও সদ্যঃসাক্ষরদের নবলব্ধ অক্ষরজ্ঞান টিকিয়ে রাখার জন্যে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন অপরিহার্য। মানুষকে গ্রন্থমুখী ও গ্রন্থাগারমনা করে তুলে পাঠক সংখ্যা বর্ধিত করা গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম একটি প্রধান লক্ষ্য। নিছক ব্যবসায়ের উন্নতির জন্যও অন্ততঃ গ্রন্থাগার আন্দোলনে প্রকাশকদের এক গুরু দায়িত্ব রয়েছে। পুস্তক ব্যবসায়ের সহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এক বিরাট শ্রেণীর জীবিকাই শুধু জড়িত নয়—পুস্তক ব্যবসায়ের ভালমন্দর সংগে দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রশ্ন জড়িত। এবং পুস্তক ব্যবসায়ের উন্নতি সর্বতোভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ওপর নির্ভরশীল। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগে প্রকাশন ব্যবসায়ের কোনো বিরোধ নেই। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলার কাজে প্রকাশকদের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থাগার

৭ম বর্ষ] অগ্রহায়ণ : ১৩৬৪ [৮ম সংখ্যা

গ্রন্থবিদ্যা

। ৩ ।

আদিত্য ওহদেদার

কাগজের উপাদান ও প্রস্তুত প্রণালী

কাগজ মানুষের একটি অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার। অতি ব্যবহারের ফলে আজ আর এতে বিস্ময়ের কিছু পাই না, কিন্তু একটু ভাবলেই একথা নিশ্চয়ই আশ্চর্য ঠেকে যে কেমন করে তুলো, পাট, কাঠ, ঘাস, পাতা ইত্যাদি থেকে আমরা কাগজ পাচ্ছি।

গঠন প্রকৃতি

কাগজ কি ক'রে তৈরী হয় তা ভালো ক'রে জানতে হ'লে কাগজের গঠন-প্রকৃতির মূল কথাটা জানা দরকার। এক কথায় বলতে পারি কাগজ হ'ল উদ্ভিদজাত আঁশময় বা আঁশাল বস্তু হ'তে গঠিত জিনিষ। তুলো, পাট, কাঠ ইত্যাদি থেকে আঁশ বার করে নেওয়া হয়; সেই আঁশ কুটে পিষে জলে মিশিয়ে মণ্ড তৈরী করা হয়। তারপর এই মণ্ডকে চালুনির মত ছাঁচের উপর বিছিয়ে তার থেকে জল ঝরিয়ে নেওয়া হয়। এই বিস্তৃত মণ্ডটাকে এবার চাপ দিয়ে দিয়ে চারিদিক সমানভাবে পুরু সহজেই করা যায়। তারপর তাকে শুকিয়ে নিলেই কাগজ। কিন্তু লেখবার ও ছাপবার কাগজ পেতে হলে এইখানেই থামলে চলবে না। এই কাগজকে মার্বেল পাথর বা অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে ঘষে ঘষে মসৃণ করে নিতে হয়।

উপাদান

কাগজের মূল উপাদান হল সেলুলোজ (cellulose), যে বস্তুটি গাছপালার জীবকোষে প্রভূত পরিমাণে থাকে। সেলুলোজ নিরাকার (amorphous), অর্থাৎ কোনও প্রতিক্রিয়াতেই একে মিছরির মত দানায় পরিণত করা যায় না। রসায়ন-পরিভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় সেলুলোজকে কেলাসিত (crystallise) করা যায় না। একে সাধারণতঃ কোনও দ্রব্যকে দ্রবীভূতও করা

যায় না, এবং বিকারক (reagent) প্রয়োগে এর কোনও পরিবর্তন ঘটে না। এই সব গুনের জন্যই সেলুলোজ কাগজ তৈরির পক্ষে এত মূল্যবান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর এই নিষ্ক্রিয়তার জন্যে এর সঙ্গে মিশ্রিত অন্যান্য দ্রব্যকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিদূরিত করা যায়, কিন্তু সেলুলোজ অক্ষত থাকে।

সেলুলোজকে যে একেবারে দ্রবীভূত করা যায় না এমন নয়। আজকাল কয়েকটি দ্রাবক আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন, zinc chloride এর উষ্ণ দ্রবণে সেলুলোজ গলে গিয়ে এক রকম ঘন (viscous) পদার্থে পরিণত হয়, যা বৈদ্যুতিক বাল্বের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত তারের কাজে লাগানো হয়। Schweitzer বিকারকে সেলুলোজ গলে যে পদার্থে পরিণত হয় তাকে ব্যবহার করা হয় ওয়াটারপ্রুফ ও কৃত্রিম রেশম তৈরীর কাজে।

কাঁচামাল

সাধারণত কাগজ নিম্নলিখিত দ্রব্য থেকে প্রস্তুত করা হয়ঃ

(১) ছিন্ন বস্ত্রখন্ড—তুলোর ও রেশমের,

(২) পাট, শন ও এই জাতীয় অন্যান্য দ্রব্য ;

(৩) বাঁশ, খড় ও ঘাস, এসপারটো (esparto) নামক একরকম ঘাস কাগজ প্রস্তুতের কাজে আজকাল খুব ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ঘাস দক্ষিণ স্পেন ও উত্তর আফ্রিকায় জন্মে। এ ঘাসের আঁশ লম্বা ও নমনীয় ব'লে এর থেকে দড়ি, মাদুর, চুবড়ি ইত্যাদি বহুদিন থেকে তৈরি করা হচ্ছে, তবে কাগজের উপাদান হিসেবে এর ব্যবহার ফরাসীরা সর্ব প্রথম সুরু করে, এবং ইংলণ্ডে ১৮৫৭ সাল থেকে এর ব্যবহার আরম্ভ হয়।

(৪) কাঠ ; কাঠকে দুই উপায়ে কাগজ প্রস্তুতের মণ্ডে পরিণত করা চলে। প্রথমতঃ, রাসয়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে কাঠের মধ্য থেকে সেলুলোজ আঁশ বার করা যেতে পারে। একে বলা হয় কেমিক্যাল উড (chemical wood)। দ্বিতীয়ত, কাঠকে যাঁতায় ফেলে পিষে নেওয়া যেতে পারে। যান্ত্রিক উপায়ে প্রস্তুত এই মণ্ডকে বলে মেকানিক্যাল উড (mechanical wood)।

কাগজের পক্ষে কাঁচামালের উপযোগিতা নির্ভর করে আঁশের পরিমাণ, দীর্ঘতা ও নমনীয়তার ওপর। এই ত্রিগুণ বিশিষ্ট আঁশ তুলো ও রেশমে প্রচুর পরিমাণে আছে বলে তুলো ও রেশম থেকে প্রস্তুত কাগজই সর্বোৎকৃষ্ট হয়ে থাকে। কোন জাতের কাঁচামালে কত পরিমাণ সেলুলোজ আছে সেটা জানতে

পারলে কাগজের পক্ষে সে জাতের কাঁচামাল কতখানি উপযোগী তা আঁচ করা যায়। এই পরিমাণের একটা হিসেব নিচে দেওয়া গেল :

তুলো ও রেশম···	শতকরা ৯০ ভাগ বা তদূর্ধ্ব
পাট ও শন···	,, ৬৫-৮০ ভাগ
বাঁশ, খড় ও এস্পারটো ঘাস	,, ৫০ ভাগ
কাঠ ···	,, ৫০ ভাগের নিচে

কেবলমাত্র ছিন্ন বস্ত্র থেকে কাগজ তৈরি করলে সে কাগজ খুব মজবুত অথচ অতি পাতলাও করা সম্ভব। সাধারণত ব্যাংক নোট, টিস্যু কাগজ, সিগারেট তৈরির কাগজ ও ইণ্ডিয়া-পেপার নামক পাতলা কাগজ তৈরির জন্যে নির্ভেজাল ছিন্ন বস্ত্র ব্যবহার করা হয়।

তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, ছিন্ন বস্ত্রের সঙ্গে অন্যান্য দ্রব্য মিশেল দেওয়া হয়।

বাঁশ, খড় ও এস্পারটো ঘাস থেকে ছাপা, লেখা ও পত্র পত্রিকার কাগজ বেশ ভালোই তৈরি হয়। এই কাগজ অমাজা অবস্থায় রাখলে ব্লটিং কাগজরূপে ব্যবহার করা যায়।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কাঠ থেকে যে মণ্ড প্রস্তুত করা হয়—যাকে কেমিক্যাল উড্ বলে—তার থেকে তৈরি কাগজ ভালোই হয়। এ কাগজ গুণের দিক থেকে প্রায় ছিন্ন বস্ত্র থেকে প্রস্তুত কাগজের সমতুল্য।

কিন্তু মেকানিক্যাল উড্, অর্থাৎ যান্ত্রিক উপায়ে প্রস্তুত কাঠের মণ্ড থেকে যে কাগজ তৈরি হয় তা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। খবরের কাগজ, পিজবোর্ড, রেলের টিকিট, সিগারেটের খোল, বাদামি কাগজ ইত্যাদির জন্যে মেকানিক্যাল উড্ ব্যবহৃত হয়।

প্রস্তুত-প্রণালী

কাগজ হাতে তৈরি করা যায়, আবার যন্ত্রের সাহায্যেও। কিন্তু উভয় প্রণালীকেই নিম্নোক্ত চারটে স্তর অতিক্রম করতে হয় :

(১) কাঁচামালকে টুকরো করে কাটা, তাকে পরিষ্কার করা ও তার থেকে অন্য মিশ্রিত দ্রব্যকে পৃথক করে নেওয়া।

(২) টুকরো বস্তুপুঞ্জকে জলে ভিজিয়ে ও নানা প্রক্রিয়ায় মণ্ডে পরিণত করা। এই অবস্থায় আঁশের মধ্যস্থিত অ-সেলুলোজ দ্রব্য আলাদা হয়ে যায়।

(৩) মণ্ডকে পাতে ঢালাই করা ও চাপ দিয়ে পুরুত্ব ঠিক করা।

(৪) মণ্ডে আঁশ যতই গায়েগায়ে লাগালাগি থাকুক না কেন, একটু ফাঁক থাকেই; এই সূক্ষ্ম ফাঁকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে ভরাট করে নিতে হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে **লোডিং** (loading)। তারপর কাগজকে মসৃন করতে হয় যাতে কাগজ কালি ধরতে পারে, এবং কাগজে কালি লাগবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ব্লটিং-এর মতো কাগজ যেন কালি টেনে না নেয় এবং কাগজের উল্টো পিঠেও কালির কোন চিহ্ন না দেখা যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলে **সাইজিং** (sizing)।

হাতে কাগজ-প্রস্তুত প্রণালী

হাতে তৈরি কাগজের জন্যে ছেঁড়া ন্যাকড়া ও কাগজ জড় করা হয়। এগুলোকে টুকরো টুকরো করে কেটে ধুলো ও ময়লা পরিস্কার করে ফেলা হয়। তারপর এই টুকরোর স্তূপ জলে ভিজিয়ে বেশ করে থেঁথলান হয়। আমাদের দেশে দুপা দিয়ে তলে থেঁথলান কাজটা সম্পন্ন হয়। এবার ভাসমান আঁশগুলো ছেঁকে নিয়ে জলে ধুয়ে, প্রচলিত প্রক্রিয়ায় মণ্ড করা হয়। মণ্ডকে একটা পাত্রে বেশ করে নেড়েচেড়ে তাকে একটা বড় ভাড়ে (vat) রাখা হয়। তারপর একটা ঘন বুনন তারের জাল বা মোল্ড—যার চারিদিকে চলনশীল কাঠাম (moveable frame) বা deckle লাগানো থাকে—এই ভাড়ে ডুবিয়ে একখানা কাগজ তৈরির মতো মণ্ড তুলে নেওয়া হয়। এই কাজটা যে লোক করে—যাকে vatman বলা হয়—তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও কার্যদক্ষতা থাকা দরকার, কারণ কাগজের পুরুত্ব ঠিক করার কোন সহজ উপায় তার কাছে নেই। মোল্ডে মণ্ড তুলে নিয়ে চারিদিকে নেড়েচেড়ে মণ্ডকে জালের ওপর সমানভাবে বিছিয়ে নেওয়া হয়। তারপর মোল্ডটি ঝাঁকা দিয়ে জালের মধ্য দিয়ে জল বার করে দিলে মণ্ডটি জলের ওপর থিতিয়ে জমাট বেঁধে যায়। এবার মোল্ড থেকে সচল কাঠামটি খুলে ফেলে কাগজ শুদ্ধ মোল্ডটি একটা বনাতের (felt) ওপর উল্টে দেওয়া হয় এবং জমাট বাঁধা মণ্ডের ওপর আর একটা বনাত ঢাকা দেওয়া হয়। এই রকম ছয় সাতখানি কাগজের তা বনাত মোড়া করে চাপ দেবার যন্ত্রে ফেলে চাপ দিয়ে নেওয়া হয়। তারপর কাগজগুলিকে বালামুচির ওপর শুকোতে দেওয়া হয়। এই অবস্থায় কাগজ ব্লটিং-এর মতো শোষনীয় থাকে। সুতরাং এই ভাব দূর করবার জন্যে, অর্থাৎ size করবার জন্যে, gelatine solution পূর্ণ একটা লম্বা পাত্রে

কাগজগুলিকে দু তিন খানা করে ডুবিয়ে নেওয়া হয়। তারপর আবার তাদের বালামুচির ওপর শুকোতে দেওয়া হয়। সব শেষে তাদের পালিশ করা হয় ও দিস্তায় পরিণত করা হয়।

যান্ত্রিক উপায়

কাগজ তৈরির যন্ত্র প্রায় দেড়শ বছর আগে আবিষ্কৃত হয়, এবং আবিষ্কার কর্তা একজন ফরাসী। বহু উন্নতি সাধনের পর এ যন্ত্র এখন বিরাট আকার ধারণ করেছে, এবং এমনই তার কৌশল যে যন্ত্রের একদিকে মণ্ড দিলে অন্য দিকে দেখা যাবে পরিপাটি কাগজ বেরিয়ে আসছে।

কাগজের মণ্ড প্রথমে বৃহৎ ভাঁড়ের (vat) মধ্যে রাখা হয়। এই ভাঁড়ের মাঝখানে একটা চাকা অনবরত ঘোরে যার ফলে মণ্ড থিথিয়ে যেতে পারে না। পাম্পের সাহায্যে এই ভাঁড় থেকে মণ্ড তারের জাল লাগানো মোল্ডের ওপর আনা হয়। মণ্ড পড়ে স্রোতের মতো, এবং এই স্রোত ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করে কাগজের ওজন ও পুরুত্ব ঠিক করা হয়। মণ্ডের স্রোত মোল্ডের ওপর দিয়ে বয়ে কতকগুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট পিতলের রোলারের ভেতর অতিক্রম করে save-all নামক এক গড়ান পাত্রে এসে পড়ে। এই save-all যন্ত্র কাগজের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি মণ্ডের স্রোত থেকে টেনে নেয়। মণ্ড থেকে জল টেনে নেবার বিশেষ এবং মণ্ডের স্রোত যাতে তারের জাল থেকে পড়ে না যায় সেজন্যে পাশে পাশে রবারের বন্ধনী (Deckle) আছে। এখান থেকে মণ্ড কাউচ্ রোলে (Couch Roll) যায়, সেখানে মণ্ডের আর্দ্র অবস্থা বহুলাংশে দূরীভূত হয়। কাউচ্ রোলে মণ্ড কাঁচা কাগজে পরিণত হয় এবং সেখান থেকে সে কাগজ চাপ দেবার রোলার শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করে। চাপ দেবার রোলারগুলি এমন ভাবে ঘোরে যাতে কাঁচা কাগজে বেশী আঘাত না লাগে, এবং তারা বনাতের (felt) দ্বারা আবৃত হয়ে রোলার থেকে কাগজ বেরিয়ে আসে। তারপর শুকোবার যন্ত্র (Drying Cylinder) দিয়ে কাগজকে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এবার কাগজ যায় calender যন্ত্রে, যেখানে ঢালাই লোহার রোলার এত ঘন সন্নিবিষ্ট যে কাগজ রোলারের মধ্য দিয়ে যাবার সময় খুব চাপ পায় এবং এই চাপের ফলে কাগজ মসৃণ ও ঝকঝকে হয়ে ওঠে।

মণ্ড (Pulp)

কাগজের মণ্ড কিভাবে তৈরি হয় সেটা একটু বিশদ ভাবে জানা দরকার, কারণ মণ্ডের ওপরই কাগজ তৈরির প্রায় সবটা নির্ভর করে।

আমরা আগেই বলেছি যে কাগজের জন্য চাই সেলুলোজ। এই সেলুলোজ আঁশের অন্তস্থিত অন্যান্য অ-সেলুলোজ দ্রব্য থেকে পৃথক করাই হল মণ্ড তৈরির কাজ।

যে দ্রব্য থেকেই কাগজ তৈরি হোক না, তাকে প্রথমে টুকরো টুকরো করে কাটতে ছিঁড়তে হবে। তারপর তার থেকে ধুলো ময়লা পরিষ্কার করে নিতে হবে। এবার এই টুকরোগুলি ফুটন্ত গরম জলের পাত্রে ছেড়ে দেওয়া হয়। জলের মধ্যে কষ্টিক সোডা ও অন্য ক্ষার মেশান হয়, যার ফলে আঁশের মধ্যস্থিত অ-সেলুলোজ বস্তু গলে যায়। জল ছেঁকে ফেললে সেলুলোজ যুক্ত আঁশ পাওয়া যায়।

এই আঁশকে এবার আর এক যন্ত্রে ফেলা হয়, যাকে বলে ব্রেকার (Breaker)। ব্রেকারের কাজ হল জমাটবাঁধা আঁশগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। এরপর বীটার যন্ত্রের (Beater) কাজ। বীটারের কাজ হল চিরঞ্জন (bleach) করা, loading করা এবং sizing এর দ্রব্য মেশান।

Loading এর জন্যে সাধারণতঃ মেশান হয় চীনে মাটি, খড়ি ও titanium oxide ইত্যাদি।

Sizing এর জন্যে মেশান হয় রজন, ফিটকিরি, সাবান প্রভৃতি।

মণ্ড তৈরির বিভিন্ন স্তরের ছকটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই রকম : –

১। আঁশ = সেলুলোজ + অ-সেলুলোজ বস্তুসমষ্টি।

২। আঁশকে ঠাণ্ডা অথবা গরম জলে ভিজিয়ে রাখলে অনেক অ-সেলুলোজ দ্রব্য গলে যায়। ছেঁকে নিলে যে আঁশ পাওয়া যাবে তাতে থাকবে সেলুলোজ এবং জলে দ্রব নয় এমন অ-সেলুলোজ বস্তু।

৩। আঁশকে এবার ফুটন্ত ক্ষারে মেশালে দ্রব এমন অ-সেলুলোজ বস্তুগুলি গলে যাবে। ছেঁকে নিলে যে আঁশ পাওয়া যাবে তাতে প্রায় সবটাই সেলুলোজ থাকে, শুধু ক্ষারে দ্রব নয় এমন অ-সেলুলোজ বস্তু তখনো কিছু থাকে।

৪। এবার bleaching powder মেশান ফুটন্ত জলে আঁশ ভেজালে বাকি অ-সেলুলোজ অংশ গলে যাবে। ছেঁকে নিলে বিশুদ্ধ সেলুলোজপূর্ণ মণ্ড পাওয়া যাবে। এই মণ্ডই ছাপা ও লেখার কাগজের উপযোগী।

কাগজ পরীক্ষা—

কাগজের ভালোমন্দ জানবার কতকগুলি উপায় আছে, সেগুলি এই :—

১। জিব দিয়ে কাগজ স্পর্শ করে জানা যায় কাগজের উভয় পিঠের জমি সমান মসৃণ কিনা।

২। উজ্জ্বল আলোর সামনে কাগজ ধরে দেখা যেতে পারে কাগজের মধ্যে কোনো ছিবড়ে দাগ আছে কিনা।

৩। কাগজের size কি রকম, অর্থাৎ শক্ত কি নরম, তা জানতে হলে কাগজের এক কোণ জিব দিয়ে ভেজাতে হবে। যদি দেখা যায় কাগজ ভিজে গিয়েও অবিকৃত আছে তাহলে সে-কাগজ শক্ত, অর্থাৎ Hard-sized, আর যদি দেখা যায় ভিজবার পরই কাগজ ফুলে ওঠে এবং একটুতেই ছিঁড়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে সে-কাগজ নরম অর্থাৎ Soft-sized.

৪। যে কাগজ নাড়লে খড় খড় (rattling) শব্দ করে, বুঝতে হবে সে কাগজ মজবুত।

৫। কাগজ টেঁকসই (durable) কিনা তা জানবার উপায় হল, কাগজকে আঙুল দিয়ে ঘষতে থাকা কোন অবস্থায় কাগজে প্রথম ছেঁদা হয় তা লক্ষ্য করা। যদি অনেকক্ষণ ঘষবার পর কাগজে ছেঁদা হয়, তবে বুঝতে হবে কাগজ খুবই টেঁকসই।

কাঠের মণ্ড থেকে প্রস্তুত কাগজ টেঁকসই হয় না। কাগজ কাঠের মণ্ডের দ্বারা তৈরি কিনা তা জানবার একটা উপায় আছে। তিন ভাগ নাইট্রিক অ্যাসিড ও একভাগ সালফিউরিক অ্যাসিড একসঙ্গে মিশিয়ে তার কয়েক ফোঁটা কাগজের ওপর ফেলতে হবে। যদি দেখা যায় স্থানটি সঙ্গে সঙ্গে আরশোলার গায়ের রঙ (Dark brown colour) ধরেছে, তাহলে বুঝতে হবে কাগজ কাঠের মণ্ডের তৈরি। অন্য কাগজ হলে, যেখানে অ্যাসিড পড়ে সেখানে কোনো রঙের বৈষম্য ঘটে না, শুধু শুকিয়ে গেলে স্থানটা একটু পাসুটে রঙ (grey tint) ধারণ করে।

কাগজের শ্রেণীবিভাগ—

কাগজ নানা রকমের, এবং প্রকার ভেদে তাদের নামও বিভিন্ন। কয়েক রকম কাগজের নাম করা গেল—

অ্যান্টীক (Antique)—যেকোন কাগজের মণ্ড থেকে তৈরি, খসখসে জমি, ছাপবার কাগজ। এ কাগজে হাফ্-টোন্ ব্লক ছাপা যায় না।

আর্ট (Art)—হাফ্-টোন্ ব্লক ছাপবার উপযুক্ত সুমসৃণ, দামী, Fine china clay দিয়ে মাজা কাগজ। পুজাপার্বণ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপবার জন্যে সাধারণত এই কাগজ ব্যবহার করা হয়।

ব্যাঙ্ক (Bank)—লেখবার কাগজের মধ্যে পড়ে। Letter head ছাপবার জন্যে এ কাগজ সাধারণত ব্যবহার করা হয়।

ব্লটিং (Blotting)—size না করা শোষণীয় কাগজ। ভালো ব্লটিং তুলো ও শন থেকে তৈরি হয়। ভালো ব্লটিংএর গুণ হল, তাড়াতাড়ি শোষণ করা, অনেক পরিমাণে শোষণ করা, এবং একস্থানে একাধিকবার শোষণ করার ক্ষমতা থাকা। সস্তা ব্লটিং সাধারণত রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত কাঠের মণ্ড থেকে তৈরি হয়।

বণ্ড (Bond)—এ কাগজও লেখবার কাগজের মধ্যে পড়ে। চিঠির কাগজ ও টাইপ করার কাগজ হিসেবে এ কাগজ খুব ব্যবহৃত হয়।

গ্রেইণ্ড (Grained)—যে কাগজের জমিকে চামড়া, কাঠ এবং কাপড়ের আকৃতি-বিশিষ্ট করবার জন্যে ডাই (Die) এবং ছাঁচ বিশিষ্ট (Matrix) রোলারের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করিয়ে অনুরূপ আকার দান করা হয়, সে কাগজকে গ্রেইণ্ড কাগজ বলে।

লেজার (Ledger)- এ কাগজ খুব মজবুত ও টেকসই, এবং হিসেবপত্র রাখবার জন্যে (Account Book) ব্যবহৃত হয়। বস্ত্রের মণ্ড থেকেই এ কাগজ তৈরি হয়। এ কাগজের size খুব নিখুঁত হয়।

নিউজ-প্রিণ্ট (News print)—রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত কাঠের মণ্ড থেকে মেশিনে প্রস্তুত কাগজ।

পোস্টার (Poster)—এক পিঠ ছাপার জন্য মসৃণ করা অন্য পিঠ খসখসে। সস্তা কাগজ। বিজ্ঞাপনের জন্যে ব্যবহৃত হয়।

কাগজের মাপ

সাধারণত ছাপার জন্যে যে কাগজ পাওয়া যায় তার বিভিন্ন নাম ও মাপ নির্দিষ্ট আছে। নিচে একটা তালিকা দেওয়া গেল :—

কাগজের নাম	আকারের পরিমাপ (ইঞ্চিগত)
ফুলস্কাপ (Foolscap)	১৩½ × ১৭
ক্রাউন (Crown)	১৫ × ২০
ডিমাই (Demy)	১৭½ × ২২½
মিডিয়াম (Medium)	১৮ × ২৩
রয়াল (Royal)	২০ × ২৫
লার্জ রয়াল (Large Royal)	২০ × ২৭
ইম্পিরিয়াল (Imperial)	২২ × ৩০

পারিভাষিক ব্যাখ্যা

কাগজ সম্পর্কিত যে সব ইংরেজি শব্দের খুব চল আছে তাদের কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া গেল :

Engine sized—যে কাগজ কেবলমাত্র মণ্ড অবস্থায় সাইজ করা হয় তাকে Engine sized কাগজ বলে।

Machine sized—যে কাগজ মণ্ড অবস্থায় size করা সত্ত্বেও মেশিনে আবার size করা হয় তাকে Machine sized বলে।

Tub sized—যে কাগজ সম্পূর্ণরূপে শেষ হবার আগে size করা হয় তাকে Tub sized কাগজ বলে।

Right side, Wrong side—মেশিনে তৈরি হলে কাগজের যে পিঠ ওপর দিকে থাকে অর্থাৎ তারের জালের উপরদিকে থাকে এবং হাতে তৈরী হলে মোল্ডের তারে যে পিঠ লেগে থাকে, তাই হল কাগজের সোজা পিঠ (Right side) বা দিক। কাগজের উল্টো সোজা দিক বেশ বোঝা যায়। যদি ঠিক না বোঝা যায় তখন জলের দাগ (water mark) দেখে ঠিক করে নিতে হয়। যে পিঠে জলের দাগ স্পষ্ট দেখা যায় এই হল সোজা পিঠ। সাধারণত কাগজের সোজা পিঠ উল্টো পিঠের চেয়ে বেশি মসৃণ হয়।

Ream-৪৭২, ৪৮০ অথবা ৫০০ খানি কাগজে এক রীম হয়। ৪৭২ খানি কাগজের রীমকে Mill ream বলে। হাতে প্রস্তুত কাগজের রীমও ৪৭২ খানি কাগজে হয়। ৫০০ খানি কাগজের রীমকে Printer's ream বলে।

Pinched—যে কাগজের মাপ স্টাণ্ডার্ড মাপ থেকে ছোট।

Laid-তরল অবস্থায় কাগজের মণ্ড যে তারের জালের ওপর দিয়ে বয়ে আসে সেই জালের দাগকে laid বলে। আলোর সামনে ধরলে laid বুনন কাগজের গায়ে প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ দূরত্বে সোজা সমান্তরাল মোটা রেখা দেখা যায় এবং এই মোটা রেখাগুলিকে বহু ঘন সন্নিবিষ্ট সূক্ষ্ম রেখা বিপরীত দিক থেকে এসে সমকোণে কাটে।

Wove—যে কাগজ তৈরির মেশিনে তারের জাল পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ (woven) সেই জালের ওপর প্রস্তুত কাগজকে wove বলে। তারগুলি জড়াজড়ি করে থাকে বলে কাগজের গায়ে laid কাগজের মতো কোনো স্পষ্ট দাগ পড়ে না।

কাগজ তৈরির কাজে ভারত

ভারতে কাগজের কল সর্বপ্রথম বসে ১৭১১ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ প্রদেশে ট্রেনকুবার (Tranquebar) শহরে। মিশনারীরা বাইবেল ছাপবার জন্যে বিলেত থেকে পাঠায় কয়েক রীম কাগজ ও একটা ছাপাখানার যন্ত্র। কিন্তু এখানকার মিশনারীরা চাইলেন ভারতেই কাগজ তৈরী করতে। তাই বসল কল। বাইশ

জন লোক নিযুক্ত হল এবং গরু দিয়ে মেসিন চালান হল। এ কল বেশী দিন চলে নি ; ১৭২২ সালে কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

তারপর শ্রীরামপুরে মার্শম্যান সাহেব ১৮২৫ সালে কাগজের কল বসান। কিন্তু তাও সফল হয়নি। কিছুদিন পরেই উঠে যায় সে কল।

১৮৭০ সালেই পুরোদমে কাগজের কারখানা স্থাপিত হয়। এ কারখানা চালু হয় হুগলীর তীরে বালিতে। ১৮৭৯ সালে Upper India Couper Ltd নামে লক্ষ্ণৌতে কাগজের কারখানা স্থাপিত হয়। তারপর টিটাগড় ইত্যাদি আরও কাগজের কারখানা ইতস্তত স্থাপিত হয়। ১৯১৮ সালে Indian Pulp and Paper mills সর্বপ্রথম বাঁশ থেকে কাগজ তৈরি করতে শুরু করে।

এখন ভারতে সর্বসমেত পনরটি কাগজের কল আছে, এবং তারা প্রতি বছর গড়ে ১,৫০,০০০ টন কাগজ উৎপন্ন করে।

ভারতে যে কাগজ তৈরি হয় তার কাঁচামাল হল বাঁশ, ঘাস, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, গেঞ্জি ও মোজার টুকরো, এবং শন।

কাগজ সংক্রান্ত গবেষণার কাজ চলে দেরাদুনের ফরেষ্ঠ রিসার্চ বিদ্যায়তনে।

যে কাগজের জন্য ভারত সম্পূর্ণরূপে বিদেশের মুখাপেক্ষী, তা হল নিউজ-প্রিন্ট। এ কাগজ আমাদের দেশে তৈরি হয় না।

আমাদের দেশে মাথাপিছু কাগজের ব্যবহার খুবই কম। নিচের হিসেব দেখলেই এটা ধরা পড়ে :

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র...	৩৬০
ইংলণ্ড ...	১৫৪
সুইডেন	৮৫
জার্মানি	৭৭
ইজিপ্ট	৪
ভারত	১

কলে প্রস্তুত কাগজ ছাড়াও হাতে তৈরি কাগজ আমাদের দেশে এখনও অনেক স্থানেই করা হয়। এই শিল্প সম্বন্ধে খুব মনোজ্ঞ এবং তথ্যপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় ডার্ড হান্টারের বইতে।[১] ভদ্রলোক ঘুরে ঘুরে দেখেছেন যে সব স্থানে কাগজ হাতে তৈরি করা হয় এবং অতি সযত্নে সে সব প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সে সবের বিবরণ চিত্রের সাহায্যে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

১। Hunter, Dard. Papermaking by hand in India, 1939.

প্রাক্ মুদ্রণ বাংলা গদ্যের পুঁথি

মুরারি ঘোষ

তলোয়ারের এক কোপে ৯৬টা মানুষকে মেরেছিলেন রাজা আর্থার। সত্যি সত্যি মেরেছিলেন কিনা তার কোন ইতিহাস নেই। তবু এমন রাজা যদি বাংলাদেশে জন্মাতেন, তাহলে আমাদের সাহিত্যে তাঁর স্থান হোত নিশ্চই চাঁদ সদাগরের পাশাপাশি। মনসামঙ্গলের মত উপাদেয় এক আর্থারমঙ্গল কাব্য আমাদের লাভ হোত। সভায়, চণ্ডীমণ্ডপে, ঘরের কোণে; যাত্রার ঢঙে কিংবা একক সুরে হাজার শ্রোতার মনোরঞ্জক কাব্য কাহিনী লাভ হোত। কিংবদন্তি থেকে সাহিত্য হয়েছে সব দেশেই। আর্থারের কাহিনী ইংরিজি সাহিত্যে গদ্য ও পদ্য দুই জাতের সাহিত্যই সৃষ্টি করেছে। ইংরিজি ভাষায় প্রথম উল্লেখযোগ্য গদ্য গ্রন্থ হোল স্যার টমাস ম্যালরির Morte-De-Arthur। Paradise Lost রচনার আগে আর্থারকে নিয়ে এক মহাকাব্য রচনার ইচ্ছে মিল্টনেরও ছিল। কাহিনী রচনায় ম্যালরির অরিজিন্যালিটি' না থাক, কিন্তু গদ্য রচনায় ম্যালরি সে যুগে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মূলত ম্যালরির কাহিনীই মিল্টনকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মিল্টনের পিউরিটানিক মনে রোমান্টিক সাহিত্যের ক্ষুধা জাগিয়ে তোলা নিছক সহজ ব্যাপার নয়। তাই ম্যালরি প্রসংগে সমালোচক সেন্টসবেরীর উক্তি নিশ্চয়ই বাহুল্য হবে না।
সেন্টসবেরী বলছেন :

If he had not been vouchsated to us, the loss would be immense in delight to a dozen generations of eager readers, and not a few writers would have lost a valuable pattern. A History of English Prose Rhythm : G. Saintsbury : 1912 : পাতা 100)

আর্থারকে নিয়ে এ পর্যন্ত যে জাতের সাহিত্য রচনা হয়েছে ম্যালরির আগে, সবই ছিল কবিতায়। রোমান্টিক কাহিনী সেই দিন পর্যন্ত কবিতাতেই জমেছে ভাল। ম্যালরির যুগে ইংরিজি সাহিত্য ভরে ছিল ভার্স-রোমান্স। এমন অবস্থা প্রাচীন বাংলা সম্পর্কেও যথাযথ সত্য।

আমাদের দেশে চাঁদ সদাগর কিংবা কালকেতুর উপাখ্যান কোন উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনার প্রেরণা জোগাতে পারে নি। এটা নিশ্চয়ই সাহিত্যের বা কোনো সাহিত্যকারের ত্রুটি নয়। আমাদের সাহিত্যের আংশিক নির্বাচনের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এ ঘটনার বিচার করতে হবে।

প্রথম মুদ্রিত বাংলা গদ্য গ্রন্থের রচয়িতা রামরাম বসু। রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র মুদ্রিত হয় ১৮০১ সালে। ম্যালরির সঙ্গে অবশ্য রামরাম বসুর কোন তুলনাও চলে না। কেবল একটা ঐতিহাসিক সাদৃশ্য ছাড়া। ম্যালরির নায়ক রাজা আর্থার আর রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য দুজনে দুই বিভিন্ন চরিত্র। একটা রোমান্টিক কাহিনী অপরটি ইতিহাস বলেই কথিত। ম্যালরি প্রসংগে ইংরেজ সমালোচকের উক্তির সংগে রামরাম বসু সম্পর্কে বাঙালী সমালোচকের উক্তিও প্রণিধান যোগ্য। সমালোচক সজনীকান্ত বলছেন :

"...লেখক রামরাম বসুর পরিচয় তাঁহার দুইখানি পুস্তকের মধ্যে (রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র ও লিপিমালা) লুক্কায়িত আছে। সে পরিচয় খুব বিরাটের নয় কিন্তু পাইওনীয়রের। তাঁহার পাণ্ডিত্য বা ভাষাজ্ঞান গোড়ায় খুব যে অধিক ছিল তাহা বলা যায় না। কিন্তু দুর্জ্জয় সাহস ছিল। সাহসের জোরেই তিনি নির্ভযে ফার্সী, আরবী, বাংলা, সংস্কৃত শব্দ পাশাপাশি সাজাইয়া আদর্শহীন গদ্যের যুগে একটা কিছু খাড়া করিয়াছেন এবং পাণ্ডিত্যজনিত সঙ্কোচ ছিল না বলিয়াই লজ্জিত হইয়া হাল ছাড়েন নাই। ফলে যে ভাষার উদ্ভব হইয়াছে তাহার বিরূপ বিকৃত মূর্ত্তি দেখিয়া পরবর্ত্তীয়েরা সাবধান হইতে পারিয়াছে।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : সজনীকান্ত দাস : ১৩৫৩ : পাতা ১৪৭)

বাংলা গদ্য সাহিত্যের এই দুর্ভাগ্যের নায়ক শুধু রামরাম বসু নন। রামরাম বসুর অন্তত পাঁচশো বছর আগে থেকেই বাংলা গদ্য সাহিত্য রচনার এক ধারাবাহিক ক্ষীণ ইতিহাস পাওয়া যাবে। আর সে ইতিহাসে যে গদ্য ভাষার নমুনা, তা কোনোকালেই বাঙালী সাহিত্যিকের প্রেরণাস্থল হতে পারে না। আর্থারের মত কোন রোমান্টিক কাহিনী দিয়ে এ ইতিহাস শুরু হয় নি। তবে বাংলা কাব্য সাহিত্যে রোমান্টিজমের অভাব কোন যুগেই যে ছিল না তা বলাই বাহুল্য।

যে যুবতী কোনো কারণে মনভারী করে থাকে তার মন ভাঙাবার সহজ উপায় নাকি বাংলার অতি সাধারণ জনেরও অজানা নয়। এমন উক্তির সপক্ষে আমি রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্যও টেনে আনতে পারি :

"গানের কথাগুলি শুনিবার জন্য কান পাতিলাম অবশেষে বারংবার আবৃত্তি শুনিয়া যে ধুয়াটি উদ্ধার করিলাম তাহা এই—

"যুমতী, ক্যান্ বা কর মন ভারী
পাবনা থ্যাহে আন্যে দেব ট্যাহা দামের মোটরি।"

রবীন্দ্রনাথ আরো বলছেন : "মোটরি পদার্থটি কি তাহা ঠিক জানি না

কিন্তু তাহার মূল্য যে এক টাকার বেশী নয় কবি তাহাতে সন্দেহ রাখেন নাই। ......কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কবিরা এমন স্থলে নিশ্চয়ই মানস সরোবরের স্বর্ণপদ্ম, আকাশের তারা এবং নন্দন কাননের পারিজাত অম্লান মুখে হাঁকিয়া বসিতেন, এবং উজ্জয়িনীর প্রথম শ্রেণীর যুবতীরা শিখরিণী ও মন্দাক্রান্তা ছন্দে এমন দুঃসাধ্য অনুষ্ঠানের প্রস্তাবমাত্র শুনিলে প্রসন্ন না হইয়া থাকিতে পারিতেন না।" (রবীন্দ্র রচনাবলী : ষষ্ঠ খণ্ড : লোক সাহিত্য)।

গ্রাম্য সাহিত্যের এই অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের এমন কিছু উল্লেখযোগ্য কীর্তি নয়। তবু রবীন্দ্রনাথ পরে বলেছেন, এই দুই লাইনের মধ্যে গ্রাম্য জীবনের সীমাবদ্ধ অনুভূতি অর্থে ও প্রাণ-সম্পদে জমজমাট হয়ে ওঠে। লোক সাহিত্যে অলংকারের অংশ থাক বা না থাক তার ভাঙা ছন্দে আর অল্পে মিলে স্বল্পে সন্তুষ্ট গ্রাম্য জীবনের এক মাধুর্যময় ছবি পাওয়া যাবে। আর আমাদের রাজসভার সাহিত্য, অলংকারের সাহিত্য মার্জিত মনের তৈরী সাহিত্য এই গ্রাম্য অনুভূতিকেও ছাপিয়ে বিশ্বের বিরাট পরিধিতে বিস্তৃত হতে পারে নি। অন্তত বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যের অনুজ হয়েও তার পিছু পিছু অনুসরণ করে এই দুনিয়াটা ঘুরে দেখবার বাসনাও হয় নি। রবীন্দ্রনাথ বলছেন : "অন্নদামঙ্গল ও কবি কঙ্কনের কবি যদিচ রাজসভা ধনীসভার কবি, যদিচ তাঁরা উভয়ে পণ্ডিত, সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে বিশারদ তথাপি দেশীয় প্রচলিত সাহিত্যকে বেশি দূরে ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। অন্নদামঙ্গল ও কুমার সম্ভবের আখ্যানে প্রভেদ অল্প, কিন্তু অন্নদামঙ্গল কুমার সম্ভবের ছাঁচে গড়া হয় নাই। তাহার দেবদেবী বাংলা দেশের গ্রাম্য হরগৌরী। কবি কঙ্কন চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, মনসার ভাসান, সত্যপীরের কথা সমস্তই গ্রাম্য কাহিনী অবলম্বনে রচিত। সেই গ্রাম্য ছড়াগুলির পরিচয় পাইলে তবেই ভারতচন্দ্র-মুকুন্দরাম রচিত কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবার পথ হয়।" (গ্রাম্য সাহিত্য : রবীন্দ্র রচনাবলী : ষষ্ঠ খণ্ড)

সাধারণ লৌকিক অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির প্রবেশ পেরিয়ে বাঙালী মননের কল্পনা দূরাকাশ বিহারী হতে পারে নি। কিন্তু ঘরের সীমায় গণ্ডীবদ্ধ থেকেও সাধারণ মানুষের কাছে নিত্যকার একঘেয়েমীপনায় তা পর্যবসিত হয় নি। গতানুগতিক গ্রাম্যজীবনের মধ্যে আবদ্ধ থেকে বাঙালী মনন বিচিত্র সংস্কৃতি ও ধর্মের উদ্ভাবনা করেছে যুগে যুগে। পণ্ডিতদের মতে ভারতের এই পূর্বদেশ বেদ বিরোধি সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডের বিচিত্র ভাবনায় প্রধান লালন

পালন কেন্দ্র। মৌলিক ভারতীয়ত্ব থেকে বিচ্যুত না হয়েও এক নিবিড় বাঙালীয়ানায় বাংলার বিশেষত্ব আদিমকাল থেকেই। বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মের সংঘাত ও সংস্পর্শে, বিরোধিতায় ও সমন্বয়ে বাংলাদেশ কালে কালে বিচিত্র রূপমানস গড়ে তুলেছে। কিন্তু মূল সামাজিক পরিবেশ ছাপিয়ে তার বিস্তার উপচিয়ে পড়ে নি। প্রধানত লোকধর্মের মাহাত্মেই এই সংস্কৃতি সংস্পর্শের বিচিত্রতর প্রকাশ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে। লোকরঞ্জনে ও লৌকিকতায় পৃথিবীর আর কোন দেশের সাহিত্যের সংগে বোধ করি এর তুলনা চলে না। এতটা মাটির টান, এতটা গ্রাম্য পরিবেশের চিন্তা ভাবনা, আচার অনুষ্ঠান আর কোন দেশের সাহিত্যে পাবো? Matter of Sanskrit আর Matter of Bengali বলে কথিত উপাদান আর আংগিকের সম্পর্কে শেষোক্তটির পাল্লা অসম্ভব ভারী বাংলা সাহিত্যে। চর্যাপদ থেকে সুরু করে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির বৈষ্ণবীয় সহজিয়া, পরবর্তী শ্রীচৈতন্য সাহিত্য ও প্রেম সাহিত্য, ধর্ম-চণ্ডী-মনসা পাঁচালী, যাত্রাগান আর মঙ্গল কাব্যের ধারায় বাংলার বিচিত্র সংস্কৃতিমন্যতার শিল্পরূপে লোকায়ত মানসের গভীরতা অস্বীকার করা যায় কি? স্বীকার করতেই হবে বাঙালী মননের এটাই প্রধান দিক। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে, উৎপাদনে, জীবন রক্ষার যখন নিয়ত সংগ্রাম আর প্রতিযোগিতার একান্ত অভাব তখন বৈচিত্র্য সন্ধানী মানসিকতার দৃষ্টি সাধারণ লৌকিক অভিজ্ঞতার দিগন্তরেখা পার হতে পারে নি। কত বিচিত্র পথেই যে লোক সংস্কৃতির গতায়াত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার সাহিত্য সাধনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর এই লৌকিক প্রয়োজনের বিশেষ প্রেরণায় মধ্যযুগের বাংলায় প্রথম গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি।

কিন্তু সে যুগের গদ্য গ্রন্থ আজ অচল, অপাঙক্তেয়। তার প্রধান কারণ, সাহিত্যের দরবারে সেদিনের বাংলা গদ্য তার প্রয়োজনাতিরিক্ত রূপ ও উপাদান নিয়ে কালসীমা অতিক্রম করতে পারে নি। এমন কি দীর্ঘ কয়েকশত বছর পরেও প্রথম মুদ্রিত গদ্যের যে রূপ তারও সীমানা প্রয়োজনের পরিবেশ অতিক্রম করে নি। নিছক অ্যাকাডেমিক চাহিদাতেই মিশনারী প্রচেষ্টার সহায়করূপে রামরাম বসুর গদ্য রচনা। এ জাতীয় গদ্যে হয়তো চেষ্টা আছে কিন্তু প্রাণ নেই, বস্তুভার আছে রস নেই, জাতীয়তা আছে কিন্তু দেশ ও কালের বেড়াভাঙার ইংগিত নেই।

বাংলা ভাষায় প্রথম গদ্য সাহিত্যের উপকরণ যা পাওয়া যায়, পণ্ডিতদের মতে তা হোল রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণে। গদ্য পদ্য মিশ্রিত ভাষায় রচিত এ বই। ডক্টর সুনীল কুমার দের মতে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনের চেয়েও

পুরোণো শূন্য পুরাণের গদ্যাংশ।[১] প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় দ্বিতীয় ধর্মপালের রাজত্বকালীন খৃষ্টীয় দশম শতকেই রামাই পণ্ডিতের কাল নির্ণয় করেছেন (শূন্য পুরাণ : রামাই পণ্ডিত : শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ : বঙ্গাব্দ ১৩১৪)। ইতিহাসের কালবিচারে প্রথম বাংলা গদ্য রচনার গৌরব রামাই পণ্ডিতেরই প্রাপ্য। শূন্য পুরাণ ধর্মঠাকুরের পূজার্চনার আদি বাংলা গ্রন্থ বলেই স্বীকৃত। তবু শূন্য পুরাণের যে কটা পুঁথি আজ পাওয়া গেছে কোনটাই মৌলিক পুঁথি বলে ধরা হয় না। ভাষা অনুসারে প্রত্যেকেরই বিভিন্ন পাঠভেদ রয়েছে। বাঁকুড়া জেলা থেকে প্রাপ্ত পুঁথিকে আদর্শ হিসেবে গণ্য করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সেই পুঁথিকেই প্রকাশ করেছে। এ পুঁথির গদ্যাংশ তুলে ধরলে বাংলার প্রাথমিক গদ্যরচনার একটা উদাহরণ দেখা যাবে তবে তা কতখানি 'অরিজিন্যাল' এবং কতখানি অবিকৃত তাও তর্কাতীত নয়। শূন্য পুরাণে রয়েছে :

"হে জয় সঙ্ঘ হে বিজয় সঙ্ঘ তুমি সংখ হইএ চিরাই। তুম্বার জলে স্নান করেন শ্রীধর্ম গোসাঞি। অভিসেক জলে স্নান মনখির কেসের পাবন সইতের পাবন সচল অচল সৃষ্টি সৃজিলেন গোসাঞি ভকত বৎসল। সুবর্ণের কোটাল রূপার বাঁট। মহাদেব কুদালেন স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল ...ইত্যাদি।" নমুনা অংশ আরো তুলে দিতে পারা যায়। কিন্তু তা অনর্থক। আজকের যুগে অপ্রচলিত এমন শব্দ সাজিয়ে এ রচনা। শূন্য পুরাণের মুখবন্ধে নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন : "শূন্য পুরাণে এমন অনেক শব্দের ব্যবহার আছে, যাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলাম না।" অষ্টাদশ ভাগের বিশ্বকোষেও তিনি লিখেছেন : "ইহার পূর্বে কোন বাঙালী লেখক গদ্য লিখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। রামাই পণ্ডিত স্থানে স্থানে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এরূপ গদ্য লিখিবার চেষ্টা করিয়াও পদ্য রচনার কুহকিনী আকর্ষণী শক্তির হস্ত এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহার লিখিত গদ্যও যেন ভাঙা ভাঙা পদ্যে পরিণত হইয়াছে। এই গদ্যের পদসংস্থান পদ্যের রীত্যানুযায়ী বলিয়াই প্রতিভাত হয়।"[২]

এর পরের যে গদ্য পুঁথি পাওয়া গিয়েছে তা হোল চণ্ডীদাস রচিত "চৈতন্যরূপ প্রাপ্তি"। অবশ্য এ পুঁথি সত্যি চণ্ডীদাসের লেখা কিনা পণ্ডিতেরাও স্থির নিশ্চয় নন। চৈতন্যরূপ প্রাপ্তির ভাষার নমুনা বিশ্বকোষকার উদ্ধৃত করেছেন : "জিহ্ব রহকিনী তিহ রাগময়ী। রাগআত্মা শ্রীমতীর অঙ্গ এক হন। জিহ চেতনরূপ তিহ চণ্ডীদাস। কার দেহ। শ্রীমতীর অঙ্গরেণ্ডা দেহ। এই দুইজন

শ্রীমতীর অন্তরঙ্গা লাড়িতে.এক দেহ হইল। তপ্ত কাঞ্চন রূপে তিন এক বর্ণ। তিন এক প্রকৃতি। এক ভাব নগরে একুই ভাবে একুই রতি।" অনেকে অনুমান করেন এই পুঁথি সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্ব সম্পর্কিত আদি গ্রন্থ।

আজ থেকে চারশো কি পাঁচশো বছর আগেকার বই, কিন্তু আজ তা খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। এমনটি কিন্তু পশ্চিমের দেশে হয় না। বাংলা দেশে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু গ্রন্থাগার সৃষ্টি হয়নি। বইয়ের মূল্য আমাদের সাধারণ জনের কাছে কোনদিনও অনুভূত হয়নি এবং পণ্ডিতেরাও বইয়ের বিশেষ সামাজিক মূল্য অনুধাবন করতে পারেন নি। বোধহয় অনুভূত হয়নি এই জন্যে যে, বইয়ের মধ্যে দিয়ে যে বিশেষ সাংস্কৃতিক তৃষ্ণা নিবারিত হয় তা মিটে যেত পাঁচালী, ধর্মগান আর যাত্রাগানের মাধ্যমে। লৌকিক আসরে। গ্রামকেন্দ্রিক জীবনের প্রধান অভিশাপ হল, গ্রামের বাইরের জগৎটাকে জানবার বিশেষ আগ্রহের অভাব। দৈনিক জীবনের চৌহদ্দি পেরিয়ে বিস্তৃত জীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় অত্যাবশ্যক ছিল না। তাই দূরে দূরে দেশ থেকে পুঁথি সংগ্রহ করে সংগ্রহশালা বানাবার সামাজিক প্রয়োজন কোনো দিনও দেখা দেয়নি। বাংলা প্রাচীন পুঁথির অধিকাংশই নষ্ট হয়েছে। নষ্ট হওয়ার বিস্তৃত বিবরণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনায়[৩] পাওয়া যাবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বাংলা পুঁথির সম্ভার তা সংগ্রহ করার ইতিহাস আধুনিক বাঙালী মনীষার গৌরব। গ্রাম গ্রামান্তরে পুঁথি খুঁজে বার করেই দীনেশ চন্দ্র বাংলা সাহিত্যের যথাযোগ্য ইতিহাস রচনার প্রয়াস পেয়েছিলেন। আর, বাংলা গদ্য কোনোদিন সাধারণের আকর্ষণের বস্তু ছিল না—সুতরাং গ্রন্থাগারের প্রচলন না থাকায় গদ্যের পুঁথি বাঙালী লেখকদের গোচরে ছিল না—অন্ততঃ পরের যুগে সার্থক গদ্যরচনার ইন্ধন যা জোগাতে পারতো।

প্রাক্‌মুদ্রণ যুগের বাংলা গদ্যের প্রায় ৪৪টি পুঁথির নাম উল্লিখিত হয়েছে বিশ্বকোষে। এদের প্রত্যেকটির সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ ভূমিকাও দিয়েছেন লেখক। পুঁথিগুলি সাজিয়েছেন এই রকম ভাবে :

শূন্য পুরাণ, চৈতন্যরূপ প্রাপ্তি, দ্বাদশপাঠ নির্ণয়, আশ্রয় নির্ণয়, রূপগোস্বামীর কারিকা, রাগময়ী কণা, আত্ম জিজ্ঞাসা, দাস্যদন্ত ভাবার্থ, আলম্বন চন্দ্রিকা, উপাসনা তত্ত্ব, সিদ্ধতত্ত্ব, ত্রিগুণাত্মিকা, আত্ম সাধন, ভোগপটল, দেহভেদতত্ত্ব নিরূপণ, চন্দ্র চিন্তামণি, আত্ম জিজ্ঞাসা সারাৎসার, তিন মানুষের বিবরণ, সাধনাশ্রয়, শিক্ষাপটল, সিদ্ধান্ত টীকা,

কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ, উপাসনা নির্ণয়, স্বরূপ বর্ণন, রাগমালা, দেহকড়চা, চম্পক কলিকা, আত্মতত্ত্ব, তত্ত্বকথা, পঞ্চতত্ত্ব নিগূঢ় তত্ত্ব, হরিনামের অর্থ, গোষ্ঠী কথা, সিদ্ধিপটল, জিজ্ঞাসা প্রণালী, জবামঞ্জরী, ব্রজকারিকা, রসভজন তত্ত্ব, শ্রীশ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমার স্থান নিরূপণ, বেদাদিতত্ত্ব নির্ণয়, ভাষাপরিচ্ছেদ টীকার বঙ্গানুবাদ, ব্যবস্থাতত্ত্ব, বৃন্দাবন লীলা, পাচন সংগ্রহ।

এ ছাড়াও কিছু কিছু কবিরাজী গ্রন্থের কথা লেখক বলেছেন কিন্তু নামোল্লেখ করেন নি। অষ্টাদশ শতকের আরো কতকগুলি উল্লেখযোগ্য গদ্যরচনার তালিকা দিয়েছেন শ্রীসজনীকান্ত দাস তাঁর "বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে" ঃ

জ্ঞানাদি সাধনা, ব্যবস্থাতত্ত্ব, স্মৃতি কল্পদ্রুম, বেদান্ত দর্শন শাস্ত্রের অনুবাদ, দেব ডামরতন্ত্র, কবিরাজী পাতড়া, কামিনী কুমার, কুলজীপঞ্জী ব্যাখ্যা, জয়নাথ ঘোষের রাজোপাখ্যান।

প্রাক্ মুদ্রণ যুগের এই যে তালিকা পাওয়া যাচ্ছে তাদের আলোচনায় প্রাচীন বাংলা গদ্য সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ সিদ্ধান্তে আসা যায়।

প্রথমতঃ রেনেশাঁ এবং গদ্যের সংগে এক ঐতিহাসিক যোগ আছে। গ্রীস বা রোমে না হোক য়ুরোপের অন্যান্য জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এ যোগাযোগ দেখতে পাওয়া কষ্ট কল্পনা নয়। অবশ্য এই যোগসূত্রের প্রধানতম যন্ত্রী হোল মুদ্রণ যন্ত্র। মুদ্রণ যন্ত্র→রেনেশাঁ→গদ্যসাহিত্য ঃ সামাজিক পরিবেশ ও তার ফলশ্রুতিকে এই রকম ভাবেই সাজানো চলে। রেনেশাঁর আগে য়ুরোপীয় সাহিত্য জগতে কোথাও যে গদ্য রচনা ছিল না এমন নয় আসলে রেনেশাঁর উল্লাস গদ্য রচনায় প্রগতি এনেছে। এই ঐতিহাসিক ঘটনা বিন্যাস বাংলাদেশেও সত্য। রামরাম বসুর অনেক আগে গদ্য রচনার সৃষ্টি হলেও সেই বাংলা গদ্যকে সাহিত্যের উপযুক্ত বাহন বলে কল্পনা করাও চলে না। বিশেষ করে নবজাগরণের সংঘাত আর মুদ্রণ যন্ত্র বাংলাদেশে প্রকৃত গদ্য সাহিত্যের সূচনা করেছে। রামরাম বসু আর রামমোহন রায় দুজনেই ব্যক্তিগতভাবে ছাপাখানার সংগে যুক্ত ছিলেন। গদ্য সাহিত্য প্রচার করার 'মটো' দুজনেরই ছিল বিশেষ করে।

দ্বিতীয়তঃ বাংলা গদ্যের বিষয়বস্তু কাব্য সাহিত্যের মত সর্বজনীন আবেদনে ভরা ছিল না। বাংলা কাব্য সাহিত্যের যে পর্বভাগ বা গোষ্ঠিগত সৃষ্টি চেতনা, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ সিদ্ধতান্ত্রিক বা সহজিয়া তা নির্দিষ্ট ধর্ম বিশ্বাসে প্রত্যেকটাই আপামর জনসাধারণের কাছে স্বীকৃত না হোলেও

সাহিত্য হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। মানিক গাঙ্গুলী তাঁর ধর্মমঙ্গল কথায় লিখেছেন, "জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান।" উচ্চবর্গের মানুষেরা ধর্মের পূজা, ধর্মের গান প্রথম দিকে ঘৃণার চোখেই দেখতো। কিন্তু মানিক গাঙ্গুলী প্রথম ও শেষ ব্রাহ্মণ কবি নন। অনেক ব্রাহ্মণ কবিও পরে ধর্মমঙ্গলের গান রচনা করেছেন। আর উচ্চবর্গের মানুষেরা পরম রসোপলব্ধিতে সেই গানও গ্রহণ করেছে। শাক্তবিশ্বাসের মানুষেরা কি কৃষ্ণ কীর্তনের আসরের শ্রোতা হতেন না? মূলতঃ বাংলা কাব্যের সৃষ্টিচেতনায় আর তার রসাস্বাদনে এক মিশ্র সাংস্কৃতিক রূপমানস আমাদের লাভ হয়েছিল।

তৃতীয়তঃ গ্রাম্য সাহিত্যের সংগে বাংলার পোষাকী সাহিত্যের যে কোন তফাৎ নেই, এমন কথা বলি না। তবে বাংলার জনপদের ছড়া, গান বা কথাসম্পদ জনচিত্তে যে নির্মল আনন্দ, আবেগ ছড়িয়ে দেয়, তার রূপ, রস আর জীবনবোধ বাংলার পোষাকী সাহিত্যের উপজীব্য। বাংলার চন্ডী-মনসা ধর্মমঙ্গলের বা বৈষ্ণব সাহিত্যের বিষয়বস্তুর আবেদন বাংলার গ্রাম-জীবনের পরিধি অতিক্রম করেনি। রবীন্দ্রনাথের যে মতামত আগেই উদ্ধৃত করেছি: "সেই গ্রাম্য ছড়াগুলির পরিচয় পাইলে তবেই ভারতচন্দ্র-মুকুন্দরাম রচিত কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবার পথ হয়" (রবীন্দ্র রচনাবলী : ৬ষ্ঠ খন্ড : ৬৪২ পাতা)। এইটাই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় প্রধান দিক। বিভিন্ন বিষয়বস্তু আর ধর্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে রচিত হলেও বাংলার কাব্য সাহিত্যের সার্বজনীন আবেদনের মৌল কারণ হোল তার গ্রামকেন্দ্রীক সরল জীবন।

প্রধানতঃ এই তিন কারণের জন্যই বাংলা কাব্যের পুঁথি দু একটি করেই অন্তত্ত শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে পাওয়া যেত। কিংবা পুঁথি হারিয়ে গেলেও লোক মুখে, কবি কথায় গানের মাধ্যমে তা প্রচারিত ছিল। আলোচ্য এই তিন কারণের কোনটারই পরিচয় প্রাচীন বাংলা গদ্যে পাওয়া যাবে না। শিল্পের স্বাভাবিক মনোহারিত্ব সেই প্রথম যুগের গদ্যে অনুপস্থিত। ভাঙাভাঙা গদ্য সাহিত্য রচনার চেষ্টা। নগেন্দ্র নাথ বসুর যে তালিকা তুলে ধরা হয়েছে বিচার করলে দেখা যাবে তার অধিকাংশ বই সহজিয়া সাধনতত্ত্ব সংক্রান্ত। সাধারণের উপযোগী আধুনিক কালের রম্য রচনা নয়। বিভিন্ন সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধন সংক্রান্ত বিভিন্ন পুঁথি লেখা হয়েছিল।

এ গদ্যের রূপ দেখলেই বোঝা শক্ত নয় যে এ গদ্য মোটেই পপুলার হয় নি। জনপ্রিয় তত্ত্বকথার পরিবেশন করলেও জনতার সমর্থন পায় নি।

মনোরঞ্জন করার বিশেষ পন্থাই ছিল কাব্যে বা কবিতাংশে। বাংলা গদ্য পুঁথির পাঠক কই? এমনিতেই পাঁচালী বা মঙ্গলকাব্য জাতীয় সাহিত্য হল সুর করে পাঠ করার। বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য গান করার। এক জনে গায় দশ জনে শোনে। পড়া হোত সভায়, চন্ডীমন্ডপে, ঘরের স্তিমিতালোকে। অনুষ্ঠানে উৎসবে বা নিত্যকালীন অবসরক্ষণে। হাজার শ্রোতার মুগ্ধ বিস্ময়ের সামনে, চাঁদোয়া ঝাড় লণ্ঠনের সামাজিক পরিবেশে কিংবা একান্ত পারিবারিক অবসর কালীন ধর্মকথা শোনার আকাঙ্খায়—সেখানে হয়তো দু'চার জন শ্রোতা। এই পটভূমিকায় গদ্যের স্থান নেই। গদ্য সাহিত্যের মধ্যে যে 'সীরিয়াসনেস' সামাজিক পরিবেশে তার বিস্তৃত জমি তখনো তৈরী হয়নি।

বাংলা গদ্যের যে পুঁথিগুলো পাওয়া গেছে এবং যা পাওয়া যায়নি তাদের সমাবেশ যেকোন সাহিত্যের পারস্পরিক বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট। মূলতঃ, দীর্ঘস্থায়ী মধ্যযুগীয় জীবনধারার অত্যন্ত তত্ত্বগত দিক বাংলা গদ্যের বিকাশের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কবিতার সুরে আমরা কোনদিনও কথা বলি না। গুছিয়ে মনের কথা বলতে হলে কবিতায় বলা নিরর্থক। তবু আমরা দেখি প্রাচীন ভারতের সমস্ত সাহিত্য চেষ্টা শ্লোকের ছন্দ, সুর আর রসাত্মক বাক্যের আংগিক আশ্রয় করেছিল। এমন কি গণিতের বইও শ্লোকাকারে রচনা। এই অনুপস্থিত গদ্যের রাজত্বে বাংলা গদ্যের হঠাৎ আবির্ভাব এক ধরণের বিপ্লব বলেই হয়তো অভিহিত করা যায়। কিন্তু এ বৈপ্লবিক চেষ্টা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সার্থকও হয়নি। অথচ গদ্য আমাদের অপরিহার্য সংগী, কবিতা নয়। হাটে ঘাটে মাঠে, সমস্ত জীবন জুড়ে; ঘুমভাঙ্গা থেকে সুরু করে নতুন করে ঘুমোবারকালে স্বপ্নের মধ্যেও আমাদের গদ্যের জগতে আনাগোনা। কথ্যভাষার গদ্যের সংগে আমাদের নিত্যকালীন পরিচয় সাহিত্যের দরবারে সহজে আশ্রয় লাভ করেনি কখনো। গদ্যের এই সাহিত্য-রূপ উত্তর রেণেশাঁর সামাজিক ফলশ্রুতি।

দীর্ঘস্থায়ী মধ্যযুগে গদ্যের হঠাৎ অভ্যুদয়ে আমরা স্বাগত জানাতে পারি। কিন্তু অলংকারে আভরণে ভূষিত নয় বলে তাকে উপেক্ষা করতে পারি না। উপেক্ষা করতে পারি না এই জন্যেই যে রামাই পন্ডিতের গদ্যে পদ্যে মেশানো 'এক্সপেরিমেন্ট' সবটাই ব্যর্থ হয় নি। হয়তো শূণ্য পুরাণ পুঁথির অনেকটাই আজ আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। তার গদ্যের প্রতিটি চরণের নেহাৎ শব্দগত অর্থ দিয়েও আজ আমরা রচনার মূলার্থ খুঁজে পাব না।

ভাবটীকা দিয়ে এর অর্থ গ্রহণ সম্ভব হলেও হতে পারে। অন্ততঃ তখনকার কালে যে অর্থ গ্রহণ করা যেত তার ফললাভ হয়েছিল হাতে হাতেই। কেননা শূন্য পুরাণ সহজিয়া সাধনতত্ত্বের গ্রন্থ, আর এই সহজিয়া সাধনের বিষয়বস্তু নিয়ে অনেক গদ্য পুঁথি রচিত হয়েছিল সে যুগে। সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য হলেও সাধক সম্প্রদায়ের কাছে সেদিনের বাংলা গদ্য দুর্বোধ্য ছিল না নিশ্চয়ই। নেহাৎ চর্চার অভাবেই আজ আমরা তা ভুলতে বসেছি।

সাধক আর কবিরা তাঁরা নিজেদের প্রয়োজনে এক ধরণের বাংলা গদ্য রচনা চালু করলেন। বিষয়বস্তুভারেই হোক বা দুরূহ শব্দ সংযোগেই হোক এ গদ্যে কোন 'ইমাজিনেটিভ' সাহিত্য রচিত হয়নি। আর্থারের মত চাঁদসদাগরের কাহিনী নিয়েও গদ্যের পুঁথি লেখা হতে পারতো। কিন্তু সে সম্ভাবনার চিন্তা সে যুগে নিরর্থক কেননা আজকের মত বই পড়ার রেওয়াজ তখন ছিল না। সব ভাষাতেই, গদ্য রচনা যত পাঠ্য তত শ্রোতব্য নয়। গদ্যের চাহিদা বাড়ে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের যুগে। ব্যক্তি মানুষ একাই যখন সাহিত্যের রসোপলব্ধি আস্বাদ পেতে চায়—তখন বইয়ের চাহিদা পুঁথি রচনার দীর্ঘায়ত সময়ের জন্যে অপেক্ষা করে না। ছাপাখানার তৈরী মালের জন্যেই বাজার অপেক্ষা করে। ছাপাখানার বইয়ের সুলভ সরবরাহ আর পরিবর্তিত সংস্কৃতি চর্চা গদ্য গ্রন্থের জনপ্রিয়তার সহায়ক। ইংরাজি সাহিত্য-চেষ্টায় তাই 'ক্যাক্সটনের' ভূমিকা অনস্বীকার্য। 'ক্যাক্সটন' শুধু Morte-De Arthur নয়, আরো অনেক গদ্য গ্রন্থের মুদ্রক। সাহিত্য ইতিহাসকার 'কাম্পটন-রিকেটের' মতে : ক্যাক্সটনের দূরদর্শিতা হোল Morte-De-Arthur প্রকাশ করা। Morte-De-Arthur এর মত কোন গদ্য গ্রন্থের প্রেরণা আমাদের সাহিত্যে খুঁজে পাব না।

(১) History of Bengali literature in the Nineteenth Century —Dr : Sushil Kumar De : 1919

(২) বিশ্বকোষ : অষ্টাদশ ভাগ (বাঙলা সাহিত্য) : শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু : ১৩১৪।

(৩) হরপ্রসাদ রচনাবলী : (প্রথম সম্ভার) : সম্পাদক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ১৩৬৩ : পাতা ২৫০।

পরিষদ কথা

পরিষদ সান্ধ্য-কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ

ভারত সরকার নিযুক্ত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য পর্যটন করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছিলেন।

গত ২৪শে নভেম্বর সকালে পশ্চিম বঙ্গের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ কমিটির সহিত সাক্ষাৎকার করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কমিটির গোচরীভূত করেন এবং এরাজ্যে উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মতামত ব্যক্ত করেন।

ঐদিন সায়াহ্নে জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে কমিটির সদস্যগণকে চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়। অনুষ্ঠানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংসদ সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

২৬শে নভেম্বর সন্ধ্যায় কমিটির সদস্যগণ পরিষদের হজুরিমল লেনস্থ সান্ধ্য কার্যালয় পরিদর্শন করেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন কমিটির সভাপতি বিহারের ডি, পি, আই, শ্রীকে, পি, সিংহ, সচিব শ্রীসোহন সিং ও অন্যান্য সদস্যগণ। পশ্চিম বঙ্গের সমাজ শিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিল রঞ্জন রায়ও ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্রমবিকাশ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস ও বর্তমান কার্যক্রম উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ প্রত্যক্ষ করেন।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে মিঃ স্ট্রিটনের বক্তৃতামালা

পরিষদের সংযোগ ও সংগঠন উপসমিতির উদ্যোগে স্কটিশ চার্চ কলেজ ভবনে গত ১ই ডিসেম্বর হইতে তিনদিনব্যাপী 'বিদ্যালয় গ্রন্থাগার' সম্পর্কে এক বক্তৃতামালার আয়োজন হয়। বক্তৃতা করেন ভারতের বৃটিশ কাউন্সিলের প্রধান গ্রন্থাগারিক মিঃ জন স্ট্রিটন। বিভিন্ন দিনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য প্রায় ত্রিশটি উচ্চ ও মধ্য বিদ্যালয় প্রতিনিধি প্রেরণ করেন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

নজরুল পাঠাগার ॥ ৪৭।১, সূর্য সেন স্ট্রীট ॥ কলিকাতা—৯

নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস পাঠাগারে গত ১লা ডিসেম্বর সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। প্রত্যুষে একটি প্রভাত ফেরী পল্লী পরিক্রমণ করে এবং কয়েকটি পথকোণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সায়াহ্নে পাঠাগার কক্ষে এক জনসভার আয়োজন হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীসুনীল রায়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত থাকেন এবং সমাজ শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। সভায় সর্বশ্রী কমলা রায়চৌধুরী ও আশীষ মৈত্র কণ্ঠসংগীত ও পরেশ চৌধুরী গীটার বাজাইয়া শোনান।

নারী শিল্প নিকেতন ॥ ১১৬-এ, মেছুয়াবাজার স্ট্রীট ॥ কলিকাতা—১২

গত ১লা ডিসেম্বর নারী শিল্প নিকেতন শিক্ষাকেন্দ্রের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব ও সমাজ-শিক্ষা দিবস পালিত হয়। ডক্টর ফুলরেণু গুহ সভানেত্রীর ভাষণে শিক্ষিতাদের দেশের নিরক্ষরতা নিরসন কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করেন। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য যুগের পরিবর্তনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া শিক্ষিতা ও স্বাবলম্বী হইতে উপদেশ দেন। প্রধান অতিথি শ্রীরেবতী রঞ্জন সিংহ, শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবী ও শ্রীঅরুণকান্তি রায় ভাষণ দান করেন। সমাবর্তনে মোট ৪৬টি অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করা হয়। নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি ও অভিনয়ে অনুষ্ঠানটি যথেষ্ট উপভোগ্য হয়।

তরুণ সমিতি পাঠাগার ॥ কাশীরাজাজা ॥ নদীয়া।

পাঠাগারের উদ্যোগে এবং স্থানীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় গত ১লা ডিসেম্বর সমাজ শিক্ষা দিবস প্রতিপালিত হয়। প্রাতে প্রভাত ফেরী, অপরাহ্নে একটি জনসভা ও রাত্রে এক সাংগীতিক অনুষ্ঠানে পল্লীর আপামর জনসাধারণ যোগদান করেন। উৎসব মুখর পল্লীতে যথেষ্ট আনন্দ ও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

বসন্ত স্মৃতি পাঠাগার ॥ চাকদহ ॥ নদীয়া ॥

গত ১লা ডিসেম্বর বসন্ত স্মৃতি পাঠাগার গৃহে নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস পালন করা হয়। আয়োজিত এক সভায় হুগলী গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক শ্রীরণেন্দ্র কুমার দাশ সভাপতিত্ব করেন। সমাজ শিক্ষার তাৎপর্য ও ভূমিকা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করেন সর্বশ্রী ফণিভূষণ বিশ্বাস প্রবোধ কুমার মিত্র ও সভাপতি শ্রীদাশ।

বড়ণ্ডায় সমাজ শিক্ষা দিবস

গত ১লা ডিসেম্বর বড়ণ্ডা (বর্ধমান) বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে সমাজ শিক্ষা দিবস পালিত হয়। সকালের অনুষ্ঠানে মুক্ত বাংলা লাইব্রেরীর প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন দ্বিজপদ ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শিবসত্য চট্টোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি, সভাপতি ও শ্রীজগবন্ধু কুমার সমাজ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

সান্ধ্য অনুষ্ঠানে মেমারী সার্কেলের ব্লক ডেভলপমেণ্ট অফিসার শ্রীসন্তোষ কুমার চক্রবর্তী বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন ও সমাজ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রভাত ফেরী, সংগীত, জনসভা ও আলোচনা সভা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। দৃষ্টি ২-৮-৬৪

পারহাট গ্রাম্য উন্নতি পরিষদ ॥ বর্ধমান ॥

গত ১লা ডিসেম্বর সমাজ শিক্ষা দিবস উপলক্ষে পরিষদের উদ্যোগে প্রত্যুষে এক প্রভাত ফেরী গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। স্থানীয় মহিলাদের কুটির শিল্পের এক প্রদর্শনী হয়। মধ্যাহ্নে এক সাংগীতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় কুশলী শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন। তৎপরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীশ্যামলাল চট্টোপাধ্যায়। স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মহিলা কর্মীরা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। ঐদিন একটি বিচিত্রানুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হইয়াছিল।

ভারতী পাঠাগার ॥ করন্দা ॥ বর্ধমান।

গত ১লা ডিসেম্বর করন্দা ভারতী পাঠাগারের সভাগণ কর্তৃক জেলা গ্রন্থাগার ও জেলা সমাজশিক্ষা অফিস প্রস্তাবিত ও নির্ধারিত কার্যক্রমানুযায়ী

'নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা' দিবস সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়। প্রভাতে প্রভাত ফেরী বাহির করা হয় এবং গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া ইহা পাঠাগার কক্ষ সমক্ষে আহূত সভায় মিলিত হয়। সভায় পাঠাগার সম্পাদক শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায় 'সমাজ শিক্ষা দিবস' পালনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতি শ্রীশৈলজানন্দ মণ্ডল 'সমাজ শিক্ষা দিবস' পালনের তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র পাল 'সমাজ শিক্ষা'র কয়েকটি অধ্যায় বিশ্লেষণ করেন। 'জন-গন-মন অধিনায়ক' জাতীয় সঙ্গীত সহযোগে সভার সমাপ্তি হয়। অপরাহ্নে সাঁওতালী নৃত্যের আয়োজন করা হয়।

জাড়গ্রাম মাখম লাল পাঠাগার ॥ বর্ধমান ॥

চাচা নেহরুর জন্ম দিবস উপলক্ষে গত ১৪ই নভেম্বর পাঠাগারে এক শিশু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীমতী সুভাষিনী বন্দোপাধ্যায়। সারাদিন ব্যাপী এই উৎসবে বিচিত্রানুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অংগীভুত ছিল।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও পাঠাগারে সমাজ শিক্ষা দিবস গত ১লা ডিসেম্বর বিশেষ সমারোহের সহিত উদযাপিত হয়। এতদুপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনী, জনসভা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে গ্রামের আপামর জনসাধারণ বিপুল উৎসাহের সহিত যোগদান করেন।

বাসুদেব গ্রন্থাগার ॥ সোনামুখী ॥ বাঁকুড়া।

সর্বভারতীয় সমাজশিক্ষা দিবস উপলক্ষে গত ১লা ডিসেম্বর সোনামুখী বাসুদেব গ্রন্থাগারের উদ্যোগে শিক্ষামূলক পোষ্টার সহ শোভাযাত্রা, শিক্ষামূলক প্রদর্শনী এবং গ্রন্থাগার প্রাংগণে একটী জনসভার অনুষ্ঠান ও সংগীতানুষ্ঠান হইয়াছিল। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন সোনামুখী সর্বার্থসাধক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীঅনন্তলাল পাত্র এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন সোনামুখী মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি ও সভাপতির ভাষণ ছাড়াও সোনামুখী অবর-বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীঅনিল কুমার দাস, শ্রীসুধীরচন্দ্র বসু ও শ্রীঅনাদি চট্টোপাধ্যায় এই দিনের তাৎপর্য ও সমাজশিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

মিলন মন্দির ॥ লাইব্রেরী রোড ॥ খড়গপুর ।

সমাজ শিক্ষা দিবস উপলক্ষ্যে মিলন মন্দির এক দিবসব্যাপী কর্মসূচী পালন করেন। মন্দির পরিচালিত নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক ও অন্যান্য নাগরিকগনকে লইয়া এক প্রভাতফেরী নগর পরিভ্রমণ করে। সমাজ শিক্ষা বিষয়ক হস্তাঙ্কিত এক প্রাচীর পত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। সায়াহ্নে এক জনসভা আহূত হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅমিয় কুমার ভট্টাচার্য। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগনের ভাষণের পর সমিতির শিশু ও মহিলা বিভাগের কর্মীগণ এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আযোজন করেন।

তাজুত আনন্দময়ী সাধারণ পাঠাগার ॥ বলুহাটি ॥ হাওড়া।

পাঠাগার সজ্জিতকরণ, গঠনমূলক কার্য্য, অর্থ ও পুস্তক সংগ্রহ, আলোকসজ্জা এবং জনসভা ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে পাঠাগার কর্তৃক গত ১লা ডিসেম্বর সমাজ শিক্ষা দিবসটি সাড়ম্বরে পালিত হয়। অপরাহ্নে স্থানীয় আনন্দময়ী বিদ্যালয়ে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মাননীয় শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পাঠাগার কর্মী ও জনসাধারণের মধ্যে প্রেম ও প্রীতির ভাব বজায় রাখিতে এবং আত্মগরিমা ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন। সভায় শ্রীপাঁচুগোপাল চৌধুরী, শ্রীশশাঙ্ক শেখর ঘোষ ও আরও অনেকে সমাজ শিক্ষার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা দেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীঅজিত কুমার ঘোষ কর্তৃক উদ্বোধন সংগীত গীত হয়। সভায় স্থানীয় হরিসভার সভ্যগণ মধুর কীর্তনে সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করেন।

বৈদ্যবাটি যুবক সমিতি ॥ হুগলী।

গত ১৭ই নভেম্বর সমিতির পাঠকক্ষে এক আলোচনা সভা হয়। বিষয় ছিল 'গ্রন্থাগার আন্দোলনের বর্তমান ভূমিকা'। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংযোগ ও সংগঠন উপসমিতির আহ্বায়ক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। গ্রন্থাগারিক শ্রীসুনীল চট্টোপাধ্যায় আলোচনায় যোগদান করেন। গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীবিনোদ বিহারী দত্তের জীবনাবসানে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সভায় ১ মিনিট সকলে নীরব থাকেন।

দিল্লী পাব্লিক লাইব্রেরীর সমাজ শিক্ষা কার্যাবলী

ইউনেস্কোর গ্রন্থাগার সংজ্ঞাতে সাধারণ পাঠাগারকে জনসাধারণের বিশ্ব বিদ্যালয়, গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান এবং অপরিহার্য সামাজিক শক্তির কেন্দ্র প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইহাকে আমরা যে রূপেই বর্ণনা করার প্রয়াস পাই না কেন প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা যে জ্ঞান বিস্তারের সহায়ক একথা সর্ব্বকালেই সমান সত্য। আজ পর্যন্ত এই উদ্দেশ্য সাধনে পুস্তক ও ছাপান পত্রিকাগুলি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে বহুদিন থেকেই স্থির চিত্র, মানচিত্র এবং প্রাচীরপত্রের ব্যবহার চলছে। পাশ্চাত্য দেশে চলচ্চিত্রকে বর্তমানে সাধারণ গ্রন্থাগারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিগণিত করা হয়। পুস্তকের সহিত চলচ্চিত্রের পার্থক্য এই যে ইহা কাগজের পরিবর্ত্তে সেলুলয়েডে লিখিত। সংগীতের সম্বন্ধেও এই কথাটি প্রযোজ্য।

কিন্তু আজও চলচ্চিত্র, প্রদর্শনী, গোষ্ঠী আলোচনা প্রভৃতি অন্যান্য সমাজ শিক্ষার মাধ্যমগুলি গ্রন্থাগারের করণীয় বিষয়ের অন্তর্গত কিনা সে সম্বন্ধে মতানৈক্য রয়েছে। দিল্লী গ্রন্থাগারের উদ্যোক্তাগণ—ইউনেস্কো ও ভারত সরকার এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছেন—সহরবাসীদের সমাজ শিক্ষার বিষয়গুলি গ্রন্থাগারের নিয়মিত কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে।

সম্প্রতি পুস্তক পাঠে দক্ষতা অর্জন করেছেন এইরূপ বহুসংখ্যক সভ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে তাঁদের প্রিয় বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন। গ্রন্থাগারের গত ছয় বছরের ইতিহাসে সামাজিক দপ্তর থেকে যে সব চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, নাটক অভিনয়, সংগীতের আসর এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে তাহাতে সর্ব্বশ্রেণীর এবং সর্ব্ব বয়সের শ্রোতারাই যোগদান করেছেন।

সমাজ শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন কার্যাবলী নির্বাহের জন্য তিনশত ব্যক্তির বসিবার স্থান সংকুলান হয় এইরূপ একটি সুসজ্জিত মঞ্চ সমন্বিত রঙ্গালয় আছে। এই দপ্তরটি ১৬ মিলিমিটার ফিল্মপ্রজেক্টর, এপিডায়াস্কোপ, টেপরেকর্ডার, লিংগুয়াফোন, স্লাইড্‌স্‌, ফিল্মস্ট্রিপস্‌, গ্রামোফোন রেকর্ডস্‌ ও গীতবাদ্যাদির যন্ত্র প্রভৃতি সরঞ্জাম দ্বারা সমৃদ্ধ। এইগুলি পাঠাগারের সভ্যগণের সুবিধার্থে প্রায়শঃই ব্যবহার করা হয়। সভ্যগণকে বিনা শুল্কে গ্রামোফোন রেকর্ডগুলি ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়া থাকে। দিল্লী গ্রন্থাগার সমিতি (দিল্লী লাইব্রেরী বোর্ড) এই গ্রন্থাগারটিকে কানাডার জাতীয় চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের (ন্যাশানাল ফিল্ম বোর্ড অব্‌ কানাডা) চলচ্চিত্র জমা রাখিবার কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করার প্রস্তাবটি অনুমোদন করেছেন।

দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও আগামী ৪ঠা হইতে ৫ই এপ্রিল ঈস্টারের ছুটিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি শীঘ্রই সম্মেলনের স্থান নির্বাচন করিবেন। নিজ এলাকায় সম্মেলন আহ্বান করিতে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানকে অনতিবিলম্বে পরিষদ সচিবের সহিত যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কাহারও কিছু মতামত থাকিলে তিনি যেন অন্তত একমাস পূর্বে লিখিত ভাবে পরিষদ সচিবকে তাহা জানাইয়া দেন। পরিষদের সদস্যগণের পরামর্শ অনুযায়ী সম্মেলনের বিষয় নির্বাচন হইয়া থাকে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগ প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলন

আগামী ১৮ই জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৫টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের বর্তমান বৎসরের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে এই বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের এক প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু এই সম্মেলনের সংগঠন সভায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

এই উপলক্ষে একটি স্মারক পত্রিকা প্রকাশনের চেষ্টা করা হচ্ছে। সকল প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরোধ জানান হচ্ছে যে তাঁরা যেন তাঁদের নাম বর্তমান ঠিকানা, কর্মস্থান ইত্যাদির বিবরণ ঐ পুস্তিকার অন্তর্ভুক্তির জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র পাঠান। বলা বাহুল্য এই সম্পর্কে সকল ব্যয়ভার বহনের জন্য প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর দান সাদরে গৃহীত হবে। এ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সম্পাদকীয়

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি

আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যে যুগোপযোগী নয় এ কথা আমরা বহুবার বহুভাবেই জনসাধারণের কাছে জানিয়েছি। সমাজে শিক্ষা সংস্কৃতি বিতরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহকের এই ত্রুটিপূর্ণ অবস্থার কারণ সম্পূর্ণ ভাবেই সামাজিক বা ঐতিহাসিক। কিছুটা দায়ী অতীত ইতিহাসের সংগৃহীত বাধার সমষ্টি, আর কিছুটা তারই প্রতিক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট বর্তমানের সামাজিক বাধা।

ইতিহাসের কোন অবস্থার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের জনশিক্ষার ব্যবস্থা অক্ষরাশ্রয়ী না হয়ে অন্য পথে বহুদিন ধরেই প্রবর্তিত হয়ে চললো এবং কেন মূলতঃ অক্ষরাশ্রয়ী জ্ঞান বিতরণের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম গ্রন্থ বহুকাল ধরেই এমন কি বর্তমান পর্যন্ত এ দেশের অত্যন্ত অধিক সংখ্যক লোকের কাছেই তাঁদের মনের খোরাক পৌঁছিয়ে দিতে পারলো না, তার বিবরণ দেওয়া এ বিবৃতির উদ্দেশ্য নয়। তবে যে কারণে গ্রন্থ আজও ভারতবর্ষের অধিকাংশ নাগরিকের জীবনে অপরিহার্য বস্তু হিসাবে প্রবেশ করতে পারেনি ঠিক সেই কারনেই গ্রন্থাগারের পক্ষে আজও সমাজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠা সম্ভবপর হয়নি। কারণ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করবার বহু পরে মানুষ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করতে পারে। এমন কি একথা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে গ্রন্থাগারের সামাজিক ভূমিকাকে ঠিক মত উপলব্ধি করতে পারা যে কোন মার্জিত মনের উন্নতধরণের সমাজ সচেতনতার অপেক্ষা রাখে। কাজেই দেশের লোকের মনে গ্রন্থের আসনই যখন সঙ্কীর্ণ তখন গ্রন্থাগারের আসন যে সঙ্কীর্ণতর হবে তা বিচিত্র নয়।

তাই সমাজজীবনে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব যাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন তাঁদের প্রথম কর্তব্য হবে দেশের উন্নত ধরণের গ্রন্থাগারব্যবস্থা-প্রতিষ্ঠার অনুকূল সামাজিক আবহাওয়া সৃষ্টি করা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তার সংস্থাপনার পর হতে এ কর্তব্য পালনের প্রাণপন চেষ্টা করে চলেছে। দেশে প্রয়োজনানুরূপ সক্রিয়তার সৃষ্টি করা নানা কারনেই সম্ভব হয়ে উঠেনি তবু মানসিক অনুকূলতার পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টাও উপেক্ষার বস্তু নয়।

ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক বিশেষ ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক অতিদ্রুত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা বাড়া এবং কমার পটভূমিকায় বিভিন্ন দল নিজেদের মতামত ব্যক্ত করে সেই দুঃখ দুর্দ্দশাকে সাধ্যমত কমিয়ে ফেলার চেষ্টা করে চলেছেন। কিন্তু শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই মতামতের প্রকাশ এখনও বহুলাংশেই দৃঢ়তর ও স্পষ্টতর হওয়ার অপেক্ষা রাখে। দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এই মতামত নানা কারনেই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

কিন্তু দেশের দাবী সবচেয়ে অধিক সংখ্যক কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত না হলে তা কল্যানকর হলেও তার চিন্তা আপাততঃ মুলতুবী থাকবে এ কল্পনা অযৌক্তিক। কাজেই দেশের গ্রন্থাগার অনুরাগী ব্যক্তিদেরই আশা ছিল এবং আছে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এই পরম কল্যাণকর রূপের দিকে তাকিয়ে সমাজের শিক্ষা সংস্কৃতির এই অন্যতম প্রধান বাহক ও ধারককে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হবে। নানা কারনেই সেই আশা পরিপূর্ণভাবে সফল হয় নি। তবু সরকারী প্রচেষ্টা যে অল্পে অল্পে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এই সামাজিক ভূমিকাকে স্বীকার করে নিতে চলেছে এ কথাও আনন্দ ও আশার উদ্রেক করে।

সম্প্রতি ভারত সরকার দেশের বর্ত্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ঠিকমত ওয়াকিবহাল হয়ে প্রয়োজনানুরূপ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য একটি উপদেষ্টা সংসদ গঠন করেছেন। এই উপদেষ্টা সংসদ তাঁদের কাজের সুবিধার জন্য একটি অনুসন্ধানপত্র মারফৎ দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠান ও কর্মিদের কাছ থেকে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। কিছুদিন পূর্বে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসেছিলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তরফ হতে তার নিজস্ব বক্তব্য এই উপদেষ্টা সংসদের কাছে উপস্থাপিত করা হয়। বলা বাহুল্য এই সংসদের নিয়োগ বা তার কর্ণধার সময়োপযোগী হয়েছে। দেশের শিক্ষা সংস্কৃতিকে জনমানসে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বর্ত্তমান যুগে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন অপরিহার্য। সরকারের তরফ হতে এ প্রয়োজনকে মেনে নেওয়া যুগের দাবীকেই স্বীকৃতি দেওয়া মাত্র। উপদেষ্টা সংসদ তাঁদের মতামত যথা শীঘ্র সম্ভব গঠন করে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে বর্ত্তমান সামঞ্জস্যহীন ও অনিশ্চিত অবস্থা থেকে একটা সুদৃঢ় সামাজিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করুন, এ আমাদের আন্তরিক অনুরোধ ও কামনা।

সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষা

কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত ভাষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর ভারতের অহিন্দী রাজ্যগুলিতে ধুমায়িত অসন্তোষ ও সন্দেহ অগ্নিশিখায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে। ভারতের সংবিধানে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার সময় অনিচ্ছা ও অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও ঐক্য ও শান্তি রক্ষার খাতিরে সে সময় অনেকেই এর বিরোধীতা করা সমীচীন মনে করেন নি। ধৈর্য ও উৎসাহের সঙ্গেই তাঁরা গত দশ বছর যাবৎ হিন্দীর গতি ও উন্নতির ধারা লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তু সকলের প্রচ্ছন্ন অসন্তোষ ও ধৈর্যের বাঁধ ভাষা কমিশনের উগ্র রিপোর্ট প্রকাশের পর ভেঙ্গে পড়েছে তীব্র বিক্ষোভ ও উত্তেজনায়। সারা দেশব্যাপী আন্দোলন সুরু হয়েছে—পূর্ব ঘোষিত সময়ের মধ্যে ইংরাজিকে উৎখাৎ করে হিন্দীকে যাতে স্কন্ধে চাপানো না হয়। রাজাজী ও সুনীতিবাবু প্রভৃতি একদা হিন্দীর প্রচারক ও সমর্থকগণ আজ এর বিরোধীতা করতে বাধ্য হয়েছেন। দক্ষিণ ভারতের গুনীজ্ঞানী অনেক দিকপাল সমস্বরে তাঁদের প্রবল আপত্তি জানিয়েছেন। পূর্ব ভারতের শিল্পী সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদরাও একক ও মিলিতভাবে প্রতিবাদ করেছেন। বিলম্বে হলেও অনেকেই আজ একথা উপলব্ধি ও ব্যক্ত করেছেন যে ইংরাজি বর্জন বর্তমানে দেশের পক্ষে 'আত্মঘাতী' হবে। ইংরাজি যে কোনও বিশেষ দেশ ও জাতের ভাষা একথা তাঁরা স্বীকার করেন না। প্রকৃতই ইংরাজীর ব্যবহার কোন প্রকারেই দাস মনোবৃত্তি নয়।

সর্বভারতীয় ঐক্য রক্ষণ একমাত্র হিন্দীর সাহায্যে সম্ভব একথা নির্ভুল নয়। কোর্টকাছারী, চিঠিপত্র ও অন্যান্য সরকারী কাজে হিন্দী তার ব্যর্থতা প্রমানিত করেছে। পক্ষান্তরে শিক্ষাদীক্ষায় ও কারিগরী বিদ্যার্জনে হিন্দী অনুপযোগী ও অনুন্নত।

ইংরাজীর মত একটি আন্তর্জাতিক ভাষা দেশে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তৎপরিবর্তে একটা অনুন্নত ও অনুপযোগী ভাষা চালু করা নেহাৎই যুক্তিহীন। অহিন্দী অঞ্চলে তাকে গ্রহণ করতে হবে এটা কি অগনতান্ত্রিক নয়?

হিন্দীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ কারুর নেই। তবে আঞ্চলিক ভাষার অধিক উন্নত স্থান হিন্দীকে দেওয়া নিরর্থক। অনেকেই তাই যে-মত প্রকাশ করেছেন যে চৌদ্দটি আঞ্চলিক ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃত হোক এবং সর্বভারতীয় সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরাজি অধিষ্ঠিত থাকুক, এমত আমরাও পোষণ করি।

গ্রন্থাগার

০ম বর্ষ] পৌষ : ১৩৬৪ [৯ম সংখ্যা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার দিবস

বাংলা দেশের সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রারম্ভ দিবস ২০শে ডিসেম্বর পশ্চিম বঙ্গের সর্বত্র গ্রন্থাগার দিবস হিসাবে উদযাপিত হয়। বিভিন্ন জেলায় নানাবিধ অনুষ্ঠানে সর্বসাধারণ বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করেন। নিঃশুল্ক সর্বাত্মক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য বিভিন্ন জনসভায় নানাবিধ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নির্দেশক্রমে বহু প্রতিষ্ঠান ঐদিন অথবা ঐদিন হইতে সপ্তাহকালের মধ্যে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে জনসভা, প্রদর্শনী ও বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

সেনেট হলে কেন্দ্রীয় জনসভা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ঐদিন সায়াহ্নে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে এক মহতী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভার প্রারম্ভে উপাচার্য অধ্যাপক নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তেত্রিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে তেত্রিশটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। পৌরোহিত্য করেন অধ্যক্ষ প্রশান্ত কুমার বসু।

উদ্বোধন ভাষণে উপাচার্য সিদ্ধান্ত মহাশয় বলেন, যে-দেশের শতকরা ৮০ জন নিরক্ষর সেই দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বেশী রহিয়াছে। সেই দেশের ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষার পরই ছাত্রজীবন শেষ হয় এবং তাহারা সমাজ জীবনে প্রবেশ করে, যে শিক্ষাটুকু তারা পায় তাহা যাহাতে বিনাশ না হয় তাহার জন্যই গ্রন্থাগারের প্রয়োজন আছে। পরিণত

বয়সে শিক্ষার ক্ষেত্র হইতেছে গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার যত প্রসার লাভ করে এবং গ্রন্থাগারগুলি যতই সমৃদ্ধ হয় ততই দেশের মঙ্গল। তিনি গ্রন্থাগার পরিষদকে এমন ভাবে কাজ করিয়া যাইতে বলেন, যাহাতে ইহার কীর্তি সমগ্র ভারতবর্ষে একটি উজ্জ্বল আদর্শ হইয়া থাকিতে পারে।

সভাপতি শ্রীপ্রশান্ত কুমার বসু তাঁহার ভাষণে বলেন যে লোক-শিক্ষার প্রধান সহায়ক গ্রন্থাগার। তিনি বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার, যেমন কিশোর ও শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন জাতীয় জীবনে শিক্ষা সংস্কৃতির যে দৈন্য রহিয়াছে, তাহা বিদূরিত করিতে হইলে গ্রন্থাগারের বিস্তার অপরিহার্য। তিনি এই সম্বন্ধে সরকারকেও সচেষ্ট হইতে বলেন। মাতৃ ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যাপারে তিনি গ্রন্থাগার পরিষদকে উদ্যোগী হইবার আহ্বান জানান।

সভায় শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, শ্রীশচীন্দ্র নাথ বসু, শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল, গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু এবং উহার সম্পাদক শ্রীরাখাল চন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস ও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সমাজ শিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিল রঞ্জণ রায় বক্তৃতা করেন।

কেন্দ্রীয় জনসভায় গৃহীত প্রস্তাব

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে সর্বস্তরের মানুষের গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় চাহিদা পূরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র সুপরিকল্পিত নিঃশুল্ক গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, ঐ প্রয়োজন সিদ্ধি এবং শক্তি ও অর্থের অপচয় নিবারণের উদ্দেশ্যে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে রচিত এক সর্বাত্মক পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে এযাবৎ জনচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত এবং সাম্প্রতিককালে সরকারী উদ্যোগে প্রবর্তিত গ্রন্থাগার সংস্থাগুলির সংযোগ, সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন আবশ্যক।

সভায় গৃহীত ঐ প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজ্যের বর্তমান অবস্থার অনুসন্ধান কার্যে জনসাধারণের জন্য প্রবর্তনযোগ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনা নির্ধারণে এবং জনসাধারণের জন্য প্রবর্তিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনে কর্তৃত্বসম্পন্ন যে সকল সংস্থা গঠনের প্রয়োজন, তাহাতে সরকারী প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ ও যোগ্যতা সম্পন্ন বেসরকারী প্রতিনিধি থাকা একান্ত আবশ্যক।

ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা সংসদ তাঁহাদের সুপারিশ রচনাকালে সভার উপরোক্ত অভিমতগুলির গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত থাকিবেন বলিয়া সভায় আশা প্রকাশ করা হয়।

কেন্দ্রীয় প্রদর্শনী

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সেনেট হলে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। কেন্দ্রীয় জনসভার সমাপ্তির পর সাংবাদিক শ্রীসুধাংশু কুমার বসু প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিতে উঠিয়া শ্রীসুধাংশু কুমার বসু বলেন যে, গ্রন্থাগারগুলি যাহাতে জনসাধারণের কাছে আকর্ষণীয় হইয়া উঠে, তার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। তিনি শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে বিবৃত করেন এবং অধিকতর গ্রন্থাগার স্থাপনের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের শিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম হউক ইহাই একান্তভাবে কামনা করেন। গ্রন্থাগারের প্রসারকল্পে সরকারী অর্থানুকুল্যের প্রয়োজনীয়তাও তিনি স্বীকার করেন।

সেনেট হলে আয়োজিত উক্ত প্রদর্শনীতে সপ্তাহকালব্যাপী বিপুল জন সমাগম হয়। প্রদর্শনীটি নিম্নলিখিত ৫টি বিভাগে সজ্জিত হয়:

প্রথম, বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্রমবিকাশ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস, হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার সঙ্ঘের কার্যাবলী এবং বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচয়জ্ঞাপক তথ্যবহুল প্রাচীরপত্র।

দ্বিতীয়, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত দেড় হাজার গ্রন্থের এক বর্গীকৃত সমাবেশ। এ বিভাগে সহরের বিভিন্ন প্রকাশক পুস্তক প্রেরণ করেন।

তৃতীয়, বালিগঞ্জ ইনষ্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত আদর্শ শিশু গ্রন্থাগার ও গীতার ৬৪টি সংস্করণের প্রদর্শনী।

চতুর্থ, কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা ও ক্রমোন্নতির পরিচয়। যে গ্রন্থাগারগুলি এ বিভাগে অংশ গ্রহণ করেন তাঁহাদের নাম অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

পঞ্চম, বিভিন্ন বৈদেশিক দপ্তর যথা:—ইউ, এস, আই, এস, ব্রিটিশ কাউন্সিল, জার্মাণ গণতান্ত্রিক রিপাবলিক ও সোভিয়েট দূতাবাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত পুস্তক ও প্রাচীর পত্রাদি।

ষষ্ঠ, গ্রন্থাগারের আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম, ছক ও খাতাপত্রের প্রদর্শনী।

সপ্তম, গ্রন্থন শিল্পের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কীয় পরিচয়।

অষ্টম, শিশু সাহিত্য ও শিশু গ্রন্থাগারের ইতিহাস এবং ক্রমবিকাশের ধারা।

প্রদর্শনীর যে বিভাগটি সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ও প্রাণবন্ত হয় সেটি বালিগঞ্জ ইনষ্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত আদর্শ শিশু গ্রন্থাগার। উক্ত বিভাগে প্রতিদিন শত শত শিশু সমবেত হইত। ছোটদের গ্রন্থাগারের প্রতি একনিষ্ঠ উৎসাহ ও আগ্রহ বিভাগটিতে প্রত্যহ পরিলক্ষিত হইত। কসবার কিশোরগণ কর্তৃক পরিচালিত মণি পাঠাগারের শিল্পীগণ কর্তৃক অঙ্কিত শিশু সাহিত্য ও শিশু গ্রন্থাগারের ক্রমবিকাশের চিত্রমালা বহুল প্রশংসিত হয়।

বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্মিগণ ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের দরদীদের মনে প্রদর্শনীটি যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রেরণার সঞ্চার করে।

বিভিন্ন জেলায় গ্রন্থাগার দিবস পালনের সংবাদ

পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বহু প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার দিবস অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পত্র পরিষদ কার্যালয়ে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু যথাসময়ে অনুষ্ঠানের বিবরণ না আসায় পূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। যেগুলি আসিয়াছে সেগুলি সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করা হইল :

ইন্টালী ইন্‌ষ্টিটিউট ॥ ২১১, ডিহি ইন্টালী রোড ॥ কলিকাতা-১৪।

গত ২১শে ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় ইন্টালী ইনষ্টিটিউট কর্তৃক অনাড়ম্বর ও ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে "গ্রন্থাগার দিবস" প্রতিপালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅশোককমোহন সুর এম. পি। শ্রী সুর চব্বিশটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করিয়া সভার সূচনা করেন। প্রতিষ্ঠাতা সভ্যগণ সকলেই গ্রন্থাগারের বর্তমান উন্নত অবস্থার জন্য বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। সভায় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে শ্রীবিনয়কুমার বসু গ্রন্থাগারে উপযুক্ত পুস্তক নির্বাচন এবং রক্ষণ বিষয়ে আরও সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করেন। ওয়ার্ড কাউন্সিলার ডাঃ লালমোহন ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে জনশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের বিশেষ দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীকৃষ্ণ দাস ও শ্রীঅশোক দত্ত যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের "গ্রন্থাগার" প্রবন্ধ হইতে পাঠ ও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সরকার তাঁর ভাষণে "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ"কে প্রত্যেক গ্রন্থাগার যাহাতে বিনামূল্যে সংবাদপত্র ও সুলভ মূল্যে পুস্তক সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়, সেই বিষয়ে সংবাদপত্রের মালিক ও পুস্তক প্রকাশনী সংস্থার সহিত আলোচনা চালাইতে অনুরোধ করেন। সভাপতি শ্রীমৃগাঙ্কমোহন সুর জনশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সরকার এবং জনসাধারণের যৌথ দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন।

দমদম লাইব্রেরী ও লিটারারী ক্লাব ॥ গোরাবাজার ॥ কলিকাতা—২৮ ॥

গত ২১শে ডিসেম্বর শনিবার দমদম লাইব্রেরী ও লিটারারী ক্লাবের সভ্যবৃন্দ কর্তৃক "গ্রন্থাগার দিবস" উদ্‌যাপিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ পৌরোহিত্য করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। প্রধান অতিথি গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া পাশ্চাত্যের বিশেষ করিয়া আমেরিকা দেশে গ্রন্থাগারের পুস্তক সংরক্ষণ ও উহার শ্রেণী বিন্যাস এবং পুস্তক লেনদেনের যে ধারা প্রবর্তিত আছে এবং আমেরিকা সফরকালীন যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাহার বিশদ আলোচনা করিয়া তিনি এক সারগর্ভ ভাষণ দেন। সভাপতি শ্রীমণীন্দ্র ঘোষ, গ্রন্থাগারের সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক শ্রীকালিদাস চন্দ, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং বৈদ্যনাথ স্কুলের শিক্ষক শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গ্রন্থাগার আন্দোলনের ও গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। দমদম লাইব্রেরী ও লিটারারী ক্লাব বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দ প্রকাশ করেন।

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী ॥ কে, সি বোস রোড ॥ কলিকাতা-৪ ॥

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর উদ্যোগে ২১শে ও ২২শে ডিসেম্বর দুইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্যে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। প্রথম দিনে পুস্তক ও প্রাচীরপত্র প্রদর্শনী এবং জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুধাংশুকুমার বসু।

পৌরোহিত্য করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু ও কর্মাশিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীফণিভূষণ রায় প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে লাইব্রেরীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শাখার উদ্যোগে এক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই সভার পৌরোহিত্য করেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিযোগিরা অংশ গ্রহণ করেন। পুরুষ বিভাগে সর্বশ্রী সুজন চট্টোপাধ্যায় বিশ্বনাথ ঘোষ ও পঞ্চানন ঘোষ, মহিলা বিভাগে সর্বশ্রী লতিকা বসু মায়ারাণী শীল ও সুরুচী বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশু বিভাগে সর্বশ্রী বিকাশ দাস, কৃষ্ণা ঘোষ ও সুব্রত সেনশর্মা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

বি এস এ ক্লাব ॥ বৌবাজার ॥ কলিকাতা—১২ ॥

গত ২১শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে শুচিস্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে বি, এস, এ, ক্লাবের গ্রন্থাগারের সভ্যগণ কর্তৃক গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে সিনেটর শ্রীশচীন্দ্র নারায়ণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়—

গ্রন্থাগার উন্নয়ন কল্পে, যে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হইয়াছে, সেই কমিটি যেন প্রত্যেক প্রদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হন, এবং প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারকে সুচারু রূপ দিবার জন্য একটি সরকারী সাহায্য ভাণ্ডার স্থাপনে সচেষ্ট থাকেন। এবং জনসাধারণের সাহায্যপুষ্ট প্রত্যেকটি গ্রন্থাগার শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকের সাহায্য লাভে বঞ্চিত না হয়, তৎপ্রতি যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

বরাহনগর পিপলস লাইব্রেরী ॥ ১৩৩ কুঠিঘাট রোড ॥ কলিকাতা ৩৬ ॥

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বরাহনগর পিপলস্ লাইব্রেরীর উদ্যোগে ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ে সন্ধ্যায় এক জনসভা হয়। শ্রীনলিন বিহারী বন্দোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুব্রত মুখোপাধ্যায়, বরাহনগর পৌরসভার সদস্য শ্রীজয়দেব মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। বিধান সভার বিরোধী দলের

নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বক্তৃতা প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনে সরকারী ও বে-সরকারী উভয় প্রচেষ্টাকেই সমান প্রয়োজনীয় বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি কিছুকাল পূর্বে বিধান পরিষদের অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য্য কর্তৃক উত্থাপিত গ্রন্থাগার বিলটির উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন যে, বিধান সভার আগামী বাজেট অধিবেশনে তাঁহারা একটি গ্রন্থাগার বিলের আলোচনা করিতে পারেন। গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সভা সমিতির আয়োজন করায় তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে ধন্যবাদ জানান।

মহাবীর পুস্তকালয় ॥ মনুজেন্দ্র দত্ত রোড ॥ কলিকাতা ॥

গত ২৭শে ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় মহাবীর পুস্তকালয়ে গ্রন্থাগার দিবস অনুষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত কামতা নাথ তিবারী ও শ্রীভূপেন্দ্র নাথ ভৌমিক যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রধান অতিথি গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া এক বক্তৃতা দেন এবং উপস্থিত জনসমূহের নিকট এই পুস্তকালয়ের উন্নতি বিধানের জন্য অর্থ ও গ্রন্থ সাহায্যের জন্য আবেদন জানান। এই আবেদনে কয়েকজন লোক গ্রন্থদানের আশ্বাস দিয়েছেন। সভাপতি পণ্ডিত কামতানাথ তিবারী, প্রধান অতিথি শ্রীভূপেন্দ্র নাথ ভৌমিক, পুস্তকালয়ের সভাপতি শ্রীরামানন্দী সাহা, উপ সভাপতি শ্রীপ্রভাস চন্দ্র সাহা, সম্পাদক শ্রীকমলা কর মিশ্র, গ্রন্থাগারিক শ্রীসতীশ চন্দ্র সাহা, কোষাধ্যক্ষ শ্রীচন্দ্রাবলী তিবারী ও কার্য্য নির্বাহক সমিতির সভ্য শ্রীশিবপ্রসাদ দুবে ও শ্রীভোলা নাথ গ্রন্থাগার দিবস ও গ্রন্থাগারের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

রামগঙ্গা নারায়নী পাঠাগার ॥ বিশ্বনাথপুর ॥ ২৪ পরগণা ॥

২০শে ডিসেম্বর রামগঙ্গা নারায়নী পাঠাগারের উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস প্রতিপালন করা হয়।

গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপনের নিমিত্ত পাঠাগার গৃহটি পত্র-পুষ্পাদির দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। প্রাচীরপত্র বিভিন্ন মহাপুরুষগণের ফটোদ্বারা গৃহটিকে চিত্তাকর্ষক করা হইয়াছিল। কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণ জনসাধারণের সহযোগিতায় একযোগে স্থানীয় জনগণের নিকট হইতে অর্থ ও পুরাতন পুস্তক

সংগ্রহ করেন। উক্ত দিবস গ্রন্থাগারে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হয়। তন্মধ্যে পঠন, আবৃত্তি, সংগীত, গল্প, প্রাচীরপত্র অন্যতম। জনসাধারণের ও পাঠকগণের এবং রামগঙ্গা ফ্রী প্রাইমারী স্কুলের ও যোগীন্দ্রপুর প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকগণের সহযোগিতায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যুৎশরণ মান্না।

পাঠাগারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যের প্রশংসা করিয়া সভাপতি মহোদয় এক ভাষণ দেন। যাহাতে এই পাঠাগারটি উন্নতত্ব পথে অগ্রসর হইয়া জনশিক্ষা প্রসারে সাহায্য করিতে পারে তজ্জন্য সমবেত জনমণ্ডলী ও কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্যগণকে উৎসাহিত করেন।

সম্মিলনী আনন্দমঠ ॥ ইছাপুর ॥ ২৪ পরগণা ॥

বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্ম্মসূচী অনুযায়ী গত ২০শে ডিসেম্বর হইতে গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন করা হয়।

গ্রন্থাগার দিবস সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত কিছুদিন পূর্বে বিভিন্ন প্রকার দেওয়াল পত্র প্রকাশ করা হয়। ২০শে ডিসেম্বর স্মরণীয় দিনে প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবকগণ স্থানীয় জন-সাধারণের দ্বারে দ্বারে বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রেরিত কর্মসূচী অনুযায়ী উপস্থিত হয়। এবং ২০শে ডিসেম্বরে গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য সম্বন্ধে প্রচার এবং অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহের দ্বারা উক্ত দিনটি বিশেষ মর্যাদার সহিত পালন করা হয়। স্থানীয় জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতায় মোট ১০১ খানা পুস্তক ও নগদ ২৮৸৹ আনা সংগৃহীত হয় এবং অর্থ ও গ্রন্থের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

২১শে ডিসেম্বর রাত্রি ৭-০ ঘটিকায় প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীলোকেশ চন্দ্র সরকার মহাশয় সভাপতিত্ব করেন।

সন্তান সংঘ ॥ সংগ্রামগড় ॥ ২৪ পরগণা।

গত ২০শে ডিসেম্বর সন্তান সংঘের উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। ঐ দিন সংঘের সভ্যগণ কর্তৃক দলবদ্ধ ভাবে অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহ অভিযান করা হয়। ইহার ফলে পরবর্তী সপ্তাহের মধ্যে নগদ ১০৲ (দশ) টাকা এবং ৫১ খানি পুস্তক সংগ্রহ হয়।

তরুণ সংঘের সভ্যরা গ্রন্থাগারের জন্য গ্রামে অর্থ সংগ্রহ অভিযান চালাইবেন। সভায় কিছু সংখ্যক লোক অর্থদান করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। এই সভা বর্ধমান জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকারিককে অনুরোধ জানান যে যাহাতে এই পাঠাগারটী সরকারী অনুমোদন লাভ করে ও পুস্তকাদি সাহায্য পায় সে বিষয়ে তিনি যেন অনুগ্রহ পূর্বক দৃষ্টি দেন।

মোয়াড়া-গোয়াড়া জ্ঞানেন্দ্র গ্রন্থাগার ॥ বহরকুলি ॥ বর্ধমান।

গত ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার গৃহে মহা সমারোহের সহিত গ্রন্থাগার দিবস প্রতিপালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীগৌরহরি কুমার। সভাপতি মহাশয় বলেন যে, গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পল্লী জীবনের মধ্যে এক নূতন জীবনের পদধ্বনি শোনা যাইতেছে এবং অজানাকে জানিবার এই যে ব্যাকুল আগ্রহ চারিদিকে পরিলক্ষিত হইতেছে তাহাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে গ্রন্থাগারকে কতকগুলি পুস্তকের সমষ্টি করিয়া তুলিলেই চলিবে না, জ্ঞান আহরণের প্রধান উৎস রূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে। সম্পাদক শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন গ্রন্থাগার সর্বজনের, প্রত্যেক গ্রন্থাগারেরই এই দিবসটীকে সার্থকভাবে পালন করা উচিত। তিনি আরও বলেন যে গ্রন্থাগার কেবলমাত্র পুস্তকের সমষ্টি হইয়া না উঠিয়া ইহা যেন পল্লী অঞ্চলে জ্ঞান আহরণের মূল কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠে। সেইজন্য পুস্তক সংগ্রহের ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়া ইহাকে একটী শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে। সভায় শ্রীরাধাশ্যাম মিত্রও একটী মনোরম ভাষণ দান করেন।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী ॥ মানকর ॥ বর্ধমান।

গত ২০শে ডিসেম্বর মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীর উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন মানকরের সাব-রেজিষ্ট্রার শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে গ্রন্থাগার এবং লোক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। ইহা ছাড়া সভায় ডাঃ কৃষ্ণপদ দাস, শ্রীরাধা রমণ দত্ত, শ্রীদিবাকর সেনাপতি ও অমিতাভ দত্ত গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অবশেষে উপস্থিত জনসাধারণকে নৃত্য, গীত ও আবৃত্তি দ্বারা আনন্দ দান করা হয়। এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীরূপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী।

ঝাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার ॥ ঝাড়গ্রাম ॥ বর্ধমান ॥

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নির্দেশে গত ২০শে ডিসেম্বর ঝাড়গ্রাম মাখন লাল পাঠাগারের সভ্যগণ কর্তৃক গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে পুস্তক, প্রাচীরপত্র এবং সাময়িক পত্রের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণে শ্রীবিরজাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গ্রন্থাগারের সম্পাদক ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করেন, তিনি পাঠাগারের ইতিবৃত্ত ও এই প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনে ৺কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় এবং তিনকড়ি দত্তের নিরলস চেষ্টা ও ঐকান্তিকতার কথা উল্লেখ করেন। বর্তমানে জাতীয় সরকার গ্রন্থাগার প্রসারের পরিকল্পনা গ্রহণ করায় এই সভা আনন্দ প্রকাশ করে। সরকারের এই মহৎ পরিকল্পনার সাফল্য কামনা করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ॥ মুর্শিদাবাদ ॥

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগারে মুর্শিদাবাদ জেলার সকল শ্রেণীর লেখকগণের রচিত এবং মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জেলা গ্রন্থাগারের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীকমল বন্দোপাধ্যায়ের সংগ্রহ হইতেই বেশীর ভাগ গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ডাঃ সতীনাথ বাগচীর সভাপতিত্বে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হইয়াছে। শ্রীবাগচী গ্রন্থাগার সম্বন্ধে ভাষণ দেন। তাঁহার ভাষণের পর বিপুল জনসমাবেশের মধ্য হইতে বহু মূল্যবান পুস্তক এবং কিছু অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়।

শঙ্কর লাইব্রেরী ॥ সালু ॥ মুর্শিদাবাদ ॥

২০শে ডিসেম্বর মসস্ত শঙ্কর লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে সালু জুনিয়র উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। সভাপতি মহাশয় গ্রন্থাগার দিবস পালনের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। পাঠাগারের সভাপতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারের ইতিহাস সরল ভাষায় বিশ্লেষণ করেন। পরে পাঠাগারের সম্পাদক ও সহ সম্পাদক বক্তৃতা করেন।

হিন্দুস্থান সেবা সমিতি ॥ খাগড়া ॥ মুর্শিদাবাদ ॥

গত ২০শে ডিসেম্বর হিন্দুস্থান সেবা সমিতির উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ডাঃ সতীনাথ বাগচী সভাপতিত্ব করেন।

পাঠাগারের সাংস্কৃতিক সম্পাদক শ্রীপূর্ণেন্দু শেখর ধর মহাশয় গ্রন্থাগার দিবস পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। ইহার পর সহ সম্পাদক সভায় উপস্থিত জনগণের নিকট পাঠাগারের উন্নতিকল্পে আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব করিলে ইহাতে ১৫৲ সাহায্য পাওয়া যায় এবং ৩০ খানি পুস্তকের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

পাড়িহাটি সাধারণ পাঠাগার ॥ পাড়িহাটি ॥ মেদিনীপুর ॥

গত ২০শে ডিসেম্বর শুক্রবার পাড়িহাটি সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে মহা-সাড়ম্বরের সহিত গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। প্রাতে পাঠাগারটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং পুস্তক গুলির সুশৃংখল শ্রেণী বিন্যাস করা হয়। বেলা ৯ ঘটিকায় এক শোভাযাত্রা সহকারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি মহাশয়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন পূর্বক তাঁহার হস্তে পাঠাগারের উন্নতি কল্পে আর্থিক সাহায্য নিমিত্ত একটি আবেদন পত্র অর্পন করা হয়। বৈকালে একটি জনসভা ও আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া ঐ দিবসের কর্মসূচী সমাপ্ত করা হয়।

প্রবর্তক সংঘ ॥ মহেশপুর ॥ মেদিনীপুর ॥

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নির্দেশক্রমে ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উদযাপিত হয়। সংঘের সভ্যগণ সকালে পুস্তক এবং অর্থ সংগ্রহের অভিযান চালান, ইহাতে মোট ২৩ খানি পুস্তক ও কিছু অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়। বৈকালে এক জনসভার আয়োজন হয়। সভাপতি গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। অতঃপর সভার শেষে উপস্থিত ব্যক্তি বৃন্দকে চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়।

স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার ॥ সোনাখালী ॥ মেদিনীপুর ॥

গত ২০শে ডিসেম্বর আড়ম্বরের সহিত গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে বিবিধ পুস্তক ও পত্রিকার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রদর্শনীটি স্থানীয় জনসাধারণের বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি করে। সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় কৈগোড়া জুনিয়র বেসিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীপঞ্চানন গোস্বামী মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীকানন বিহারী পাত্র। সভাপতি জনসাধারণকে গ্রন্থাগার বিষয়ে উৎসাহিত হইবার জন্য আবেদন জানান এবং গ্রন্থাগারের উন্নতি কল্পে আর্থিক সাহায্য কামনা করেন। তাঁহার আবেদনে উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের নিকট হইতে অর্থ এবং পুস্তক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

মির্জাপুর নেতাজী গ্রন্থাগার ॥ মির্জাপুর ॥ বাঁকুড়া ॥

গত ২০শে ডিসেম্বর শুক্রবার মির্জাপুর নেতাজী গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার দিবস সুচারুরূপে প্রতিপালিত হয়। প্রত্যূষে প্রভাত ফেরী ও গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয় এবং জনসাধারণের নিকট গ্রন্থাগার উন্নতি কল্পে সাহায্য কামনা করে ইহাতে কিছু অর্থ ও পুস্তক সংগৃহীত হয়। অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে একটি জনসভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীরাধারমণ মণ্ডল। সভাপতি মহাশয় একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। তিনি গ্রন্থাগারটির উন্নতি কল্পে সকলকে অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করিতে অনুরোধ জানান। গ্রামসেবক শ্রীপংকজাক্ষ ঠাকুর মহাশয় সংক্ষিপ্তভাবে পল্লীগ্রামে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সভাশেষে উপস্থিত ব্যক্তিগণকে নৃত্য, সংগীত এবং কৌতুকাভিনয়ের দ্বারা আনন্দ দান করা হয়।

পানুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার ॥ পানুয়া ॥ বাঁকুড়া ॥

গত ২০শে ডিসেম্বর পানুয়া পাঠাগারের উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ঐ দিন গ্রন্থাগার গৃহের পুস্তক এবং আসবাবপত্রাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। পাঠাগারের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য নানাস্থানে উপদেশমূলক বহু প্রাচীরপত্র আঁটিয়া দেওয়া হয়। সমাজ সেবা ও পাঠাগার কর্মিগণ সান্ধ্য বৈঠকে মিলিত হইয়া পাঠাগারের উন্নতিকল্পে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করেন।

জাতীয় সেবা সমিতি ॥ জগমোহনপুর ॥ হুগলী ॥

গত ২৩শে ডিসেম্বর 'জাতীয় সাধারণ পাঠাগারে' গ্রন্থাগার দিবস সমারোহে পালন করা হয়। প্রাতে পাঠাগার গৃহ পরিমার্জন ও পুস্তক সজ্জিত করা হয়। এই দিন পাঠাগারের সভ্যগণকে পুস্তক যত্নের সহিত পাঠের আবেদন জানান হয়। পুস্তক সংগ্রহ অভিযানের ফলে সর্বশ্রী পরেশ চন্দ্র মান্না, গুরুগোবিন্দ দে, দুর্গাপদ মান্না পাঠাগারে কয়েকটি পুস্তক দান করেন। বৈকালে পাঠাগার গৃহে এক আলোচনা সভায় পল্লী জীবনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ও অবদান লইয়া আলোচনা করেন স্থানীয় সুধীবৃন্দ। সন্ধ্যায় পাঠাগার গৃহকে আলোক সজ্জিত করা হয়।

তরুণ লাইব্রেরী ॥ নেতাজী পার্ক ॥ হুগলী ॥

গত ২০শে ডিসেম্বর পাঠাগারের নিজস্ব ভবনে সাড়ম্বরে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালিত হয়। শ্রীলক্ষণ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে এক সভা আয়োজিত হয়। সভার প্রারম্ভে স্থানীয় শিক্ষাবিদ শ্রীপুলিন বিহারী দে মহাশয়ের অকাল বিয়োগে তাঁর আত্মার প্রতি সম্মানার্থ ২ মিনিটকাল নিরবতা পালন করা হয়। পাঠাগার গত দুই বৎসর সরকারী সাহায্য না পাওয়ায় বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। পাঠাগারের প্রতি সাধারণের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য পরীক্ষামূলকভাবে বিনা চাঁদায় কিছু সংখ্যক পুস্তক গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচার করিবার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। এরপর স্থানীয় ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত হস্তলিখিত পত্রিকা 'জোনাকী' পাঠাগার কর্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করা হয়। শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় পাঠাগারের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করিয়া সভা ভঙ্গ করেন।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি ॥ ত্রিবেণী ॥ হুগলী ॥

গত ১৭ই পৌষ ১৩৬৪ ইং ১লা জানুয়ারী ১৯৫৮ বিকাল ৫টায় পাঠাগার গৃহে হিতসাধান সমিতি সাধারণ পাঠাগারের ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাঠাগারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্যপ্রধান শিক্ষাবিদ্ শ্রীসত্যপ্রকাশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

কুমারী স্বপ্না ভট্টাচার্যের উদ্বোধনী সংগীত ও সভাপতিবরণের পর অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠাকাল

পর্যন্ত পাঠাগারের অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন এবং পাঠাগারের বর্তমান সমস্যা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কেও আলোচনা করেন। পাঠাগার গৃহ সম্প্রসারণের কাজটি আশু সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি বিশেষ ভাবে জোর দেন এবং এই সম্পর্কিত অসুবিধাগুলি দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে পাঠাগারের হিতৈষীগণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্যও বর্ণনা করেন। আবৃত্তি, বিতর্ক ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়া অনুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

প্রতিষ্ঠা দিবস ও গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে পাঠাগার গৃহটিকে আলোক মালায় সজ্জিত করা হয়।

তালা প্রদীপ সাহিত্য মন্দির ॥ দামুন্যা ॥ হুগলী ॥

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নির্দেশক্রমে গত ২০শে ডিসেম্বর তালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীগদাধর ভট্টাচার্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠিত জনসভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে জাতীয় জীবনে গ্রন্থাগার অপরিহার্য বলিয়া গ্রন্থাগারকে দেশব্যাপী শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে অবিলম্বে স্বীকার করিয়া লওয়া হউক। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক এবং বিচক্ষণ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি শক্তিশালী সংস্থা গঠন করিয়া দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রথায় উন্নীত করুন।

প্রগতি পাঠাগার ॥ জিরাট ॥ হুগলী ॥

গত ২০শে ডিসেম্বর পাঠাগার প্রাঙ্গণে পাঠাগারের সভাপতি শ্রীসতীন্দ্র কুমার মজুমদার মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বৈকাল ৩ ঘটিকায় গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। সভায় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভাপতি তাঁহার ভাষণে বলেন, সমাজ ও দেশের উন্নতিকল্পে পাঠাগারের গুরু দায়িত্ব রহিয়াছে, যাহাতে আমরা এই মহান দায়িত্ব জয়যুক্ত করিয়া তুলিতে পারি তাহার জন্য আমাদের সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। তিনি সকলের আন্তরিক সহানুভূতি প্রার্থনা করেন।

সহ-সম্পাদক শ্রীচিত্তরঞ্জন সন্নামত যাঁহারা গ্রন্থাগার আন্দোলনের মহান ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের শুভেচ্ছা জানান।

পাঠাগারে ঐ দিন পুস্তক ও হস্তলিপি পত্রিকার প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছিল।

বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি ॥ সেওড়াফুলি ॥ হুগলী ॥

গত ২০শে ডিসেম্বর হইতে ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি গ্রন্থাগারে তিন দিন ব্যাপী গ্রন্থাগার দিবস বিশেষ নিষ্ঠা সহকারে পালিত হয়। মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের একটী প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন অধ্যাপক কুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। তিনি উদ্বোধনী ভাষণে স্কুল কলেজের শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে গ্রন্থাগারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার প্রতি সমাজ চেতনা জাগানোর এইরূপ প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। প্রদর্শনীর ইংরাজী বাংলা বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান পুস্তক, আকর্ষণীয় প্রাচীর পত্র প্রভৃতি সমাগত ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, সাধারণ সর্বশ্রেণীর শিক্ষামোদীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ২১শে ডিসেম্বর "পাঠচক্র" কর্তৃক আহুত সভায় শ্রীরামপুর মহকুমা প্রচারাধিকরণ কর্তৃক শিক্ষা মূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। ২২শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হইয়াছিল। স্থানীয় শিল্পিগণ কর্তৃক পরিবেশিত "গ্রন্থাগার গীতি আলেখ্য" উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে।

রামনগর গোলাপ সুন্দরী সাধারণ পাঠাগার ॥ সালেপুর ॥ হুগলী ॥

গত ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৫৭ পাঠাগারের তরফ হইতে আড়ম্বরের সহিত গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে ঐ দিন এক সভার আয়োজন হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীতীর্থভূষণ কুণ্ডু। গ্রন্থাগারের উৎসাহী কর্মীবৃন্দ এই উপলক্ষে জনসাধারণের নিকট হইতে কিছু সংখ্যক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাগারে দান হিসাবে জমা দেন।

পারহাট এ্যাডাল্ট এডুকেশন লাইব্রেরী ॥ বর্ধমান ॥

২০শে ডিসেম্বর পারহাট গ্রাম্য উন্নতি পরিষদের উদ্যোগে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসূচী অনুযায়ী যথারীতি গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। এইদিন গ্রন্থাগার ভবনে গ্রন্থাগারিক শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় একটি গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। অপরাহ্নে সহ গ্রন্থাগারিক শ্রীনিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি আলোচনা বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এই আলোচনায় কয়েকজন সমাজসেবী কর্মী যোগদান করিয়া গ্রন্থাগারের বিশেষতঃ পল্লী গ্রন্থাগারের নানাদিক আলোচনা করেন। পল্লী গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক দিক এবং সংগঠনের নানাদিক আলোচিত হয়। পরিশেষে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

"পল্লীর গ্রন্থাগারগুলিকে সংগৃহীত পুস্তকের একটি নিষ্ক্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য না করিয়া ইহাকে জাতির সকল প্রকার কর্মধারার কেন্দ্রস্থল এবং সর্ববিধ উন্নতির সহায়ক, সক্রিয়, শক্তিশালী ও অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করিয়া সরকার হইতে গ্রন্থাগারগুলি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সহজবোধ্য আইন প্রস্তুত করিয়া পল্লী গ্রন্থাগারগুলিকে রক্ষা করা কর্তব্য।"

দারাপুর বিবেকানন্দ পাঠ ভবন ॥ লেগো ॥ বাঁকুড়া ॥

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসরও দারাপুর বিবেকানন্দ পাঠভবনের উদ্যোগে ২০শে ডিসেম্বর তারিখে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। সমস্ত দিবসব্যাপী এক কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। গ্রন্থাগার ভবনটিকে বিভিন্ন প্রচারপত্র ও পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত করা হয়। গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পুস্তকগুলির একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। অপরাহ্নে এক জনসভায় সভাপতিত্ব করেন বর্তমান গ্রন্থাগারিক শ্রীসাগরচন্দ্র নন্দী মহাশয়। বিভিন্ন বক্তা জনশিক্ষা বিস্তারের এবং নানাবিধ সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের কেন্দ্র হিসাবে পল্লী অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলির অবদানের কথা উল্লেখ করেন। সভাপতি মহাশয় এই গ্রন্থাগারটির অধিকতর সমৃদ্ধির জন্য জনসাধারণের ব্যাপক সহযোগিতা আহ্বান করেন।

সহৃদয় নেতাজী লাইব্রেরী ॥ পাত্রসায়র ॥ বাঁকুড়া ॥

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নির্দেশে গত ২০শে ডিসেম্বর সহৃদয় নেতাজী পাঠাগারের উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। ঐদিন জনসাধারণকে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আকৃষ্ট করিবার জন্য বহুস্থানে প্রাচীরপত্র আঁটিয়া দেওয়া হয় এবং পথকোনী সভার মাধ্যমে জনসাধারণকে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সচেতন করার প্রয়াস পায়। ইহাতে সাধারণের নিকট হইতে বিপুল সাড়া পাওয়া যায় এবং ঐ দিন নগদ ৩০৲ (ত্রিশ টাকা) এবং ১৫ খানি পুস্তক সংগৃহীত হয়। সন্ধ্যায় একটি ঘরোয়া বৈঠকে পাঠাগারের উন্নতিকল্পে কোন পন্থা অবলম্বন করণীয় সেই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয়।

জুবিলী লাইব্রেরী ॥ রামরঞ্জন টাউন হল ॥ সিউড়ী ॥ বীরভূম।

গত ২০শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় রামরঞ্জন পৌরভবনে জুবিলী গ্রন্থাগারের উদ্যোগে 'গ্রন্থাগার দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। গ্রন্থাগারের যুগ্ম সম্পাদক সভার উদ্বোধন করেন। জাতীয় জীবনে গ্রন্থাগারের স্থান, গ্রন্থাগারের উন্নতি ও প্রসার সম্পর্কে সভাপতি মহাশয় একটি মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন এবং সকলকে গ্রন্থাগারের সহিত সংযোগ সাধনের অনুরোধ জানান।

নজরুল পাঠাগার ॥ সূর্য সেন ষ্ট্রীট ॥ কলিকতা—৯ ॥

নজরুল পাঠাগারের উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে পাঠাগারটিকে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। বৈকালে পাঠাগার কক্ষে গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য আলোচিত হয়। ২২শে ডিসেম্বর একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ডাঃ আব্দুল আহ্‌মান। সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সভাশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত কবি নজরুল ইসলামের জীবনচিত্র প্রভৃতি কয়েকখানি শিক্ষামূলক চিত্র প্রদর্শিত হয়। গ্রন্থাগার সপ্তাহ সমাপ্তি উপলক্ষে ২৬শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পাঠাগার ভবনে কিশোর কিশোরীদের একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে শ্রীমতী শুভ্রা গুপ্ত, শুক্লা গুপ্ত এবং ইভা মিত্র যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

শৈলেশ্বর লাইব্রেরী ॥ প্রভুরাম সরকার লেন ॥ কলিকাতা—১৫ ॥

শৈলেশ্বর লাইব্রেরীর উদ্যোগে গত ২৩শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। গ্রন্থাগারে বিভিন্ন শ্রেণীর পুস্তকের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে পুস্তকসমূহ সজ্জিত করা হয়। সন্ধ্যায় গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ কর্তৃক চিত্তরঞ্জন, লোকমান্য তিলক, প্রভৃতি কয়েকটি প্রামান্য চিত্র প্রদর্শিত হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীপ্রমোদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সমাগত জনগণকে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া বলেন এবং সরকারের গ্রন্থাগার পরিকল্পনার প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন।

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী ॥ উত্তরপাড়া ॥ হুগলী ॥

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নির্দেশে উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে বহু প্রাচীন, দুষ্প্রাপ্য এবং ১৫০ বৎসরের পূর্বেকার হস্তলিখিত পুস্তকাদির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষ আগ্রহ সহকারে যোগদান করেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যের ইংরেজী এবং বাংলা দেশের মুদ্রিত এবং সাধারণ গ্রন্থাগারের সংরক্ষিত ইংরাজী, বাংলা পুস্তক প্রদর্শিত হয়, তাহা ছাড়া ১২০৫ বঙ্গাব্দে মধ্যবিত্ত সংসারের জীবনযাত্রার ব্যয়ের তালিকাও প্রদর্শিত হয়। গত ২২শে ডিসেম্বর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন যে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির পরই আমাদের শিক্ষা শেষ হয় না। ইহার জন্য চাই আদর্শ গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারই আমাদের আজীবন জ্ঞান আহরণে সাহায্য করে। তিনি এজন্য এই গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত বিদ্যোৎসাহী জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মহৎ দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করেন এবং সভাপতি এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান। শ্রীকমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় চীন দেশের গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থ সংগ্রহ বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভূমিকা

প্রশান্ত কুমার বসু

অধ্যক্ষ, বঙ্গবাসী কলেজ

আজ থেকে ত্রিরিশ বছরেরও বেশী আগে ঠিক আজকের এই দিনটিতে আধুনিক বাংলা সংস্কৃতির প্রধান পুরোহিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে বাংলা দেশের গ্রন্থাগার কর্ম্মী ও শিক্ষানুরাগীরা সংঘবদ্ধভাবে বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন আরম্ভ করেন। প্রধানতঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চেষ্টাতেই সেই আন্দোলন দিন দিন অগ্রগতির পথে চলেছে। একথা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের অন্ততঃ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে চেতনা জাগাতে সক্ষম হয়েছে। এই আন্দোলনের গোড়ার দিকে এর পুরোভাগে ছিলেন হুগলী বাঁশবেড়িয়ার কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়। মুনীন্দ্রবাবু বাংলাদেশে তথা ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করে তুলতে যে চেষ্টা ও ত্যাগ করেছেন, সে জন্য, তিনি নমস্য এবং আজকের এই পুণ্যদিনে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেককিছু জানবার সুযোগ সৌভাগ্যবশতঃ আমার হয়েছে এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দু'একটি সম্মেলনে যোগদান করবার সুযোগও এর আগে আমার ঘটেছে। সেই সুযোগে গ্রন্থাগার কর্মীদের একাগ্রতা ও নিষ্ঠার যে পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে আমি মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারিনি। সভাসমিতির আয়োজন করা ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত আছে। গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষার ব্যবস্থা করে পরিষদ দেশের অশেষ উপকার করছেন। এই শিক্ষার ফলেই দেশের অনেক গ্রন্থাগারের পক্ষে সুশিক্ষিত গ্রন্থাগারিক পাওয়া সম্ভব হয়েছে এবং আশা করা যায় ভবিষ্যতেও হবে।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রচুর হলেও শিক্ষা বিস্তারের যে মহাব্রত পালন করে যাচ্ছে, তার মূল্য সামান্য নয়। তবুও বলতে হবে যে মাত্র এই পথে একটা বিরাট দেশকে শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব নয়।

সেনেট হলে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় জনসভায় পঠিত সভাপতির ভাষণ।

জনসাধারণ বলতে আমরা যা বুঝি তা পড়ে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমার বাইরে। তাদের শিক্ষিত করে তোলার বহু এবং বিচিত্র আয়োজন আমাদের দেশে এককালে ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে আধুনিক রুচির প্লাবনে তাদের অধিকাংশই ধুয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বন্যা শুধু ভাসিয়ে নিয়েই গেল, নূতনতর উর্ব্বরতায় মাটিকে সে নবজন্ম দিলেনা, অভিনব সৃষ্টির কল্যাণে ধ্বংসকে সে সার্থক করলেনা।

শিক্ষা ছাড়া জাতির মুক্তি নাই, একথা এক বাক্যে সকলেই স্বীকার করেন। জনগনকে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজন আজ আংশিকভাবে হলেও, অনুভূত হয়েছে, কিন্তু আয়োজনের প্রাচুর্য আজ আর নেই। পল্লী অঞ্চল পাঠশালা চতুস্পাঠী জাতীয় যে প্রতিষ্ঠানগুলি শিবরাত্রির সলতের মত আজও বেঁচে আছে, তাদের ক্ষীণ শিখায় অবিদ্যার অন্ধকার ঘোচে না বা ঘুচতে পারে না। নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস যে আধুনিক জীবনের শতবর্ষের সাধনাতেও দেশের শতকরা নব্বইজন নিরক্ষর রয়ে গেল। এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, নিরক্ষর থেকেও মানুষ জ্ঞানী হতে পারে। চোখে দেখে হাতে কলমে করে শিখতে না পারুক, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সমষ্টিগত ফলভাগী মানুষ, নিরক্ষর হয়েও হতে পারবে না কেন? পরম্পরাগত যে জনশিক্ষার ধারা এদেশে সহজছন্দে সাবলীলভাবে বয়ে আসছিল তা আজ শুকিয়ে গেল, অথচ নবীন ধারার উৎস উৎসারিত হ'ল না—এত বড় অভিশাপ দু'শ বৎসরের পরাধীন জীবনেই সম্ভব।

এ পাপের আংশিক প্রায়শ্চিত্ত রূপে জেগে উঠেছে আজ গ্রন্থাগার আন্দোলন। শিক্ষা বিস্তার বা প্রচার বিষয়ে গ্রন্থাগারের স্থান যে কত উচ্চে সে কথা আপনারা সবাই জানেন। গ্রন্থাগারের এই প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেই বৃটিশ মনীষী কার্লাইল বলেছিলেন যে, আমাদের যুগের বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থাগার। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশেই—বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকায় কার্লাইলের কথার সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে হাজার হাজার সুপরিচালিত গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের দ্বারা। আমরা এ আশা পোষণ করতে পারি, যে, স্বাধীন ভারতে শিক্ষার যে নব পরিকল্পনা গৃহীত হচ্ছে বা হবে তাতে নিশ্চয়ই গ্রন্থাগার তার উপযুক্ত আসন লাভ করবে। সমস্ত দেশময় স্থায়ী এবং ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের এরূপ ব্যবস্থা করা হবে, যে, ভারতের প্রতিটি পল্লীর প্রতি গৃহে শিক্ষার আলোক প্রবেশ করতে পারে। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় এখানেও আইন দ্বারা গ্রাম, শহর, মহকুমা ও জেলার স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সাহায্য

দিয়ে গ্রন্থাগার সমস্যার সমাধান করতে হবে। কেবলমাত্র বয়স্ক উচ্চ শিক্ষিত পুরুষদের উপযোগী পুস্তকাদি রাখলেই গ্রন্থাগারের দায়িত্ব শেষ হবে না। কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী বই ও সাধারণ মহিলাদিগের প্রয়োজনীয় বই গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। অধিক বয়স্ক নিরক্ষর চাষী ও শ্রমিকদের লেখাপড়া শেখাবার কাজও ভিন্ন গ্রন্থাগারের সাহায্যে সম্পন্ন হতে পারে ও হওয়া উচিত। এক কথায় আমাদের জাতীয় জীবনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে দৈন্য তা ঘোচাতে হ'বে নতুন নতুন গ্রন্থাগার সৃষ্টি ক'রে ও পুরান-গ্রন্থাগারগুলির সংস্কার করে।

এ কথা সত্য যে, স্থানু ও ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে এবং এখনও হচ্ছে। কিন্তু যারা পড়তে শিখেছে তাদের আরো পড়ার সুযোগ দেওয়াই যদি এ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তা হলে সমাজ তাতে লাভবান হবে না। শিক্ষার প্রচার কার্য্য হবে গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য—বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা যে হতভাগ্য দেশে এখনও হ'ল না সে দেশে প্রচারের দ্বারা সমাজ শিক্ষাকে সুদূর-প্রসারী করতে হবে। পুঙ্খানুপুঙ্খ শিক্ষার পরিবর্ত্তে জনগণকে শিক্ষার সমষ্টিগত ফলভাগী করতে হবে। আপনারা অনেকেই জানেন পল্লী অঞ্চলে নিরক্ষরা বর্ষীয়সী মহিলারাও ভাদ্রমাসের দিনে ছেলে মেয়েদের বেশী রৌদ্র লাগাতে নিষেধ করেন—বলেন পিত্তি বৃদ্ধি হয়ে অসুখ করবে। ত্রিশ বছর আগেও আমরা, তথাকথিত শিক্ষিতের দল, এই দেশের মহৎ ঐতিহ্যটিকে অন্যান্য সকল ঐতিহ্যের মত উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু আজ পশ্চিম আমাদের শিখিয়েছে 'আল্ট্রা ভাওলেট্ রে' মানব দেহে রোগ নিরাময়ও যেমন করে, মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টিও তেমন করে, এবং বর্ষার বর্ষনের পর শরতের নির্ম্মল আকাশ থেকে সূর্যের এই অতি ক্ষুদ্র রশ্মি তরঙ্গের অনেকগুলিই অবাধে মাটিতে নেমে আসে। এসত্য ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির যুগেও ছিল এবং এখনও আছে, এসত্য আমরা পশ্চিম থেকে শিখি নি। বৃদ্ধাদের গুরু পশ্চিম নয়; এ দেশেরই সাধনার সিদ্ধি প্রচার পরম্পরায় তাঁদের মধ্যে মূর্ত্ত হয়েছে। তাঁরা সূক্ষ্ম কারণ জানেন না, জানেন কেবল ফলটুকু—ভাদ্রমাসের রৌদ্রে শরীরে রোগ প্রবেশ করতে পারে। আজ Spectral Analysis এর সাহায্যে নতুন নতুন আবিস্কারে আমরা স্তম্ভিত হয়ে আছি। কিন্তু আমরা কজন খবর রাখি যে জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ যে ঋগবেদ্—সেই ঋগ্বেদের ভেতরই শুভ্র সূর্য্যালোক যে

সপ্ত রশ্মির মিলিত ফল এ কথা বিবৃত আছে? সেই থেকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে বহুমুখী সাধনা ব্যাপক ভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রবাহিত হয়ে বিচিত্র সিদ্ধিরূপ পরিগ্রহ করেছিল এই দেশেই। তার ফলশ্রুতি প্রচারের পথেই সমাজের সুদূর প্রান্তে পৌছে ছিল। আজও ঐ বয়ীয়সী মহিলাদের সাবধান বাণীতে তারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই।

গ্রন্থাগার দিবস পালন একমাত্র গ্রন্থাগার পরিষদেরই কর্ত্তব্য নয়। এই অনুষ্ঠান সমগ্র দেশের এবং দেশবাসীর। শিক্ষা বিস্তারে গ্রন্থাগারের স্থান কোথায় তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে দেশের শিক্ষাবিস্তার কেবল বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুল কলেজের ওপরেই নির্ভর করে না। আজ স্কুল কলেজে না গিয়েও গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থের সাহায্যে মানুষ নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতে পারে। আমাদের বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রধান আচার্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এ কথা সত্য যে স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের ভারতবর্ষে শিক্ষাদীক্ষার খানিকটা অগ্রগতি হয়েছে। কোন কোন স্কুল কলেজের মত অনেক গ্রন্থাগারও আজ সরকারী সাহায্য লাভের সুযোগ পাচ্ছে। বয়স্ক পুরুষ ও মেয়েদের শিক্ষার জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অনেক জায়গায় বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যার হার খুব বেশী বাড়তে পারেনি। জগতের অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় এ বিষয়ে আমরা আজও অনেক পেছনে পড়ে আছি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যাঁদের কথা ভেবে বলেছিলেন 'এই সব মূঢ় মূক ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা' তারা আজও ভারতের অসংখ্য সহরে ও পল্লীতে 'মূঢ় ম্লান মুখ' নিয়েই বসে আছে। এদের শিক্ষিত করে তোলার উপযুক্ত ব্যবস্থা আজও হয় নি। এজন্য দোষী কে সে আলোচনা বা সমালোচনার মধ্যে আজকের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আমরা না হয় নাই বা গেলাম!

তবে ভারতীয় জীবনের চিরন্তন ধারা অনুসরণ করেই আমি বলতে চাই যে এই শিক্ষাদানের দায়িত্ব আমাদের সকলেরই—যেমন সরকারের তেমনি জনসাধারণের। সরকারের কর্ত্তব্য সরকার পালন করুণ, আমাদের কর্ত্তব্য পালন করব আমরা। ছাত্র সমাজের বন্ধু ও হিতৈষী হিসেবে আমি আজকের এই সুবর্ণ সুযোগে ছাত্র সমাজকে জানাতে চাই যে পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সেবাও তাদের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। এই সমাজ সেবার কার্যসূচী ঠিক

কী হবে এটা নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারেন। তবে আমার ব্যক্তিগত মত এই যে সুযোগ ও সুবিধে মত গ্রন্থাগারের সেবা ছাত্রদের অবশ্য কর্ত্তব্য। পল্লী অঞ্চলে এমন অনেক গ্রন্থাগার আছে যেখানে পয়সা দিয়ে গ্রন্থাগারিক রাখা সম্ভব নয়। ছুটির সময়ে ছাত্রেরা নিজ নিজ পল্লীতে গিয়ে এই জাতীয় গ্রন্থাগারের সেবা করলে সেটা প্রকৃত পক্ষে দেশেরই সেবা হবে। তাঁরা ছোট ছোট নতুন গ্রন্থাগার স্থাপনও করতে পারেন। ভালো ভালো ছাত্রেরা তাঁদের পুরস্কার বই থেকে দু চারখানি দান করলে গ্রন্থাগার পরিপুষ্ট হতে পারে। এই সব গ্রন্থাগারে যেমন বই লেনদেন চলতে পারে তেমনি ছোটদের খবরের কাগজ থেকে দেশ বিদেশের খবর পড়ে শোনান, আলোচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সংগীতের আসর ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থাগার গুলি হয়ে উঠতে পারে পল্লীর প্রাণ, নির্জীব পল্লীর বুকে এরাই আবার সঞ্চার করতে পারে প্রাণের জোয়ার। আমার মতে ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়—অপরিহার্য।

যে সব গ্রন্থাগার কর্ম্মী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত তাঁদের নিজেদের রোজগারের ব্যবস্থা করা ছাড়াও কতকগুলি বিশেষ কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আছে বলে মনে করি। এমন অনেক গ্রন্থাগার আছে যেখানে গ্রন্থ, পুঁথি, পত্রিকার অভাব নেই, কিন্তু কর্মীর সংখ্যাল্পতার জন্য এই সব গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলিকে শ্রেণীবন্ধ ভাবে সাজানো সম্ভব হয়নি বা গ্রন্থগুলির বিজ্ঞান সম্মত তালিকা প্রণয়ণের ব্যবস্থা করা যায় নি। আমাদের এই কলকাতা সহরেও এমন প্রতিষ্ঠান আছে যার গ্রন্থরাজি অমূল্য কিন্তু লোকাভাবে তার উপযুক্ত বিলি ব্যবস্থা ব্যাহত হয়ে আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু কবে সরকারী সাহায্য আসবে সে অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না। গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের কাছে আমার এই আবেদন যে এই সকল প্রতিষ্ঠান যদি তাঁদের সাহায্য নিতে প্রস্তুত থাকে তাহলে অন্ততঃ আংশিকভাবে শ্রমদান করে তাঁরা বাংলা ও বাঙ্গালীর অমূল্য সম্পত্তি এই সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখুন। এ ছাড়া যে-সব ছাত্র ও ছাত্রী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত নন অথচ অবৈতনিক ভাবে গ্রন্থাগারের সেবা করতে ইচ্ছুক সেই সব ছাত্র ছাত্রীদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মোটামুটি জ্ঞান দান করে গ্রন্থাগার কর্ম্মীরা দেশের ও জাতির মঙ্গল সাধন করতে পারেন।

এ কথা ভাবলে ভুল করা হবে যে-গ্রন্থাগারে পুস্তকের প্রাচুর্য্য আছে সেই গ্রন্থাগার উচ্চশ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের পর্য্যায়ে পড়ে। গ্রন্থাগারের গ্রন্থের সংখ্যা অপ্রচুর হলেও বিভিন্ন পাঠকের সুরুচি সম্পন্ন প্রয়োজনীয়তার চাহিদা যদি মেটাতে পারে এবং পড়াশুনোর আবহাওয়া যদি গ্রন্থাগারে থাকে তাহলে সেইটিই হোলো সত্যিকারের গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারকে আমরা বিচার করব সংখ্যা দিয়ে নয়। বিচার করব তার গুন দিয়ে—it is to be judged by quality and not by quantity ; ইংরেজ কবি Southey তাঁর গ্রন্থাগারের কথা উল্লেখ করে বলেছেন my days among the dead are past around me I behold wherever those casual eyes are cast, the mighty minds of old.

ছত্র কয়টিতে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা, তাৎপর্য ও পবিত্রতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সব পাঠক পাঠিকাই গ্রন্থাগারের সাহায্যে mighty minds of old এর সংস্পর্শে আসুক এইটিই সকলের কাম্য।

যেমন সাধারণ স্তরে শিক্ষা বিস্তার, গ্রন্থাগারের উপরে অনেকাংশে নির্ভর করে। যেমনি উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার উন্নতির পথেও গ্রন্থাগারের দাম কম নয়। স্যার অশুতোষ মুখোপাধ্যায় চেয়েছিলেন যে আমাদের বাংলা দেশ জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলনে জগতের যে কোন উন্নত দেশের সমকক্ষ হোক্। একজন মানুষের পক্ষে যতখানি করা সম্ভব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে স্যার আশুতোষ জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচারের জন্য তা করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হয়তো আজ অনেকটা সাধিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের করণীয় আরো অনেক কিছু আজও বাকী রয়েছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার আমাদের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। এদিকে আজও আমরা বেশীদূর এগোতে পারিনি। বর্ত্তমানে মাতৃভাষার ভাণ্ডার কবিতা, গল্প, উপন্যাস এবং নাটকে পূর্ণ হয়েছে এ কথা সত্য; কিন্তু এই সম্ভার নিয়ে একটা ভাষা সমৃদ্ধ হয় না, জাতীয় জীবন সমৃদ্ধ হয় না। বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন প্রভৃতি বিষয়ে আজও আমাদের মাতৃভাষায় আমরা কখানাই বা গ্রন্থ দেখতে পাই? এ বিষয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের নিশ্চিতই কর্ত্তব্য আছে। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে মাতৃভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থের চাহিদা জাগিয়ে তুলতে পারলে লেখক ও শিক্ষিত সমাজে এমনি একটি প্রেরণা আসবে যে প্রেরণার তাগিদে অদূর ভবিষ্যতে মাতৃভাষায় নিশ্চয়ই বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ লেখা ও ছাপার ব্যবস্থা হবে।

পরিশেষে দু একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। গ্রন্থাগারের ক্রমোন্নতির মূলে যিনি প্রথম প্রেরণার উৎস সঞ্চারিত করবেন তিনি হলেন গ্রন্থাগারিক। তাই গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব অনেক। গ্রন্থাগারিক একাধারে শিক্ষক এবং পরিচালক। গ্রন্থাগারে যাঁরা পড়তে আসেন তাঁদের বই জোগানই শুধু গ্রন্থাগারিকের কাজ নয়, অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা কি বই পড়বেন সে বিষয়ে তাঁদের সাহায্য করা গ্রন্থাগারিকের অন্যতম কর্ত্তব্য। সুতরাং গ্রন্থাগারিকের ব্যক্তিগত শিক্ষাদীক্ষার মান হওয়া উচিত যথেষ্ট উঁচু। এবং সেই সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হওয়া উচিত উদার। সর্ব বিষয়েই তাঁর ঔৎসুক্য ও আগ্রহ থাকা চাই—কি বিজ্ঞান, কি সাহিত্য, কৃষ্টির সর্ব্বস্তরে আমরা আশা করব তাঁর সমদৃষ্টি। এখানে পক্ষপাতিত্বের কোন স্থান নেই। সব চাইতে বড় কথা—গ্রন্থাগারিককে হতে হবে ধৈর্য্য ও সহানুভূতিশীল। তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের ফলে পাঠকেরা অধিক সংখ্যায় গ্রন্থাগারের দিকে আকৃষ্ট হবে এবং তখনই হবে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সাধিত। যে গ্রন্থাগারিকের মধ্যে এই সহানুভূতির ও উদারতার অভাব দেখা যায়, সেই গ্রন্থাগার বহিদৃষ্টিতে যতই চকচকে, ঝকঝকে হোক না কেন, বা সেই গ্রন্থাগারে বইএর সংখ্যা যতই বেশী হোক না কেন, সহানুভূতিহীন গ্রন্থাগারিকের বিরাট গ্রন্থাগার কেবল ব্যর্থতার হাহাকার নিয়ে পড়ে থাকবে। গ্রন্থাগারিকই হলেন গ্রন্থাগারের মধ্যমণি—সুতরাং আমাদের চাই সত্যকারের গ্রন্থাগারিক যিনি আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে গ্রন্থাগারের দিকে আকৃষ্ট করতে পারবেন।

আজ এই গ্রন্থাগার দিবসে গ্রন্থাগার আন্দোলনের তাৎপর্য্য সম্পর্কে সকলেরই অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করুক, নতুন নতুন গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা হোক, যে গ্রন্থাগারগুলি বর্তমানে বিদ্যমান সেগুলিতে মহিলা বিভাগ, শিশু বিভাগ ইত্যাদি সংযোজিত করা হোক। আরো বেশী সংখ্যক পাঠকের আগমনে গ্রন্থাগারগুলি উন্নতি ও সার্থকতার পথে এগিয়ে চলুক, শিক্ষা দীক্ষা প্রচারের পথে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে আমরা সমগ্র জাতিকে নিয়ে যাই আলোকের পথে, উন্নতির, শিল্প সাহিত্য ও সমৃদ্ধির পথে - সর্বোপরি গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনমত জাগ্রত হোক, গ্রন্থাগারের প্রসার হোক—গ্রন্থাগার দিবসের এইটিই প্রধান বার্তা, এইটিই শপথ বাক্য, গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্যও হোলো এই।

গ্রন্থাগারের সংরক্ষণাগার

অরবিন্দ ভূষণ সেনগুপ্ত

অনেকের ধারণা গ্রন্থাগারে বই আসার পর তাকে পরিগ্রহণ, তালিকাকরণ ক'রে সেলফে স্থানান্তরিত করলেই তার সম্বন্ধে ভবিষ্যতে করণীয় আর কিছুই থাকেনা। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো। কারণ বই সেলফে পৌঁছানোর পরই তা গ্রন্থাগারে জীবন্ত রূপ গ্রহণ করে। তাছাড়া গ্রন্থাগারের বইয়ের ব্যাপক ব্যবহারই গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ও পরিচালনা সার্থক ক'রে তোলে। গ্রন্থাগারের পাঠকদের বই পরিবেশন—তা মূলতঃ সংরক্ষণাগারের (Stack Room) কাজের উপরই নির্ভরশীল।

অন্যভাবে ব'লতে গেলে এই সংরক্ষণাগারই বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে বই, পত্রিকা, খবরের কাগজ, মাইক্রোফিল্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য নথিপত্র সংরক্ষণের ধারক ও বাহক। বইয়ের নিরাপত্তা বজায় রেখে সর্বাধিক উপায়ে তার ব্যাপক ব্যবহারের নিশ্চয়তা দানই সংরক্ষণাগারের কর্মিবৃন্দের কাজ। তাঁদের সব সময় বইয়ের অবয়ব ও এদের ধারাবাহিক বিন্যাসের প্রতি সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সংরক্ষণাগার তাই শুধু মুদ্রিত বস্তু সংরক্ষণের কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার নয়—ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী। ইহার পরিচালনা এমনই হওয়া প্রয়োজন যা'তে বই অনায়াসে এবং শীঘ্র পাঠকগণ পেতে পারে।

বর্তমান গ্রন্থাগার পরিকল্পনার প্রবণতা হচ্ছে যে পাঠকবর্গকে বই ভর্তি আলমারি থেকে দূরে সরিয়ে না রেখে যাতে তারা সরাসরি নিজেরাই প্রয়োজনীয় বই তুলে নিতে পারে তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু এই প্রথা প্রবর্তনের গতি অতি মন্থর। কারণ অনেক সময় গ্রন্থাগারের স্থায়ী কাঠামো এই প্রথা প্রবর্তনের প্রতিকূল হ'য়ে দাঁড়ায়। সুতরাং বড় বড় গ্রন্থাগারে সব সময়ই অধিক সংখ্যক বই সুচারুরূপে একস্থানে সংরক্ষণের জন্য সুবৃহৎ স্থানের প্রয়োজন। এইসব ক্ষেত্রে সংরক্ষণাগারের কাজকর্ম একটি বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আলমারিতে বই ধারাবাহিক ভাবে সাজিয়ে রাখার যথেষ্ট মূল্য আছে। কেননা তাতে পাঠকবর্গ ও গ্রন্থাগারের কর্মিগণ অনায়াসে বই খুঁজে পায়। নিম্নোদ্ধৃত যে কোন একটা নীতির উপর নির্ভর করে বই সাজানো যেতে পারে :

(১) বিশেষ কোন বই বিশেষ কোন আলমারিতে স্থায়ীভাবে রাখা।

(২) কোন বর্গীকরণের নিয়মানুসারে কোন বইকে তার সম্পর্কীয় অন্যান্য বইয়ের সাথে আলমারিতে রাখা।

অবশ্য বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারেই কোন না কোন বর্গীকরণের নিয়মানুসারেই বই সাজানো হ'য়ে থাকে। বৃহৎ গ্রন্থাগারে অনেক সময় বড় আকারের বই, বাঁধানো খবরের কাগজ, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, মানচিত্র ও পুস্তিকা আলমারিতে সাজানো এক সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ায়। এ'সব ক্ষেত্রে প্রায়ই বর্গীকরণের নিয়ম রক্ষা করা সম্ভব হ'য়ে ওঠেনা, এবং এই সমস্ত বই স্থানান্তরে সাজানো হ'য়ে থাকে। কিন্তু এই বিন্যাসের প্রণালী যাই হোকনা কেন, সংরক্ষণাগার মাঝে মাঝে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। এতে বিন্যাসে কিছু কিছু ভুলচুক থাকলে তা ধরা পড়ে যায়। এই পর্যবেক্ষণের সাহায্যেই বই নির্ভুলভাবে সাজিয়ে রাখা যায়। কোন বই ভুল স্থানে সাজানো বা ভুল নম্বর লাগালে, তা প্রায় হারিয়ে যাবারই সামিল।

এই সেল্‌ফ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ঠিকভাবে ও তাড়াতাড়ি করতে হ'লে গ্রন্থাগারে যে বর্গীকরণের নিয়ম প্রচলিত, তা সর্ব্বশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক বইয়ের বিশেষ একটি ডাকসংখ্যা (Call No) আছে। যে নাম অন্যান্য গ্রন্থ হ'তে বইটির পৃথক অস্তিত্ব নির্দেশ করে। সংরক্ষণাগার পর্যবেক্ষণ দ্বারা সংরক্ষিত গ্রন্থ সমূহকে ব্যবহারোপযোগী ক'রে তোলা সংরক্ষণাগারের মুখ্য কাজ।

বৃহৎ গ্রন্থাগারে এই সংরক্ষণাগার সংগঠন এক দুরূহ কাজ। সংরক্ষণাগারকে মোটামুটি এইভাবে ভাগ করা যায় :

(১) পর্যবেক্ষণ বিভাগ,

(২) সরবরাহ বিভাগ ও

(৩) রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ।

সংরক্ষণাগারের প্রধান, সংগৃহীত পুস্তকের রক্ষণ, সরবরাহ ও সংগঠনের জন্য দায়ী থাকবেন। সংরক্ষণাগারের রক্ষণ, তদারক, নিয়মকানুন প্রবর্তন, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সংগ্রহকে অধিকতর কার্য্যকরী ক'রে তোলার সমস্ত

দায়িত্বই তাঁর। সংরক্ষণাগার পরিদর্শক ইত্যাদির ন্যায় দায়িত্বশীল কর্মচারিগণ অবশ্য এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করবেন। তাঁরা অধস্তন কর্মচারিগণের কাজকর্ম, শিক্ষা ও কর্তব্য বিষয়ক সমস্ত ব্যাপারে নির্দেশ দেবেন।

পরিচালনার কাজে দুজন কারণীক থাকা প্রয়োজন। তাঁরা বিভাগীয় কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ, কর্মচারিগণের চাকরী বিষয়ক নথিপত্র, পরিসংখ্যান সংকলন, ছুটির আবেদন পত্রের দেখাশুনা, কর্মচারিগণের নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রচার ও পত্র আদান প্রদান প্রভৃতি কাজকর্ম করবেন।

সরবরাহ বিভাগীয় কর্মচারিগণ বইএর লেনদেন করবেন। সংরক্ষণাগারের কোন কিছুর চাহিদা মেটানোই তাঁদের প্রাথমিক কাজ এবং এই কাজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেই পাঠকের বিভিন্ন রকমের চাহিদা বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে মেটাবে। কেননা কোন পাঠক হয়ত অনুরোধ পত্রে বইয়ের ডাক নাম লেখেনি বা ভুল ডাক নাম লিখেছে। কর্মরত ব্যক্তি তখন সম্ভব হ'লে বইয়ের তালিকা দেখে ডাকসংখ্যা বসিয়ে অথবা ডাকসংখ্যা শুদ্ধ ক'রে বই সরবরাহ করবে।

কর্মিগণ কে, কখন, কোথায় কাজ করবেন, তা নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়াই কর্মতালিকা (Duty Chart) প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য। বই সরবরাহের চাপ কোন সময় বেশী, কোথায় কোন বই আছে এবং সেই স্থানের আয়তন কত—এই সমস্ত বিষয় লক্ষ্য রেখেই কোন সময়, কোথায় কত কর্মী প্রয়োজন তা নিরূপণ করা হয়। কর্মতালিকা এমনভাবে প্রণয়ণ করা উচিত যাতে প্রত্যেক কর্মী—কে, কোথায় কর্মরত, কার কি কাজ, এ সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন থাকে। টিফিনের সময় যাতে সরবরাহে বিঘ্ন না ঘটে সে বিষয়ে কর্মতালিকা প্রণয়ণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে।

আলমারিতে বই পুনঃস্থাপন করা রক্ষণ বিভাগের কাজ। বই আলমারিতে সাজান একটি নিরবচ্ছিন্ন কাজ। আপাতঃ দৃষ্টিতে এটাকে খুব সহজ মনে হলেও, সংরক্ষণাগারে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। একটা বই তার নির্দিষ্ট স্থানে না রাখার মানেই হচ্ছে গ্রন্থাগার থেকে বইটা হারিয়ে যাওয়া। যে বই সেলফে তার নির্দিষ্ট স্থানে সাজানো হয়নি, গ্রন্থাগারের বিপুল পুস্তকরাশি থেকে তাকে খুঁজে বার করা খুবই মুস্কিল। নিত্যকর্মের ধারা মাফিক কোন একজন কর্মী একটা বিশেষ বিভাগের বই বিন্যাস বা পুর্ণবিন্যাসের জন্য দায়ী থাকবে। বই ফিরে এলে তার পরিবর্তে অনুরোধ পত্রের যে একাংশ ডামী (Dummy) হিসেবে বইটার পরিবর্তে সেলফে রাখা হয় সেটা বাতিল করতে

হবে। এই রক্ষণ বিভাগের কর্মিগণই সেল্‌ফ পর্যবেক্ষণ করার জন্য দায়ী থাকবেন। এটা বিশেষ অত্যাবশ্যকীয় কাজ। এই পর্যবেক্ষণের সাহায্যেই বই নির্ভুলভাবে সেল্‌ফে সাজিয়ে রাখা সম্ভব।

বই বাঁধাই বা মেরামতের প্রয়োজন হ'লে তা সেল্‌ফ থেকে সরিয়ে নিয়ে বাঁধাই বিভাগে (Binding Section) পাঠান হয়। বই বাঁধাই বিভাগে পাঠানোর আগে, বইয়ের নাম, ডাকসংখ্যা, সরিয়ে নেওয়ার তারিখ প্রভৃতি বিবরণ দিয়ে এবং "বই বাঁধাইখানায়" এই মন্তব্যটি লিখে সেখানে ডামী রাখা অবশ্য প্রয়োজন।

বইয়ের ভালমন্দ বেশীর ভাগ নির্ভর করে তার উপযুক্ত ব্যবহারের উপর। একটা সেল্‌ফের তিন—চতুর্থাংশ যখন ভর্তি হয়ে যায়, তখন তাকে পূর্ণ সেল্‌ফ ধরা হয়। নতুবা সেল্‌ফে সম্পূর্ণ বই ভর্তি করলে অতিরিক্ত ঘেঁষাঘেঁষির দরুণ বইয়ের উপর ক্ষতিকর চাপ পড়ে। আংশিক ভর্তি সেল্‌ফে বই বাঁদিকে ঠেসান (Book rest) দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। কাগজে বাঁধাই বই, পুস্তিকা, পত্রিকা ঠিকমত ঠেসান দিয়ে না রাখলে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে। বড় আকারের খবরের কাগজ, পত্রিকা প্রভৃতি সেল্‌ফে শুইয়ে রাখাই বাঞ্ছনীয়।

একটু বড় গ্রন্থাগারে বই ধুলো ময়লা থেকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এক বিশেষ সমস্যার ব্যাপার। এজন্য একদল সাফাই কর্মী থাকা প্রয়োজন। ঝাড়পোঁছ করার সরঞ্জাম প্রায় সব গ্রন্থাগারে একই রকম—ঝাড়ন, হাত-বুরুশ, বা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। এই সব সাফাই কর্মীর দৈনিক কাজ হবে ঝাড়ন বা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে সেল্‌ফ এবং বইয়ের আপাদমস্তক ডানদিক থেকে ঝেড়ে আবার তেমনি ভাবে সাজিয়ে রাখা।

মাঝে মাঝে সমস্ত বই পর্যবেক্ষণের জন্য তালিকা প্রণয়ণ প্রয়োজন। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হোল কি কি বই নিখোঁজ হয়েছে এবং কতদিন যাবৎ পাওয়া যাচ্ছে না, তা আবিস্কার করা। এই তালিকা প্রণয়ণ নিম্নলিখিত ভাবে হতে পারে :

(১) সেল্‌ফ লিষ্ট এর সাথে বই মিলিয়ে দেখা ও যে বই পাওয়া যাচ্ছেনা তা লিখে নেওয়া ;

(২) এই না-পাওয়া বইয়ের তালিকা ইস্যু রেজিষ্টার (Issue register) ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখা ;

(৩ মাঝে মাঝে না-পাওয়া বইগুলি খোঁজ করা,

(৪) গ্রন্থাগারের প্রয়োজন অনুসারে এই বইগুলি আবার পূরণ করা ; এবং

(৫) নিখোঁজ বইয়ের কার্ড তুলে নেওয়া বা বাতিল ক'রে দেওয়া।

বলা বাহুল্য এইভাবে মাঝে মাঝে পর্যবেক্ষণ করলে সন্তোষজনক ভাবে বই পরিবেশন করা যেতে পারে।

উপরিউক্ত ব্যাপার থেকে সংরক্ষণাগারের প্রকৃতি ও কার্যধারা এভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে :

(১) সংরক্ষণাগার পাঠকদের পরিবেশনের উপযোগী বর্গীকৃত গ্রন্থ সংগ্রহের ভাণ্ডার বিশেষ। এই সংগ্রহ স্বল্প ও বহু মূল্যের পুস্তক ও অন্যান্য বস্তুর সমষ্টি।

(২) এই সংগ্রহ সহজ বিনাশী বলে এর নানা পর্যায়ের সংরক্ষণ প্রয়োজন।

(৩ সংরক্ষণাগার ক্রমাগতই সম্প্রসারিত হচ্ছে। কাজেই এই সম্প্রসারণ এই পরিবর্তন যাতে সহজসাধ্য হয়, তার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(৪) কোন বর্গীকরণের নিয়ম অনুসারে সংরক্ষণাগারের বই ধারাবাহিক ভাবে সাজান থাকে। এতে পাঠকবর্গ অনায়াসে বই পেতে পারে।

(৫) বড় গ্রন্থাগারের সংরক্ষণাগারে যেখানে প্রধান সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে, সেখানে প্রবেশ অধিকার সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত এবং সেটা শুধু বইয়ের নিরাপত্তার জন্যই নয় বই যথাযথভাবে আলমারিতে সাজিয়ে রাখার জন্যও বটে।

সংরক্ষণাগারে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে বই বিন্যাসের সচেতনতা বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারেই নেই এবং সংরক্ষণাগারকে অনেক ক্ষেত্রে বইয়ের গুদাম ঘর হিসেবেই গণ্য করা হয়। অন্যদিকে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সংরক্ষণাগার সংগঠন করলে গ্রন্থাগারের নাম সার্থক হ'য়ে ওঠে। গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনায় এই দিকটা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত। বিশেষ করে ছোট ছোট গ্রন্থাগারে এই বিষয়টি সাধারণতঃ অবহেলিত হয়ে থাকে। গ্রন্থাগার সুন্দর বন্দোবস্তযুক্ত হলে ছোট ছোট গ্রন্থাগারের কর্মিগণ ও পাঠকবর্গকে সহজে এবং সত্বর বই সরবরাহ করতে পারে।

(ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরীয়ান পত্রিকার ১৯৫৬ সালের মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীঅনঙ্গ চন্দ্র দাশ)

গ্রন্থ সমালোচনা

ঝিল, দুই সৈনিক ও অন্যান্য গল্প ॥ অনুবাদক শ্রীগৌরচাঁদ চট্টোপাধ্যায় ॥ প্রকাশক—দি গ্রেটার ইণ্ডিয়া পাবলিশার্স ॥ কলিকাতা ॥ মূল্য ২.২৫ ॥

পাঁচ জন বিদেশী লেখকের গল্প—(১) ইনল্যাণ্ড, ওয়েস্টার্ণ সী (চলার পথে)—নাথান আশ, (২) দি পণ্ড (ঝিল)—লুই ব্রমফিল্ড, (৩) টু সোলজারস্ (দুই সৈনিক)—উইলিয়াম ফকনার, (৪) ফারমার ইন্ দি ডেল্ (ভুলের মাশুল)—এড্না ফারবার, ও (৫) এ নিউ ইংলণ্ড নান (ব্রতচারিণী) —মেরী ই উইলকিন্স্।

আধুনিক ইংরেজী সাহিত্য মৌলিক রচনা ও অনুবাদ-সাহিত্য লইয়া বর্তমান বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিকই বিশ্বজ্ঞান ভাণ্ডারের যাবতীয় সম্পদই ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে অত্যন্ত সহজ লভ্য। আমাদের আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে অনুবাদ-সাহিত্য একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। মাতৃ ভাষার মধ্য দিয়া বিশ্ব সাহিত্যের রূপ, রস ও গন্ধ পরিবেশন ও আস্বাদন সত্যই প্রশংসার্হ। কিন্তু এই পরিবেশন কার্য মোটেই একটা সহজ কাজ নহে। মৌলিক রচনার মূলরস অনুবাদের মধ্য দিয়া সঠিকভাবে পরিবেশন কার্য একনিষ্ঠ শিল্পীমন ও রুচিবোধের প্রয়োজন। এই শিল্পীমন ও রুচিবোধই সাহিত্য সৃষ্টির অমূল্য সম্পদ। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে কোন কোন গল্পের অনুবাদ এই শিল্প এবং রুচিবোধ নিঃসন্দেহে দাবি করিতে পারে।

গল্প সঞ্চয়নের প্রথম গল্পটির নামে গ্রন্থটি নামাংকিত হইতে পারে নাই—ইহার কারণ আমরা বুঝিলাম না। মোট পাঁচটি গল্পের মধ্যে 'ভুলের মাশুল' এবং 'ঝিল' গল্প দুইটি সত্যই অনবদ্য; এই ছোট গল্প দুইটির আবেদন প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকার মনকে নাড়া দিতে সক্ষম। ইহাদের অনুবাদ সাবলীল ও চমৎকার হইয়াছে। ইহা ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষা অনুবাদ গন্ধী হইলেও মোটের উপর রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

স্নেহ নীড় (The Gentle House by Anna Perrott Rose) ॥ অনুবাদক গৌরচাঁদ চট্টোপাধ্যায় ॥ প্রকাশক—দি গ্রেটার ইণ্ডিয়া পাবলিশার্স ॥ কলিকাতা ॥ মূল্য ২'৫০ ॥

অস্বাভাবিক পরিবেশ শিশুমনের স্বাভাবিক বিকাশের যে কতখানি অন্তরায়, এবং অসীম ধৈর্য, স্নেহ-মমতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগির অনুকূল অবস্থায় তাহা যে কি ভাবে সুস্থ এবং কল্যাণধর্মী হইয়া উঠে—আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠ করিলে তাহা সহজে বুঝা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমগ্র ইয়োরোপ একটা আতঙ্ককর অবস্থার মধ্য দিয়া কাটাইয়াছে। ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ শিশুমনে বিষময় ফল ফলিয়াছে। অনেকেরই স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হইয়া গিয়াছে। এ্যান্ড্রিসের জীবনেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ল্যাটভিয়ার অনাথ এবং উদ্বাস্তু শিশু এ্যান্ড্রিস এই গ্রন্থের নায়ক। আমেরিকার একটি মমতাময়ী শিক্ষয়িত্রীর অসীম ধৈর্য ও একটি পরিবারের আনুকূল্যে কি ভাবে এ্যান্ড্রিস সুস্থ, স্বাভাবিক ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

এদেশেও উদ্বাস্তু আছে এবং শিশুমনের অস্বাভাবিকতা আছে। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন দরদের। এই দরদ বোধ মানবিক বিকাশের অমোঘ অস্ত্র। এই পুস্তকখানি পাঠে ইহার একটি বাস্তব চিত্র পাওয়া যাইবে। ইহাছাড়া প্রত্যেক পিতামাতার এই বইখানি পড়া উচিত। প্রতিটি সন্তানই সমান পরিবেশ ও সুযোগ পায় না। অথচ তাহাদিকে শিক্ষাদান করিতে হইবে। কতখানি ধৈর্য, স্নেহ এবং কি প্রকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগি লইয়া এই শিক্ষাদান ও জীবনগঠন সহজ ও সম্ভব হইতে পারে তাহার নিশ্চিত নির্দেশ এই পুস্তকখানিতে পাওয়া যায়।

বাংলা দেশের ঘরে ঘরে এই বইখানির প্রচলন কামনা করি। ছাপা ও বাঁধাই সুরুচিসম্পন্ন।

নদীয়ার মহাজীবন—কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ প্রবর্তক পাবলিশার্স ॥ কলিকাতা-১২ ॥ মূল্য ১'৭৫ ।

গল্প বা উপন্যাসের মত জীবনী সাহিত্য বেশি লোকপ্রিয় নয়; কিন্তু যদি মামুলী পথ ছাড়িয়া একটা রসঘন পরিবেশের মধ্যে জীবনী সাহিত্য রচিত হয় তবে

তাহা অবশ্যই আগ্রহের বস্তু হইয়া উঠে। বিশাল বাংলা সাহিত্যে জীবনীর অভাব নাই, কিন্তু সাধারণের আগ্রহ সৃষ্টি করিবার মত খুব অল্পই আছে।

আলোচ্য পুস্তকখানি সেই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে মিটাইতে পারিবে সন্দেহ নাই। এই পুস্তকে নয় জনের কথা লেখা হইয়াছে—গৌরাঙ্গ দেব, তাঁহার প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মী দেবী, কৃত্তিবাস, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, মনমোহন ঘোষ, লালমোহন, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ও বাঘা যতীন।

আমরা আশা করি, লেখক তাঁহার সুনিপুণ লেখনী লইয়া বাংলার অন্যান্য জেলার 'মহাজীবন'-সম্বন্ধেও আলোচনা করিবেন। শুধু নদীয়ার নয়, 'বাংলার মহাজীবন'—এর সন্ধান পাইলে প্রতিটি লোক উপকৃত হইবে। কেন না, রসঘন অথচ প্রামাণ্য জীবনী-সাহিত্যের অভাব আছে।

কল্পিত গল্প বা উপন্যাস অপেক্ষা মহামানবের জীবন কথা ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জীবনগঠনে বাস্তব-প্রভাব প্রয়োগ করুক ইহাই সকলের কাম্য; পূর্বাচার্যগণের কর্মকীর্তি পরবর্তিগণের পাথেয় হইয়া উঠুক—এই গ্রন্থের দৃষ্টিভংগি জাতিগঠন কার্যে হিতকর। বইখানি প্রতি স্কুলে পাঠ্য হইবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করি। ছাপা ও বাঁধাই মন্দ নয়।

—কৃষ্ণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অর্ধ ভারত কথকতা—১ম পর্ব ॥ শ্রীকথকঠাকুর ॥ বিদ্যোদয় লাইব্রেরী ॥ কলিকাতা-৯ ॥ ১৯৫৭ ॥ ১৪০ পৃঃ ॥ মূল্য ২.২৫ ॥

ছোটদের উপযোগী আটটি গল্পের সংকলন। গল্পগুলির অধিকাংশ জাতক থেকে গৃহীত হয়েছে, বাকিগুলির একটি অসমীয়া আদিবাসীদের ও একটি বাংলার উপকথা; এবং রেভারেন্ড লালবিহারী দে'র 'ফোক্ টেল্‌স অব বেঙ্গল থেকে একটি নেওয়া হয়েছে। লেখকের কথায় 'সংক্ষিপ্ত মূল গল্পের কঙ্কালে রক্ত মাংস মজ্জা যোজনা করা হয়েছে।' উপাদানের দিক থেকে গল্পগুলির সবকটিই উৎকৃষ্ট এবং লেখার ভাষা ও ভংগীর দিক থেকে বইটি সুখপাঠ্য—ছোট বড় সকলের কাছেই সমাদৃত হবে। প্রতিটি গল্পের সঙ্গে ছবি থাকায় এবং সুন্দর মুদ্রণ ও প্রচ্ছদের জন্যে বইটি আকর্ষণীয় হয়েছে।

॥ গ্রন্থাগার দিবস ১৯৫৭ ॥

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও প্রকাশকগণ আমাদের প্রদর্শনী আয়োজনে সহযোগিতা করায় তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি :

॥ ক ॥ প্রকাশক

আর্ট এণ্ড লেটার্স
ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
ইণ্ডিয়ানা
এশিয়া পাবলিশিং কোং
ক্যালকাটা বুক ক্লাব
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
ছাত্র শিক্ষা নিকেতন
জিজ্ঞাসা
ঢাকা জেলা স্বাধীনতা সংগ্রাম
ইতিহাস প্রনয়ন সমিতি
নতুন সাহিত্য ভবন
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
বিদ্যোদয় লাইব্রেরী
বিশ্বভারতী
বুক ল্যাণ্ড
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স
বেঙ্গল পাবলিশার্স
ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স
ভারতী লাইব্রেরী
মিত্র এণ্ড ঘোষ
মিত্রালয়
রীডার্স কর্ণার
শরৎ বুক হাউস
শরৎ পুস্তকালয়
শান্তি লাইব্রেরী
সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি
সাধারণ পাবলিশার্স
সারস্বত লাইব্রেরী

॥ খ ॥ গ্রন্থাগার

অঘোর কামিনী গ্রন্থালয়
ইণ্টালী ইনষ্টিটিউট
কসবা মনি পাঠাগার
কিশোর গ্রন্থালয়
কিশোর মহল
গোপালনগর কে, এম
এ্যাথলেটিক ক্লাব এণ্ড লাইব্রেরী
দক্ষিণ কলিকাতা তরুণ সমিতি
নজরুল পাঠাগার

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী
বালিগঞ্জ ইনষ্টিটিউট
বেলেঘাটা ছাত্র সংসদ
বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি
রাখী সংঘ পাঠাগার
শান্তি ইনষ্টিটিউট
শৈলেশ্বর লাইব্রেরী
সুবারবন রিডিং ক্লাব
হাওড়া জেলা পাঠাগার সংঘ

॥ গ ॥ প্রতিষ্ঠান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
(সমাজ শিক্ষা বিভাগ)
বাইওয়ার্স কর্ণার
মুকট্রাকো এণ্ড এজেন্সী

॥ ঘ ॥ বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান

ইউনাইটেড ষ্টেটস
ইনফরমেশন সার্ভিস
ইউ এস এস আর
ইনফরমেশন অফিস
জার্মাণ গণতান্ত্রিক রিপাবলিক
ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস
ব্রিটিশ কাউন্সিল

॥ ঙ ॥ ব্যক্তি

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
শ্রীরমনীরঞ্জন চক্রবর্তী
শ্রীবিনোদকিশোর গোস্বামী
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ জানা
শ্রীসুনীল পাল (শিল্পী)

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার দিবস

উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং অনুষ্ঠানের ব্যাপকতায় এবছরের 'গ্রন্থাগার দিবস' গ্রন্থাগার অনুরাগীদের মনে আশার সঞ্চার করেছে। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন যে উত্তরোত্তর গতি সঞ্চয় করে চলেছে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা যে ধীরে ধীরে ব্যাপকতর জনসমর্থন লাভ করছে—সমগ্র অনুষ্ঠানটির মধ্যে তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা। তার বর্তমান কর্মশক্তি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা মূলতঃ নিহিত রয়েছে রাজ্যের ছোট-বড়ো আড়াই হাজার গ্রন্থাগারের মধ্যে। এই গ্রন্থাগারগুলোর শক্তি যতই সুসংহত হয়ে উঠবে, রাজ্যের সামগ্রিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের পক্ষে ততই মঙ্গল।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও পরিষদ তার প্রতিষ্ঠা-দিবসটিকে গ্রন্থাগার দিবসের স্মরণীয় মর্যাদায় উদ্‌যাপিত করবার জন্যে রাজ্যের সকল গ্রন্থাগার-গুলোকে আহ্বান জানিয়েছিল, এবং অনুষ্ঠানের একটি খসড়া কার্যসূচীও সেই সঙ্গে প্রেরণ করেছিল। গ্রন্থাগারগুলোর কাছ থেকে এ পর্যন্ত যে-সকল বিবরণ পাওয়া গিয়েছে তা থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে—পরিষদের আহ্বানের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের দূর পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারগুলোও যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যে কার্যসূচী পালনের নির্দেশ পরিষদের পক্ষ' থেকে প্রচারিত হয়েছিল--- তা গ্রন্থাগারগুলো পূর্ণ নিষ্ঠাসহকারে যথাসাধ্য অনুসরণ করেছেন; পরিষদ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় কোনও খসড়া প্রস্তাব প্রেরণ না করলেও গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বহু জনসভায় স্থানীয় গ্রন্থাগার সমস্যা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এতদসম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এ সকল বিবরণ থেকে পরিষদের সঙ্গে গ্রন্থাগারগুলোর সম্পর্ক যে ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে—একথা সুস্পষ্ট।

'গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে পরিষদের উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট হলে একটি কেন্দ্রীয় জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীনির্মল কুমার সিদ্ধান্ত, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্ত কুমার বসু, হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুধাংশু কুমার বসু প্রমুখ শিক্ষাবিদ্‌গণ দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। ভারত সরকার গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্পর্কে সম্প্রতি যে উপদেষ্টা সংসদ (Advisory Committee for Libraries) স্থাপন করেছেন তাকে অভিনন্দন জানিয়ে, এবং 'এই সংসদ সুষ্ঠু ও জনসাধারণের কাম্যপথে এদেশে সার্বজনীন নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার পক্ষে ভারত সরকারকে যথাযথ পরামর্শ দিবেন—এই আশা পোষণ' ক'রে এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

গ্রন্থাগার দিবস' উপলক্ষে সিনেট হলে অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী গ্রন্থাগার প্রদর্শনী ব্যাপকতায় এবং বস্তু সম্ভারের আয়োজনে পূর্ব-বৎসরের প্রদর্শনীকে বহুদূর অতিক্রম করে গিয়েছে। প্রতি সন্ধ্যায় অগণিত দর্শক সমাগম এবং শিশু বিভাগে সমবেত আনন্দমুখর হাস্যচঞ্চল পরিবেশ পরিষদের কর্মীগণের প্রচেষ্টাকে গভীরভাবে অভিনন্দিত করেছে।

এবারের 'গ্রন্থাগার দিবস' উদ্‌যাপনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তার জীবনের ৩২ বৎসর অতিক্রম করে ৩৩ তম বৎসরে পদার্পণ করল। ১৯২৫ সালে যে প্রতিষ্ঠান ছিল সদ্যোজাত শিশুর মত দুর্বল, অসহায়, আজ সে-প্রতিষ্ঠান বহু জনের বহু শ্রমের ফল লাভ করে তার কৈশোর অতিক্রম করে, কর্মচঞ্চল যৌবনের পথে এগিয়ে চলেছে। প্রতি বৎসরের ন্যায় এবৎসরও তাই সে তার জন্ম তিথি পালনকে উপলক্ষ করে বাংলা দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি অনুরাগী প্রতিটি মানুষের কাছে তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং সক্রিয় সহযোগিতা লাভের আবেদন পৌঁছে দিল।

গ্রন্থাগার

৭ম বর্ষ]   মাঘ : ১৩৬৪   [১০ম সংখ্যা

পল্লী-অঞ্চলে গ্রন্থাগারের সুযোগ-সুবিধা

মন্মথনাথ রায়

সহকারী মুখ্য সমাজশিক্ষা আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ-সরকার

আমাদের পল্লী-অঞ্চলে যে ক'জন লেখাপড়া-জানা লোক বাস করে তাদের প্রায় সকলেই সামান্য লেখাপড়া জানে। তারা পাঠশালার পড়া শেষ ক'রেই কৃষি, কুটিরশিল্প প্রভৃতি নানা কাজে নিয়োজিত হয়েছে। অধিকতর শিক্ষালাভ করার সাধ হয়তো অনেকের ছিল, কিন্তু সাধ্য আর সুযোগ ছিল না ব'লে তারা লেখাপড়া শেষ করেছে পাঠশালায়। এই স্বল্পশিক্ষিত পল্লীবাসীরা বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করার পর যদি আর লেখাপড়ার চর্চা না করে, তা হ'লে তারা বিদ্যালয়ে যা শিখেছে তা ধীরে ধীরে ভুলে যায়। তাদের অর্জিত বিদ্যা প্রায় লোপ পেয়ে যায়। পল্লী-অঞ্চলে যদি গ্রন্থাগার থাকে তবে ঐ ধরনের স্বল্পশিক্ষিত লোকেরা অবসর সময়ে লেখাপড়ার চর্চা করতে পারে। তাতে তাদের অর্জিত বিদ্যার সংরক্ষণ ত হয়ই, সংগে সংগে পরিবর্ধনও হয়। তা ছাড়া যে অবসর-সময়টা সাধারণ গ্রামবাসীরা পরনিন্দা-পরচর্চায় নষ্ট করে, সে সময়টা তারা বই প'ড়ে নির্দোষ আনন্দে কাটাতে পারে। কখনও কখনও নিজেদের দৈনন্দিন জীবিকার গরজে তাদের কৃষি, কুটিরশিল্প প্রভৃতি ব্যাপারে নতুন নতুন তথ্য জানতে হয়। গ্রামে গ্রন্থাগার থাকলে সেখানকার বই প'ড়ে তারা সে সকল তথ্য অতি সহজে জানতে পারে। পল্লী-অঞ্চলে যে সকল ছাত্র লেখাপড়া করে তারাও গ্রন্থাগারের বই প'ড়ে বিদ্যালয়ের বাইরে আনন্দ এবং অধিকতর জ্ঞানলাভ করতে পারে।

আমাদের পল্লী-অঞ্চলে অনেক দিন ধ'রেই কিছুসংখ্যক গ্রন্থাগার ছিল। গ্রামের উৎসাহী ব্যক্তিদের চেষ্টায় বা সদাশয় ধনী ব্যক্তিদের বদান্যতায় এ সকল গ্রন্থাগার গ'ড়ে উঠেছিল। কোন-কোনটির সংরক্ষণ ও পরিচালন ব্যবস্থাও বেশ

ভাল ছিল। চব্বিশ-পরগনা জেলার মথুরাপুরে, হাওড়া জেলার মাজুতে, হুগলি জেলার রাজবলহাটে, বর্ধমান জেলার জাড়গ্রামে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলায় এ ধরনের বেশ ভাল গ্রন্থাগার ছিল এবং আছে। বাইরে থেকে কোন প্রকারের সাহায্য না নিয়েও এ সকল পল্লী-গ্রন্থাগার পল্লীর পাঠক-সাধারণের চাহিদা মেটাবার সকল চেষ্টা করেছে। অবশ্য এ ধরনের গ্রন্থাগারের সংখ্যা যা ছিল, প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্ত কম। এ ধরনের ভাল গ্রন্থাগার ছাড়াও পল্লী-অঞ্চলে এখানে-সেখানে কিছু সংখ্যক ছোটখাট গ্রন্থাগার ছিল। অর্থ এবং উৎসাহী লোকের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই এ সকল গ্রন্থাগার ভালভাবে কাজ করতে পারে নি। তৎকালীন বিদেশী সরকার আমাদের গ্রন্থাগারগুলির প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়েছে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলিকে বিপ্লবীদের আস্তানা মনে ক'রে পরোক্ষভাবে সেগুলিকে তারা ধ্বংসও ক'রে দিয়েছে। যেগুলি ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে সেগুলিও নিজেদের দৈন্য এবং সরকারী ঔদাসীন্যের ফলে ভালভাবে কাজ করার সুযোগ পায় নি।

স্বাধীনতালাভের পর আমাদের দেশের সরকার এদিকে মনোযোগ দিয়েছে। দেশের সর্বত্র পাঠক-সাধারণ যাতে গ্রন্থাগারের সুযোগসুবিধা পেতে পাবে সেজন্য পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে এবং সে পরিকল্পনা অনুসারে ব্যাপকভাবে কাজও চলেছে। ফলে আজ দেশের সর্বত্র, কি শহরে, কি পল্লী-অঞ্চলে, একদিকে যেমন পুরনো গ্রন্থাগারগুলি নবীন উৎসাহে কাজ আরম্ভ করেছে, অপরদিকে এখানে-সেখানে নতুন নতুন গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। দেশ স্বাধীন হবার আগে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পল্লী-অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ন্যূনাধিক ছ' শ'। আজ সেই সংখ্যা হয়েছে ন' শ'। এই ন' শ' গ্রন্থাগারের মোট গ্রন্থসংখ্যা হবে প্রায় বারো লক্ষ আর পাঠকসংখ্যা হবে প্রায় দু' লক্ষ।

বিভিন্নভাবে সরকার আজ দেশের গ্রন্থাগারগুলিকে সাহায্য করছে। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রন্থ এবং আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। এই সাহায্যের পরিমাণ বছরে দু' শ' টাকা থেকে ছ' শ' টাকা। সাহায্যপ্রার্থী গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা অন্যূন পাঁচ শ', সদস্যসংখ্যা অন্যূন পঞ্চাশ এবং বার্ষিক আয়-ব্যয় অন্যূন তিন শ' টাকা হওয়া চাই। এ সাহায্যের সুযোগ শহর এবং পল্লী অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলি পাচ্ছে সমানভাবে। এখন পল্লী-অঞ্চলের প্রায় পাঁচ শ' সাধারণ গ্রন্থাগার এ ধরণের সাহায্য পায়।

বয়স্কশিক্ষার জন্য সারা পশ্চিমবঙ্গে দু' হাজারের অধিক বয়স্কশিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলির অধিকাংশই রয়েছে পল্লী-অঞ্চলে। এইসকল কেন্দ্রে যারা লিখতে পড়তে শেখে তাদের আরও লেখাপড়ার সুযোগ দেবার জন্য নির্বাচিত কয়েকটি কেন্দ্রে গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে। এগুলিকে বলা হয় গ্রন্থাগারকেন্দ্র। প্রত্যেক গ্রন্থাগারকেন্দ্র সরকারী সাহায্য পায় বছরে তিন শ' টাকা করে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পল্লী-অঞ্চলে এ ধরণের গ্রন্থাগার কেন্দ্র রয়েছে প্রায় ছ'শ'।

অপর একটি পরিকল্পনা অনুসারে চব্বিশপরগনা, বর্ধমান এবং মেদিনীপুর জেলায় দুটি করে এবং অন্যান্য জেলায় একটি করে জেলা-গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে। চব্বিশ পরগনার জেলা গ্রন্থাগারগুলি ছাড়া অন্য জেলা গ্রন্থাগারগুলি শহরে অবস্থিত। যে অঞ্চলেই অবস্থিত হোক না কেন, পল্লী-অঞ্চলের গ্রন্থাগার গুলির সুবিধাবিধান জেলা গ্রন্থাগারের অন্যতম কাজ। অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে জেলা-গ্রন্থাগারগুলির একটি ভ্রাম্যমাণ বিভাগ আছে। এই ভ্রাম্যমাণ বিভাগের একটি ক'রে গ্রন্থযান আছে। জেলাগ্রন্থাগার এই গ্রন্থযানের সাহায্যে পল্লী অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রন্থ ধার দেয়। পল্লী-অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলি সে গ্রন্থ নিজেদের সভ্যদের ধার দেয়। নির্দিষ্ট সময়ের পর জেলাগ্রন্থাগারের গ্রন্থ-যান আগের ধার দেওয়া বইগুলি ফেরত নিয়ে যায় এবং নতুন বই ধার দিয়ে যায়। যেখানে যান-বাহন চলাচলের সুবিধা নেই, সেখানে লোক মারফৎ বাক্স ক'রে বই পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে জেলা-গ্রন্থাগার থেকে বই ধার পেয়ে পল্লী-অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলি নিজেদের কাজের পরিধি বাড়াবার সুযোগ পায়। প্রত্যেকটি জেলাগ্রন্থাগার স্থাপনের সময় গৃহনির্মাণের এবং গ্রন্থ ও আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য সরকারী তহবিল হতে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রত্যেকটির পরিচালন-ব্যয় বছরে পনের হাজার টাকা। এ ব্যয়ও সরকারী তহবিল হ'তে মেটানো হয়।

আগেই বলেছি চব্বিশপরগনা জেলাগ্রন্থাগারগুলি স্থাপন করা হয়েছে পল্লী-অঞ্চলে। একটি হয়েছে বিদ্যানগরে, অপরটি রহড়ায়। এই দুটি জেলাগ্রন্থাগারের সকল রকমের সুযোগসুবিধাই পাচ্ছে পল্লী অঞ্চল। নবনির্মিত সুদৃশ্য এবং সুপরিকল্পিত একটি গৃহে রহড়া জেলাগ্রন্থাগারের কাজ চলছে। এ গ্রন্থাগারটির পরিচালনভার গ্রহণ করেছেন ভারতীয় রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোমের

কর্তৃপক্ষ। সুষ্ঠু এবং সুশৃংখলভাবে কার্য পরিচালনা করার জন্য এই গ্রন্থাগারটি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে।

আর-একটি পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৫৬ ৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পল্লী-অঞ্চলে মোট ১৩০টি গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে। এগুলিকে বলা হয়েছে পল্লী-গ্রন্থাগার। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি পুরনো গ্রন্থাগারকে পল্লী-গ্রন্থাগারে পরিণত করা হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও নতুন ক'রে পল্লী-গ্রন্থাগার গ'ড়ে তোলা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক থানায় একটি ক'রে পল্লী-গ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে। এই পল্লী-গ্রন্থাগারকে জেলাগ্রন্থাগার গ্রন্থ-ঋণ দেয়। পল্লী গ্রন্থাগার ধারে-পাওয়া এই গ্রন্থগুলি এবং নিজস্ব গ্রন্থগুলি হ'তে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গ্রন্থাগারকে গ্রন্থ ধার দেয়। পল্লী-গ্রন্থাগার আপন এলাকার অন্যান্য গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটা যোগসূত্র রক্ষা করে এবং তাদের সংগঠন এবং পরিচালন ব্যাপারে পরামর্শ দান করে। প্রত্যেকটি পল্লী-গ্রন্থাগারকে সূচনায় গৃহনির্মাণ বা সংস্কারের জন্য তিন হাজার টাকা, আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ছ' শ' টাকা এবং গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য চার শ' টাকা সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। পল্লী-গ্রন্থাগারে একজন বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ও একজন সাইকেল-পিয়ন আছে। এদের বেতন সরকারী সাহায্য থেকে দেওয়া হয়। এ ছাড়া নৈমিত্তিক ব্যয় মেটাবার জন্য প্রত্যেকটি পল্লী-গ্রন্থাগার মাসে পঞ্চাশ টাকা ক'রে সরকারী সাহায্য পায়। চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত এবং দার্জিলিঙ জেলার কালিম্পঙের দু'টি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ব্যাপক এবং নিবিড়ভাবে গ্রন্থাগারের সুযোগ-সুবিধা দেবার জন্য কতকগুলি গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে। গ্রামের কয়েকটি গ্রন্থাগারকে সাহায্য করার জন্য রয়েছে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার আর কয়েকটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগারকে সাহায্য করার জন্য রয়েছে—দু'টি অঞ্চলে দু'টি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করে সরকার। আঞ্চলিক এবং গ্রাম গ্রন্থাগারগুলি তাদের নিজ নিজ ব্যয় মেটাবার জন্য পায় নির্দিষ্ট নিয়মে সরকারী সাহায্য। চব্বিশ পরগণা জেলার সরিষায়, বর্ধমান জেলার কলানবগ্রামে এবং বীরভূমের শ্রীনিকেতনেও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার রয়েছে। এগুলি তাদের এলাকায় গ্রাম গ্রন্থাগারগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করে। কিন্তু এগুলিকে সাহায্য করার মত সে অঞ্চলে কোন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার নেই।

কলকাতার উপকণ্ঠে একটি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন করা হচ্ছে। এর নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে। শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হবে। এ কেন্দ্রীয়

গ্রন্থাগারের কার্যপ্রণালী এখনও সম্পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট হয় নি. তবে জেলা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে পল্লী-অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলি যে এই রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে নানাভাবে সাহায্য পাবে এটা মোটামুটি বলা যেতে পারে।

আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলিকে কার্যকরীভাবে শিক্ষাপ্রসারের কাজে লাগাবার জন্য কয়েকটি পরিকল্পনা অনুসারেই কাজ হচ্ছে। এ পরিকল্পনাগুলি পরস্পরবিরোধী নয় বরং একটি আর একটির পরিপূরক। বিভিন্ন ব্যবস্থার ফলে আজ দেশের দূরতম পল্লী-অঞ্চলেও গ্রন্থাগারগুলি কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে। পল্লীর মনোরম পরিবেশের মধ্যে এই ছোট-বড় নানা ধরনের গ্রন্থাগারের কর্মচাঞ্চল্য সকলের মনেই আজ আনন্দের সঞ্চার করছে।

[সাপ্তাহিক কথাবার্তা পত্রিকা হইতে মুদ্রিত]

গ্রন্থবিদ্যা

॥ ৪ ॥

আদিত্য ওহদেদার

ছাপাইয়ের ইতিহাস

কাগজের বৃত্তান্ত জানবার পর আমাদের ঔৎসুক্য জাগে, কী করে এই কাগজের ওপর ছাপা হয়। যে ভাষাতেই ছাপা হোক না, ছাপার কাজটা দাঁড়িয়ে আছে লিপি ও বর্ণমালার ওপর। মানুষ আগে মনের ভাব আঁচড় কেটে প্রকাশ করতে শিখেছে তারপর সেই সব আঁচড়গুলি ক্রমশঃ পরিণত হয়ে স্থায়ী নির্দিষ্ট বর্ণমালার সৃষ্টি করেছে। ছাপার কাজের আলোচনা প্রসঙ্গে লিপি ও বর্ণমালার ইতিহাস কিছু জানা তাই প্রয়োজন।

লিপি ও বর্ণমালার ইতিহাস

আমরা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি কথায়। এই কথাকে যখন সংকেতের দ্বারা পাকাপাকিভাবে চিহ্নিত করতে পারি তখনি তা হয় লিপি। বৈজ্ঞানিকরা বলেন লিপির আবিষ্কার হয়েছে মাত্র পাঁচ ছ' হাজার বছর হল। পূর্ণাঙ্গ আক্ষরিক লিপির আবিষ্কার তো আরও পরে।

লিপি হল স্মৃতি সহায়ক। তা ছাড়া মানুষ নিজে না গিয়েও নিজের মুখের কথাকে অন্যত্র প্রেরণ করতে পারে লিপির সাহায্যে। লিপির আদিম কৌশল জানা যায় পেরুভিয়া, পলিনেসিয়া ও ভারতবর্ষের আসাম, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীরা যেভাবে নিজেদের মনের কথা অন্যত্র প্রেরণ করে। এরা দড়িতে গিঁট বেঁধে কিম্বা লাঠির গায়ে দাগ কেটে লোক মারফৎ তা যথাস্থানে পাঠিয়ে দেয়। দড়ির গিঁট ও লাঠির দাগই হল এখানে লিপি।

চিত্র-লিপি—এর পরের ধাপ হল ছবিকে লিপিরূপে ব্যবহার করা। কতকগুলি ছবি একত্র করে মনের কোনো ভাব একটানা প্রকাশ করা হয়ে থাকে: একে বলে ভাবব্যঞ্জক-লিপি (Ideographic writing) বা চিত্র-লিপি (Picture writing)।

চিত্র-লিপির পরের অবস্থা পরিণতি পায় ধ্বনি-লিপিতে। আমরা যখন কথা বলি তখন উচ্চারিত শব্দগুলি নানা ধ্বনি-বৈচিত্র্য ঘটায়। এই ধ্বনিগুলিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে নিতে পারলে সেই চিহ্নগুলি সাজিয়ে মনের ভাব বোঝান যায়। এই রকম সংকেতের সাহায্যে যে লিপি আবিষ্কৃত হয় তারই নাম ধ্বনি-লিপি।

ধ্বনি লিপি দু'রকমের। প্রথম হল, যা অক্ষর অথবা শব্দাংশের (Syllable) প্রতীক; দ্বিতীয় যা বর্ণের প্রতীক। দ্বিতীয় ধ্বনি-লিপিতেই পাই প্রকৃত বর্ণমালা। লিপি শুধু অক্ষরের প্রতীক হলে অসুবিধে হয়। 'রাজা' কথাটি অক্ষরে সহজে ভাগ করা যায—রা-জা। কিন্তু 'রাষ্ট্র'কে ভাগ করা যায় কি? ধ্বনি লিপির প্রাথমিক অবস্থা তাই অক্ষর-প্রতীক, কিন্তু উন্নততর অবস্থা হল বর্ণ প্রতীক। কারণ বর্ণমালার এক একটি বর্ণ যতদূর সম্ভব একটি মাত্র বিশুদ্ধ ধ্বনিকে প্রকাশ করে।

তবে ধ্বনি-লিপি একেবারে সরাসরি চিত্রলিপির পরের অবস্থা নয়। এদের মাঝামাঝি একটা অবস্থা ছিল যেখানে লিপি ভাব ও ধ্বনি উভয়কেই প্রকাশ করত। এই মধ্যবর্তী লিপির পর্যায়ে পড়ে কিউনিফর্ম, হায়রোগ্লিফিক, হায়রোটিক ও ডিমোটিক লিপি।

কিউনিফর্ম (Cuneiform) লিপি—এ লিপির প্রচলন ছিল সুমের, মেসোপোটেমিয়া, ব্যাবিলন, আসিরিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশের প্রাচীন অধিবাসী-দের মধ্যে। এই লিপির নাম 'কিউনিফর্ম' দিয়েছেন বিখ্যাত লিপিবিদ টমাস

হাইড্। এ শব্দের উদ্ভব ল্যাটিন Cuneus থেকে যার অর্থ হল কীলক। নরম মাটির চাক্তিতে সরু কাঠির আগা দিয়ে ফুঁড়ে ফুঁড়ে লিখলে লিপিচিহ্ন গুলি কীলকের মতো দেখতে হয়, তাই এই নামকরণ। কিউনিফর্মের প্রাথমিক অবস্থা থেকে আসিরীয় কিউনিফর্ম উন্নততর অবস্থা। তবু এ লিপিতেও ৫৭০টি প্রতীক ব্যবহৃত হত। এ লিপির লিখন রীতি ছিল বাঁ দিক থেকে দক্ষিণে। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত এ লিপির চল ছিল।

হায়রোগ্লিফিক (Hieroglyphic) **লিপি**—এ লিপির আবিষ্কার হয় মিশরে। হায়রোগ্লিফিকের অর্থ হল 'পবিত্র লিপি'। মন্দির, কবর ও অন্যান্য পবিত্র ও পুণ্য স্থানে এ লিপির ব্যবহার হত। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ব্যঞ্জন-ধ্বনির জন্য প্রতীক ব্যবহার। কতকগুলি প্রতীক একটি ব্যঞ্জন-ধ্বনিকে প্রকাশ করত। কতকগুলি একাধিক ব্যঞ্জন ধ্বনির সমষ্টিকে।

হায়রোগ্লিফিক লিপি লেখা হত ডান দিক থেকে বামে। এ লিপির ইতিহাস মিশরেই সীমাবদ্ধ—জন্ম, প্রসার ও মৃত্যু, সবই ঘটে ঐ এক দেশে।

হায়রেটিক (Hieratic) ও (Demotic) **ডিমোটিক লিপি** এ দুটি লিপি হায়রোগ্লিফিকেরই অপভ্রংশ। হায়রোগ্লিফিক লিপি পবিত্র লিপি হবার ফলে এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল মন্দির ইত্যাদি পবিত্র স্থানে। এই সীমাবদ্ধ ব্যবহারের দরুণ এর সৌন্দর্যের প্রতি খুব দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে এ লিপির প্রতীকগুলি নানা সূক্ষ্ম রেখার বাহুল্যে জটিল হয়ে পড়ে। এ লিপি দ্রুততার কাজে অচল। সাধারণের উপযোগী, ব্যবসা বাণিজ্য, দেনা-পাওনার কাজ দ্রুত মেটাতে পারে এমন লিপির প্রয়োজন মেটাতেই হায়রেটিক ও ডিমোটিক লিপির উদ্ভব। হায়রেটিক তবু বহুলাংশে ধর্মযাজকদের মধ্যে ব্যবহৃত হত, ডিমোটিক কিন্তু ছিল প্রকৃত জনসাধারণের লিপি। এই জন্যে এ লিপি শক্তিশালী হয়ে হায়রেটিকের অপমৃত্যু ঘটায়। এ লিপির উদ্ভব হয় অনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে, এবং প্রচলন থাকে খৃষ্টাব্দ পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত।

সিন্ধু উপত্যকার লিপি—সিন্ধু উপত্যকায় যে প্রাচীন সভ্যতা বিস্তৃত ছিল, যাকে মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পার সভ্যতা বলা হয়, সেখানেও একপ্রকার লিপির প্রয়োজন ছিল যা চিত্র-লিপি ও ধ্বনি-লিপির মধ্যবর্তী। এ লিপির পাঠোদ্ধার অবশ্য এখনো হয় নি।

বর্ণমালার আবিষ্কার

কিউনিফর্ম, হায়রোগ্লিফিক, হায়রেটিক কিংবা ডিমোটিক, এরা সকলেই যদিও ধ্বনি লিপির পর্যায়ে উন্নত হয়েছিল, কিন্তু তবু এরা কেউই বর্ণমালার সৃষ্টি করে নি। বর্ণমালা-লিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল অন্যত্র—মিশরে নয়। মেসোপোটেমিয়াতেও নয়। আধুনিক গবেষণা মতে বর্ণমালার আদি জন্মভূমি হবার গৌরব অর্জন করেছে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন। সেমিটিক জাতির অবদান হল বর্ণমালা। অবশ্য এটা ঠিক যে এই আবিষ্কারের মূলে ছিল কিউনিফর্ম ও মিশরীয় লিপির প্রভাব ও অনুপ্রেরণা।

বর্ণমালার শাখা-প্রশাখা—প্রোটো-সেমিটিক বা আদি সেমিটিক বর্ণমালাই কালক্রমে শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে সারা পৃথিবীর বর্ণমালা সৃষ্টি করেছে।

ভারতীয় লিপি

ভারতবর্ষে যে সব লিপি প্রচলিত আছে তারা সকলেই প্রধানত ব্রাহ্মীলিপি থেকে উদ্ভূত। কিন্তু এই বর্ণমালা আবিষ্কারের ইতিহাসটি আজও রহস্যাবৃত রয়েছে। পন্ডিতগণ অনুমান করেন এ লিপি আরমিক অথবা কোনো সেমিটিক বর্ণমালা থেকে উৎপত্তি হয়েছে। অনেকে আবার মনে করেন এ বর্ণমালা ভারতবর্ষের মধ্যেই সৃষ্টি হয়, কোনো বাইরের প্রভাবে নয়।

প্রাচীন ভারতীয় লিপির আর এক নিদর্শন খরোষ্ঠী লিপি। এ লিপির ইতিহাস কিছুটা উদ্ধার করা গেছে। অশোকের অনুশাসনের একটি খরোষ্ঠী অনুবাদ ইন্দো-আফগান সীমান্তে অবস্থিত শাহবাজগরহি নামক স্থানে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ অনুবাদ লিপির কাল খৃঃ পূঃ ২৫১ অব্দে। এ লিপির লিখন-রীতি ছিল দক্ষিণ দিক থেকে বামে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর থেকে এ লিপির চলন এ দেশ থেকে উঠে যায়।

ভারতবর্ষে লিপির প্রাচীনত্ব কত দিনের? বৈদিক সাহিত্যে কোথাও লিপির উল্লেখ নেই। বৌদ্ধ সাহিত্যেই পাওয়া যায় লিপি সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর এক বৌদ্ধ গ্রন্থে অক্ষরিকা' নামে একটি ক্রীড়ার উল্লেখ আছে। এই ক্রীড়া হল বর্ণমালা সাহায্যে শব্দ রচনা করা। বৌদ্ধ জাতকে 'লেখ' ও 'লেখক' শব্দ বহু স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। 'ললিত বিস্তারে' উল্লেখ আছে যে বুদ্ধ বাল্যকালে লিপি অভ্যাস করেছিলেন। গোরখপুর জেলায় প্রাপ্ত সাগোরা তাম্রশাসনে ও মুদ্রায় ব্রাহ্মীলিপির যে সব নমুনা দেখা যায়, তাদের কাল হল খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী।

সুতরাং এই অনুমান করা হয় যে খৃঃ পূঃ পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে বর্ণমালা লিপি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল। অবশ্য লিপির ব্যবহার শুরু হয়েছিল নিশ্চয় আরো দু তিন শ' বছর আগে।

'ব্রাহ্মী' নামটি প্রচলিত হয় অনুমানিক খৃষ্টীয় তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শতাব্দীতে—অর্থাৎ এ লিপি আবিষ্কারের প্রায় এক হাজার বছর পরে। স্বয়ং ব্রহ্মা এ লিপি সৃষ্টি করেছেন, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে লোকে ব্রাহ্মী নামটি গ্রহণ করলো। তাঁরা ভুলে গেল এ লিপির আসল ইতিহাস।
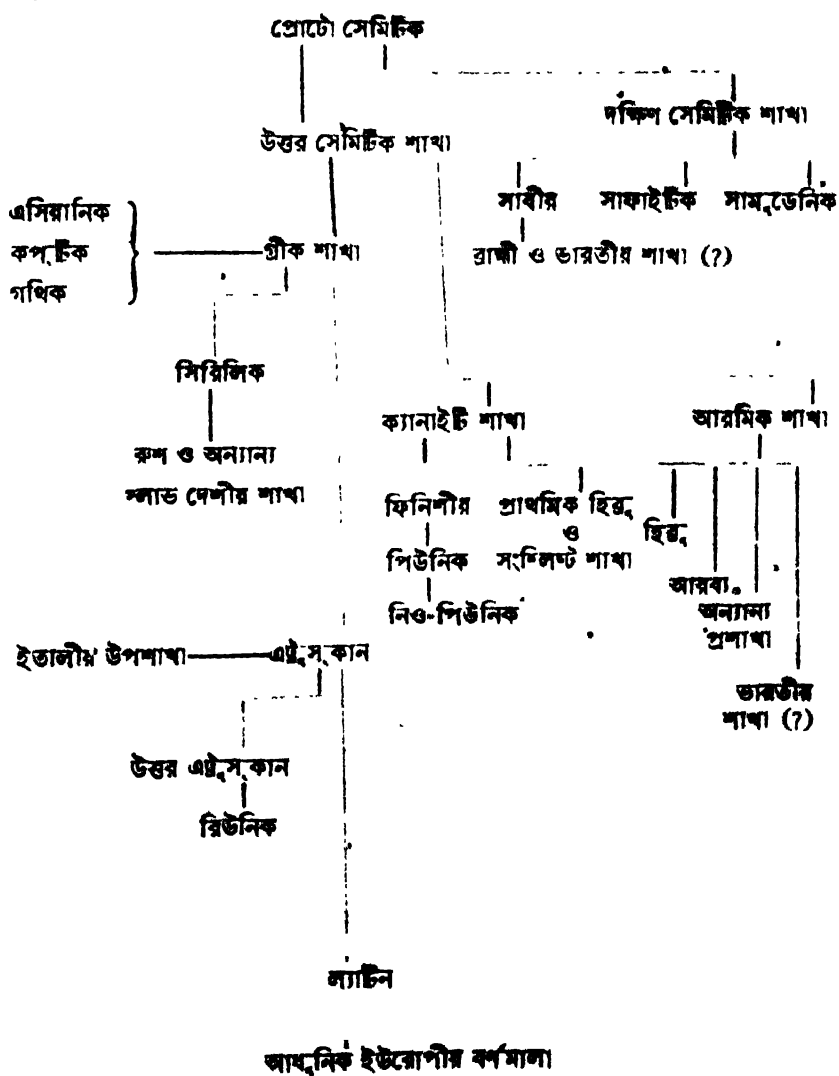
ছাপাইয়ের সূত্রপাত ও ব্লক বই

লিপি আবিষ্কার ক'রে মানুষ নিজের মনের ভাব লিপিবদ্ধ করতে লাগল। কিন্তু এখনো তার অভাব রইল। সে অভাব হল কোনো লিখিত বস্তুকে শীঘ্র ও সহজে বহু সংখ্যক করতে না পারা। একটি লিখিত বস্তুকে নকল করা সময় সাপেক্ষ, তার উপর ভুলভ্রান্তি, ত্রুটিবিচ্যুতি হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। অতি সাবধানী লিপিকারও ভুল-ত্রুটির হাত থেকে এড়াতে পারতেন না।

সুতরাং, লিপিকৌশল আয়ত্ত করার পর মানুষ চেয়েছে নিখুঁতরূপে একটি লিখিত বস্তুকে বহুসংখ্যা করার কৌশল আবিষ্কার করতে। এই ইচ্ছার বশেই মানুষ আবিষ্কার করেছে ছাপার কৌশল।

কিন্তু এ কৌশল হঠাৎ আবিষ্কৃত হয় নি। কাগজের মতো ছাপাই-এরও একটা পেছনের ইতিহাস আছে।

ছাপাই-এর ব্যাপক অর্থ হল ছাপ তোলা। এ কাজ তিন হাজার বৎসর পূর্বের মানুষের কাছেও অজানা ছিল না। কিন্তু উপত্যকার খননকার্যকালে প্রাপ্ত বহুবিধ শীলমোহর এ-কথা প্রমাণ করে। নরম মাটির চাক্‌তির ওপর আসীরীয় কিউনিফর্ম লিপির ছাপ, ও বাতির ওপর গ্রীক ও রোমান অক্ষরের ছাপ —যাদের নিদর্শন এখনও আছে—এরাই হল ছাপাইয়ের প্রাথমিক অবস্থা। নিচে এদের ছবি দেওয়া হল।

এর পরের ধাপ হল একখণ্ড কাঠের ওপর কারুকার্য খোদাই করে, তাতে কালি বুলিয়ে কাগজের ওপর ছাপ মারা। কাগজের আগে কাপড়ের ওপর এই রকম ছাপ ব্যবহার করা হয়েছে। ছাপা শাড়ির কাজ ভারতবর্ষের বহু পুরাণো শিল্প। সুতরাং কাঠ খোদাই থেকে ছাপার চল অনেক দিনেরই বলতে হবে।

কাঠে ছবি খোদাই করে কাগজে যখন ছাপ ওঠানো সম্ভব হল তখন আর এক ধাপ অগ্রসর হওয়া গেল ছবির সঙ্গে অক্ষর খোদাই করে। কাঠের ওপর অক্ষর কুঁদে বার করে যে ছাপা হয় তাকে বলে জাইলোগ্রাফী (xylography), বাংলায় বলতে পারি কাঠ-খোদাই লিপি। প্রথমে শুধু একটি করে অক্ষর খোদাই করা হত। পরে যখন এই খোদাইয়ের কৌশলটা বেশ আয়ত্ত হল, তখন এক একটি সম্পূর্ণ বাক্যের খোদাই হতে লাগল।

ব্লক বই :

তারপর শুরু হল এই রকম ছাপা কাগজখণ্ডকে একত্রিত করে বইয়ের আকারে বাঁধা। যেহেতু খোদাইযুক্ত কাষ্ঠখণ্ডকে বলা হয় ব্লক (block)

তাই কাঠ খোদাই সাহায্যে ছাপা বইয়ের নামকরণ হয়েছে ব্লক বই (block book)।

ব্লক বই তিন প্রকারের :—

(১) যাতে শুধু ছবি থাকে, এবং যদি তাতে কিছু কথা থাকে সে-কথা ছবির অঙ্গীভূত হয়েই থাকে।

(২) যাতে ছবি ও কথা পৃথক পাতায় থাকে, কিম্বা একই পাতায় আলাদা থাকে।

(৩) যাতে শুধু কথাই ছাপা থাকে।

কাগজের মতো ছাপার বেলাতেও চীনের সম্মান অগ্রগণ্য। ব্লক বইয়ের প্রথম নিদর্শন চীন থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে। এক বিরাট পাহাড়ের ওপর পাথর কেটে তৈরি করা "হাজার বুদ্ধের গুহা"র মধ্যে পাওয়া যায় একরাশ পুঁথি। প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্যর অরিয়েল ষ্টেইন প্রায় তিন হাজার পুঁথি নিয়ে গেলেন ব্রিটিশ মিউজিয়মে। এই পুঁথিপত্রের মধ্যেই দেখা দিল পৃথিবীর প্রথম মুদ্রিত পুস্তক, ইংরাজিতে যা ডায়মণ্ড সূত্র (Diamond Sutra) নামে পরিচিত। এ বই হল চীন ভাষায় বৌদ্ধ সূত্রের অনুবাদ। বইয়ের মধ্যে উল্লেখ আছে, "৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মুদ্রিত।" এর মুদ্রাকর হলেন ওয়াং চিয়ে (Wang Chieh), ব্লক বই হিসেবে এই বই দ্বিতীয় পর্যায়ের, অর্থাৎ এতে ছবি ও লেখা একই পাতায় ভিন্ন ভাবে ছাপা আছে।

ব্লক বই ছাপার কাজটা চীন দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বহুদিন, কারণ দেখা যাচ্ছে ইউরোপে ব্লক বই প্রস্তুত হয়েছে প্রায় ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে। কাগজ প্রস্তুত প্রণালীও চীন থেকে ইউরোপে পৌঁছুতে বহুদিন লেগেছিল। যাই হোক, ইউরোপে ব্লক বই প্রথম হলাণ্ডে প্রস্তুত হয়। তখন ধর্মতন্ত্রের যুগ। বাইবেল প্রচারের বিরাট প্রয়োজন ব্লক বই সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছে। প্রথম ব্লক বই তাই হল Biblia Pauperum (Poor Man's Bible), অর্থাৎ দরিদ্রের বাইবেল। ছবির সাহায্যে বাইবেলের উপদেশগুলি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হল। ইতিপূর্বে আমরা ব্লক বইয়ের যে শ্রেণী বিভাগ করেছি, তার প্রথম শ্রেণীতে পড়ে এই বিব্লিয়া পপেরম্। অর্থাৎ এ হল শুধু ছবিওয়ালা ব্লক বই।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্লক বই, অর্থাৎ যাতে এক পৃষ্ঠায় আছে ছবি ও অপর পৃষ্ঠায় আছে ছবির ব্যাখ্যা,—তার বিখ্যাত উদাহরণ হল Ars Memorandi যার অর্থ হল, কেমন করে ধর্মগুরুদের মনে রাখা যায়। Ars Moriendi হল

আর একখানি এই শ্রেণীর ব্লক বই। এ বইয়ের নামের অর্থ হল, কেমন করে মরতে হয়। এর প্রথম দু' পাতায় ছাপা আছে ভূমিকা, তারপর এগারটা পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি এবং তাদের প্রত্যেকটির উল্টো পৃষ্ঠায় প্রতিটি ছবির ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। ছবিগুলির সাহায্যে এই বোঝানো হয়েছে যে, মরবার আগে প্রত্যেক খৃষ্টান যেন তার সম্পত্তি গির্জার কাজে দান করে যায়, নইলে তার আত্মা শয়তানের খপ্পরে পড়বে।

চতুর্থ শতাব্দীর একটি ল্যাটিন ব্যাকরণ যার নামকরণ হয় Donatus, এ ব্যাকরণের সঙ্কলয়িতা Aelius Donatus এর নামানুসারে,—এটি হল তৃতীয় পর্যায়ের ব্লক বই, অর্থাৎ যাতে কেবল লেখা আছে, ছবি নেই।

আধুনিক ছাপাই

ব্লক বইয়ের পরের অবস্থাই হল আধুনিক ছাপাইয়ের কৌশল। এ ছাপাইয়ের প্রণালী হল বর্ণমালার অক্ষরগুলি পৃথক পৃথক তৈরি করা এবং পরে তাদের যথাযথ সাজিয়ে ছাপার কাজে ব্যবহার করা। ইংরেজিতে একেই বলে—Typographic Printing অথবা Printing by Movable Types।

আধুনিক ছাপাইয়ের আবিষ্কর্তা কে – এ তথ্য খুব নিশ্চয়তার সঙ্গে আজও নির্ণীত হয়নি। এ সম্পর্কে দুজনের নাম করা হয়। একজন হলেন জার্মেণীর গুটেনবার্গ (John Gutenberg), অন্যজন হল্যাণ্ডের কস্টর (Laurens Janszoon Coster), তবে এ দুজনের মধ্যে গুটেনবার্গের নামই ছাপাইয়ের আবিষ্কর্তা হিসেবে বেশি পরিচিত হয়ে পড়েছে। গুটেনবার্গ জার্মেণীর মেনজ (Mainz) নামক নগরের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর জন্ম হয় অনুমানিক ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে এবং ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দের আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। গুটেনবার্গ যে ছাপাইয়ের কৌশল আবিষ্কার করেন তার প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে সমকালীন একটি বইতে। তাতে এই বৃত্তান্ত পাওয়া গেছে যে, ফ্রান্সের সপ্তম চার্লস ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জানতে পারেন যে, মেনজ নগরের গুটেনবার্গ ছাপাই কৌশল আবিষ্কার করেছে, এবং এ কথা জেনে রাজা তাঁর টেঁকশালের অধিকর্তা নিকোলাস জেনসন (Nicholas Jenson)কে মেনজ-এ পাঠান গোপন-ভাবে এই কৌশল আয়ত্ত করে আনবার জন্যে। এখন প্রশ্ন, গুটেনবার্গ কবে উদ্ভাবন করেন ছাপাইয়ের কৌশল? এর উত্তর অনুমান করা চলে ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে নিষ্পাদিত একটি মামলার বিবরণ থেকে। এই বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে জোহান ফস্ট (Johann Fust) নামে এক ধনী স্বর্ণকারের

ব্যবসায়িক অংশীদার হন গুটেনবার্গ। ফস্ট গুটেনবার্গকে অনেক টাকা হাওলাত দেন, এবং এই সহযোগিতা গড়ে ওঠে ছাপাখানার ব্যবসাকেই কেন্দ্র করে। অতএব এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে অনুমানিক ১৪৫০ খৃষ্টাব্দের ভেতর গুটেনবার্গ ছাপাইয়ের কৌশল উদ্ভাবন করেন।

গুটেনবার্গের ছাপাখানায় যে সব ছোটবড় বই ছাপা হয়, তার মধ্যে বিয়াল্লিশ পংক্তির বাইবেল (Fortytwo line Bible) বিখ্যাত। এ বাইবেলকে গুটেনবার্গ বাইবেল অথবা ম্যাজারিন বাইবেল (Mazarine Bible) বলা হয়। এ বইয়ের অধিকাংশ পাতায় বিয়াল্লিশ করে পংক্তি ছাপা আছে বলে এ বইয়ের নামকরণ হয়েছে বিয়াল্লিশ পংক্তির বাইবেল। খুবই সুন্দর করে ও যত্ন নিয়ে ছাপা হয়েছিল এই বই, তবে ছাপার অক্ষরগুলি তৎকালীন হস্তলিপির অনুকরণে গঠিত হয়েছিল, ফলে হাতের লিপি ও ছাপার লিপির কোনো পার্থক্য গড়ে ওঠে নি। এ বই কে ছেপেছে ও কোথায় ছাপা হয়েছে তার কোনো খবর এ বইয়ের কোথাও নেই। তবে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন এ বই ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দের আগেই ছাপা হয়।

ইতিহাস বলে গুটেনবার্গ যে টাকা ফস্টের কাছ থেকে নিয়েছিলেন তা তিনি শোধ দিতে পারেন নি, তাছাড়া গুটেনবার্গের কাজ ফস্টকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। এ কারণে ছাপাখানার সমস্ত স্বত্ব ফস্টের হাতে চলে আসে। শোয়েফার (Peter Schoeffer) নামে গুটেনবার্গের একজন কর্মচারী ছিল। ফস্ট এই কর্মচারীকে নিজের কারখানায় নিযুক্ত করলেন এবং দুজনে মিলে ছাপাখানার কাজ চালাতে লাগলেন।

এঁরা মিলিতভাবে প্রথম যে বই ছাপান তা হল একটি ধর্মসংগীতের পুস্তক (Psalter)। এ বই বিখ্যাত হবার প্রধান কারণ হল এই যে, এ বই সর্বপ্রথম মুদ্রণের তারিখ ও মুদ্রাকরের নাম প্রকাশিত করে। এই বইতে স্পষ্টই ছাপা আছে যে ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে ফস্ট ও শোয়েফার কর্তৃক এই ধর্মসংগীতে পুস্তক মুদ্রিত হয়েছে। এ বইয়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে এর ছাপাই কিছু নূতন ধরনের, এর মুদ্রাক্ষর ইতিপূর্বে প্রকাশিত সব বইয়ের মুদ্রাক্ষর অপেক্ষা বড়।

ফস্ট এবং শোয়েফার বইয়ের পর বই ছাপিয়ে চলেছিলেন, এমন সময় মেনজে একটি কাণ্ড ঘটল। গির্জায় পুরোহিত কে হবে এই নিয়ে বাধল বিরোধ। এই বিরোধে যিনি জয়লাভ করেন তিনি শহরের কারিগরি-শিল্পীদের মনে আতঙ্কের

সৃষ্টি করলেন, যার ফলে অন্যান্য কারিগরদের সংগে বহু ছাপাখানার কারিগরও শহর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হল। এই পলায়নকারীদের মধ্যে ফস্ট এবং শোয়েফারও ছিলেন। তাঁরা চলে যান ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে। সেখানে কিছুকাল কাটিয়ে তাঁরা অবশ্য আবার মেন্‌জে চলে আসেন। এবং পুরোদস্তুর ব্যবসা চালাতে থাকেন। ফস্টের মৃত্যু হয় ১৪৬৬ খৃষ্টাব্দে। শোয়েফার বেঁচে থাকেন আরও ৪৬ বৎসর, এবং অর্থ ও প্রতিষ্ঠায় মেন্‌জ-এ একজন বিশিষ্ট নাগরিক রূপে পরিগণিত হন। ফস্ট এবং শোয়েফার উভয়ে মিলিত ভাবে প্রায় ১১৫টি বই ছাপেন। ফস্টের মৃত্যুর পর শোয়েফার নিজে প্রকাশিত করেন উনোষাটটি বই।

মেন্‌জ শহরে যে ধর্মবিরোধ ঘটে তার একটা সুফল হয়েছিল এই যে এ বিরোধ ছাপাইয়ের কাজ ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে প্রসারিত করে। ছাপাখানার কারিগর ইতস্ততঃ নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এবং সংগে সংগে নানাদেশে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। যারা একদিন মেন্‌জ এ ছিল তারাই অন্যান্য দেশে গিয়ে ছাপাখানার গোড়াপত্তন করল। এইভাবে জার্মেনীর বিভিন্ন স্থানে তো বটেই, ইতালী, হলান্ড ও স্পেনে ছাপাখানা বিস্তার লাভ করে। ফ্রান্সে অবশ্য সপ্তম চার্লসের চেষ্টায় মেন্‌জে ধর্মবিরোধ শুরু হবার আগেই ছাপার কৌশল করায়ত্ত হয়।

ইংলন্ডের প্রথম মুদ্রাকর হলেন উইলিয়ম ক্যাক্সটন (William Caxton) ইনি কার্য উপলক্ষ্যে ইউরোপের নানাস্থানে ঘোরেন এবং সে সময় ছাপাখানার সংগে পরিচিত হন। ফ্রান্সের বারগান্ডি (Burgundy) প্রদেশে যখন ছিলেন তখন তিনি Receui des Histoires de Troı (ট্রয় ইতিহাসের কাহিনী) বইখানি অনুবাদ করেন। এ অনুবাদের অনেক চাহিদা হয়, কিন্তু অত কপি নকল করানো সম্ভবপর নয় জেনে ক্যাক্সটন চাইলেন নূতন আবিষ্কৃত ছাপাইয়ের কৌশলে বইটির অনেক কপি প্রস্তুত করতে। এ বই ছাপাবার পর আরও কয়েকখানা বই ক্যাক্সটন ছাপান। ছাপার কাজের সংগে এই কারণে ক্যাক্সটনের পরিচয় অন্তরংগ হয়ে ওঠে। এর পর রাজনৈতিক কারণবশত বারগান্ডিতে থাকা ক্যাক্সটনের পক্ষে আর সম্ভবপর হয় না, তিনি ১৪৭৬ সালে ইংলন্ডে চলে আসেন। সেখানে তিনি নিজের ছাপাখানা খোলেন, ১৪৭৭ সালে তাঁর মুদ্রিত Dictes and Sayengis of the Philosophres হল ইংলন্ডের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক।

আমেরিকায় ছাপাখানার প্রবর্তন হয় ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে। ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত হারবার্ড কলেজ (Harvard College) এর কাজকর্ম চালাবার জন্যে রেভারেন্ড জোসে গ্লভার (Rev. Jose' Glover) যিনি ভেবেছিলেন এই কলেজের প্রথম প্রেসিডেন্ট তিনিই হবেন ইংলন্ড থেকে ছাপাখানার যন্ত্র আনাবার ব্যবস্থা করেন। ইনি ইংলন্ডে গিয়ে কলেজের জন্যে ও ছাপাখানার জন্যে টাকা তোলার আয়োজন করেন, এবং ছাপার কাজের লোকও নিয়োগ করে ফেলেন। কিন্তু আমেরিকা ফেরার পথে তাঁর মৃত্যু হওয়ায়, ছাপাখানার ব্যবস্থা কিছু বদলে গেল! গ্লভার-পত্নী হারবার্ড কলেজের বদলে কেমব্রিজে ছাপাখানাটি বসালেন। এই ছাপাখানা থেকে প্রথম যা ছাপা হয় তা হল ছোট কাগজের একপিঠে ছাপা একটি অঙ্গীকার-পত্র—Freeman's Oath। ম্যাশাসুসেটস্ বে (Massachusetts Bay) নামক কলোনীর পুরুষ অধিবাসীদের নাগরিক কর্তব্যের ফিরিস্তি।

ভারতবর্ষ

ভারতে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় ইউরোপীয় মিশনারীদের কল্যাণেই। খৃষ্ট-ধর্ম প্রচার করার কালে দেশীয় ভাষায় বাইবেল ও অন্যান্য খৃষ্টিয় ধর্মপুস্তক ছেপে বার করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মিশনারীরা তাই ছাপাখানা বসাতে শুরু করে।

ভারতের প্রথম ছাপাখানা পর্তুগীসদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় গোয়ায়। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে "Conclusoes" নামে পর্তুগীস্ ভাষায় লিখিত একটা বই ছাপা হয় বলে কথিত আছে। অবশ্য আজ আর এ বইয়ের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না।

তারপরেই নাম করতে হয় সেন্ট ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার প্রণীত Doctrina Christao-র তামিল অনুবাদ, যা ছাপা হয় ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে। এ বইটির মাত্র একখানি কপি ফ্রান্সের জাতীয় গ্রন্থাগার বিব্লিয়োথেক্ ন্যাশ্যানেল-এ আছে।

ভারতীয় ছাপাখানার ইতিহাসে দাক্ষিণাত্যের ত্রিচুর প্রদেশে অবস্থিত আম্বালাক্কাডু (Ambalakkadu) শহর প্রখ্যাত। এইখানে ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম 'মালাবার" টাইপ ('মালাবার" বলতে সেকালে মলয়ালাম ও তামিল দুই ভাষাই বোঝাত) তৈরি করা হয়। যিনি এই টাইপ তৈরি করেন তাঁর নাম Joannes Gonsalves। কিন্তু এই স্থানে ছাপা কোনো বই-ই ভারতে মেলেনা। রোম্-এ প্রাপ্ত একটি তালিকা থেকে জানা যায় এই স্থানে কতগুলি বই মলয়ালম্

অক্ষরে ছাপা হয়েছিল। তামিল অক্ষরের টাইপও তৈরি করা হয়েছিল, এবং এই টাইপে একটা তামিল-পর্তুগীস অভিধান ছাপা হয়। কিন্তু আজ এ সবের কোনো কপি বর্তমান নেই। আম্‌বালাক্‌কাড্‌তে ছাপা বইয়ের কোনো চিহ্ন আজ নেই তার কারণ টিপু সুলতান যখন ট্রাভানকোর ও কোচিন আক্রমণ করেন। তখন তিনি সেখানকার সব কিছু ধ্বংস বিধ্বস্ত করে ফেলেন। এই দারুণ যজ্ঞের আহুতি ছিল সমস্ত খৃষ্টীয় ও হিন্দু ধর্মপুস্তক।

প্রথম ছাপাইয়ের বর্তমান নিদর্শন হিসেবে জাইজেন্‌বাল্‌গ্‌ (Ziegenbalg) কৃত বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের তামিল অনুবাদ Biblia Damulicaর নাম করতে হয়। ১৭০৮ সালে ছাপা আরম্ভ হয়ে ১৭১১ সালে শেষ হয়। জাইজেন্‌বাল্‌গ্‌ তামিল টাইপ নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। শুধু তাই নয়, তিনি ট্রানকেবার (Tranquebar) শহরে ভারতের প্রথম কাগজের কল বসান।

এর পরেই নাম করতে হয় বাংলাদেশের। বাংলা টাইপের প্রবর্তন ঘটে ইংরেজদের কল্যাণে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় এই বৎসরে হুগলীর একটি ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হল একটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ—A Grammar of the Bengali Language। এ বইয়ের যিনি লেখক তাঁর নাম নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেদ (Nathaniel Brassey Halhed) ফিরিঙ্গিদের জন্যে লেখা এই বই সৃষ্টি করল প্রথম বাংলা টাইপ। বইটি লেখা ইংরেজিতে, কিন্তু তার দৃষ্টান্তের উদ্ধৃতিগুলি যা রামায়ণ, মহাভারত ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল থেকে গৃহীত হয়েছিল - তাদের জন্যে বাংলা টাইপের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। হালহেদ অনুরোধ করেন তাঁর সিভিলিয়ান বন্ধু ও প্রাচ্যবিদ্যায় পণ্ডিত চার্লস উইল্‌কিন্‌কে এই বিষয়ে সাহায্য করতে। উইল্‌কিন্‌ ইতিপূর্বেই শখের বশে কিছু বাংলা হরফ খোদাই করেছিলেন। এখন হালহেদের অনুরোধে এ সম্বন্ধে উঠে পড়ে লাগলেন। তিনি নিজে হাতে বাটালি নিয়ে কাজে নামলেন বাংলা টাইপ তৈরিও করলেন। এ কাজে তাঁর কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। তাঁকে সাহায্য করেন তাঁর বাঙালী কর্মচারী পঞ্চানন কর্মকার। টাইপ-কাটার কৌশল পঞ্চাননকে উইল্‌কিন্‌ শেখান। পঞ্চানন এই কৌশল অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। বাংলা ছাপার কাজটা তাই হালহেদের ব্যাকরণেই সীমিত না থেকে অব্যাহতরূপে বিস্তৃত হয়ে পড়ল।

এরপর নামকরা বই হিসেবে, যা ছাপা হয় তা হল আপ্‌জনের বাংলা ইংরেজি অভিধান—An Extensive vocabulary 'Bengalese and English

by A. Upjohn। বইটি ছাপা হয় ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে। অবশ্য এ বইয়ের খবর পাওয়া গেছে সম্প্রতি। এ আবিষ্কারের আগে প্রথম ছাপা বাংলা অভিধান হিসেবে ধরা হত এইচ. পি. ফরস্টার প্রণীত দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ ইংরেজি বাংলা ও বাংলা ইংরেজি অভিধান (H, P. Forster's A vocabulary in two parts, English and Bengalee and vice versa)-এর প্রথম খণ্ড ছাপা হয় ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮০২ খৃষ্টাব্দে। বইটি ছাপা হয় কলকাতায় ক্রনিকল্ প্রেসে।

বাংলা ছাপাইয়ের জন্মদাতা হিসেবে ইং ১৭৭৮ সালটি যেমন স্মরণীয়, বাংলা তথা ভারতীয় ছাপাই ও সাহিত্য বিকাশের দ্বার উন্মোচক হিসেবে ১৭৯৯ সালটি তেমনি অপরূপ মহিমায় ভাস্কর। এই বৎসর রেভারেণ্ড ডাঃ উইলিয়াম কেরী (১৭৬১—১৮৩৪) তৎকালীন ইণ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতীয় এলাকায় ধর্মপ্রচার করার অনুমতি না পেয়ে অবশেষে দিনেমার গভর্ণরের আনুকূল্যে শ্রীরামপুরে এসে একটি মিশন স্থাপন করেন। মিশন স্থাপনের পর তাঁর প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল বাংলা ভাষায় "নিউ টেস্টামেণ্ট" ছাপিয়ে ধর্মপ্রচারের সুব্যবস্থা করা। তিনি খোঁজ ক'রে জানলেন যে কলকাতা থেকে দশ হাজার কপি এই বাইবেল যদি ছাপান হয় তাহলে তাঁর খরচ পড়বে ৪৩,৭৫০ টাকা। এত টাকা তাঁর কোথায়। তাই তিনি নিজের প্রেস বসাতে চাইলেন। চল্লিশ পাউণ্ড দিয়ে ক্রয় করলেন একটা কাঠের প্রেস। এই প্রেসেই ছাপা হল কেরী-কৃত বাইবেলের বাংলা অনুবাদ। টাইপ সাজানোর কাজে সাহায্য করেন কেরী-পুত্র ফেলিক্স (Felix) ও কেরীর সহকর্মী ওয়ার্ড (Ward)।

বাংলা বাইবেল ছাপার সাফল্য কেরীকে উৎসাহিত করল অন্যান্য ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ ছাপাতে। কিন্তু একাজ করতে গেলে সে সব ভাষায় টাইপ চাই। কেরী যথারীতি খবর পেলেন উইল্‌কিন্ সাহেবের সহকারী পঞ্চাননের কথা। পঞ্চানন টাইপের ছাঁচ কাটার কাজে ওস্তাদ শিল্পী। পঞ্চাননকে পেলে কেরীর মনোবাসনা পূর্ণ হয়। তিনি লিখলেন পঞ্চাননের আসল মালিক কোলব্রুক সাহেবকে। কিন্তু কোলব্রুক পঞ্চাননকে ছাড়তে রাজী হলেন না। তখন কেরী পঞ্চাননের কাছে সোজাসুজি প্রস্তাব পাঠান, তবু কোনো ফল হলনা। অবশেষে কেরী কূটকৌশলের আশ্রয় নিলেন। অনেক অনুনয় বিনয় করে কোলব্রুককে লিখলেন তিনি শুধু একবার পঞ্চাননকে দেখবেন মাত্র, তাঁর এই ইচ্ছা পূর্ণ ক'রে কোলব্রুক যেন দয়া করে পঞ্চাননকে দুচারদিনের জন্যে শ্রীরামপুরে পাঠিয়ে দেন। কেরীর এই মর্মস্পর্শী আবেদন ব্যর্থ হল না। দয়াপরবশ হয়ে

কোলব্রুক পঞ্চাননকে পাঠালেন। কিন্তু কোলব্রুক আর পঞ্চাননকে ফিরে পেলেন না। কেরী সুকৌশলে ও দিনেমার গভর্মেণ্টের সহযোগিতায় পঞ্চাননকে শ্রীরামপুরের স্থায়ী বাসিন্দা করে নিলেন। কোলব্রুক সরকারের কাছে বহু আবেদন নিবেদন জানান, আইনের সাহায্য নেন, কিন্তু কোনই ফল হল না। কেরী আত্মপক্ষ সমর্থনে পরিস্কার জানিয়ে দিলেন পঞ্চাননের মতো কুশলী শিল্পীকে—যে গোটা দেশে একমাত্র মুদ্রণশিল্পী—কোলব্রুকের কোনো অধিকার নেই তাকে একচেটিয়া করে নিজের করায়ত্ত রাখা। পঞ্চাননের এই শ্রীরামপুর-বাস কেবল যে কেরীর জবরদস্তির ফলেই ঘটেছিল এমন মনে করার কারণ নেই, পঞ্চাননের নিজের ইচ্ছার সায় এই কর্মে যথেষ্ট ছিল।

পঞ্চাননের সঙ্গে আসে পঞ্চাননের জামাই মনোহর। মনোহরও পঞ্চাননের মতোই সুদক্ষ কারিগর ছিলেন। এঁদের সাহায্যে কেরী টাইপ ঢালাইয়ের কারখানা স্থাপন করলেন। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা তথা এশিয়ার কতকগুলি ভাষা, যেমন ফারসী, আরবী, চীন, ইত্যাদি—এদের টাইপের ছাঁচ কাটা ও টাইপ তৈরী করা, সবই চলতে লাগল অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অদম্য উৎসাহে। ১৮০১ থেকে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কেরীর প্রেস থেকে ছাপা হয় দুই লক্ষ বারো হাজার বই—চল্লিশটি বিভিন্ন ভাষায়।

শ্রীরামপুর ছাপাখানা সৃষ্টি করেছে বহু ভারতীয় ভাষার প্রথম টাইপ। অনেক ভাষায় টাইপকে শ্রীসম্পন্ন ও সুপরিণত করেছে। মারাঠি, আসামী প্রভৃতি ভাষার প্রথম ছাপা বই এখান থেকেই প্রস্তুত হয়। ভারতীয় ছাপাই, বিশেষ করে বাংলা ছাপাইয়ের ইতিহাসে কেরী সাহেবের অবদানের যথাযোগ্য মূল্য নির্ণয়ের অবকাশ আজও যথেষ্ট রয়েছে। তাঁর ছাপা বই শ্রীরামপুরে কলেজ গ্রন্থাগারে সঞ্চিত আছে। ভারতীয় ছাপাইয়ের ইতিহাস এবং ভারতীয় সাহিত্য গদ্যের বিকাশ ও বিবর্তন সম্পর্কে গবেষণা করতে গেলে শ্রীরামপুরে ছাপা বইগুলির স্মরণাপন্ন না হয়ে উপায় নেই।

এই প্রসঙ্গে একথারও উল্লেখ প্রয়োজন যে শ্রীরামপুরে ছাপাখানা প্রবর্তিত হবার এক বৎসর পরে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়। কলেজের কর্তৃপক্ষগণ দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান কল্পে দেশী ভাষায় ছাপা বইয়ের প্রয়োজন অনুভব করেন। যে সব প্রেস দেশীয় ভাষায় বই ছাপায় আগ্রহ প্রকাশ করে তাঁরা তাদের রীতিমত উৎসাহিত করেন। এঁদের উৎসাহ ও ব্যবস্থায় ভারতের বিভিন্ন ভাষায় বই ছাপার কাজ দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে।

স্কুল লাইব্রেরী—১

জন স্মিটন

বৃটিশ কাউন্সিলের ভারতস্থ প্রধান গ্রন্থাগারিক

আমার এই বক্তৃতা কয়টিতে আমি মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সংগঠনের কয়েকটি দিক আলোচনা ক'রব। আমার আলোচ্য বিষয় হবে (১) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা, (২) ব্রিটেন এই বিষয়ে কতটা অগ্রসর হ'তে পেরেছে, (৩) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কেমন হওয়া উচিত এবং (৪) কেমন ক'রে এই গ্রন্থাগার গ'ড়ে তোলা যায়।

ব্রিটেনের শিক্ষাদপ্তরের ২১ নং পুস্তিকা "The School Library; an approach to the problem of teaching the use and enjoyment of books, with notes on the essentials of a good school library," এই সম্বন্ধে খুব সুস্পষ্ট এবং উপযুক্ত বর্ণনা দিয়েছে। এই পুস্তিকায় বলা হ'য়েছে -- "শিক্ষকের প্রভাব আর উপদেশকে বাদ দিলে বইই হ'চ্ছে শিক্ষার প্রধান অবলম্বন। এমন কি শিক্ষকের কাজেরও প্রধান সহায়ক হ'চ্ছে বই। একবার যদি ছেলেকে পড়তে শেখান যায় এবং তার মধ্যে বইয়ের প্রতি অনুরাগ জাগিয়ে দেওয়া যায় তা' হ'লে সে নিজেই মানুষের সমস্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আয়ত্ত ক'রে ফেলতে পারে। তাই যে বাড়ীর আবহাওয়ায় বইয়ের প্রতি অনুরাগ স্বাভাবিক, সেই বাড়ীর ছেলে তারই সমান বুদ্ধিসম্পন্ন অপর একটি ছেলে যার বাড়ীর আবহাওয়া অনুকূল নয়, তার চেয়ে অনেক এগিয়ে যায়। ছেলেদের গোড়া থেকেই আকর্ষণীয় বইয়ের পরিবেশ দরকার এবং এই পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের যত্নবান্ হওয়া উচিত। বইয়ের সঙ্গে প্রথম সম্পর্ক যদি মধুর হয় তাহ'লে ছেলেদের ভবিষ্যতের ভিত দৃঢ় হ'য়ে গ'ড়ে ওঠে। প্রথম জীবনে পুস্তকের প্রভাবের গুরুত্ব কখনই ব'লে শেষ করা যায় না।

[বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে স্কটিশ চার্চ কলেজ ভবনে ১ই ডিসেম্বর হইতে চার দিন ব্যাপী স্কুল লাইব্রেরী সম্পর্কে অনুষ্ঠিত বক্তৃতামালায় প্রদত্ত প্রথম ভাষণের অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়।]

যত সুন্দর ক'রেই হক না কেন কতকগুলি পাঠ্য পুস্তক মাত্র সংগ্রহের দ্বারা এই পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব হবে না। ছেলে স্কুলে ঢোকার সংগে সংগেই (এমনকি তারও আগে থেকেই) তার ব্যবহারের জন্য এমন বইয়ের সংগ্রহ তার আয়ত্তের মধ্যে থাকা দরকার যা সে সব-সময় ব্যবহার ক'রতে পারবে, যা তার বয়স ও পরিবৃদ্ধি অনুযায়ী রচিত, যা তার পাঠ্য পুস্তকের আলোচিত বিষয়ের সংগে সংযোগ রক্ষা ক'রবে, যা তার কৌতূহল ও আগ্রহকে পরিবর্ধিত ক'রে তার পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে নানাভাবে বাড়িয়ে তুলবে।"

উপরের এই উদ্ধৃতির মধ্যেই আমরা বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সংগঠনের মূল বক্তব্যটি পাই। শিক্ষার প্রধান উপকরণ হ'চ্ছে পুস্তক। শিক্ষক এবং ছাত্র দুজনেই এর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু উপরের উদ্ধৃতির মধ্যেও "একবার যদি ছেলেকে পড়তে শেখান যায় এবং বইয়ের প্রতি তার অনুরাগ জাগিয়ে দেওয়া যায়" এই অংশটুকুর দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে চাই। সব ছেলেকেই বই পড়তে শেখান যায়, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য হবে সব ছেলেকে বই ভালবাসতে শেখান। আমাদের লক্ষ্য বই পড়তে বাধ্য করা নয়—ধীরে ধীরে বইয়ের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করা।

শিক্ষাখাতে ব্যয় অনেক দেশেই জাতীয় ব্যয়ের মধ্যে এক দফায় সর্বাধিক ব্যয়। এই ব্যয়ে অবশ্য আমরা অভ্যস্ত হ'য়ে গেছি। কিন্তু আমরা অনেকেই খোঁজ রাখি না এই ব্যয়ের কত অংশ নিরর্থক নষ্ট হয়। এমন কি ব্রিটেনের মত শিক্ষায় অগ্রসর দেশেও কোন ছেলে স্কুলের পাঠ শেষ করার চার বছর বাদে যদি সেনাবাহিনীতে কাজ ক'রতে যায় তা' হ'লে তাকে ফের প'ড়তে শেখানোর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় ক'রতে হয়। এই সব ছেলেদের সাধারণের চেয়ে নির্বোধ মনে করলে ভুল হবে। এরা অন্য সাধারণ ছেলেদের মতই সমান মেধার অধিকারী। কিন্তু স্কুলে পড়বার সময় এদের বই ও পড়ার প্রতি অনুরাগ না জন্মানয় এরা কখনই পাঠে দক্ষতা লাভ করেনি। পড়ার অভ্যাস না রাখলে মানুষ প'ড়তে ভুলে যায় এবং আবার তাকে নতুন ক'রে পড়তে শিখতে হয়।

(ব্রিটেনে মানুষের নানাদিকে আগ্রহ তার পড়বার অভ্যাস গঠনে বাধা জন্মায়। সিনেমা, টেলিভিসন, রেডিও, অত্যধিক খেলাধুলা, প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য ক'রলেই একথা বোঝা যাবে। ভারতের মত গ্রাম—প্রধান দেশে এইগুলো এত বেশী উপদ্রব ক'রতে না পারলেও এখানে পড়ার অভ্যাসের অন্যরকম বাধা আছে। এখানে আর্থিক অনটনই প্রধান অসুবিধা) প্রাথমিক এমন কি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ

শেষ ক'রে ছেলেকে উদরান্নের জন্য এতই ব্যস্ত থাক্‌তে হয় যে সে পড়ার সুযোগ বা অবসর পায় না। আয় কম, বই কাগজ কেন্‌বার পয়সা নেই। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অপ্রচুর এবং পড়বার প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগও তেমন গ'ড়ে ওঠে নি'। ফলে অভ্যাসের অভাবে পড়বার ক্ষমতা ক্রমে নষ্ট হ'য়ে যায়?

কারণ যাই হোক্‌ না কেন, পড়বার ক্ষমতা নষ্ট হ'য়ে গেলে অধিক শিক্ষা লাভের সম্ভাবনা লুপ্ত হ'য়ে যায় এবং সেই ছেলের শিক্ষার জন্য সমস্ত ব্যয়ই অপব্যয়ে পর্যবসিত হয়। বইয়ের শিক্ষার বদলে সমান কার্যকরী অন্য কিছুই আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি'। রেডিও, টেলিভিসন, সিনেমা এরা সবই চলমান শব্দ ও দৃশ্য। ইন্দ্রিয়ের সাম্‌নে একবার মাত্র উপস্থিত হ'য়েই এরা অন্তর্হিত হ'য়ে যায় এবং সাধারণতঃ এদের মনেও রাখা যায় না। ব্যয়বহুল, দুর্বহ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত এগুলো কার্যকরী হয় না। বই কিন্তু সুলভ, স্থায়ী এবং সহজে বহনযোগ্য। যেখানে, যখন এবং যতবার ইচ্ছা বই পড়া যায়। কয়েকটি বছরের মধ্যে স্কুলের সংগে ছেলের সম্পর্ক শেষ হ'য়ে যায়, কিন্তু পড়ার অভ্যাস যদি গঠিত হয় তা' হ'লে সারাজীবন বিদ্যার চর্চা করা যেতে পারে। Beatrice Ward লণ্ডনে গ্রন্থাগারিকদের এক সভায় তাঁর প্রদত্ত ভাষণের উপর ভিত্তি ক'রে "The Crystal Goblet" নামে একখানি বই প্রকাশ ক'রেছেন। এই বইতে তিনি ভবিষ্যৎ জগতের এক সাংঘাতিক চিত্র দিয়েছেন। জগৎ শাসন করেছেন মাত্র কয়েকজন পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক, আর অর্ধশিক্ষিত লোকেরা সেখানে তাদের তাঁবেদারীতে বাস ক'র্‌ছে। এগার বছর পর্যন্ত ছেলেদের কেবলমাত্র রোমান লিপির বড় হরপ শেখান হবে। তারপর বুদ্ধির পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে তাদেরই মাত্র ছোট হরপ শেখান হবে—যাতে তারা সমস্ত জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের অধিকার পেতে পারে এবং শাসক গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে। দেশের অধিকাংশ লোকের বিদ্যাবুদ্ধি থাক্‌বে সিনেমার লেখা বোঝা, হাওয়াই আক্রমণ প্রতিরোধক সংকেত বোঝা বা সাধারণের স্নানাগারের নির্দেশলিপি পড়ার ক্ষমতার মধ্যে সীমিত। যদি পরে কেউ ছোট হাতের অক্ষর চিনে ফেলে তবে হয় তাকে শাসকের গোষ্ঠিতে উন্নীত করা হবে নয়ত নির্বাসিত করা হবে। Beatrice Ward অবশ্য বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে কটাক্ষ ক'রে এই চিত্র এঁকেছেন—কিন্তু এই অবস্থাকে একেবারে অসম্ভব মনে করা যায় না। যদি আমরা আমাদের ছেলেদের ভিতর পড়ার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার ক'রতে পারি তবেই মাত্র এটা অসম্ভব হ'তে পারে।

স্কুল গ্রন্থাগারের প্রধান লক্ষ্য হ'চ্ছে বইয়ের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করা, পড়ার ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করা, এবং স্কুল গ্রন্থাগারে ছেলের শিক্ষা ও জ্ঞানবৃদ্ধির যে সুযোগ আছে ছেলেদের তার সদ্ব্যবহার ক'রতে উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু গ্রন্থাগারের বিশেষ ক'রে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের লক্ষ্য এইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সাধারণ পড়ার ব্যবস্থা ছাড়াও, জ্ঞানের জন্য নিয়মিত পাঠের, কোষগ্রন্থাদির, স্বাধীন অধ্যয়নের, দলগত ভাবে বা একক ভাবে উদ্দেশ্য-নিরূপিত পড়াশুনার এবং প্রবন্ধাদি রচনার জন্য ব্যবস্থা ও সুযোগ থাকা প্রয়োজন ; ছেলেদের হাতে রোজকার পড়ার বই মাত্র দিলেই চলবে না—পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয়ের এবং স্কুলজীবন ব্যতীত বৃহত্তর জীবনের প্রয়োজনের দিকেও নজর রাখতে হবে। ছেলেদের অবসর বিনোদনের, খেয়াল-খুসীর, অভিনয়ের, সমাজসেবার কাজের সহায়ক গ্রন্থেরও এখানে সমাবেশ ক'রতে হবে।

"জ্ঞানের" পড়ার সংগে সংগে 'আমোদের" পড়ার ব্যবস্থাও রাখতে হবে। একদল লোক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে ছেলে কী প'ড়ল না প'ড়ল তাতে কিছু যায় আসে না—সে নিয়মিত পড়ে কিনা এবং পড়ে আনন্দ পায় কিনা এইটাই লক্ষ্য করা দরকার। আমিও এই মতে বিশ্বাসী। আমার দশ বছরের মেয়েকে বই বেছে দিতে আমি মোটেই চেষ্টা করি না। সে Enid Blyton এবং W. E. Johns এর বই পড়ে। পরীর গল্প এবং সাধারণ গল্প পড়ে এবং রসরচনা পড়তে ভালবাসে। 'Three men in a boat', 'The sword in the stone' এবং Gerald Durrell এর রচিত বড়দের উপযোগী বইও সে পড়ে এবং উপভোগ করে। ইতিহাস এবং ভূগোলের পাঠ্যপুস্তক পড়তেও তার ভলো লাগে। কিন্তু মনে হয় অঙ্কের বই সে আনন্দের জন্য পড়তে পারে না। আমি দেখেছি প'ড়তে তার ভাল লাগে, পড়ে সে দ্রুত, এবং সুলিখিত চিত্তাকর্ষক অংশগুলো সে মনে রাখে। অঙ্কে সে অবশ্য খুব ভাল নয়, তা' হ'লেও তার ভাব প্রকাশের ক্ষমতা চমৎকার—তার পরিবেশকে সে বেশ সুন্দরভাবে বুঝতে পারে এবং পারিপার্শ্বিক জগতের সংগে নিজেকে খাপ খাওয়ান'র ক্ষমতা তার বয়সের তুলনায় অনেক বেশী।

পুস্তক-প্রীতি সঞ্চারিত ক'রতে হ'লে গ্রন্থাগারে চিত্ত-বিনোদক গ্রন্থের সমাবেশ ক'রতে হবে প্রচুর। শুধুমাত্র প্রখ্যাত গল্পের বই সংগ্রহ ক'রলেই চ'লবে না—ভাল ভাবে লেখা, ছবিঠবি দিয়ে সাজানো এবং চিত্তাকর্ষক সব কিছুই

সংগ্রহ ক'রতে হবে। বইয়ের সাহিত্য-মূল্য প্রথম শ্রেণীর হ'তেই হবে তার মানে নেই—শুধু দেখতে হবে বইটিতে কোন অনিষ্টজনক কিছু আছে কিনা। পুস্তক নির্বাচন প্রসঙ্গে এবিষয়ে আমরা আরও আলোচনা ক'রব।

স্কুল-লাইব্রেরীর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'চ্ছে ছেলেদের বইয়ের যথাযথ ব্যবহার শেখানো। লাইব্রেরীতে প্রচলিত কোষ-গ্রন্থ এবং প্রামাণিক গ্রন্থগুলি সংগ্রহ ক'রতে হবে এবং সেগুলোর ব্যবহার শেখাবার নিয়মিত আয়োজন রাখতে হবে। ছেলেদের সূচী ও নির্দেশ দেখতে শেখাতে হবে—সংবাদ সংগ্রহের রীতি শেখাতে হবে এবং নোট ও সংক্ষিপ্তসার তৈরী করার পদ্ধতি শেখাতে হবে।

আমেরিকায় স্কুল-গ্রন্থাগার কোন নতুন কথা নয়। বস্তুতঃ সেখানে প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইতিহাস খুঁজলে স্কুল-লাইব্রেরীর আরম্ভ সম্বন্ধে যাই পাওয়া যাক না কেন, ব্রিটেনে কিন্তু স্কুল-লাইব্রেরীর ধারণা অনেকটা আধুনিক। ব্রিটেনের স্কুল-লাইব্রেরীগুলো মোটামুটি প্রাচীন পাবলিক স্কুল এবং সহরাঞ্চলের গ্রামার স্কুলগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর কোন কোনটা কয়েক শত বৎসর আগে প্রতিষ্ঠিত। এদের বাদ দিয়ে যা স্কুল লাইব্রেরী তা' একেবারে অধুনাতন কালের কথা।

১৮৮৮ সালের ক্রশ রিপোর্টে স্কুল লাইব্রেরী স্থাপনের সুপারিশ ক'রে মন্তব্য করা হ'য়েছে—"ছেলেদের মনে যদি পাঠের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা যায় তা' হ'লে উত্তরকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সংরক্ষিত হবে না।" ১৯০৬ সালেও Board of Education মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গৃহ সম্পর্কে নিয়মাবলীতে ব'লেছে যে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের জন্য একটি সুসজ্জিত কক্ষ থাকা "বাঞ্ছনীয়"। ১৯১৪ সালের নিয়মাবলীতে বলা হ'য়েছে যে ঐ কক্ষ "অত্যাবশ্যক"। ১৯২৮ সালে বোর্ড সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলোর গ্রন্থাগার সম্বন্ধে এক স্মারক পত্র প্রচার করে, এবং ১৯৩১ সালের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন বিষয়ক পুস্তিকায় স্কুল লাইব্রেরী সম্বন্ধে একটা পরিচ্ছেদ সংযোজিত হয়। ১৯৩৬ সালের Carnegie United Kingdom Trust এর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সম্পর্কিত রিপোর্টে এই বিষয়ের বিস্তৃততর আলোচনা করা হয় এবং ঐ বছরেই Board of Education মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের জন্য সংক্ষিপ্ত শিক্ষার আয়োজন করেন।

ইতিমধ্যে অধিকাংশ ভাল স্কুলেই গ্রন্থাগার স্থাপিত হ'য়েছিল এবং ১৯৩৭ সালে দু'টি সংস্থা স্থাপিত হয় একটি Library Association এর স্কুল গ্রন্থাগার বিভাগ এবং অপরটি School Library Association. ১৯৪২ সালে Library

Association "যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে স্কুল লাইব্রেরী" সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা প্রচার করেন। ১৯৪৩ সালে দুটি সংস্থা মিলিতভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির কার্যকালের মধ্যেই ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং এই আইনানুসারে ব্রিটেনের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠিত হয়। এই আইনের বিধান অনুসারে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের সময় প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক করা হ'য়েছে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়েও গ্রন্থাগারের জন্য স্থান সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে।

১৯৪৫ সালে এই মিলিত কমিটি তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করেন। ১৯৫০ সালে এই রিপোর্টের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচারিত হয়। বস্তুতঃ স্কুল লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য ও পরিচালন পদ্ধতি সম্বন্ধে ব্রিটেনে প্রকাশিত সমস্ত পুস্তকের মধ্যে এই রিপোর্টের গুরুত্ব অসাধারণ। ১৯৪৫ সালে প্রচারিত রিপোর্টটিও স্কুল গ্রন্থাগার পরিচালনার মূলনীতির সংক্ষিপ্তসার হিসাবে আজও উল্লেখযোগ্য।

"শিক্ষায় পুস্তকের স্থান" সম্বন্ধে একটি আলোচনার উল্লেখ ক'রে আমার বক্তৃতা সুরু ক'রেছিলাম। আমি ঐ রিপোর্টেরই আরম্ভক অনুচ্ছেদ যাতে শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং গ্রন্থাগার তার কতটা সহায়ক হ'তে পারে—এ বিষয়ে আলোচনা আছে তার থেকে আর একটা সন্দর্ভ উল্লেখ ক'রে আমার বক্তৃতা শেষ ক'রতে চাই।

"আমরা এখানে শিক্ষার দু'টি দিকের উপর জোর দিতে চাই—শিশুব্যক্তির বিকাশ সাধন এবং সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিশুর বিকাশসাধন। একদিকে আমরা চাই শিশুর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ ও সুষম বিকাশ—তার আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিক সমস্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ স্ফূর্তি। অন্যদিকে আমরা চাই শিশুর সামাজিক চরিত্রের দৃঢ় ভিত্তি। ক্লাস ঘরের ছোট পরিধি থেকে সুরু ক'রে, খেলার মাঠের, স্কুলের এবং পল্লীর, গ্রাম, নগর ও দেশের বৃহত্তর পরিবেশে শিশুকে যথাযথভাবে চলতে শেখাতে হবে। শেখাতে হবে শিশুকে সারাজগতের পরিবেশের সংগে আপনাকে খাপখাওয়াতে এবং প্রতি ক্ষেত্রে নিজের যথাযথ অংশানুরূপ কাজ ক'রতে।

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে আমরা নিষ্ক্রিয় গ্রহণের চেয়ে সক্রিয় সৃষ্টির উপর বেশী গুরুত্ব দিতে চাই। যথাযথ সমালোচনা আর বিচারের ক্ষমতা

উপযুক্ত অনুরাগ ও রুচি গঠন এক কথায় শুধুমাত্র প্রচলিত জ্ঞান সংগ্রহই নয় জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলা আর এ বিষয়ে ছেলেদের মধ্যে দায়িত্ববোধের উন্মেষ করিয়ে দেওয়াই গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য।

আমরা ছেলেদের পুস্তক সংগ্রহের সংগে পরিচিত ও পুস্তক ব্যবহারে অভ্যস্ত ক'রে তুলতে চাই। আমরা চাই ছেলেরা বই ভালবাসুক—বইয়ের যত্ন নিতে শিখুক, ছেলেরা চিত্তবিনোদনের আর আবিষ্কারের উপকরণ হিসাবে বইকে দেখতে শিখুক। ছেলেরা ক্লাসে যা পড়ে তার পরিপূরক জিনিষ—যাতে আলোচ্য বিষয় ছবি প্রভৃতি দিয়ে বিশদ ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া হ'য়েছে—এমন জিনিষ ছেলেদের হাতে তুলে দেওয়া আমাদের লক্ষ্য। বইয়ের ব্যবহার সম্বন্ধে প্রাথমিক উপদেশ দেওয়া, Project-এর সাফল্যের জন্য বইয়ের ব্যবহার ক'রতে শেখানো, সাধারণ দায়িত্বজ্ঞানের বিকাশসাধন এবং শিশুকে বৃহত্তর গ্রন্থাগার অর্থাৎ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহারে উপযুক্ত ক'রে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।

পল্লী-গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে

সৈয়দ আবদুল খালেক
গ্রন্থাগারিক, পুশুলিয়া যুব সঙ্ঘ, বীরভূম

পল্লীঅঞ্চলে গ্রন্থাগার স্থাপনে যে কত কষ্ট সহ্য করতে হয় তা' কেবল পল্লী অঞ্চলের উৎসাহী লোকগণই জানেন। বাংলাদেশের শতকরা কয়জন লোক যে লেখাপড়া জানে এবং সেই শতকরার কত অংশ যে পল্লী অঞ্চলের ভাগে পড়ে সে খবর প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। কাজেই একটা ছোট্ট গ্রাম—যেখানে হয়তো দশ বা বারো জন লোক মাত্র শিক্ষিত, বাকী অর্দ্ধ-শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের দল, সেখানে গ্রন্থাগার স্থাপন যে কি কষ্টকর তা' বলতে গেলে আমার প্রবন্ধ বিরাট আকার ধারণ করবে। কিন্তু চেষ্টা থাকলে সবই হয়। পল্লী অঞ্চলে গ্রন্থাগার করতে গেলে প্রথমতঃ পল্লীবাসীদের প্রতিদিন একজায়গায় সমবেত করে গ্রন্থাগারের নানাদিক আলোচনা করতে হবে এবং গ্রন্থাগারের উপকারিতা সম্বন্ধে তাদের বোঝাতে হবে। তখন তাদের মত একদিন না একদিন ফিরবেই। এরপরই এসে যায় আর্থিক প্রশ্ন এবং এটাই সব

চেয়ে বড় প্রশ্ন। পল্লীঅঞ্চলের গ্রন্থাগারে গেলে দেখা যায় কি—না আছে তাদের ভাল ঘর—না আছে বই রাখবার উপযুক্ত আসবাবপত্র—না তাদের বসবার জায়গা এবং না আছে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা। এই তো আমাদের দেশের পল্লীঅঞ্চলের গ্রন্থাগারের প্রকৃতরূপ। অথচ তাদের গ্রন্থাগার গড়ে তুলবার জন্যে হয়তো এতটুকুও অলসতা নেই। কেবল অভাব তাদের অর্থের। কেবলমাত্র অর্থের অভাবে তারা তাদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে না। আমাদের জাতীয় সরকার গ্রন্থাগারসমূহের প্রসার ও উন্নতিবিধানের জন্যে অনেক বড় বড় পরিকল্পনা করছেন. এ খবর আমরা খবরের কাগজ থেকে দেখতে পাই; এবং সেই পরিকল্পনানুসারে কেবল শহর অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলিই দিন দিন পুষ্টি ও উন্নতিলাভ করছে। পল্লী অঞ্চলের গ্রন্থাগারসমূহের উন্নতি হচ্ছে বা তারা সাহায্য পাচ্ছে এ দৃষ্টান্ত বিশেষ চোখে পড়ে না। চোখে পড়লেও তা একেবারেই নগণ্য, উল্লেখ করবার মতো নয়। শুনা যাচ্ছে যে—আজকাল জাতীয় সম্প্রসারণ কৃত্যক (Block Development Office) থেকে পল্লীর গ্রন্থাগারসমূহকে যথেষ্ট সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমি খুব ভালরূপ জানি বহু গ্রন্থাগারকে তাঁদের কাছে অনেক আবেদন করেও বিফল মনোরথ হতে হয়েছে বা হচ্ছে। যাই হোক পল্লীর গ্রন্থাগারসমূহের আর্থিক অভাবই যে সবচেয়ে বড় অভাব এতে কোন সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে পুস্তক সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। আমার মতে এভার সম্পূর্ণ গ্রন্থাগারিকের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিৎ। গ্রন্থাগারিককে হতে হবে শিক্ষিত, উদারমনা এবং বিভিন্ন পুস্তক ও লেখক সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয়নে আগ্রহান্বিত। বিভিন্ন পুস্তক প্রতিষ্ঠান এর সংগে তাঁর যোগাযোগ রাখাটা একান্ত দরকার। বিভিন্ন সাময়িকী ও মাসিকপত্রিকার দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকাও দরকার। গ্রন্থাগারে বেশ কিছু নভেল রাখলেই যে একটা গ্রন্থাগার পূর্ণাঙ্গ হবে এ ধারণা একেবারে অমূলক। রহস্যোপন্যাসের পক্ষপাতী আমি মোটেই নই। এতে শিক্ষালাভের কিছুই নেই। অবশ্য নভেল যে থাকবে না এমনও নয়। আমাদের সাহিত্যে ভাল ঔপন্যাসিকের অভাব নেই। যথা; শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রবোধ সান্যাল, অনুরূপা দেবী ইত্যাদি অসংখ্য প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক আছেন। এঁদের বই নিঃসন্দেহে রাখা যেতে পারে। তাছাড়া আধুনিক লেখকদেরও বই কিছু রাখা ভাল। যথা, সুবোধ ঘোষ, সন্তোষ ঘোষ, সুশীল জানা, সমরেশ বসু, দীপক চৌধুরী এঁরা হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ আধুনিক লেখকদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রেমেন্দ্র মিত্র·

এঁদের কিছু কবিতার বই রাখতে হবে। শিক্ষামূলক প্রবন্ধের বই যথা: 'বনফুলের' শিক্ষার ভিত্তি, শ্রীশ্রীনিবাস ভট্টাচার্যের শিক্ষাপ্রসংগ ইত্যাদি ধরণের বই রাখতে পারলে তো খুবই ভাল হয়। সমালোচনা, ধর্ম্মপুস্তক, বড় বড় মহাপুরুষদের জীবনী এ সব শ্রেণীর বইও রাখা ভাল। প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকাগুলির সাধ্যানুযায়ী গ্রাহক হওয়া ভাল। এই সংগে আবার পাঠক সমাজের রুচির কথা আপনা আপনিই এসে যায়। প্রায় দুই বৎসর যাবৎ আমি আমাদের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের পদে অধিষ্ঠিত আছি। কিন্তু পাঠকশ্রেণীর রুচি দেখে আমি আমি বড়ই বিরত বোধ করি, তাঁরা চান কেবল নভেল। তাঁদের মতে যে গ্রন্থাগারে রাশি রাশি নভেলে আলমারী ভর্ত্তি সেইটাই ভাল গ্রন্থাগার, অন্যথায় একেবারে বাজে। অবশ্য গ্রন্থাগারে উচ্চ শ্রেণীর পাঠক যে থাকেন না তাও নয়। পাঠকবৃন্দকে কেবলমাত্র নভেল না পড়িয়ে সব শ্রেণীর পুস্তকের প্রতি অনুরাগী করে তোলা গ্রন্থাগারিকের একান্ত কর্ত্তব্য। প্রতিটি পাঠককে করে তুলতে হবে উচ্চমনা এবং সকল শ্রেণীর লেখকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

বিবেকানন্দ পাঠাগার ॥ কাঁদোয়া ॥ নদীয়া।

আগামী ২৫শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৯৭তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে কাঁদোয়া বিবেকানন্দ পাঠাগারের উদ্যোগে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিযোগিতায় রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ ২৫শে চৈত্র। বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্রালাপ করুন। সাহিত্য সম্পাদক, বিবেকানন্দ পাঠাগার। কাঁদোয়া, পোঃ ধর্ম্মদা, নদীয়া।

পরিষদ কথা

বার্ষিক অভিজ্ঞান-পত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের সমাপ্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের গত ২০শে ডিসেম্বর সেনেট হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী মহাশয় কর্তৃক অভিজ্ঞান পত্র বিতরিত হয়। সর্বসমেত ৮৭জন শিক্ষার্থী অভিজ্ঞান পত্র লাভ করেন।

অভিজ্ঞান পত্র বিতরণের পর ডক্টর চক্রবর্তী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন যে গ্রন্থাগারিক বৃত্তির দুইটি দিক আছে—একটি জীবিকার্জন অপরটি সমাজ সেবার সুযোগ, অন্যান্য বৃত্তির অধিকাংশের প্রথমটিই প্রধান। তাই নিজেদের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে গ্রন্থাগারিকদের সর্বদা সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয়, গ্রন্থাগার আজকের দিনে শুধু গ্রন্থের আগার মাত্র নয়; ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী সর্বজনের মানসিক বিকাশ ও উন্নতি সাধনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিহার্য।

আগামী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের আমন্ত্রণক্রমে এ বৎসর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্য নির্বাহক সমিতি ৪ ৫ এপ্রিল নবদ্বীপ সহরে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সম্মেলনের কার্যসূচী ও মূল সভাপতির নাম 'গ্রন্থাগারের' পরবর্তী সংখ্যায় ঘোষিত হইবে। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি সদস্যদের ও গ্রন্থাগার কর্মীদের উপদেশ ও মতামত আহ্বান করিয়াছেন। প্রবন্ধাকারে উপস্থাপিত বিষয়াদি সম্মেলনে আলোচিত হইবে। প্রতিনিধিদের নিকট পূর্বেই প্রবন্ধগুলি মুদ্রিতাকারে প্রেরিত হইবে।

বিশেষ ঘোষণা

পরিষদের হিসাবে প্রকাশ যে বহু সদস্যের ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালের চাঁদা বাকি পড়িয়াছে। চাঁদা নিয়মানুযায়ী পাওয়া না যাইলে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা প্রেরণ অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। আশা করা যায় তাঁহারা এই অসুবিধা উপলব্ধি করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র চাঁদা পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

দি ইষ্ট লাইব্রেরী ॥ সারপেনটাইন লেন ॥ কলিকাতা-১৪ ॥

গত ১৪ই নভেম্বর ইষ্ট লাইব্রেরীর সাধারণ সভায় বাৎসরিক বিবরণী ও আয়-ব্যয়ের হিসাব গৃহীত হয়। সভায় আগামী বৎসরের কার্যনির্বাহক সমিতি নির্বাচিত হয়। নূতন কার্যকরী সমিতিতে শ্রীমৃগাঙ্কমোহন সুর সভাপতি, শ্রীসুশীল গঙ্গোপাধ্যায় সাধারণ সম্পাদক, শ্রীরণেন্দ্রভূষণ ঘোষ গ্রন্থাগারিক এবং শ্রীমানিক দাস কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

কাঁচরাপাড়া প্রগতি পাঠাগার ॥ কাঁচরাপাড়া ॥ চব্বিশ পরগণা ॥

বিগত ১১ই এবং ১২ই জানুয়ারী কাঁচরাপাড়া প্রগতি পাঠাগারের পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ১১ই জানুয়ারী প্রতিনিধি সম্মেলনে পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীজয়ানন্দ ভট্টাচার্য বিগত বৎসরের কার্য-বিবরণী পেশ করেন। সম্মেলনে নয় জন সদস্যকে লইয়া আগামী বৎসরের জন্য একটি শক্তিশালী কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করা হয়।

১২ই জানুয়ারী স্থানীয় সার্কাস ময়দানে প্রকাশ্য সম্মেলনে খ্যাতিমান কবি গোলাম কুদ্দুস এবং সাহিত্যিক প্রদ্যোত গুহ উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ভাষা-সমস্যার উপর এই অতিথিদ্বয়ের ভাষণ বিশেষ মনোজ্ঞ হইয়াছিল। সভাপতির ভাষণে পাঠাগারের মূল সভাপতি শ্রীনরেন্দ্রনাথ মল্লিক সমাজ-শিক্ষায় পাঠাগারের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করিয়া স্থানীয় জনসাধারণের নিকট পাঠাগারকে সর্বতোভাবে সাহায্যের জন্য আবেদন জানান। সভা শেষে বিচিত্রানুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পী উমা নিয়োগী (মাউথ-অর্গান), মঞ্জরী ঘোষাল (কন্ঠ সঙ্গীত), মন্টু চক্রবর্ত্তী, শান্তি সুর, নির্মল মুখার্জি (তবলা সঙ্গত) এবং ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের কলিকাতা কেন্দ্রীয় শাখার শিল্পীবৃন্দ যোগদান করেন।

বিবেকানন্দ পাঠাগার ॥ কাঁদোয়া ॥ নদীয়া ॥

গত ১৬ই ও ১৭ই পৌষ কাঁদোয়া বিবেকানন্দ পাঠাগারের উদ্যোগে অষ্টম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে পুরস্কার বিতরণী

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীচিত্তরঞ্জন খাঁ। প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত বালক বালিকাগণ বিজয়ী হয়ঃ ক বিভাগ শ্রীসুশান্তকুমার মজুমদার; খ বিভাগ শ্রীনিমাইচাঁদ বিশ্বাস। গ বিভাগে শ্রীমিহিরকুমার সাহা। বালিকা বিভাগ কুমারী ছায়া মুখার্জী।

সাধারণ পাঠাগার মদনপুর ॥ নদীয়া ॥

২১শে ডিসেম্বর পাঠাগারের সদস্যবৃন্দ বিশেষ আলোচনা করিয়া সর্বসম্মতি-ক্রমে পাঠাগারের পুরাতন নাম 'আদর্শ সংঘ' পরিবর্তে সাধারণ পাঠাগার নামটি অনুমোদন করেন। ৪ঠা জানুয়ারী উক্ত পাঠাগারে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নূতন কার্যকরী সমিতির শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সহঃ সচিব) সভাপতি, বিশ্বনাথ মণ্ডল সাধারণ সম্পাদক এবং বিভূতি ভূষণ বিশ্বাস গ্রন্থাগারিক, শ্রীগুরুদাস সাহা কোষাধ্যক্ষ এবং শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ রায় হিসাব পরীক্ষক নির্বাচিত হন।

পীর গোরাচাঁদ সাধারণ পাঠাগার ॥ হাড়োয়া ॥ চব্বিশ পরগণা ॥

গত ২৭শে জানুয়ারী গোরাচাঁদ পাঠাগারের উদ্যোগে প্রজাতন্ত্র দিবস সমারোহের সহিত উদযাপিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় থানার বি, ডি, ও শ্রীঅজিত লাল ঘোষ। সভায় পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ কর্তৃক একটি শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। বৈকালে সংগীত ও নাটক অনুষ্ঠিত হয়। সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন রইস আহম্মদ, সেতার বাজান শ্রীঅখিল রায়। নাটকে অংশ গ্রহণ করেন কিশোরী সংঘ ও পাঠাগারের সদস্যবৃন্দ।

জুবিলী গ্রন্থাগার ॥ সিউড়ি ॥ বীরভুম ॥

১২ই জানুয়ারী রবিবার সন্ধ্যায় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমের বিবিদিষানন্দ সভায় পৌরোহিত্য করেন। অধ্যাপক ননীগোপাল সেন, এবং শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্তী স্বামিজীর অবদান সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন। সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ভোলানাথ ভাদুড়ী। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দকে গ্রন্থাগারের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীশ চন্দ্র নন্দী মহাশয় স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।

উচিয়া আঞ্চলিক পল্লী পাঠাগার ॥ উচিয়া ॥ বর্ধমান ।

গত ২৩শে হইতে ২৬শে জানুয়ারী ৪ দিবসব্যাপী পাঠাগার কর্তৃক উৎসব অনুষ্টিত হইয়াছে। নেতাজীর ৬৩ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২৩শে জানুয়ারী পাঠাগারের সভ্য ও স্থানীয় শিশুরা এক প্রভাত ফেরী বাহির করে। পরে পাঠাগার প্রাঙ্গনে এক জনসভা হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীকালীপ্রসন্ন চৌধুরী। সভার প্রারম্ভে সভাপতি নেতাজীর আবরণ উম্মোচন করেন এবং প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। সংঘের সম্পাদক কালাচাঁদ দে এবং আরও অনেকে নেতাজী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন। উৎসব সমাপ্তি হয় ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে। ঐ দিনকার সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীকালাচাঁদ দে।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী ॥ মানকর ॥ বর্ধমান ॥

২৫শে জানুয়ারী বেকালে লাইব্রেরীর একাদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন, বর্ধমান, বীরভূম এবং পুরুলিয়া জেলার সেটেলমেণ্ট অফিসার শ্রীঅনুকুল চন্দ্র সেন। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন পশ্চিম বঙ্গের মাননীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীআব্দুস সাত্তার। বর্ধমান জেলার কতকগুলি ইউনিয়ণ সংস্থার পক্ষ হইতে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে মানপত্র এবং মাল্যদানে ভূষিত করা হয়। সভার প্রারম্ভে সম্পাদক বার্ষিক কার্য বিবরণী পাঠ করেন। প্রধান অতিথি পল্লী সংগঠন এবং পাঠাগার পরিচালন সম্বন্ধে সুদীর্ঘ ভাষণ দেন।

বাদলা পল্লী উন্নয়ন পাঠাগার ॥ সিজারকোন ॥ বর্ধমান ॥

গত ১লা জানুয়ারী ১৯৫৮ পাঠাগারের তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠান হয়। বাদলা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীবৈদ্যনাথ চক্রবর্তী অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বর্দ্ধমান জেলা সোস্যাল এডুকেশন এড্ভাইসারী কাউন্সিলের সদস্যা শ্রীমতী সুচরিতা পাল। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীশম্ভুনাথ শীল বাৎসরিক বিবরণী ও হিসাব পাঠ করেন। কর্ম্ম পরিষদের সভাপতি শ্রীমোহনচাঁদ বন্দোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথি পাঠাগারের বৃহত্তর উন্নতি কামনা করিয়া বক্তৃতা দেন।

রামেন্দ্র সুন্দর স্মৃতি পাঠাগার ॥ জেমো ॥ মুর্শিদাবাদ ॥

রামেন্দ্র সুন্দর স্মৃতি পাঠাগারের পরিচালক সমিতির সভাপতি অজয়েন্দু নারায়ণ রায় মহাশয়ের আকস্মিক পরলোক গমন উপলক্ষে গত ৫ই জানুয়ারী

একটি শোক সভা অনুষ্ঠিত হয় ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সভায় সকলে ১ মিনিট নীরব থাকেন। তাঁহার বিয়োগ বিধুর পরিজনকে সমবেদনা জ্ঞাপনের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অজয়েন্দু নারায়ণ ছিলেন স্বধর্মনিষ্ঠ, নিরভিমান, পরদুঃখকাতর এবং বঙ্গবাসীর একনিষ্ঠ সেবক।

পূর্বাশা গ্রন্থাগার ॥ বালী ॥ হাওড়া ॥

২৯শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগারের উদ্যোগে "গীতা" জয়ন্তী উপলক্ষ্যে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন বেলুড় রামকৃষ্ণ ধর্মচক্রের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী শ্যামাপদ শাস্ত্রী মহাশয়। সভাপতির ভাবগম্ভীর ব্যাখ্যা উদাত্ত কণ্ঠস্বর সকলকে মুগ্ধ করে।

সারস্বত সম্মিলন ॥ উত্তরপাড়া ॥ হুগলী ॥

সারস্বত সম্মেলনের ৪৮শ বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১৩ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করা হয়। ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতি ও সুকুমার চট্টোপাধ্যায় সাধারণ সম্পাদক, অমূল্য ভূষণ চক্রবর্তী গ্রন্থাগারিক, মালতী রায় চৌধুরী পরিচালিকা মহিলা ও শিশু বিভাগ এবং সুকুমার পাল কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ॥ রাজবল হাট ॥ হুগলী ॥

গত ২৬শে জানুয়ারী সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে পাঠাগার প্রাঙ্গনে স্থানীয় পল্লী উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটির সহ সভাপতি শ্রীঅভয়কালী চট্টোপাধ্যায়। সভার উদ্বোধন করেন শ্রীপান্নালাল ভড়। সভাপতি স্বাধীনতার গুরুত্ব বিষয়ে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। এই উপলক্ষে শ্রীহরিসাধন চক্রবর্তী মহাশয়ের পরিচালনায় একটি আবৃত্তি ও হাস্যকৌতুক অনুষ্ঠানে উৎসব প্রাঙ্গন আনন্দ মুখর হয়।

কাদম্বিনী স্মৃতি জ্ঞানাগার ॥ রামকৃষ্ণ বাটী ॥ হুগলী ॥

নেতাজীর জন্ম দিবস পালন এবং জ্ঞানাগারের অষ্টম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীগৌরীপ্রসাদ রায় এবং দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সভাপতি এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। সভায় একটি প্রস্তাবে জ্ঞানাগারের পুরাতন নাম "রামকৃষ্ণ বাণী" জ্ঞানাগারের পরিবর্তে কাদম্বিনী স্মৃতি জ্ঞানাগার নামটি অনুমোদন করা হয়। সভাপতি এইরূপ নামকরণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র কোলে জ্ঞানাগারের প্রসারকল্পে কিঞ্চিৎ জমি দান করিবার প্রতিশ্রুতি দেন এবং কাদম্বিনী নন্দীর পুত্র শ্রীশরৎচন্দ্র নন্দী মহাশয় গৃহ নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, শ্রীনিতাইচরণ কর মহাশয়ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সহযোগিতা এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। সভায় ৫ জন আজীবন সদস্যকে লইয়া একটি কার্য নির্বাহক সমিতি গঠন করা হয়।

বজবজ পাবলিক লাইব্রেরী ॥ বজবজ ॥ চব্বিশ পরগনা ॥

সম্প্রতি পাঠাগারের নিজস্ব ভবনে সভ্যদের বার্ষিক সাধারণ সভা উৎসাহ ও আনন্দমুখর পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১৯৫৮ সালের বাজেট গৃহীত হয়। সম্পাদকের কার্যবিবরণীতে জানা যায় যে, বর্তমানে এই নবনির্মিত গৃহে পাঠাগারের সভ্যসংখ্যা যেরূপভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে পাঠাগারের পরিকল্পনাসমূহ বিশেষ করিয়া নিয়মিত ভাবে পুস্তক লেনদেন, পুস্তকের পরিচয়পত্র প্রবর্তন, ১৯৬১ সালে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করিতে গেলে বজবজ পৌরসভা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অকুণ্ঠ সাহায্যের প্রয়োজন। উক্ত সভায় ১৬ জন সদস্যকে লইয়া ১৯৫৮ সালের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

অন্যান্য রাজ্যের খবর

গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় আহমেদাবাদ

শিল্পনগরী আহমেদাবাদে সম্প্রতি নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। আহমেদাবাদ সহরকে গুজরাটি সংস্কৃতির কেন্দ্র বলা চলে। শিক্ষায়-দীক্ষায়, শিল্পে-সাহিত্যে আহমেদাবাদের ঐতিহ্য উজ্জ্বল। গ্রন্থাগার আন্দোলনের দিক থেকেও আহমেদাবাদ শহর যথেষ্ট উন্নত।

আহমেদাবাদের পৌর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অধীনে একটি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আছে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মোট গ্রন্থ সংগ্রহ তিন হাজারের উপর। এইগুলি সাধারণতঃ গ্রন্থাগারের নিঃশুল্ক পাঠককে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়। ভ্রাম্যমাণ বিভাগ হইতে পাঠকদের বাড়ীতে বাড়ীতে গ্রন্থ সরবরাহ করা হয়। উক্ত বিভাগে প্রায় চার হাজার পুস্তক আছে। সহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বর্তমানে সাত দিন অন্তর গ্রন্থ সরবরাহ করা হয়। সহরের বিভিন্ন ছোট বড় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে দাদাভাই নৌরজি লাইব্রেরী, ভাইশঙ্কর নানাভাই লাইব্রেরী, গিরিধারীলাল উত্তমলাল গ্রন্থাগার, হংসরাজ প্রাগজি হল গ্রন্থাগার গ্রন্থ সংগ্রহে সমৃদ্ধ। এগুলি পৌর প্রতিষ্ঠানের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হইয়া থাকে। এ ছাড়াও সহরের আরও চারিটি গ্রন্থাগারকে পৌর প্রতিষ্ঠান অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন।

কেরালার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে কেরালার মান বহু পূর্ব হইতেই উন্নত। ত্রিবাঙ্কুর কোচিন গ্রন্থশালা সঙ্ঘম (বর্তমানে কেরালা গ্রন্থশালা সঙ্ঘম) রাজ্যে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলন কার্যে বহুদিন হতেই প্রচার ও সংগঠনে রত রহিয়াছে। রাজ্য সরকার রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালন ও পরিদর্শনের ভার সঙ্ঘের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। সঙ্ঘের বহুমুখী কার্যক্রমের মধ্যে রাজ্যের সর্বশ্রেণীর গ্রন্থাগারকে বিজ্ঞানসম্মত পরিচালন পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ দান, বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ও গ্রন্থ বিনিময় এবং সর্বসাধারণকে গ্রন্থাগারমুখী তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করা তন্মধ্যে প্রধান। সারা রাজ্যে গ্রন্থাগারের সংখ্যা বর্তমানে আড়াই হাজারের কাছাকাছি এবং শ্রেণী অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে বার্ষিক ১০০৲ শত হইতে ১০০০৲ টাকা পর্যন্ত সাহায্য দান করা হইয়া থাকে। সঙ্ঘ মালায়লম ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

অন্যান্য দেশের খবর

মধ্যপ্রাচ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের গ্রন্থ বিনিময় কেন্দ্র

কিছুকাল পূর্বে মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলির যৌথ উদ্যোগে দামাস্কাসে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রকাশিত পত্র পত্রিকার

পারস্পরিক বিনিময়ের চুক্তি সাধন। মিশর, সিরিয়া, লেবানন ইহাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। এতদঞ্চলের ইউনেস্কোর কর্তৃত্বাধীন গ্রন্থ বিনিময় সংস্থার অধিকর্তা ডক্টর ডি, আর, কালিয়া যোগদান করেন। এই বৈঠক আহ্বানে ইউনেস্কোর উক্ত শাখা সহযোগিতা করে। মিশরের প্রতিনিধি আবদুল মুনিল ওমর প্রবন্ধাকারে একটি আলোচ্য বিষয় উপস্থাপিত করেন। এই অনুষ্ঠান হইতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে কয়েকটি সুপারিশ জানানো হয়। তন্মধ্যে প্রত্যেক দেশের জাতীয় গ্রন্থাগারে একটি করিয়া সংগ্রহশালা স্থাপন এবং জাতীয় গ্রন্থাগারগুলি হইতে গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন করিবার কথা বলা হয়। মিশরের জাতীয় গ্রন্থাগার ঐরূপ গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সভায় আরও সুপারিশ করা হয় যে, যে সব দেশে এখনও পর্যন্ত জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই সে সব দেশ যেন এই ব্যাপারে উদ্যোগী হন। দেশের মধ্যে পত্র পত্রিকা বিনিময়ের জন্যও জাতীয় গ্রন্থাগারগুলিকে উপদেশ দেওয়া হয়। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে গ্রন্থের বর্গীকরণ ও গ্রন্থাগার পরিচালনের জন্যও সুপারিশ করা হয়। শেষোক্ত বিষয়ে উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য আরব রাষ্ট্রগুলির শীঘ্র আর একটি যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে বিশদ পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত করা হইবে।

পাকিস্তানে গ্রন্থাগার সম্মেলন

গত নভেম্বর মাসে পাকিস্তান গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে সর্বপাকিস্তানী গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'দেশোন্নয়ন কার্যক্রমে গ্রন্থাগারের স্থান' সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল। পরিষদ একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ডক্টর মামুদ হোসেনকে সভাপতি করিয়া একটি নূতন কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে।

বিবিধ বার্তা

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ বিভাগের পুনর্মিলনোৎসব

গত ১৮ই জানুয়ারী সায়াহ্নে আশুতোষ হলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের এক মনোজ্ঞ পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ভাষণে বলেন যে আমাদের দেশে গ্রন্থাগারিকের বেতন যথোপযুক্ত নহে এবং গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদা স্বীকৃতি লাভ করে নাই। গ্রন্থাগার বিনা দেশের শিক্ষা সম্প্রসারণ সফল ও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। এবং ভালো গ্রন্থাগারের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত ও শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের। বেতনের বৃদ্ধি না হইলে উপযুক্ত ব্যক্তিদের এ বৃত্তির প্রতি আকর্ষণ করা যাইবে না। কলেজ ও উচ্চ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের বেতন অধ্যাপক ও শিক্ষকগনের সমতুল হওয়া উচিৎ বলিয়া তিনি মনে করেন।

বর্তমান শিক্ষার্থীদের পক্ষ হইতে শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় সমবেত সকলকে স্বাগত জানাইয়া পুনর্মিলন উৎসবের উদ্দেশ্য ও প্রস্তুতির বিবরণ দান করেন। জাতীয় উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা এবং গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনে কুশলী গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেন।

উৎসবে পৌরোহিত্য করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু। শ্রীবসু তাঁহার ভাষণে এ দেশে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের প্রারম্ভিক পর্যায় হইতে অদ্যাবধি এক ইতিবৃত্ত বিবৃত করেন। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্রমোন্নতি ও গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ বিভাগের কার্যাবলী ও নানাবিধ অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে এযাবৎ ১৮১ জন ডিপ্লোমা পাইয়াছেন এবং তাঁহাদের সকলেই প্রায় বিভিন্ন গ্রন্থাগারে নিযুক্ত আছেন। গ্রন্থাগারিকগণ তাঁহাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অধীত বিদ্যার পূর্ণ প্রয়োগ দ্বারা এ বৃত্তির বিকাশ সাধন করিবেন এ বিশ্বাস তিনি পোষণ করেন।

পুনর্মিলন উৎসবের উদ্যোক্তা বর্তমান শিক্ষার্থীগণ একটি প্রস্তুতি সমিতি গঠন করেন। এতদুপলক্ষে প্রকাশিত একটি মনোরম ক্রোড়পত্রে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত সমুদয় শিক্ষার্থীর নাম, ঠিকানা ও বর্তমান কর্মক্ষেত্রের বর্ণানুক্রমিক এক তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা শ্রীমনোজ রায় রচিত 'তমসাচ্ছন্ন গ্রন্থাগার' নামক একাঙ্কিকা এক সময়োপযোগী নাটিকার অভিনয় করেন। নাটিকাটির বিষয় ও অভিনয় সকলের প্রশংসা অর্জন করে। সাংগীতিক অনুষ্ঠান ও জলযোগ উৎসবটিকে উপভোগ্য করিয়া তুলে।

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় মান-নির্ধারণ (ষ্ট্যাণ্ডার্ডাইজেসন)

আদিম মানুষ নিজ অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে যন্ত্র ও অস্ত্রপাতি তৈরী করতে শেখে। এই কাজে তারা প্রথম শুধু পাথর ও বৃক্ষশাখা ব্যবহার করত। নির্মাণ কৌশলের উৎকর্ষ সাধনের মধ্য দিয়ে মানুষ বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতি তৈরী করতে শিখল। এদের কোনগুলির আকৃতি একই রকম আবার কোনগুলি একই উপাদানে তৈরী, নির্দিষ্ট একটি মান অনুসারে জিনিষ তৈরী করবার পথে একে প্রথম পদক্ষেপ বলা চলে।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানুষ যখন সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে আরম্ভ করল তখন নিজের প্রয়োজনেই মানুষ পারস্পরিক আচরণ ও ব্যবহারের কতকগুলি মান নির্ধারণ করে। সম্ভবতঃ কথ্য ভাষার সৃষ্টি করে মানুষ ভাব বিনিময়ের প্রথম মান নির্ধারণ করে। এইভাবে ক্রমশঃ ধর্মানুষ্ঠান, উপাসনা রীতি, উৎসব পালাপার্বণ, দেশাচার প্রভৃতি অসংখ্য সামাজিক রীতিনীতির উদ্ভব হ'ল। ব্যবহারিক জীবনে আমরা তাই দেখি আমাদের প্রতিটি কার্যকলাপ কতকগুলি নির্ধারিত মান অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। এগুলি হয় আইন দ্বারা অথবা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সৃষ্ট।

অবশ্য বর্তমান শিল্পোন্নয়নের যুগে "মান" (Standard) এবং "মান নির্ধারণ" (Standardization) কথা দুটি শিল্প বিজ্ঞান ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে এই সমস্ত ক্ষেত্রের অনেক কার্যক্রম কোন নির্ধারিত মান অনুসারে চালিত হলে অর্থ, সময়, জিনিষ, জনশক্তি কোন কিছুরই অপচয় ঘটে না।

যদিও বৈষয়িক ক্ষেত্রে মান নির্ধারণ ব্যবস্থার প্রথম প্রচলন হয়, বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানের রাজ্যেও তা ছড়িয়ে পড়েছে। এর দ্বারা কিন্তু মানুষের সৃজনী প্রতিভাকে একটি নির্দিষ্ট ছকে বেঁধে দিয়ে তার স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করা হয় না। অতি প্রাচীন কাল থেকেই জ্ঞানের রাজ্যের কোন কোন ক্ষেত্রে এক একটি নির্দিষ্ট মান অনুসৃত হয়ে আসছে। বৈয়াকরনেরা যে নিয়মকানুন তৈরী

করেছেন তার ফলে কবি বা সাহিত্যিকের ভাব ব্যঞ্জনায় কোন বাধা সৃষ্টি হয়নি তাদের সৃষ্টিধর্মী মনকে শিকলে বেঁধে দেওয়া হয় নি।

গ্রন্থাগারও জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রেরও কতকগুলি কার্যক্রমের মান নির্ধারণ করে দিয়ে উন্নততর উপায়ে গ্রন্থাগারকে সমাজের সেবায় নিয়োজিত করা চলে। এখানে বিচার করে দেখতে হ'বে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এই ভাবে ছক বেঁধে দেওয়া চলে। গোটা গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়ঃ লেখক লেখেন, মুদ্রাকর ও প্রকাশক তা বই হিসাবে বা পত্র পত্রিকায় ছেপে প্রকাশ করেন অর্থাৎ লেখকের সৃষ্টির বাহ্যিক রূপদান করেন, গ্রন্থাগারিক এগুলি সংগ্রহ করে গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনা করেন; এবং পাঠকদের এই সমস্ত দলিল পত্র ব্যবহারে সহায়তা করেন।

শেষের দুই পর্যায়ের সংগে গ্রন্থাগারিকের মুখ্য সম্বন্ধ থাকলেও প্রথম দুই পর্যায়ের সাথে গৌণ সম্পর্ক কোন ক্রমেই গুরুত্বহীন নয়। গ্রন্থাগারিক এই চার পর্যায়েরই মান নির্ধারণে সহায়ক হতে পারেন।

লেখকের সৃষ্টির উপর হস্তক্ষেপ করা চলে না একথা সত্য, কিন্তু বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে লেখককে পরিচালিত করবার জন্য ছক বেঁধে দেওয়া আবশ্যক। বর্তমানে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সারাংশের সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে। বিশেষ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর প্রচলন সমধিক। উদাহরণ স্বরূপ Chemical Abstracts এর নাম করা যেতে পারে। এই সারাংশ কিভাবে তৈরী হবে তার নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। তেমনি বিভিন্ন ধরণের Directory প্রণয়ণ করতে একটি নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করা প্রয়োজন। কলকাতার বর্তমান টেলিফোন Directory যাঁরা ব্যবহার করছেন তাঁরা একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে গ্রন্থাগারিকের পক্ষে এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা অনধিকার চর্চার সামিল হবে কি? গ্রন্থাগারিকের পাঠকদের সাহায্যের জন্য সূত্র-সন্ধানের কাজে অহরহ এ ধরণের বই ব্যবহার করেন। এ সমস্ত বইয়ের সংকলক ও প্রকাশকেরা গ্রন্থাগারিকদের সাথে সহযোগিতা করে লাভবানই হবেন।

তারপর বই ছাপাই ও প্রকাশন। এক বইয়ের সঙ্গে অন্য একটি বইয়ের বাহ্যিক চেহারার অনেক পার্থক্য আছে। যেমন বইয়ের ও লেখকের নাম

পরিচয়াদি সম্বলিত প্রথম পৃষ্ঠা—কেউ প্রকাশকের নাম এ পাতায় উল্লেখ করেন কেউ করেন না। প্রকাশের তারিখও কেউ উল্লেখ করেন, কেউ করেন না। গ্রন্থাগারে সূচীকরণের কাজে এই সমস্ত তথ্য গ্রন্থাগারিকের অবশ্য প্রয়োজনীয়। এ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট মান নির্ধারিত থাকলে গ্রন্থাগারিক ও প্রকাশক উভয়েরই সুবিধা হয়। ছাপার ভুল সংশোধন করবার জন্যও অনুরূপ নিয়মকানুন থাকলে ছাপার কাজে বিড়ম্বনার সৃষ্টি হবে না। এই প্রসঙ্গে বই বাঁধাইয়ের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রন্থাগারিকেরা পুরাণো বই অথবা পত্র-পত্রিকা নিজেদের পছন্দমত বাঁধাই করে থাকেন—কিন্তু নতুন বই বাঁধাইয়ের ব্যাপারে প্রকাশকরা নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করেন। আজকাল নতুন বই বাঁধাই সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ উঠছে। এই সমস্ত বইয়ের আয়ুষ্কাল এক মাসও নয়। ফলে বই ব্যবহারকারী ব্যক্তিবিশেষ ও গ্রন্থাগারকে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।

তৃতীয় পর্যায়ে গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে মাননির্ধারণের ব্যবস্থা অবলম্বনের আশু প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আজ যত বেশী অনুভূত হচ্ছে পাঁচ বছর আগেও তত হয় নি। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার, সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সর্বত্র হয় নতুন গ্রন্থাগার স্থাপিত হচ্ছে অথবা পুরানো গ্রন্থাগারের সংস্কার ও পরিবর্ধন চলেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে প্রতিটি জেলায় নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়ে যাবে। পল্লী অঞ্চলের সর্বত্র এই গ্রন্থাগার সমূহের শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে পড়বে। এর জন্য গৃহনির্মাণ ও আসবাবপত্র তৈরীর খাতে অজস্র অর্থব্যয় হবে। কিন্তু অনেক গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকের বক্তব্য শুনতে হয় রাজী নন না হয় তাঁদের মতামতকে উপেক্ষা করেন। আমরা এমন কর্তৃপক্ষের কথা জানি যাঁরা অর্থের অপচয় নিবারণের জন্য ক্যাটালগ কার্ডে হাতে লাইন টানতে নির্দেশ দিয়েছিলেন! স্বভাবতঃই অনভিজ্ঞ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে যা তৈরী হল তা নিয়ে গ্রন্থাগারিককে বিভ্রাটের সম্মুখীন হতে হয়। অথচ এই ব্যাপারে যদি মান-নির্ধারিত থাকে তবে কাজ সহজতর হয়, কর্তৃপক্ষ ও গ্রন্থাগারিকের ভিতর অকারণ মতভেদ বা অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় না। উপরন্তু সাজ সরঞ্জাম সরবরাহকেরও সুবিধা হয়।

চতুর্থ পর্যায়ের মধ্যে গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য নিহিত আছে। সে উদ্দেশ্য হ'ল পাঠকদের সেবা। মানুষের জ্ঞানের পরিধি সভ্যতার ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বেড়ে চলেছে। অজস্র বই ও পত্র পত্রিকার মাধ্যমে সেই জ্ঞান পাঠকদের জন্য পরিবেশিত হচ্ছে। এদের সংখ্যা এত দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে যে তাদের হদিস রাখা আজ অসম্ভব হয়ে পড়েছে; জ্ঞানের দেশে যেন বিশৃঙ্খলার রাজত্ব। এই অমূল্য সম্পদকে এমনভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখতে হবে যেন প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠকদের হাতে তাদের খুব সহজেই তুলে দেওয়া যায়। এইভাবে জ্ঞানের দলিলপত্র আহরণ, সংরক্ষণ ও পুনঃ পরিবাপ্তির বিভিন্ন পদ্ধতিকে সমগ্রভাগে ইংরাজীতে Documentation Work বলা হয়। আজকের গ্রন্থাগারের সাফল্য-মাপকাঠি Documentation Service। গ্রন্থাগারের সমস্ত দলিল পত্রের বর্গীকরণ সূচীকরণ, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রবন্ধাদির সারাংশ সংকলন, গ্রন্থ ও প্রবন্ধ তালিকা সংকলন প্রভৃতি পদ্ধতিগুলি এর আওতায় পড়ে। কিন্তু এই সমস্ত পদ্ধতির জন্য আমরা মুখ্যতঃ বিদেশী নিয়মকানুনের মুখাপেক্ষী। এর অর্থ এই নয় যে সমস্ত বিদেশী মানই আমরা বর্জন করব। আজকের ব্যাপকতর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি আন্তর্জাতিক রূপ আছে। এই ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য আন্তর্জাতিক আইনকানুনের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু আমাদের এমন কতকগুলি সমস্যা আছে যার সমাধানের হদিস আমরা সেখানে পাব না। যেমন সূচীকরণের কাজ। এই কাজে বহু ভাষাভাষীর দেশ ভারতবর্ষের নিজস্ব রীতিনীতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এমনকি প্রত্যেক ভাষার জন্য পৃথক নিয়মাবলী রচিত হওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে সূচীকরণ সম্পর্কিত সংজ্ঞা সংকলন, বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসের নিয়মাবলী প্রণয়নের ও ভারতীয় নামের সমস্যার সমাধানের কথাও চিন্তা করতে হবে। শেষের দুটো শুধু সূচীকরণের কাজে সহায়তা করবেনা, ভোটার তালিকা প্রণয়ন, টেলিফোন Directory সংকলনের কাজেও সহায়ক হবে।

সমস্ত দেশেই মাননির্ধারণের দায়িত্ব জাতীয় মানক সংস্থার উপর ন্যস্ত থাকে। বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও সংস্থার সহযোগিতায় মানকসংস্থা এ কাজ করে থাকেন। আমাদের দেশেও স্বাধীনতার পরে "ভারতীয় মানকসংস্থা" সংগঠিত হয়েছে। অত্যন্ত আনন্দের কথা গ্রন্থাগারের সমস্যার প্রতি এঁদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ ডাঃ এস, আর,

রঙ্গনাথনের সভাপতিত্বে মানকসংস্থার Documentation বিভাগের উপর গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় মান প্রস্তুত করবার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এই বিভাগে গ্রন্থাগারিক, প্রকাশক, মুদ্রাকরেরা আছেন। ইতিমধ্যেই গ্রন্থাগার সম্পর্কিত কয়েকটি মান প্রকাশিত হয়েছে। "ভারতীয় মানক সংস্থার" সাম্প্রতিক মাদ্রাজ সম্মেলনে এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শিক্ষা বিভাগের পুনর্মিলনোৎসব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের (ডিপ-লিব্) বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের এক পুনর্মিলন উৎসব সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অন্যান্য পুনর্মিলন উৎসবের অনুষ্ঠানসূচী যেমন হয়ে থাকে, অর্থাৎ বক্তৃতা, সঙ্গীত, অভিনয়, জলযোগ — এর কোনটিরই ত্রুটি ছিল না এ অনুষ্ঠানে, অভ্যাগতদের সমাগমও বেশ ভালই হল। কিন্তু পুনর্মিলন উৎসবের এই গতানুগতিক রূপ ও ধারার পরিবর্তনের প্রয়োজন অনেকেই অনুভব করেন। বিশেষ করে বৃত্তিমূলক শিক্ষণপ্রাপ্তদের যাদের জীবিকার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা।

নৃত্যগীত আর অভিনয়াদি তো সকলে সারাবছরই উপভোগ করেন। কিন্তু সম্বৎসরে একদিন পুরোনো সহপাঠীদের পুনর্মিলনে পুরোনো সম্পর্ক ঝালিয়ে নেবার ও পারস্পরিক বৃত্তিগত অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার প্রশ্ন উপেক্ষণীয় নয়।

গ্রন্থাগারিকদের পুনর্মিলন উৎসবে তিনটি দিক থাকা উচিত। প্রথম, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় ও মেলামেশার সুযোগ। দ্বিতীয়, বৃত্তির যথাযোগ্য স্বীকৃতি ও পারিশ্রমিক সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা ও তৃতীয়, গ্রন্থাগার বিদ্যার বিকাশ ও বিস্তার বিষয়ে প্রবন্ধপাঠ ও শিক্ষার আয়োজন।

দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সুপরিচালনা ও আগামী দিনের দেশব্যাপী সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাফল্য গ্রন্থাগার বিদ্যায় শিক্ষণপ্রাপ্তদের উপর বহুলাংশে নির্ভর করছে। তাই তাদের পুনর্মিলন উৎসব নিছক প্রমোদমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। প্রমোদানুষ্ঠানের সঙ্গেই উক্ত দিকগুলির ব্যবস্থা এতে থাকা উচিত।

আশা ও আনন্দের কথা যে এবারের উৎসবে একটি এলামনি পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এর কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য তাঁদের উক্ত বিষয়ে বিবেচনা করতে অনুরোধ জানাই।

॥ দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ॥

৪ঠা—৫ই এপ্রিল ১৯৫৮

[স্থান : নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার, নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া]

৬ই মার্চ, ১৯৫৮

সবিনয় নিবেদন :

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের আমন্ত্রণে আগামী গুড্-ফ্রাইডের ছুটিতে নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুদ্দেশ্যে নবদ্বীপ সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি বাগচী এই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পথিকৃৎ পদ্মশ্রী ডক্টর এস্, আর, রঙ্গনাথন্ এই সম্মেলনের মূল-সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন।

আমাদের শিক্ষা ও সমাজ সংগঠনে গ্রন্থাগার ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে চলিয়াছে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার-সংগঠনের যথোপযুক্ত পথ-নির্দেশের জন্য এই সম্মেলন যাহাতে সার্থক হইয়া উঠে, তাহার জন্য আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করিতেছি। আপনাদের সুচিন্তিত ও সমবেত আলোচনায় সম্মেলন সফল ও সার্থক হউক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

সম্মেলনে আলোচনার জন্য সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধাদি আগামী ২০শে মার্চের মধ্যে পরিষদ-কার্যালয়ে প্রেরিতব্য। সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণকে অবিলম্বে পরিষদ-সম্পাদকের সহিত যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

নির্মল চৌধুরী
গৌরাঙ্গচন্দ্র কুণ্ডু
সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি
দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন
নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার, নবদ্বীপ

রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস
সম্পাদক
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
৩৩, হুজুরিমল লেন
কলিকাতা—১৪

গ্রন্থাগার

৭ম বর্ষ] ফাল্গুন : ১৩৬৪ [১১শ সংখ্যা

ভারতের আগামী দিনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

[ফাল্গুনের ৯ই তারিখে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জীবনাবসানে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। জননায়ক মনীষী মৌলানা সাহেবের দেশপ্রেম, প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য সুবিদিত। জাতির শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উজ্জীবনে তাঁহার সক্রিয় উৎসাহ ও অবদান চিরস্মরণীয় থাকবে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নয়নেও তাঁহার আগ্রহ ও অনুরাগ ছিল অসীম। মৌলানা সাহেবের পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া গ্রন্থাগার সম্বন্ধে প্রদত্ত তাঁহার একটি ভাষণ নিম্নে প্রকাশ করা হইল]

জাতির ভিতর জ্ঞান সম্প্রসারণে গ্রন্থাগারের এক বিশেষ ভূমিকা আছে, সে কথা আজ আর নতুন করে বলার প্রয়োজন করে না; গ্রন্থাগারের ভিতর প্রাচীন জ্ঞান যেমন সঞ্চিত রয়েছে, তেমনি ছড়িয়ে রয়েছে নতুন জ্ঞানের বীজ। জাতীয় শিক্ষা উন্নয়ণ পরিকল্পনায় তাই এর সুষ্ঠু প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন। কার্লাইল এক সময়ে গ্রন্থাগারকে আধুনিক যুগের বিশ্ববিদ্যালয় বলে অভিহিত করেন— একথা এশিয়ার দেশগুলির পক্ষে আরো বেশী সত্য। লক্ষ লক্ষ মানুষ যেখানে মাধ্যমিক শিক্ষা পায় না সেখানে কলেজীয় শিক্ষার কথা একান্ত অবান্তর। গ্রন্থাগার মারফৎ এ অভাব পূরণ সম্ভব। Unescoর সহযোগিতায় দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী—গ্রন্থাগার কিরূপে জনপ্রিয় শিক্ষা দিতে পারে তার একটি সুন্দর নিদর্শন তুলে ধরেছে।

এশিয়া খণ্ডে গ্রন্থাগারগুলির কার্যকারিতা দুটি কারণে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য; কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় পশ্চিম ইউরোপের জনসাধারণ মানুষের চলমান উচ্চতর সভ্যতার দৌড়পাল্লায় ষোড়শ শতাব্দী থেকেই এগিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে উচ্চস্থান অধিকার করে বসেছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে এই শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে যে, পৃথিবী তার কোন অংশের মনুষ্য

সমাজকে পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে না। অগ্রসর দেশের সঙ্গে অনগ্রসর দেশের সমতার মধ্যেই পৃথিবীর শান্তি, উন্নতি ও সকলের প্রগতি নির্ভরশীল। তাই রাজনীতি ক্ষেত্রে উপনিবেশের অবলুপ্তি এবং আর্থিক ক্ষেত্রে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ শেষ হতে চলেছে। এই অসাম্য দ্রুত দূর করতে হলে শিক্ষা-ক্ষেত্রেও সাম্য প্রয়োজন। পৃথিবীর অল্পশিক্ষিত অংশগুলি সমস্ত প্রকারেই পশ্চাতে আছে। তাই এদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। অগ্রসর দেশগুলি তাদের জ্ঞান সম্পদ ও কারিগরী বিদ্যা যদি এঁদের দান করে তবেই সাম্য সম্ভব। কারিগরী বিদ্যার জন্য পুস্তক ও তথ্যাবলী একান্ত প্রয়োজন। জ্ঞানের অসাম্য দূরীকরণে গ্রন্থাগারগুলির সমাজ জীবনের ভূমিকা এখানেই।

দ্বিতীয়তঃ ভারতের জনসংখ্যা যেখানে ৩৬ কোটি সেখানে তার গ্রন্থাগার মাত্র ৩২ হাজার। বস্তুত তাও আবার নামে মাত্র আছে এমন সংখ্যাও কম নয়। ভাল গ্রন্থাগারের প্রাথমিক একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্তর তাও এদের অনেকের নেই। মাথা পিছু ৫০ জনে একখানি পুস্তক। তার ভিতর শতকরা দশ জনকে একখানি পুস্তক নিয়ে সারা বৎসর সন্তুষ্ট থাকতে হয়। বিরাট অশিক্ষিত জনসংখ্যার কথা ছেড়ে দিয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষিত জনসাধারণের কথা যদি বেশী করে ধরা যায় তবুও গড়ে বছরে একখানি মাত্র পুস্তক তাঁরা পড়েন। এ অবস্থার সঙ্গে যদি আমরা আমেরিকা বা ইংলণ্ডের তুলনা করি তবে আমরা কোথায় আছি তা সহজেই অনুমান করা যাবে। ইংলণ্ডের একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ভারতের একজন শিক্ষিত ব্যক্তির তুলনায় সাতগুণ বেশী পুস্তক পড়েন।

যে রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক জীবন পদ্ধতি বেছে নিয়েছে সে রাষ্ট্র কখনও তার জনসাধারণকে অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার ভিতর রাখতে পারে না। জাতির সম্মান ও ভবিষ্যৎ শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রে জনগণের গুণগত উৎকর্ষের উপরই নির্ভরশীল। এই সমস্ত কারণে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির প্রয়োজন।

ভারতের অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় ভারত পশ্চাতে ছিল একথা মনে হবে না। বৌদ্ধযুগের ও অন্যান্য প্রাচীনকালের বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে সুন্দর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে ঐতিহ্য আমাদের আছে তা ভোলা যায় না। মধ্যযুগের সুলতানগণ ও মোঘলযুগের সম্রাটগণের পুস্তক প্রীতির কথাও স্মরণীয়; মোঘলযুগে প্রতিষ্ঠাবানদের নিজস্ব গ্রন্থাগার রক্ষা করা একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে ছিল। এমন কী, এক সময়ে ব্যক্তির আভিজাত্য নির্দ্ধারণ হ'ত তার নিজস্ব গ্রন্থাগার আছে কী না তার মাপকাঠিতে। এই গ্রন্থাগারগুলির ফল-

ভোগী ছিল রাজা রাজড়া সম্প্রদায়। ফলে জনসাধারণের ভিতর জ্ঞানের প্রসার হোতে পারে নি। বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ তার অতীতের শিক্ষা নিয়ে সমস্ত নাগরিক যেন সমান ভাবে শিক্ষার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করছে। এই প্রচেষ্টায় বাধা অনেক। ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দুর্বলতা শুধু অর্থাভাব জনিত নয়, ভাল যথেষ্ট পরিমাণ ভাল পুস্তক প্রকাশনের অভাবই হচ্ছে সত্যকার কারণ। বিশেষ প্রচেষ্ঠার দ্বারা সংখ্যাগত ও গুণগত উৎকর্ষ ছাড়া যদি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হয় তবে তার দ্বারা সমাজের অকল্যাণ সাধনই করবে। সস্তা চাঞ্চল্যকর পুস্তকের বিলি ব্যবস্থা যদি বর্ত্তমানের মত অবাধ গতিতে জনসাধারণের ভিতর চলতে থাকে তবে তার ফলে রুচির মান নেবে যাবে ও সমাজের অকল্যাণের পথই প্রশস্ত হবে।

কিছু পূর্বেও গ্রন্থাগারিকদের কর্ত্তব্য বলতে বুঝাত পাঠকদের শুধু চাহিদা অনুযায়ী পুস্তক সরবরাহ করা। কিন্তু বর্ত্তমানে তা পাল্টে গেছে। আজ আর শুধু অধিক সংখ্যক পুস্তক অধিক সংখ্যক পাঠকের কাছে পৌঁছিয়ে দিলেই তার কর্তব্য শেষ হচ্ছে না। ভাল পুস্তক পড়ানর দায়িত্ব তার এসে গেছে। ভাল পুস্তক যাতে প্রকাশ করা যায় তার জন্য লেখক নির্বাচন, সুন্দর ছাপার ব্যবস্থা, সহজ চিত্তজয়ী পুস্তক ও সস্তা ছাপার পথ আবিষ্কার করতে হবে। এ বিষয়ে ভারত সরকার এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা ঠিক করছেন সস্তায় ভাল বই প্রকাশ করবেন। ভারতীয় যে কোন ভাষায় প্রকাশিত সদ্য সাক্ষর লোকদের জন্য উপযুক্ত পুস্তককে পুরস্কৃত করা হবে।

এই সমস্ত পুস্তক জনসাধারণের আধুনিক মন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিগঠনে যেমন সাহায্য করবে তেমনি প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধ'রে রাখারও সহায়ক হবে। লেখক ও প্রকাশককে উৎসাহিত করার জন্য ঐ পুস্তক সমূহ অমুদ্রিত অবস্থায়ও যাতে পেশ করতে পারে তার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। পুরস্কার প্রাপ্ত পুস্তকগুলি ১০০০ কপি সরকার কেনবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পুরস্কার প্রাপ্ত পুস্তকগুলির ভিতর আবার ৫ খানি শ্রেষ্ঠ পুস্তককে বিশেষ পুরস্কার ও সর্বভারতীয় স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। ঐ পুস্তক ৫ খানি প্রতিটি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের দায়িত্ব ও ১০০০ কপি কেনার দায়িত্ব ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন। এ দ্বারা লেখক বা প্রকাশককেই শুধু উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে না, ভারতীয় সাহিত্য গড়ে তোলার সাহায্যও হচ্ছে।

ভারত সরকার জনসাধারণের ভিতর সৎসাহিত্য প্রচারের জন্য জাতীয় পুস্তক ভাণ্ডার গঠন করেছেন। এই ভাণ্ডারের উপরেই ভারতীয় ক্লাসিক সাহিত্য ও সমস্ত বিষয়ে মান সম্মত পুস্তক এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিখ্যাত পুস্তকের অনুবাদের ভার ন্যস্ত।

জনসাধারণ যাতে সস্তায় ভাল বই পায় তার জন্য এই সংগঠন বিশ্ব-বিদ্যালয় ও অনুমোদিত সংস্থাগুলিকে পুস্তক প্রকাশের জন্য সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ।

আমাদের সমস্যা সম্বন্ধে সরকারের এই হচ্ছে মোটামুটি নীতি। ভারতবর্ষ মূলতঃ গ্রাম্য অবস্থার দিক থেকেই পিছিয়ে আছে। এই কারণেই গ্রামেতে বিশেষ ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সহরের চেয়ে ঢের বেশী প্রয়োজন। এই জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় জিলা গ্রন্থাগারকে শিরোমণি করার ব্যবস্থা হয়েছে। জিলা গ্রন্থাগার ভ্রাম্যমান বিলি ব্যবস্থার মারফৎ নূতন পুস্তক গ্রামের লোকেদের কাছে নিয়ে যাবে এবং পঠিত পুস্তক প্রধান কার্য্যালয়ে ফিরিয়ে আনবে। ভারতের ৩২০টি জিলার ভিতর প্রায় ১০০টি জিলায় এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সম্পন্ন হয়েছে বা হ'তে চলেছে। ১৯৬১ সনের ভিতর ভারতের সমস্ত জিলায় জিলা গ্রন্থাগার ভ্রাম্যমান বিলি ব্যবস্থা সহ গড়ে তোলা হবে। জিলা গ্রন্থাগার রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কাছ থেকে সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করবে। এই কেন্দ্রে গ্রন্থাগারগুলি আবার চারিটী জাতীয় গ্রন্থাগার যথা কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও সর্বশেষ দিল্লীর জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। এই ব্যবস্থা শুধু ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থারই সুষ্ঠু সংযোগ সাধন করবে না। পরন্তু Unesco'র সহযোগিতায় পৃথিবীর এই অংশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কার্য্যকরী হয়ে উঠবে। Unesco অতি অল্পদিনের মধ্যেই সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় একটি সুন্দর ঐতিহ্য গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত গ্রন্থাগারই Unesco'র ৫ খণ্ডে প্রকাশিত ম্যানুয়েলস্ দ্বারা উপকৃত।

[দিল্লীতে ইউনেস্কো কর্ত্তৃক আহূত এশিয়ান লাইব্রেরী সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধের অংশ বিশেষের অনুবাদ]

কোলন্ বর্গীকরণ

প্রমোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কোলন্ বর্গীকরণ ভারতের নিজস্ব। ইহার সৃষ্টিকর্তা এস, আর, রঙ্গনাথন্। ১৮৯২ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়ায় এঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৯১৭-১৯২০ সাল পর্যন্ত ইনি মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট কলেজে এবং ১৯২০-'২৩ সাল পর্যন্ত মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপকের কাজ করেন। পরে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের পদলাভ করিয়া তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গ্রন্থাগারিক বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। এখানে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ডাইরেক্টরের পরামর্শে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক বিদ্যা শিক্ষা করেন। শিক্ষান্তে তিনি মাদ্রাজে ফিরিয়া আসেন এবং স্বদেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসার লাভের জন্য কৃতসংকল্প হ'ন। তাঁহার চেষ্টায় মাদ্রাজে মাদ্রাজ লাইব্রেরী এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হন এবং ১৯২৯ সালে মাদ্রাজে গ্রন্থগারিক বৃত্তি শিক্ষা কেন্দ্র প্রবর্তিত হয়। বহুকাল মাদ্রাজে কাজ করিবার পর তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞাণের অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। ১৯৪৭ হইতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। Abgila, Annals of Library Science, ইত্যাদি পত্রিকা তাঁহারই রচিত, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর প্রায় ২৫টি বিখ্যাত গ্রন্থের ইনি রচয়িতা এবং বহু সরকারী ও বে-সরকারী উপদেষ্টা মণ্ডলীর ইনি একজন বিশিষ্ট সভ্য। জ্ঞানী, গুণী সুবক্তা এই মনীষী অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করেন। এই মনীষীকে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টরেট উপাধি দিয়া এবং ভারত সরকার পদ্মশ্রী উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে নিযুক্ত হইবার পর রঙ্গনাথন ভারতীয় গ্রন্থাগারের উপযোগী বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করেন। ইংলণ্ডে গ্রন্থাগার বিদ্যা শিখিবার পরও তাঁহার মন পরিবর্তিত হয় নাই। বিভিন্ন পাশ্চাত্য বর্গীকরণ পদ্ধতির একটিও তাঁহার চিত্ত জয় করিতে পারে নাই। তিনি নিজেই এক অভিনব বর্গীকরণ সৃষ্টি করেন ও মাদ্রাজ বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে উহা প্রয়োগ করিয়া সাফল্য লাভ করেন। ১৯৩৩ সালে তাঁহার Colon Classification প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯৫৭ সালে পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

কোলন বর্গীকরণে স্বয়ং সম্পূর্ণ তালিকা (Schedule) ও তাহার সংকেত (Notation) দেওয়া নাই, অন্যান্য পাশ্চাত্য বর্গীকরণে যাহা আমরা দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য বর্গীকরণকে ennumerative বলা যাইতে পারে। কিন্তু কোলন বর্গীকরণ analyticosynthetic। কতকগুলি standard unit—schedule লইয়া এই বর্গীকরণ। Meccano set এ কতকগুলি standard টুকরো থাকে। এই টুকরোগুলি বিবিধ প্রকারে সাজাইয়া বল্টু দিয়া আঁটিয়া ইচ্ছামত বিবিধ model সৃষ্টি করা যায়। কোলন বর্গীকরণের standard unit—schedule এর সংকেতগুলি প্রয়োজন অনুযায়ী একত্রিত করিয়া বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারের যে কোন বিষয়বস্তুর সংকেত সৃষ্টি করা যায়। বর্গীকরণে colon (:) Meccano set এর নাট ও বল্টুর কাজ করে। এইজন্য রঙ্গনাথনের বর্গীকরণ পদ্ধতির নাম Colon Classification।

"Phase", "Facet", আর "Focus" এই তিনটি বিশেষ শব্দ কোলন বর্গীকরণে ব্যবহৃত হয়েছে। মোটামুটি ভাবে বলিতে পারা যায় যে "Phase" বলিতে আমরা পুস্তকের বিষয়বস্তু বুঝি। অনেক সময় একটি পুস্তকের মধ্যে একাধিক বিষয় বস্তু থাকে, যেমন "Mathematics for Engineers" এই পুস্তক খানি। কোন পুস্তকের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিবার জন্য যে বিশেষত্ব (characteristics) ব্যবহৃত হয় তাহাকে "Facet" বলা হয়। যেমন ধরা যাক কোলন এর O বর্গ সাহিত্য (Class O-Literature) রঙ্গনাথন এখানে চারিটি "Facet" প্রয়োগ করিয়াছেন Language, Form, Author, এবং Work। বিষয় বস্তুর কেন্দ্রীয় অর্থকে আমরা "Focus" বলিতে পারি।

কোলন বর্গীকরণ-এর কাঠামো এইরূপ :—

উপযুক্ত প্রত্যেক বর্গকে প্রথমে ক্ষুদ্রতর বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং

1—9 Generalia
Sciences

A Science (general)
B Mathematics
C Physics
D Engineering

Δ Spiritual experience and mysticism
Humanities
N Fine arts
O Literature
P Linguistics
Q Religion

E Chemistry
F Technology
G Natural Science (general) and Biology
H Geology
I Botany
J Agriculture
K Zoology
L Medicine
M (other) applications of Sciences, Useful Arts
R Philosophy
S Psychology
T Education
U Geography
V History
W Political Science
X Economics
Y Other Social Sciences, including Sociology
Z Law

তারপর প্রত্যেক বিভাগকে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন,

C Physics
C 1 Fundamentals
C 2 Properties of matter
C 21 Solid
C 215 Glass
C 216 Crystal
C 5 Liquid
C 8 Gas

প্রত্যেক বর্গের তালিকায় (schedule) আগে যে বিশেষত্বগুলি (characteristics) পরপর প্রয়োগ করিয়া বর্গটি বিভক্ত করিতে হইবে, তাহা দেখানো আছে। যেমন,

Q Religion
Q (R) : (P)

ইহার অর্থ এই যে, "Q"কে প্রথমে নির্দিষ্ট "R" বা Religion দিয়া ভাগ করিতে হইবে এবং তার পর "P" বা Problem দিয়া ভাগ করিতে হইবে।

একটি উদাহরণ লওয়া যাক। 'Q' তালিকায় (schedule) আমরা পাই,

Divisions based on R
1 Hinduism
3 Jainism
4 Buddhism
5 Judaism

Divisions based on P
1 Mythology
2 Scripture
3 Theology
366 Rebirth

যদি "Rebirth according to Jainism" এই পুস্তকটির বর্গীকরণ করিতে হয় তা হ'লে আমাদের সংকেত হইবে Q 3 : 366।

এই উদাহরণ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত প্রত্যেক সংখ্যাকে decimally বিভক্ত করা যাইতে পারে।

"O" বর্গ হইতে একটি উদাহরণ লওয়া যাক্।

O : 2 J64 : 9 G52 Sprague, A. C.—Shakespeare and the audience ; a study in the technique of exposition.

এখানে O মানে সাহিত্য, O : ইংরাজী সাহিত্য, O : 2 ইংরাজী নাট্য সাহিত্য, O : 2 J64 ইংরাজ নাট্যকার যিনি ১৫৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—সেক্সপীয়র (J=15, J 6=156, J 64=1564) O : 2 J 64 : 9 সেক্সপীয়র নাটকের আলোচনা। G 52 পুস্তকের সংকেত। G=193, G5=1935 এবং G52 গ্রন্থাগারের তৃতীয় ইংরাজী পুস্তক সেক্সপীয়রের আলোচনার উপর যাহা ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পাশ্চাত্যের আধুনিক পুস্তক বর্গীকরণ পদ্ধতিতে যে অতি আবশ্যকীয় auxiliary schedules ব্যবহৃত হয়, কোলন পদ্ধতিতে সবগুলির ব্যবহার আছে, যেমন Common Subdivision, Geographical division, Time numbers, Languge numbers ইত্যাদি। একটি Index ও ইহাতে দেওয়া আছে।

এক অভিনব প্রকারের তালিকা (Schedule) এবং বিষয়বস্তুর সংকেত তৈয়ারী করিবার অষ্ট প্রক্রিয়া (Eight devices) কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতিকে বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারের যে কোন বিষয় বর্গীকরণ করিতে উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে।

রঙ্গনাথনের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তিনি বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডার বিশ্লেষণ করিয়া উহার মধ্যে পাঁচটি মূল রূপের সন্ধান দিয়াছেন, যথা Time, Space, Energy, Matter এবং Personality। প্রত্যেক বিষয়বস্তুর মধ্যে এই পাঁচটি মূল রূপের একটি বা অপরটি বর্তমান আছে। শুধু তাহাই নয় ইনি দেখাইয়া দিয়াছেন যে বর্গীকরণ করিতে গেলে একটি শ্রেণীকে বিভক্ত করিবার সময় একবার ততোধিক বিশেষত্ব (Characteristics) একই সময়ে প্রয়োগ করা যায়।

ডক্টর রঙ্গনাথন

অরুণকান্তি দাশগুপ্ত

ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি সম্মত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন ও প্রসারণ নিতান্তই সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। শিক্ষায় অনগ্রসর আমাদের দেশ এবিষয়ে অন্য অনেক দেশ অপেক্ষা অনেক পিছনে। আমরা এখনও নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার মারফৎ আমাদের দেশের সমস্ত জনসাধারণের হাতে বই তুলে দিতে পারিনি। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারে আদর্শ গ্রন্থাগার সৃষ্টি করতে পারিনি। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আদর্শ সমাজব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও ভূমিকার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এখনও পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে বা সভাসমিতিতে প্রস্তাব গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশ্বসভায় আমরা জোর গলায় বলতে পারি যে গ্রন্থাগার পরিচালনার উন্নততর বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্তনে ভারতবর্ষের দান কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। এই ক্ষেত্রে আমাদের দান আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর মূলে রয়েছেন পদ্মশ্রী ডাঃ সিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন। গ্রেট বৃটেনের এডোয়ার্ড এডোয়ার্ডস, জেমস ডাফ ব্রাউন, আমেরিকার মেলভিল ডিউই প্রভৃতি গ্রন্থাগার জগতের দিকপালদের সঙ্গেই ভারতবর্ষের রঙ্গনাথনের নাম উল্লেখ করা চলে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় অনগ্রসর ভারতবর্ষের পক্ষে এ ব্যাপার কম গৌরবের কথা নয়। গত ৩০ বৎসর ধরে রঙ্গনাথন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন সাম্প্রতিক কালের পৃথিবীর কোন গ্রন্থাগারিকের কাছে আমরা তা পাইনি।
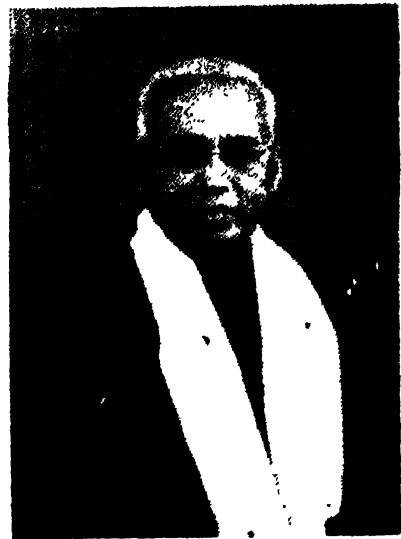
১৮৯২ সালে মাদ্রাজের তাঞ্জোর জেলার সিয়ালী নামক স্থানে তাঁর জন্ম। মাদ্রাজে তিনি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ করেন। ১৯১৫ সালে তিনি গণিত শাস্ত্রে এম-এ পাশ করেন। শিক্ষকতা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সেজন্য তিনি সায়েদাপেট Teachers Collegeএ শিক্ষণ শিক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করেন এবং ম্যাঙ্গালোর গভর্ণমেণ্ট কলেজে অধ্যাপনা সুরু করেন। ১৯২১ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিত শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গণিতশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির গ্রন্থাগারিক বৃত্তির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। ফলে তাঁর চিন্তাধারা স্বভাবতঃই সুশৃঙ্খল ভাবে বিন্যস্ত ছিল। সেজন্যই তিনি উপলব্ধি করলেন যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত তথ্য হ'ল চিন্তা ও জ্ঞানের রাজ্যে শৃঙ্খলা আনা।

১৯২৪ সালে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হলেন। ভারতবর্ষ তাঁর একজন উদীয়মান গণিতবিদ্ তরুণ অধ্যাপককে হারাল কিন্তু সমগ্র শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগৎ তাকে নতুন করে পেল। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার পর তিনি গ্রন্থাগারিক বৃত্তির উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইংলণ্ডে যান। সেখানে বর্গীকরণ শাস্ত্রের সুপণ্ডিত Sayers তাঁর অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। ইংলণ্ডের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় তিনি বিভিন্ন ধরণের এবং কোন ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী রীতিপদ্ধতির প্রচলন দেখলেন। গ্রন্থাগার কার্যক্রমের সমগ্র পর্যায়ের এই বিভিন্নতা তিনি নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন। তাঁর বিজ্ঞানী মন দিয়ে এগুলিকে বিশ্লেষণ করে সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল সূত্রগুলিকে তিনি আবিষ্কার করলেন। তাঁর বিখ্যাত "Five Laws of Library Science" মুখ্যতঃ এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফল। গ্রন্থাগারিক বৃত্তির যে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে তা বোধ হয় এই বই প্রকাশের আগে কোন দেশেই এমন সুনির্দিষ্টভাবে কেউ চিন্তা করেননি। বস্তুতঃ "গ্রন্থাগার বিজ্ঞান" কথাটির ব্যাপক প্রচলন সুরু হয় এই বই প্রকাশিত হবার পর।

এখানকার শিক্ষা শেষ করে রঙ্গনাথন ১৯৩০ সালে ইংলণ্ডের Library Association এর Fellow পদে নির্বাচিত হন।

দেশে ফিরে আসার পর ইংলণ্ডের অভিজ্ঞতা এবং নিজস্ব ভাবধারার সংমিশ্রণে ভারতবর্ষের উপযোগী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক রূপ দেবার অতন্দ্র সাধনা সুরু করলেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার তাঁর হাতে নতুন রূপ পেল। তাঁর নেতৃত্বে মাদ্রাজ গ্রন্থাগার সংঘের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হ'ল। আমাদের

দেশে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজে একটা ভাসা ভাসা রকমের উপলব্ধি ছিল। গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগারিকবৃত্তির তেমন স্বীকৃতি ছিল না। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার খসড়া পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন এবং গ্রন্থাগার আইনের খসড়া প্রস্তুত করলেন। তথ্য ও যুক্তি সমৃদ্ধ তাঁর পরিকল্পনা শিক্ষা জগতের অভিনন্দন লাভ করল। তাঁর নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলেই মাদ্রাজে ১৯৪৮ সালে প্রথম গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হ'ল। তিনি আরও কয়েকটি রাজ্যের জন্য গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং গ্রন্থাগার আইনের খসড়া প্রস্তুত করে গিয়েছেন। ভারতবর্ষে শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি স্তরে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করাই তাঁর স্বপ্ন।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৯৪৬ সালে তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য স্যার মরিস গায়ারের আমন্ত্রণক্রমে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অবৈতনিক অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংগঠনে কুশলী গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজনীয়তা রঙ্গনাথন উপলব্ধি করেছিলেন। সেজন্য মাদ্রাজে গ্রন্থাগারিকবৃত্তি শিক্ষণ ব্যবস্থার সৃষ্টি করে যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন দিল্লীতে তা বাস্তবে রূপায়িত করলেন। উচ্চতর পর্যায়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমান মর্যাদা পেল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার জন্য Doctorate Degree-র ব্যবস্থা হয়েছে। দিল্লীতে থাকার সময় তাঁকে কেন্দ্র করে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি পাঠচক্র গড়ে উঠেছিল। রঙ্গনাথন বলেছেন এই পাঠচক্র এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্গীকরণ শিক্ষকতা Colon বর্গীকরণ পদ্ধতির উন্নতি ও বিকাশে অনেক সহায়তা করেছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের উন্নততর ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তাঁর নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা শুধু শিক্ষকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সম্প্রতি এই উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত সঞ্চয় এক লক্ষ টাকা দান করেছেন।

১৯৪৮ সালে রঙ্গনাথন ইয়োরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন। সে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ও গ্রন্থাগারিকদের সঙ্গে ভাব ও মতামত বিনিময় করা এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল।

রঙ্গনাথন ভারতীয় গ্রন্থাগার সংঘের সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। তিনি U. N. O , Unesco, International Federation for Documentation, International Federation of Library Association এবং International Standard Institution প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে জড়িত থেকেছেন। তিনি ভারতীয় গ্রন্থাগার সংঘের পত্রিকা Abgilaর সম্পাদনাও করেছেন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা প্রশাখা নেই যার সম্বন্ধে রঙ্গনাথন কিছু লেখেননি। তাঁর কলম খুব সাবলীল—তিনি অজস্র লিখেছেন। শুধু গ্রন্থাগার বিজ্ঞান নয়—শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধেও তিনি লিখেছেন। শ্রীকে, এস. শিবরমন মডার্ণ লাইব্রেরীয়ান পত্রিকায় (জানুয়ারী-জুন ১৯৪৩ পৃঃ ১০৬—১৩৪) ১৯৪২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত রঙ্গনাথনের লেখার একটি সূচী প্রকাশ করেছিলেন। এই সূচীতে তিনি বই ও পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ নিয়ে ৪২০টী লেখা অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তারপর ১৬ বছর কেটেছে। গ্রন্থাগারের নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে—এর রীতি পদ্ধতি অনেক উন্নততর হয়েছে। রঙ্গনাথনের লেখনী থেমে যায়নি—দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, পত্র পত্রিকা থেকে তাঁর কাছে লেখার অনুরোধ এসেছে। তিনি কাউকে নিরাশ করেননি। তাঁর লেখা শুধুমাত্র বইয়ের সংখ্যা ৩৫। সুতরাং আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি তাঁর লেখার মোট সংখ্যা এখন কোথায় দাঁড়িয়েছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে এত অধিক সংখ্যক ও বৈচিত্র্যময় লেখা বোধহয় পৃথিবীর কোন গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। আজ তাঁর সমগ্র রচনাবলীর আর একটি সূচী অবিলম্বে সঙ্কলন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাঁর লেখা প্রথম বই হ'ল ১৬ পৃষ্ঠার "A Model Library Act," প্রকাশ সময় ১৯৩১। শ্রীশিবরমনের সূচী অনুযায়ী রঙ্গনাথনের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ হ'ল "An Introduction to the study of character formation." এটি Educational Review নামক পত্রিকায় ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়।

রঙ্গনাথনের প্রতিভা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে Colon বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রকাশের পর। বস্তুতঃ শুধুমাত্র এই কাজের জন্য রঙ্গনাথনের নাম গ্রন্থাগার জগতে অমর হয়ে থাকবে। Colon বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রচলিত অন্যান্য বর্গীকরণ পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ১৯৩৩ সালে প্রথম প্রকাশের পর এর

কার্যকারিতা সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থাগারিক সন্দিহান ছিলেন। বর্তমান যুগের দ্রুত পরিবর্তনশীল জ্ঞানের রাজ্যে নিত্য নতুন বিষয় প্রবর্তিত হচ্ছে, এবং সেজন্য যে সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে তার সমাধানের ইঙ্গিত পাশ্চাত্যের প্রচলিত কোন বর্গীকরণ পদ্ধতিতে পাওয়া যায় না। বর্গীকরণের সাহায্যে একটি বিষয়ের বিভিন্ন চরিত্র নির্দেশ বা বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিরূপণ করতে এবং মিশ্র ও জটিল বিষয়ের প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় বিভাগকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করতে যে বিভ্রাটের সৃষ্টি হচ্ছে, রঙ্গনাথনের বর্গীকরণ তত্ত্ব-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী তা দূর করতে সহায়তা করেছে। রঙ্গনাথন এর জন্য "Facet" বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। রঙ্গনাথনের এই মৌলিক অবদান আজ পৃথিবীর সর্বত্র অভিনন্দন লাভ করেছে। ১৯৫৫ সালে ব্রাসেলস শহরে অনুষ্ঠিত প্রথম গ্রন্থাগার ও Documentation কেন্দ্রসমূহের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নীতিগতভাবে সূক্ষ্ম বর্গীকরণের কাজে "Facet" বিশ্লেষণ পদ্ধতির উপযোগিতা স্বীকৃত হয়েছে। বৃটেনের বর্গীকরণ গবেষণা কর্মীরাও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন ভারতবর্ষের নিজস্ব বর্গীকরণ তত্ত্বের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভে এদেশের গ্রন্থাগারিকের উপর বিরাট দায়িত্ব ন্যস্ত হ'ল। এ সম্বন্ধে ক্রমাগত আলোচনা ও গবেষণার মাধ্যমে Colon বর্গীকরণ পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ যুগোপযোগী করে তুলতে হবে। কারণ দেখা গেছে যে বর্গীকরণ পদ্ধতির পিছনে কোন সংগঠন কাজ করছেনা কালক্রমে তা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে Dewey বা U. D. C. পদ্ধতির সঙ্গে Brownএর এবং Blissএর পদ্ধতির বর্তমান অবস্থার তুলনা করলে এ উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে। আমাদের দেশে তাই Colon এর বহুল প্রচলন প্রয়োজন। কারণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এ উৎকর্ষতা লাভ করবে। অত্যন্ত আনন্দের কথা ভারতের জাতীয় Documentation কেন্দ্র পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের তালিকা সংকলন করতে Colon ব্যবহার করছেন। Indian Nation Bibliography Deweyর সঙ্গে Colon ব্যবহার করবেন। ভারতীয় মানকসংস্থাও (Indian Standards Institution) তাঁদের প্রকাশিত মানগুলিও (Standards) Colonএর সাহায্যে বর্গীকরণ করবেন আমরা নিশ্চয় এ আশা করতে পারি। সম্প্রতি Colon বর্গীকরণ পদ্ধতির পঞ্চম সংস্করণের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ; দ্বিতীয় খণ্ডে সূক্ষ্ম বর্গীকরণের উপযোগী বর্গীকরণ তপশীল থাকবে।

আমাদের দেশ গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য মুখ্যতঃ বিদেশী নিয়মকানুনের

উপর নির্ভরশীল। রঙ্গনাথন অনুভব করেছেন যে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য যে সমস্ত রীতি নীতি বিদেশে প্রচলিত আছে তার সব কিছুই ভারতবর্ষে প্রযোজ্য নয়। ভারতবর্ষের নিজস্ব কতগুলি সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রেখে রঙ্গনাথন তার সমাধানের নির্দেশ দেবার চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থাগারের নিত্যকর্ম পদ্ধতি, বর্গীকরণ, সূচীকরণ, পুস্তক নির্বাচন, সূত্রসন্ধান কার্য প্রভৃতি গ্রন্থাগার পরিচালনার সমগ্র পর্যায়েই ভারতীয় মান নির্ধারণ করে তাঁর রচনা আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান ব্যাপক প্রসারের যুগে এর প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করেছেন। "ভারতীয় মানক সংস্থা" (Indian Standards Institution) শিল্প ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মান নির্ধারণে ব্রতী হয়েছে। অত্যন্ত আনন্দের কথা যে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য মান নির্ধারণের দায়িত্ব মানক সংস্থা গ্রহণ করেছে, এই প্রতিষ্ঠানও রঙ্গনাথনের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়নি। তিনি মানক সংস্থার Documentation বিভাগের সভাপতি। মানক সংস্থা এ পর্যন্ত গ্রন্থাগার সম্বন্ধে যে কটি মান নির্ধারণ করেছেন এবং যে সমস্ত মান নির্ধারণ করবার পরিকল্পনা করছেন সবগুলির উপরই রঙ্গনাথনের প্রভাব খুবই সুস্পষ্ট। মানক সংস্থার সাম্প্রতিক মাদ্রাজ সম্মেলনে রঙ্গনাথন Documentation বিভাগের একটি ব্যাপক কর্মসূচী উপস্থিত করেছেন। এগুলি বাস্তবে রূপায়িত হলে ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারের অনেক সমস্যার সহজ সমাধান হবে।

১৯৫৫ সালে রঙ্গনাথন কর্মজীবন হতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর কিছুদিন তিনি সুইজারল্যান্ডে বাস করেছিলেন। আনুষ্ঠানিক ভাবে সক্রিয় কর্মজগৎ হতে অবসর গ্রহণ করলেও রঙ্গনাথন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েননি। সম্প্রতি তিনি বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের (উজ্জয়িনী) অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত আছেন এবং Documentation-এর বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে গবেষণা কাজে রত আছেন। ভারতীয় মানক সংস্থা ছাড়া ভারতের জাতীয় Documentation কেন্দ্র Insdoc-এর সংগেও তিনি জড়িত আছেন। Abgila পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবার পর তার Annals অংশটি Insdoc-এর উদ্যোগে Annals of Library Science নামে প্রকাশিত হচ্ছে। রঙ্গনাথন এই পত্রিকাটির সম্পাদনা করছেন। Documentation-এর কাজে সূক্ষ্ম বর্গীকরণের জন্য Colon পদ্ধতিতে "Facet" বিশ্লেষণের প্রবর্তন সম্বন্ধে এই পত্রিকার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে

মনোজ্ঞ ও বিদগ্ধ আলোচনা চলেছে তা বর্গীকরণের সমস্যায় নতুন আলোকপাত করেছে।

রঙ্গনাথন তাঁর সমস্ত জীবন গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক বৃত্তির জন্য উৎসর্গ করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর। তিনি মনে করেন যে এর ফলে অনেক সময় বেঁচে যায় এবং সেই সময় তিনি অন্য অনেক জরুরী কাজে লাগাতে পারেন। খ্যাতনামা বৃটিশ গ্রন্থাগারিক B. I. Palmer বলেছেন, "Indeed, he leads a most exemplary life. His interests are entirely bibliothecal ..."

রঙ্গনাথনের প্রতিভা দেশে বিদেশে সর্বত্র সম্মান লাভ করেছে। F I D, Indian Association of Special Libraries and Information Centres প্রভৃতি সংস্থা তাঁকে অবৈতনিক সদস্য পদে নির্বাচিত করেছেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে D. Litt উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তাঁকে "পদ্মশ্রী" উপাধি দিয়ে সম্মানিত করায় ভারত সরকার গ্রন্থাগার জগতের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। এদেশে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংগঠনে ১৯৩১ সাল থেকে রঙ্গনাথন যে সমস্ত খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে ভারত সরকারের কার্যক্রম যদি সেই পথে চালিত হ'ত তবে ভারত সরকার রঙ্গনাথনকে আরও বেশী সম্মানিত করতেন। কারণ তিনি ভারতবর্ষের আদর্শ যোগীপুরুষ—পার্থিব সুখ, সম্পদ, আনুষ্ঠানিক সম্মানের বহু উর্ধ্বে।

এখানে একটি অপ্রিয় সত্যের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। বাংলাদেশে বোধ হয় রঙ্গনাথনের প্রতিভা ও মর্যাদার যথাযোগ্য উপলব্ধি হয়নি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থায় প্রকৃতপক্ষে রঙ্গনাথনের অবদানের যেন কোন স্থানই নেই। অন্ততঃ Colon বর্গীকরণ পদ্ধতি এখানে অবশ্য পাঠ্য বিষয় হওয়া উচিত।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে আমরা রঙ্গনাথনকে আমাদের মধ্যে পাবো। বাংলাদেশের প্রতি তাঁর দরদ অসীম। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে তাঁকে এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করবার জন্য আমন্ত্রণ জানান হলে তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করে পরিষদ সম্পাদককে লিখেছেন :

"When I come to your conference, I should like, if possible,

to fulfil a long—cherished wish of mine—a wise cherished since 1930 when Kumar Munindra Deb Roy Mahasai and myself worked together. That wish has been to draw a detailed picture of the Library Personality af Bengal, as I like to see it. Some of my earlier attemptos did not succeed……I owe all this to Bengal even if it be only to discharge my duty and in token of my regard to my friend Kumar Munindra Deb Roy Mahasai.

রঙ্গনাথনের জীবন ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারের ইতিহাস। আমরা তাঁকে স্বাগত জানাই।

ডাঃ রঙ্গনাথন প্রণীত পুস্তক তালিকা।

ডাঃ রঙ্গনাথনের লিখিত বইয়ের সময়ানুক্রমিক একটি তালিকামাত্র সংকলিত হ'ল। খুব তাড়াতাড়ি সংকলিত হওয়ায় সম্ভবতঃ এটি ত্রুটিশূণ্য নয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর লিখিত রঙ্গনাথনের সমগ্র রচনাবলীর একটি সূচী সংকলন করছি। বইগুলি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। A Model Library Act-এর প্রকাশ তারিখ দু'জায়গায় দু'রকম পেয়েছি। শ্রীশিবরমণের তালিকায় প্রকাশ তারিখ ১৯৩১। Librarian and Book World পত্রিকার মার্চ ১৯৫৭ সংখ্যায় C. A. Crossleyর প্রবন্ধে প্রকাশ তারিখ ১৯৪০ বলে উল্লিখিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের সুযোগ পাইনি :

(১) A Model Library Act, 1931
(২) Five laws of library science, 1931.
(৩) Colon classification, 1933, 1939, 1960, 1952, 1957
(৪) Classified catalogue code, 1934, 1935, 1951.
(৫) Library administration, 1935.
(৬) School library work syllabus and bibliography, 1936.
(৭) Prolegomena to library classification, 1937, 1957.
(৮) Theory of library catalogue, 1938.
(৯) Reference service and bibliography (2 vols), 1940-1941
(১০) School and college libraries, 1942.
(১১) Library classification ; fundamentals and procedure, 1944.

(১২) Post-war reconstruction of libraries in India ; a scheme, 1944.

(১৩) Elements of library classification, 1945.

(১৪) Dictionary Catalogue Code, 1945, 1952.

(১৫) Suggestions for the Organisations of libraries in India, 1946. 1956.

(১৬) Education for leisure, 1945, 1948. 1954.

(১৭) National library system—a plan for India, 1946.

(১৮) Library development plan for the Allahabad University, 1947.

(১৯) Library development plan, 1947.

(২০) Preface to library science, 1948.

(২১) Rural adult education, 1949.

(২২) Library development plan with a draft library bill for the United Provinces, 1949.

(২৩) Classification, coding and machinery for search, 1950.

(২৪) Library tour 1948; Europe & America. impressions and reflections, 1950.

(২৫) Library development plan for India, thirty year programme for India with draft library bills for the union and the constituent states, 1950.

(২৬) Library catalogue, fundamentals and procedure, 1950.

(২৭) Classification and communication, 1951.

(২৮) Library manual, 1951.

(৩০) Social education literature for authots artists, publishers, teachers literature and governments. 1952.

(৩১) Social bibliography ; physical bibliograply ; for librarians, authors and publishers, 1952.

(৩২) Library book selection, 1952.

(৩৩) Literature for neo-literates 1953.

(৩৪) Library legislation. a handbook to Madras Library Act, 1953.

(৩৫) Heading and Canons ; comparative study of five catalogue codes, 1955.

পরিষদ কথা

হুগলি জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের বৈঠক

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ও পরিষদের সংসদে হুগলি জেলার প্রতিষ্ঠানিক প্রতিনিধি বৈদ্যবাটি ইয়ংমেনস এ্যাসোসিয়েসনের ব্যবস্থাপনায় হুগলি জেলার গ্রন্থাগার কর্মিগণের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীতিনকড়ি দত্ত।

হুগলি জেলার গ্রন্থাগারগুলির নানাবিধ সমস্যা বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল। সরকারের আর্থিক সাহায্য ও জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যাবলী সভায় আলোচিত হয়। সভায় জেলা সমাজ-শিক্ষা প্রাধিকারিকের নিকট একটি স্মারক-লিপি প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতদুদ্দেশ্যে গুড়াপ সুরেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের সভাপতি শ্রীসন্তোষ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে সভাপতি করিয়া একটি অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। সভায় হুগলির বিভিন্ন গ্রন্থাগারের একটি পরিসংখ্যান প্রস্তুত করিবার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি প্রশ্নমালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছে।

হুগলি জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগার হইতে প্রায় ত্রিশ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সভার পরিবেশ সৌহার্দ্যমূলক হয়। বিলম্বে আমন্ত্রণ পৌঁছানয় বহু প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে সক্ষম হন নাই বলিয়া জানাইয়াছেন। পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীরাখাল চন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস ও শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনে যোগদান করেন।

বিভিন্ন জেলায় অনুরূপ কর্মী বৈঠক আহ্বানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আগামী ২৩শে মার্চ সিউড়ি জুবিলি লাইব্রেরীর ব্যবস্থাপনায় বীরভূম জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে।

দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

আগামী ৪ঠা ও ৫ই মার্চ নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের আমন্ত্রণক্রমে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশন নবদ্বীপ সহরে অনুষ্ঠিত হইবে। পদ্মশ্রী ডক্টর এস. আর. রঙ্গনাথন সম্মেলনের মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় প্রবন্ধাকারে উপস্থাপিত হইবে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

সুবারবণ রিডিং ক্লাব ॥ তালপুকুর রোড ॥ কলিকাতা-১০ ॥

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী সুবারবণ রিডিং ক্লাবের ৬৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সম্পাদক বিগত বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপিত করেন। গ্রন্থাগারের কার্যাবলীর মধ্যে সদস্যগণের গ্রন্থপাঠের রুচি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রণীত নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানটি উল্লেখযোগ্য :--

(বিগত বৎসরে সদস্যগণ কর্তৃক গৃহীত মোট গ্রন্থের বর্গীকৃত সংখ্যা)

উপন্যাস ও গল্প	১৪,৯১২	বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, ইত্যাদি	১০৪
ডিঃ উপন্যাস ও গল্প	১,৬১১	পত্র, কবিতা, সমালোচনা	
চরিত	৬২১	ইতিহাস, ভূগোল, কলা	
ধর্ম, দর্শন ও মনোদর্শন	১,২৪৯	ও Reference	৫০১
প্রবন্ধ	১৮৮	পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা	৫৬
কাব্য	২৪	শিশু উপন্যাস ও গল্প	
নাটক	৫০	ইতিহাস, চরিত বিজ্ঞান	
সমালোচনা	২০৩	ও বিবিধ	৩১৫
নক্সা ও রসরচনা	৪১	ইংরাজী পুস্তক	৮৯০
ইতিহাস	১২০		
ভ্রমণ	৭০১	মোট	২১,৭৪০

[illegible]

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর উদ্যোগে গত ৬ই. মার্চ মহাকবি গিরিশচন্দ্রের ১১৫তম, জন্মোৎসব পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা করেন ডক্টর হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও 'রূপমঞ্চ' সম্পাদক শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, আবৃত্তি ও গিরিশচন্দ্রের 'আবু হোসেন' নাটকের একটি দৃশ্য অভিনীত হয়। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন গিরিশচন্দ্রের সমকালীন অভিনেত্রী শ্রীমতী নীরোদাসুন্দরী ও অভিনেতা শ্রীতারক বাগচী, শ্রীরঞ্জিৎ রায় প্রভৃতি। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়—

'নাট্যাচার্য' মহাকবি গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার্থে নাট্যাচার্যের বাসভবনে কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ পর্যন্ত গ্রন্থাগারটি স্থাপিত না হওয়ায় এই সভা পৌর প্রতিষ্ঠানকে অবিলম্বে তাঁহাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

উদয়ন সংঘ ॥ কেতুগ্রাম ॥ বর্ধমান ॥

উদয়ন সংঘের উদ্যোগে ২৩শে জানুয়ারী হইতে ২৬শে জানুয়ারী চারি দিবস ব্যাপী যথাক্রমে নেতাজী জন্মদিবস, সরস্বতী পূজা এবং প্রজাতন্ত্র দিবস অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী জনাব আব্দুস সাত্তার মহাশয় সংঘ পরিদর্শন করেন এবং সংঘের কার্যাবলীর বিশেষ প্রশংসা করেন। গ্রাম্য গ্রন্থাগার প্রসারকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে কর্মসূচী আছে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য সরকারের সহিত আলোচনা চলিতেছে।

নিউ টাউন লাইব্রেরী ॥ আলিপুরদুয়ার ॥ জলপাইগুড়ি ॥

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী শ্রীনগেন্দ্রনাথ সাহার পৌরোহিত্যে নিউ টাউন লাইব্রেরীর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে সভাপতি ১১টি প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন স্থানীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম কর্মী শ্রীসুনীলকুমার ভৌমিক। গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রীবিনয় চক্রবর্তী তাঁহার ভাষণে বলেন যে, গ্রন্থাগার আন্দোলন বাংলা তথা সমগ্র ভারতের একটি মূল্যবান অবদান। আমরা এই শহরের বুকে সেই সৃষ্টিধর্মী আন্দোলনের একটি স্ফুলিংগ বাড়াইতে সক্ষম হইয়াছি বলিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। প্রধান অতিথি তাঁহার মূল্যবান ভাষণে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং গুরুত্ব বর্ণনা করেন।

বন্দীপুর সম্মিলনী ॥ বন্দীপুর ॥ ২৪ পরগণা ॥

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী বন্দীপুর সম্মিলনীর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সম্পাদক গত বৎসরের কার্য বিবরণী এবং আয় ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপিত করেন। সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি শক্তিশালী কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি শ্রীএস. পি. নিয়োগী, সহ সভাপতি শ্রীবীরেশ্বর প্রসাদ ঘোষ, সম্পাদক শ্রীরাজেন কুমার ঘোষ, গ্রন্থাগারিক শ্রীঅরুণ ঘোষাল এবং শ্রীদিলীপ সুর।

বনগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী ॥ বনগ্রাম ॥ চব্বিশ পরগণা ॥

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী রবিবার গ্রন্থাগার ভবনে বনগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী এণ্ড টাউন হলের সম্পাদক শ্রীউদয়েন্দু তরফদারের মৃত্যুতে এক শোকসভা উদ্‌যাপিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ চট্টোপাধ্যায়।

পাবলিক লাইব্রেরী, কিশোর বাহিনী, সাধুজন পাঠাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে উদয়েন্দু তরফদারের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। বিভিন্ন বক্তা ৺উদয়েন্দু তরফদারের জীবনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন। অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সকলে এক মিনিটকাল নীরবে দণ্ডায়মান থাকেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—

"আজিকার এই মৌনম্লান বিষাদময়ী সন্ধ্যায় বনগ্রামবাসীগণ এই সভায় সমবেত হইয়া বনগ্রামের সুসন্তান এবং বনগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী এণ্ড টাউন হলের সুযোগ্য সম্পাদক ও সর্বজনপ্রিয় উদয়েন্দু তরফদারের শোচনীয় অকাল মৃত্যুতে তাঁহার অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছেন। এই মর্মান্তিক শোকে মুহ্যমান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

মদনপুর সাধারণ পাঠাগার ॥ মদনপুর ॥ নদীয়া ॥

"গত ২১শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার 'মদনপুর সাধারণ পাঠাগার' এর নিজস্ব জমিতে মদনপুর কল্যাণী কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীকালী সেনগুপ্ত মহাশয় কর্তৃক পাঠাগার গৃহের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পাঠাগার সদস্য ছাড়াও স্থানীয় বিশিষ্ট মহোদয়গণ উপস্থিত থাকিয়া অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলেন। পাঠাগার সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ মণ্ডল ও স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীপ্রশান্ত কুমার হালদার মহাশয় পাঠাগারের ক্রমোন্নতি ও বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন। সভাপতি শ্রীকালী সেনগুপ্ত তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে জনশিক্ষায় পাঠাগারের স্থান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোক সম্পাত করেন।

অন্যান্য রাজ্যের খবর :

কর্ণাটক গ্রন্থাগার সম্মেলন

ফেব্রুয়ারী মাসে ধারওয়ারে কর্ণাটক গ্রন্থাগার সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীবি, এস, কেশবন সম্মেলনে মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া একটি বাণীতে শ্রীবিনোবা ভাবে জানান যে, পাঠকদিগের প্রতি গ্রন্থাগারিকের গুরু দায়িত্ব রহিয়াছে। গ্রন্থাগারিকের সাহায্য ব্যতীত গ্রন্থাগার নিছক গ্রন্থের আগার হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করা সম্পর্কে অধ্যাপক নাগরাজ রাও বলেন ভাল গ্রন্থাগারিকই কেবল গ্রন্থাগারকে সুন্দর এবং জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে পারেন। এতদুপলক্ষে আয়োজিত এক গ্রন্থ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীডি, সি, প্যাডেট। সভাপতির ভাষণে শ্রীকেশবন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেন।

সম্মেলনে স্থির হয় যে মহীশূর রাজ্যে কানাড়ী ভাষাভাষী অঞ্চলে একটি গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করা হইবে। সেইজন্য একটি অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়।

শিক্ষক-গ্রন্থাগারিক পরিষদ

সেপ্টেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌতে একটি শিক্ষক গ্রন্থাগারিক পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহাতে রাষ্ট্রোগি আন্ত কলেজের শিক্ষক গ্রন্থাগারিক শ্রীমুখোপাধ্যায় প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। পরিষদে প্রায় প্রতি মাসেই বৈঠক বসে এবং বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা ও উন্নতির পর্যালোচনা করা হয়। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী শিক্ষা দপ্তরের উপ-অধিকর্তার সভাপতিত্বে লক্ষ্ণৌর হুসিয়ানাবাদ মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি মনোজ্ঞ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন হুসিয়ানাবাদ মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি সুন্দর গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়।

উত্তর প্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদ

ফেব্রুয়ারী মাসের চতুর্থ সপ্তাহে শ্রী সি, জি, বিশ্বনাথন-এর সভাপতিত্বে উত্তর প্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন যে, প্রত্যেক শিক্ষিত নাগরিকদের গ্রন্থাগার আন্দোলনে যোগদান করা উচিত কারণ বর্তমানে ভারত স্বাধীন হইয়াছে এবং জনগণকে স্বাক্ষর করিয়া তোলা এক বিরাট জাতীয় সমস্যা; অতীতে গ্রন্থাগার যাহা ছিল বর্তমানে ঐরূপ দৃষ্টিভংগীতে চলিলে আমাদের জাতীয় উন্নতিতে বহু সময় ব্যয় হইবে। অতএব শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক ভাবের আদান প্রদানের উন্নতি করাই ভারতের নাগরিকদের কর্তব্য।

অন্যান্য দেশের খবর

আফগানিস্তানে প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার

বছর দুয়েক আগে ইউনেস্কো আফগানিস্তানে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনে সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য জনৈক বিশেষজ্ঞ শ্রী এইচ. ডি. বর্ণীকে প্রেরণ করেন। কাবুলে একটি গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ ও ইতিমধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে ভিন্ন এক গৃহে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গোড়াপত্তনের জন্য তিনি একটি পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। আফগান সরকারের শিক্ষা দপ্তর আসবাবপত্র ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ছাড়াও নিজস্ব গ্রন্থাগার হইতে কিছু সংখ্যক গ্রন্থ দ্বারা এই পরিকল্পনায় সহযোগিতা করিতেছেন। কিছুকাল পূর্বে ইউনেস্কোর বৃত্তি প্রাপ্ত দুজন শিক্ষার্থী দিল্লী ও ইউরোপে যাইয়া গ্রন্থাগার পরিচালন বিদ্যায় শিক্ষণ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে আফগানিস্তানের সহ-শিক্ষা সচিব ডক্টর মোহাম্মদ আনাস রাজ্যের উক্ত প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। বর্তমানে হাজার খানেক ইংরাজি ও হাজার দেড়েক পারসী পুস্তকই গ্রন্থাগারের প্রারম্ভিক গ্রন্থ-সংগ্রহ।

আফগানিস্তানের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রন্থাগার-ভবন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করিয়া দেশব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ঐ গ্রন্থাগারটিকে 'আদর্শ' হিসাবে সংগঠিত করা হইবে। শ্রীবর্ণি শীঘ্রই পুনরায় কাবুল যাইয়া এ ব্যাপারে সহযোগিতা করিবেন। গ্রন্থ, আসবাব ও সাজসরঞ্জামের জন্য ইউনেস্কো আড়াই হাজার ডলার সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

ইরানে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থা

গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের ব্যবস্থা ইরাণে খুব বেশী দিন হয়নি। শিক্ষক শিক্ষণে পূর্বে গ্রন্থাগার বিদ্যাও কিছুটা শিখানো হইত, এবং পরীক্ষামূলকভাবে তৎপূর্বে স্বল্পকালীন শিক্ষণ দেবার ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হইয়াছিল। তেহরাণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রবর্তিত গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ একপ্রকার পাকাপাকিভাবেই চালিত হইতেছে। নূতন পাঠ্যক্রমের যথেষ্ট পরিবর্ধন ও পরিবর্তন করা হইয়াছে। বর্তমানে শিক্ষণের মেয়াদ দুই বৎসরকালীন। প্রতি সপ্তাহে ১১ ঘণ্টা ক্লাসে হাতে কলমে

গ্রন্থাগার পরিচালন বিদ্যা ও দুষ্প্রাপ্য দলিলপত্রাদি সংরক্ষণ বিষয়ে শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে। প্রথম বৎসরে ১৫০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭৯ জন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৪৪ জন উত্তীর্ণ হন। দ্বিতীয় বৎসরে ১৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে অবতীর্ণ ৫০ জনের মধ্যে শিক্ষণ সমাপ্তি পরীক্ষায় ৪১ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তেহরাণ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষণ পাঠ্যক্রমে গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

মালয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মতৎপরতা

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর মালয় দেশের গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মপরিধি যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সম্প্রসারণ ও আধুনিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে পরিষদ বিভিন্ন অঞ্চলে পরিদর্শক প্রেরণ করেন। উৎসাহ দান ছাড়াও নানাবিধ সহযোগিতা ও পরামর্শ দান করাও পরিদর্শকদের অন্যতম কাজ। গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলিকে অর্থ সংগ্রহে সাহায্যের জন্য কয়েকটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সরঞ্জাম আছে, প্রয়োজনে সেগুলিকে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়। তাহা ছাড়াও সংগীত ও অভিনয়ের একটি দল পরিষদ গঠন করিয়াছেন। বিভিন্ন অঞ্চলে বিচিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে চিত্ত বিনোদনের সাথেই তদুপলক্ষে উক্ত দল কর্তৃক সংগৃহীত অর্থ গ্রন্থাগারগুলিতে দেওয়া হয়। মালয় সরকার মালয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহিত সর্বতোভাবে সহযোগিতা করিতেছেন।

বিবিধ বার্তা

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের সমাপ্তি পরীক্ষার ফলাফল

ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের (ডিপ্-লিব) সমাপ্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের নাম গুণানুসারে নিম্নে প্রদত্ত হইল :

প্রথম বিভাগ

১। কামাখ্যা গোবিন্দ চোঙদার, ২। চিত্রভানু সেন,
৩। নির্মল চন্দ্র চৌধুরী

দ্বিতীয় বিভাগ

১। তারানাথ ভট্টাচার্য, ২। গীতি রায়,
৩। ভূপেন্দ্র লাল নাগ।

তৃতীয় বিভাগ

১। গৌরী রায়, ২। প্রীতি মিত্র।

এগার শ' তিপ্পান্নটি প্রাচীন কাশ্মীরী গ্রন্থ আবিষ্কৃত

শ্রীনগর সহরের রঘুনাথ মহল্লায় বহুবিধ মূল্যবান দলিলপত্রাদি সহ ১১৫৩টি প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ইতিহাস, দর্শন, কলা, চিকিৎসা প্রভৃতি নানা বিষয়ক গ্রন্থরাজি সমন্বিত এই গ্রন্থগুলি রাজদান সংগ্রহ নামে পরিচিত। ভূর্জপত্র, তুলট কাগজ প্রভৃতিতে লিখিত ও মুদ্রিত সমুদয় গ্রন্থ দেবনাগরীতে রচিত।

টোকিওতে আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনী

কিছুকাল পূর্বে দূরপ্রাচ্যে লণ্ডনের এ, পি ওয়ালেশের পরিচালনায় এবং জাপান প্রকাশক সংস্থার সহযোগিতায় টোকিও শহরে এক আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদর্শনীতে ভারতও যোগদান করে। এশিয়া মহাদেশের বহু প্রকাশকগণও অংশ গ্রহণ করেন। এশিয়ার ১৮টি প্রদেশ হইতে ৫,০০০ পুস্তক প্রেরিত হইয়াছিল। প্রদর্শনীটি ৬ দিবস ব্যাপী পরিচালিত হইয়াছিল এবং ইহাতে ১,২০,০০০ লোকের সমাগম হয়।

পশ্চিম বঙ্গের জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মূল আলোচ্য-প্রবন্ধ

১.১ সমাজের স্ত্রী-পুরুষ, সাক্ষর-নিরক্ষর, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর, সকল স্তরের এবং সকল বয়সের প্রতিটি মানুষের উপযোগী এক সুসংবদ্ধ নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা স্থাপন যদি আমাদের কাম্য হয়ে থাকে, এবং এই পরিকল্পিত গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি মানুষকে তার নিজের রুচিমত পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে তুলবার সহায়তা করে ব্যক্তির তথা সমাজের কল্যাণ সাধন করা যদি আমাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে তবে আমাদের গ্রন্থাগার পরিকল্পনা রচনাকালে সমাজের তথা দেশের বাস্তব অবস্থা এবং সমস্যার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

১.২ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সমস্যার সঙ্গে ভারতবর্ষের সমস্যার কতকগুলি মূলগত প্রভেদ আছে। তাই পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের গ্রন্থাগার পরিকল্পনার (তা সে পরিকল্পনা সে-দেশে যতই সফল হোক না কেন) অন্ধ অনুসরণ সমীচীন নয়।

১.৩ ভারতবর্ষ বিশাল দেশ। তার প্রতিটি প্রদেশের রাজনৈতিক চেতনা, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যে কিঞ্চিদধিক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কাজে কাজেই কোনও গ্রন্থাগার পরিকল্পনা তার সমস্ত খুঁটিনাটিসহ সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে প্রযোজ্য হতে পারে না।

১.৪ অনুরূপভাবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে—পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার, বিভিন্ন মহকুমার অবস্থা এবং সমস্যার মধ্যেও অল্প বিস্তর স্বকীয়তা আছে। সুতরাং কোনও গ্রন্থাগার পরিকল্পনা রচনাকালে এবং সে পরিকল্পনা রূপায়ণকালে এই সকল স্থানীয় সমস্যাগুলির প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। রাজ্যের মূল গ্রন্থাগার পরিকল্পনায় যেমন প্রতিটি জেলার নিজস্ব সমস্যা এবং বৈশিষ্ট্যগুলি সুবিবেচিত হওয়া প্রয়োজন, প্রতি জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থায়, তেমনি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীগণের সমস্যাগুলির যথাযোগ্য সুবিবেচনা লাভ করা প্রয়োজন।

২.১ উপরি উল্লিখিত কারণে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে মূলতঃ স্থানীয় ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করতে হবে। ভৌগোলিক, শাসনতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিক কারণের সংগে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হলে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থাকে মূলতঃ জেলা-ভিত্তিক ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

২.২ এই জেলাভিত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় :

(ক) প্রতি জেলায় একটি (অথবা প্রয়োজনবোধে একাধিক) বৃহৎ-গ্রন্থ-সংগ্রহ গড়ে উঠবে।

(খ) জেলার নিজস্ব ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যের প্রতি ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

(গ) এই ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপন দ্বারা পাঠকগণের চাহিদা পূরণ সহজসাধ্য হবে, ফলে জনসাধারণের সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগিতা লাভ সম্ভব হবে; জেলার জনসাধারণ সমগ্র ব্যবস্থাটিকে তাদেরই সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে গ্রহণ করবে, এবং এর উন্নতি বিধানে নিজ দায়িত্বসম্পর্কে সচেতন হবে।

(ঘ) রাজ্যকেন্দ্রিক ব্যবস্থার ছকবাঁধা নিয়মে চলবার যে সম্ভাবনা রয়েছে এতে সে অবাঞ্ছিত সম্ভাবনা থাকবে না।

(ঙ) রাজ্যের শাসন-পরিচালন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক পরিবর্তন অথবা আর্থিক কৃচ্ছ্রতার প্রভাব এর গতিকে সহজে বিঘ্নিত করতে পারবে না।

৩.১ উপরি উল্লিখিত কারণে জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং এ ব্যবস্থা যত সুনির্দিষ্ট হবে দেশের সর্বাংগীন গ্রন্থাগারব্যবস্থার সার্থক রূপায়ন ততই সহজসাধ্য হবে।

৩.২ এই সকল কারণে সরকার প্রবর্তিত যে জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গত ৫ বৎসর যাবত কাজ করে চলেছে তা' ইতিমধ্যে কতদূর সাফল্যলাভ করেছে, জেলা গ্রন্থাগার সংস্থাগুলির পরিচালন-ব্যবস্থা নির্ভুল কিনা, এবং কিভাবে অগ্রসর হলে ঈপ্সীত ফললাভ ত্বরান্বিত হবে—এ সকল বিষয়ে আজ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্তৃক নিরপেক্ষ হিসাব-নিকাশ প্রয়োজন।

৩.৩ এই হিসাব-নিকাশ করতে গিয়ে অন্যান্য বিষয়ের সংগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ

(ক) প্রতিটি জেলা কেন্দ্রীয় সংস্থা বাবত এ যাবত কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়েছে এবং কাজের অগ্রগতি তদনুপাতিক হয়েছে কি-না।

(খ) জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সেবার ধরণ এবং পরিধি বর্তমানে কি রূপ।

(গ) জেলার প্রকৃত চাহিদা কি ধরণের এবং কতটা; বর্তমান ব্যবস্থা এই চাহিদার কত শতাংশ পূরণে সক্ষম।

(ঘ) জেলায় জন পরিচালিত যে-সকল বৃহৎ গ্রন্থাগার রয়েছে তাদের গৃহ, আসবাবপত্র, গ্রন্থসম্ভার, কর্মী, অর্থ প্রভৃতির তুলনায় জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অবস্থা কি।

(ঙ) জেলার সর্বস্তরের জন পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির গ্রন্থসংগ্রহ সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে আছে কি-না, এবং এই গ্রন্থসম্ভারকে জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মোট গ্রন্থসংগ্রহের সংগে যোগ করলে মোট চাহিদার কত শতাংশ পূরণ সম্ভব।

(চ) জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সেবা সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক কি না; যদি না হয়, তবে কিভাবে অদূর ভবিষ্যতে একে নিঃশুল্ক করা যেতে পারে।

(ছ) জেলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রতি কতটা দৃষ্টি রাখা সম্ভব হয়েছে।

(জ) জেলার জন-পরিচালিত সংস্থাগুলি সরকারের নিকট থেকে কি পরিমাণে অর্থসাহায্য লাভ করে, এবং সামগ্রিক জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় এদের সহযোগিতা কতদূর লাভ করা সম্ভব হয়েছে। (নিম্নে ৪.১ এবং ৪.২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

(ঝ) ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের কার্য-প্রণালী কি, এবং তা কতদূর সাফল্য লাভ করেছে। (নিম্নে ৫.১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

৪.১ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন ধারার স্বকীয়তা ছাড়াও পশ্চিমবংগের আরও এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে—গ্রন্থাগার পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে যার গুরুত্ব অপরিসীম ঃ

গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনা প্রবর্তিত হওয়ার

বহু পূর্ব থেকেই পশ্চিমবঙ্গের ছোট বড় প্রায় ২৫০০টি জন-প্রচেষ্টায় পরিচালিত গ্রন্থাগার নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী সমাজ সেবার দায়িত্ব পালন করে আসছে। বিভিন্ন জেলায় ছড়ানো এই গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে প্রায় ১৫০০০ সমাজসেবা কর্মী প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত রয়েছেন। এ সকল গ্রন্থাগারের মোট গ্রন্থসংখ্যা অন্যূন..... , এবং সরকারী সাহায্য ছাড়াও সদস্যগণের কাছ থেকে চাঁদা, এককালীন সাহায্য ইত্যাদি বাবত প্রতি বৎসর অন্যূন ২ লক্ষ টাকা এই সকল প্রতিষ্ঠান সংগ্রহ এবং ব্যয় করে থাকে।

৬.২ এই ২৫০০টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আগামী দিনের সার্থক জনপ্রিয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপনের প্রভূত উপকরণ সঞ্চিত রয়েছে। সুতরাং এদের পরিপূর্ণভাবে সরকার প্রবর্তিত গ্রন্থাগার পরিকল্পনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করে নিতে না পারলে কোনও পরিকল্পনাই সফল হয়ে উঠবে না।

৭.১ ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা—জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অংগ। তাই উপরে ৩.৩ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ব্যবস্থা অবলম্বনকালে এর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুসন্ধান প্রয়োজন :

(ক) বর্তমানে ব্যবহৃত গ্রন্থযান এবং তার পরিচালন ব্যবস্থা কতদূর ফলপ্রসূ হয়েছে।

(খ) যে সকল স্থানে গ্রন্থযান পৌঁছয় না সে সকল স্থানের জন্য গ্রন্থযান ব্যতীত অন্য কোনও চলাচল ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা এবং সুযোগ সুবিধা কতটুকু আছে।

(গ) গ্রন্থ আদান-প্রদান ব্যতীত গ্রন্থযানটিকে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণকার্যে ব্যবহার করার সুযোগ সুবিধা আছে কিনা।

(ঘ) ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার পরিচালন ক্ষেত্রে সম্মিলিত গ্রন্থসূচী প্রণয়ন, বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে একইভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে কি-না; হয়ে থাকলে তার সমাধান সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

(ঙ) জেলাস্থ বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থ-সম্ভারকে ভ্রামামাণ ব্যবস্থার মধ্যে আনা সম্ভব কিনা।

সম্পাদকীয়

দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

অল্পদিনের মধ্যেই দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আমরা মিলিত হবো। প্রতি বৎসর একবার করে এই ধরণের সম্মেলনে মিলিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃত। কাজেই সে সম্বন্ধে নতুন করে কোনোও যুক্তির অবতারণা করা অবান্তর। যুক্তির প্রয়োজন শুধু কোন বক্তব্যকে সম্মেলনের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হলো তার ভূমিকা প্রদানের বা সমর্থনের জন্য।

এবারের সম্মেলনের চিন্তার জন্য মতামত প্রকাশের জন্য যে বিষয়টি পেশ করা হবে তা স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হলো। তার মূল বক্তব্য এই যে আমাদের রাজ্যের জন্য একটি সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন আশু প্রয়োজন। সে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বর্তমান অবস্থাকে স্বীকার করে, সমগ্র রাজ্যের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করেই রচিত হবে।

আমাদের রাজ্যে বর্তমান পর্যন্ত যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে রূপ নিতে দেখা গেছে তা সেই বাঞ্ছিত অবস্থা থেকে দূরেই। কতটা দূরে তার চুলচেরা বিচার বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে আমরা যা চেয়েছি আর যা পেয়েছি তার মধ্যের এই অবাঞ্ছিত পার্থক্যের কয়েকটি মূল কারণের দিকে হয়তো অঙ্গুলি নির্দেশ করা যেতে পারে।

গ্রন্থাগার কথাটি গ্রন্থ আর আগার এই দুটি শব্দের সন্ধিতে গড়া। এর মধ্যে আগার শব্দটির সংজ্ঞা অনেক ব্যাপক। মাটি, টিন, ইঁট, কাঠে গড়া যে কোনও খাঁচাকেই আগার সংজ্ঞাতেই বুঝতে আমাদের বাধে না। কাজেই হৃদরোগীর জীর্ণ ফুসফুসের মত অতি সন্তর্পণে স্থির থাকা ঘরও আমাদের গ্রন্থের আগার হয় আবার জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাসাদকেও আমরা ঐ আখ্যাতেই মেনে নিই।

কিন্তু গ্রন্থ কথাটির শব্দগত সংজ্ঞা আমাদের কাছে অনেক বেশী নির্দিষ্ট, ব্যবহারিক জীবনে অনেক বেশী অনুদার। ফলে আগার যেমনই হোক না কেন গ্রন্থ আমাদের বাসনা মতও পাওয়া চাই এই হয়ে দাঁড়ায় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী। আগার সম্বন্ধে এই ধরণের উদাসীন মনোভাবের ফলেই রাজ্যের বহুস্থলে সতীদেহের ছিন্নাংশের মত গ্রন্থাগারগুলিকে ছড়ানো দেখি। এ সত্যকে

অস্বীকার করে লাভ নেই যে সমাজমনে শিক্ষা সংস্কৃতি সঞ্চালনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রের আশ্রয়-ভূমি সম্বন্ধে এই সমাজের কোনোও সুপ্রকাশিত অনুভূতি নেই।

যাই হোক আরও অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে গ্রন্থের আক্ষরিক সংজ্ঞা আর ঐতিহাসিক বিবর্তনে তার স্থান লাভের ঘটনা থেকে।

নানা ঐতিহাসিক কারণের জন্যই গ্রন্থ এখনও আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের কাছেই মনের খোরাক নিয়ে পৌঁছতে অক্ষম। এ সত্যকে যাঁরা এক পাশ থেকে দেখেছেন তাঁরা বলেন যে আগে সাধারণকে গ্রন্থ ব্যবহারক্ষম করে তোলা দরকার তবেই গ্রন্থের আর তার সঙ্গে গ্রন্থাগারের সামাজিক প্রয়োজন দেখা দেবে। এঁরা বলেন অধিকাংশ নিরক্ষরের দেশে গ্রন্থাগার নিয়ে প্রথমেই কিছু করতে যাওয়াটা ঘোড়ার আগে গাড়ীকে লাগানর মত। কতকটা এই ধরণের চিন্তার ফলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এখনোও আমাদের দেশে সমাজ শিক্ষার লেজুড় হয়ে রয়েছে।

উপরের ধারণাটি আমাদের মতে অর্ধসত্য। কারণ ঐতিহাসিক অবস্থায় হয়ত দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে একসঙ্গে একাধিক সামাজিক রূপ নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে। কিন্তু তার জন্য পূর্বাপর অবস্থাকে কল্পনা করে কোন রীতিকে কলের মত অনুসরণ করা নিশ্চয়ই ঠিক হতে পারে না। কারণ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বহুজনকে গ্রন্থাগার ব্যবহারে সক্ষম করে তোলা বহু দূরের জিনিষ। এবং ততদিন পর্যন্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমস্যাকে পরিপূর্ণভাবে না দেখা শেষের জিনিষই হবে। কারণ এখনই দেশে যে জ্ঞানকে বিতরণ করা হবে তা প্রাথমিক হলেও যায় আসে না। তাকে সমাজ মনে ঠিকমত ধারণ করে রাখতে হলে শিক্ষায়তনের বাহিরে স্বশিক্ষার সুযোগের ব্যবস্থা করতেই হবে। না হলে সমস্ত শ্রমকেই পণ্ডশ্রমে পরিণত করে ঐ সব শিক্ষিতের আবার মূঢ়তার অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। কাজেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজন এখনই রয়েছে। সেখানে কি ধরণের গ্রন্থাদি থাকবে তা স্বতন্ত্র বিচারের কথা।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজন যদি এখনই হয়ে থাকে তবে তার সমস্যাকে সম্পূর্ণভাবে তার মত করেই ভাবতে হবে। এখানে জোড়াতালির পথ শ্রম ও অর্থের অপব্যয়ের পথ। অর্থাৎ সমস্যাটার বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে সমাধান হোক এইটাই আমরা চাই। অন্য সমস্যার সঙ্গে মিশিয়ে তা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাক এইটা কিছুতেই কাম্য নয়।

বৈজ্ঞানিক সমাধান কথাটা আর একটু বিশদভাবে বলবার অপেক্ষা রাখে। মোটামুটিভাবে ইতিহাসের গতির মধ্যে একটি পুনর্পৌণিকতার ভাব লক্ষ্য করা গেলেও বিভিন্ন দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার স্বাতন্ত্রও চোখে পড়ে। কাজেই যে কোন দেশের সমস্যার সমাধানের খানিকটা অন্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে আহরণ করা গেলেও সেই দেশের ইতিহাসের নির্দেশকে অগ্রাহ্য করলে চলবে না।

আমাদের দেশেও তাই শিক্ষিত অশিক্ষিত মিলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার উপযোগী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গোড়া পত্তন করতে হবে। ঠিকমত পরিচালিত হলে সেই ব্যবস্থাই দ্রুত গতিতে বিবর্তিত হয়ে যে কোন অগ্রসর দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমকক্ষ হতে পারবে।

এই পরিচালনের জন্য জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। গ্রন্থাগার মানুষের স্বেচ্ছাসংগৃহীত সংস্কৃতির বিতরণ কেন্দ্র। কাজেই তার পরিচালন ব্যবস্থা অত্যন্ত কাছের থেকে হওয়া প্রয়োজন। অঞ্চলের মানুষ যদি তার রুচি ইচ্ছা প্রভৃতিকে কাছের খাদ্য ভাণ্ডারে অবিলম্বে প্রতিফলিত হতে দেখে তবে পরিবেশিত খাদ্যে তার বিতৃষ্ণা আসতে পারে। তার ফল একান্ত অনভিপ্রেত।

অঞ্চলের মানুষকে সেই পরিচালন ব্যবস্থার যোগ্য অংশীদার করে তুলতে হলে তাকে মর্যাদাপূর্ণ সামাজিক স্বীকৃতি দিতেই হবে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সে স্বীকৃতি একমাত্র আইনই দিতে পারে। প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সে কাজে সাফল্যলাভ করা সম্ভব নয় বলেই ভাববার কারণ আছে।

এই সমস্ত চিন্তার মধ্য দিয়ে বারে বারে তাই একটি কথাই প্রত্যেক সংস্কৃতিকামী মানুষের মনে প্রতিধ্বনিত হয় যে উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে সংস্কৃতি সহজলভ্য হোক। কারণ সংস্কৃতিবান মানুষকেই যদি সৃষ্টি করা না যায় তবে অন্য সমস্ত কল্যাণময় ব্যবস্থাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। অর্থ ও শ্রমের অপব্যয়কে বাঁচিয়ে সেই কল্যাণময় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সৃষ্টি হোক এই কথাই আমাদের আগামী সম্মেলনের প্রধান বক্তব্য হয়ে থাকবে। তার প্রকৃত স্বরূপে বিতরণের মধ্য দিয়ে সেই কথাটাই ব্যক্ত করার চেষ্টা হবে।

গ্রন্থাগার

৭ম বর্ষ] চৈত্র : ১৩৬৪ [১২শ সংখ্যা

দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

মুখবন্ধ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ও নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের আমন্ত্রণে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশন গত ৪ঠা ও ৫ই এপ্রিল নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে বিপুল উদ্দীপনার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। সারা পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে দুই শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন।

নবদ্বীপ সম্মেলনের গুরুত্ব ও আকর্ষণ দুইটি কারণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। প্রথমতঃ ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ পদ্মশ্রী ডক্টর এস, আর, রঙ্গনাথনের মূল-সভাপতিরূপে সম্মেলনে উপস্থিতি। দ্বিতীয়তঃ ডক্টর রঙ্গনাথন রচিত পশ্চিম বঙ্গে প্রবর্তনের জন্য এক খসড়া গ্রন্থাগার বিলের উপস্থাপন। এতদ্ব্যতীত জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিষদ প্রণীত মূল আলোচ্য-প্রবন্ধ বিশেষ সময়োপযোগী হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের পূর্ববর্তী অধিবেশনগুলিতে রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনা বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচিত হইয়া গিয়াছে। আপামর মানুষের বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবহারের অধিকার ও সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী সম্মেলনগুলিতে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়। নবদ্বীপ সম্মেলনে ডক্টর রঙ্গনাথনের প্রত্যক্ষ উপদেশ অনুযায়ী গ্রন্থাগার আইনের পূর্বোক্ত খসড়া বিল উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

পরিষদের সকল সদস্য ও এবিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মতামত অন্তর্ভুক্ত করিয়া শীঘ্রই উক্ত খসড়া চূড়ান্ত সুপারিশ হিসাবে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

বিভিন্ন দিনের অধিবেশনে প্রতিনিধিদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও সুচিন্তিত মতামত জ্ঞাপনে সম্মেলনের আলোচনা যথেষ্ট উৎকর্ষতা লাভ করে। খসড়া গ্রন্থাগার আইন ও জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে মূল আলোচ্য-বিষয় ছাড়াও কয়েকজন প্রতিনিধি নিজ নিজ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও প্রতিনিধিগণ কয়েকটি দলে বিভক্ত হইয়া মূল বিষয়গুলির আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মতামত অনুযায়ী সমাপ্তি অধিবেশনে চূড়ান্ত সুপারিশ ও প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয়।

দূর দূরাঞ্চল হইতে প্রতিনিধিগণ সর্ববিধ অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। পূর্ণ নিষ্ঠা ও উৎসাহ লইয়া তাঁহারা সম্মেলনের আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া সম্মেলনকে সফল করিয়া তুলেন।

টুকিটাকি ত্রুটি বিচ্যুতি ও যে সব অভাব অসুবিধা স্বাভাবিক কারণেই থাকিয়া গিয়াছিল তাহার জন্য মার্জনা চাহিতেছি। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ তথা নবদ্বীপবাসীদের সম্মেলনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও আন্তরিক আতিথেয়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তরুণ স্বেচ্ছাসেবকগণের সেবা ও শ্রমের অকুণ্ঠ প্রশংসা করি।

সম্মেলনের নানাবিধ কাজে বহু ব্যক্তি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংবাদ পত্রগুলির নিকট হইতে আমরা যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করিয়াছি তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

সম্পাদক

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

শ্রীবি, এস, কেশবন কর্তৃক সম্মেলনের উদ্বোধন

৬ঠা এপ্রিল প্রাতঃকালে পশ্চিম বংগ বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীশংকর দাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মেলন উদ্বোধন করিবার কথা ছিল। অনিবার্য কারণে তিনি ঐ সময় উপস্থিত হইতে না পারায় জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীবি. এস, কেশবন দ্বাদশটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় পরদিন সকালের কার্যকরী অধিবেশনে ভাষণ দান করেন।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন সমাপনান্তে ডক্টর রঙ্গনাথন এতদুপলক্ষে আয়োজিত এক প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

প্রদর্শনীর বিভিন্ন বিভাগে স্থানীয় চারু ও কারু শিল্পের নিদর্শন, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রিকা, প্রাচীন চিত্র, আদর্শ শিশু গ্রন্থাগার ও নবদ্বীপের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের দেওয়াল পত্রিকা প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়, প্রদর্শনীটি প্রতিনিধিগণের ও স্থানীয় জনসাধারণের প্রশংসা অর্জন করে।

জনসভা

৬ই এপ্রিল সায়াহ্নে সম্মেলন মণ্ডপে এক মহতী জনসভার আয়োজন হয়, সভাপতিত্ব করেন শ্রী বি এস কেশবন।

সর্বশ্রী নৃসিংহ প্রসাদ সরকার, যতীন্দ্রমোহন মজুমদার, রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস, তিনকড়ি দত্ত, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ভাষণ দান করেন।

বিচিত্রানুষ্ঠান

সম্মেলনের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের কার্যকরী ও সমাপ্তি অধিবেশনের পর স্থানীয় শিল্পিগণের নৃত্য-গীত ও অভিনয় যথেষ্ঠ উপভোগ্য হয়।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ

তিনকড়ি বাগচী

সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণের পক্ষ হইতে আমি সমবেত বিদগ্ধজনকে পরম সাদরে বরণ করিতেছি ও স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি। নবদ্বীপ ধাম বিপুল আত্মিক শক্তিবলে বহুকাল যাবৎ ভারতীয় সংস্কৃতিকে সযত্নে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জ্ঞানের অনির্বাণ দীপহস্তে স্বীয় প্রসারিত বক্ষতলে যুগে যুগে যে পরিবর্তনশীল শিক্ষা ও সভ্যতার ভাব আনয়ন করিয়াছে তাহা জাতির হৃদয়ে চিরস্মরণীয়।

নবদ্বীপ আবহমানকাল জ্ঞান-গৌরবে মণ্ডিত। বিদ্যাচর্চায় চিরকাল জগৎপূজ্য জ্ঞানী মহাত্মার জীবনী লইয়াই নবদ্বীপের ইতিহাস বিরচিত। নবদ্বীপ 'বাংলার অক্সফোর্ড" নামে চিরপরিচিত। নব্যন্যায়ের প্রবর্ত্তক রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত রঘুনন্দন, বঙ্গের তন্ত্রশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, প্রেম ও ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্যদেবের এই নবদ্বীপ আজ তীর্থ পথিকের কোলাহলে মুখরিত।

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বল্লালসেন বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এই সময়ে নবদ্বীপে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিশেষ উন্নতি লাভ করে।

ভারতের বুকে শতাব্দীর পর শতাব্দী যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভাব ও ধারার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্ধন চলিয়া আসিতেছে নবদ্বীপ সেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির বন্ধুত্বপূর্ণ সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী হইয়া পরিবর্তনকে স্বাগত জানাইয়া তাহাকে বরণ করিয়াছে। ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল তখন নবদ্বীপের স্মার্ত, তান্ত্রিক, নৈয়ায়িক ও বৈষ্ণব সমাজ তাঁহাদের ভবিষ্যৎ সন্তানের কর্মক্ষেত্র পৃথিবীব্যাপী বিস্তার লাভ করিবে এই আশায় বিজাতীয় সারস্বত লক্ষ্মীকে বরণ করিয়াছিলেন। তাহারই নিদর্শন তদানীন্তন কালের ইংরাজী স্কুলগুলি। নবদ্বীপের এই বিশিষ্ট বিবর্ত্তনের মূলে তখনকার দিনে গড়িয়া উঠিয়াছিল "হিন্দু স্কুল" ও "তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়"।

ইংরাজী শিক্ষা-প্রসারের সাথে সাথে সংস্কৃত শিক্ষার ভাবধারা ম্লান হইয়া

আসিল। কিন্তু নবদ্বীপের জ্ঞান-পিপাসু বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সংস্কৃত শিক্ষার ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ও জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্যক উপলব্ধি করিয়া ১৯০৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী নবদ্বীপে পাবলিক লাইব্রেরী নামে এই গ্রন্থাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন। তাহার পর হইতে কয়েকখানি বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ লইয়া এই গ্রন্থাগারের কার্য সুরু হয়। গ্রন্থাগারের আরম্ভে স্বর্গত দেবেন্দ্রনাথ বাগচী মহাশয় এই গ্রন্থাগারের সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৮ সাল হইতে বহু মনীষীর দান ও প্রচেষ্টায় এই গ্রন্থাগার ধীরে ধীরে বর্তমান অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য পুঁথিগুলির পাঠোদ্ধার করিবার জন্য এমন একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন যাহার মাধ্যমে বাংলা তথা ভারতের বহুল সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার জ্ঞান-পিপাসু জন-সমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করা যায়। সরকারের দৃষ্টি এ বিষয়ে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি। নবদ্বীপে একদিন যে গৌরবোজ্জল অধ্যায় রচিত হইয়াছিল আমরা আজও সেই মহান্ আদর্শের বেদীমূলে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যৎ আলোকোজ্জল দিনের উপাসনা করিতেছি।

এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মূলে নবদ্বীপের পণ্ডিত-মণ্ডলীর অবদান অনস্বীকার্য। অপরিসীম উদ্দীপনা লইয়া তাঁহারা এই গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছিলেন এবং আজও তাহার দ্যুতি অম্লান রহিয়াছে। আজিকার এই শুভ দিনে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি ও পরলোকগত বুধমণ্ডলী ও লোকান্তরিত উদ্যোক্তাগণের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

দেশে শিক্ষা প্রসারের সংগে সংগে নবদ্বীপেও শিক্ষানুরাগী কর্মিবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় নবদ্বীপে বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষায়তন গড়িয়া উঠে। তাহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বকুলতলা বঙ্গমুখী বিদ্যালয়, আর, সি, ভৌমিক সারস্বত মন্দির, বালিকা বিদ্যালয়, বঙ্গবাণী, শিক্ষা মন্দির, জাতীয় বিদ্যালয়, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ, আয়ুর্বেদ কলেজ, সরকারী সংস্কৃত কলেজ। ইহা ছাড়া বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়, জুনিয়ার হাই স্কুল, টোল প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নবদ্বীপে শিক্ষার প্রসার চলিতেছে। ইহারই পার্শ্বে নবদ্বীপে অসংখ্য ছোট বড় (মোট সংখ্যা ৩০) গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। ইহারাই শিক্ষার সজীব ধারাকে বহন করিয়া চলিতেছে। পাড়ায় পাড়ায় এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার উৎসাহী

যুবকদের প্রচেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘদিনের নিরলস সেবায় ইহারা নিজেদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কিন্তু স্বাধীন ভারতে গ্রন্থাগার যখন নবরূপ পরিগ্রহ করিতে যাইতেছে তখন উপযুক্ত অর্থের অভাবে তাহারা দ্রুত প্রসার লাভ করিতে পারিতেছে না। নবদ্বীপের পৌরসভা ও সরকার নবদ্বীপের গ্রন্থাগারগুলিকে সাহায্য করিলেও প্রয়োজনের তুলনায় তাহা যথেষ্ট নহে। নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার ইতিপূর্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাহায্য ও সহযোগিতায় গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ-শিবির স্থাপন করিয়া এই সব ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাগারিকগণকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারে Exchange Scheme করা হইয়াছে ও ছোট ছোট গ্রন্থাগার-গুলিকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া পুস্তক ধার দেওয়া হইতেছে। নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার রুরাল এরিয়া লাইব্রেরী হিসাবে অনুমোদন লাভ করিয়াছে।

নবদ্বীপ নদীয়া জেলার অন্তর্গত। বর্দ্ধমান জেলা হইতে পৃথক হইলেও নবদ্বীপ ভৌগলিক দিক্ হইতে বর্দ্ধমান জেলার সহিত একান্তভাবে সংযুক্ত। তাহার সন্নিহিত পূর্বস্থলী, পাটুলী, দাঁইহাট, অগ্রদ্বীপ, কাটোয়া, সমুদ্রগড়, ধাত্রীগ্রাম, বাগনাপাড়া, কালনা প্রভৃতি অঞ্চলগুলির সহিত বিশেষ যোগসূত্রে আবদ্ধ। ইহা ছাড়াও কালনা কাটোয়া রোড্ সমাপ্তির পর নবদ্বীপের সহিত এই সব অঞ্চলের যোগাযোগ আরও নিবিড় হইয়াছে এবং হুগলী জেলার কিয়দংশের সহিত যোগাযোগের সুযোগ হইয়াছে। বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলা গ্রন্থাগার হইতে এই সব অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলিকে পুস্তক সরবরাহ করা কষ্টসাধ্য ও ব্যয় সাপেক্ষ। "নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার" হইতে এই সব অঞ্চলে পুস্তক সরবরাহ সহজসাধ্য। আঞ্চলিক সুবিধা ও রাস্তাঘাটের সুব্যবস্থার উপর জেলা গ্রন্থাগার স্থাপন হওয়া প্রয়োজন। 'নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার'কে নদীয়া, বর্দ্ধমান ও হুগলীর উপরি উক্ত অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলিকে লইয়া জেলা গ্রন্থাগারে উন্নীত করা বিশেষ প্রয়োজন ও সময়োপযোগী বলিয়া মনে করি।

বৃটিশ যুগের সমস্ত বাধা ও বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলন ও সেই আন্দোলনকে সজীব ও পুষ্ট করিয়াছিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। 'বৃটিশ সরকার যখন নিরপেক্ষ, শিক্ষা যখন অবহেলিত তখন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শিক্ষার চিরপ্রবহমান ধারাকে ম্লান হইতে দেন নাই। বিগত দিনের বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎগণের প্রচেষ্টা আজ সার্থক হইতেছে।

এই গ্রন্থাগার সম্মেলনকে সার্থক করিতে নবদ্বীপের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিগণ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ যাঁহারা অকুণ্ঠচিত্তে সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়াছেন আজকের এই শুভদিনে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আজকের এই সম্মেলনের সার্থকতার পথে, হয়ত আমাদের অনেক ত্রুটী বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে—আপনারা গুণিজন আমাদের সেই অনিচ্ছাকৃত দোষ-ত্রুটি নিজগুণে মার্জন করিবেন।

নবভারতের সুধীবৃন্দ নবভারত গঠনে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অবদানকে সম্যকরূপে স্বীকার করিয়া গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সার্থক রূপ দানের জন্য আপনারা যে আশা, উদ্দীপনা লইয়া আজ এই শ্রীচৈতন্য-পদরেণু-ধন্য শ্রীধাম নবদ্বীপে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারই নাম স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করি এই কর্ম-প্রচেষ্টা সার্থক হউক।

মূল সভাপতির ভাষণ

এস, আর, রঙ্গনাথন

তিনটি স্মৃতি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে তিনটি পুরোনো কথা আমার মনে পড়ছে। এক, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর বিখ্যাত বিরাট ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহ যা বর্তমানে দেশবাসীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। দুই, ১৯২৮ সালে মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদ যখন স্থাপিত হ'ল, তদানীন্তন সভাপতি গ্রন্থাগার আন্দোলনের উপর একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশে সচেষ্ট হন। পরিষদের প্রকাশন-মালার ঐ প্রথম পুষ্প স্তবক রবীন্দ্রনাথের রচনায় সুরভিত। তাঁর আশীর্বাদ ও কল্যাণ সূচনায় আজ মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদ পঞ্চবিংশতি-তম গ্রন্থ প্রকাশ করতে চলেছে। এর ভিতর তিনখানি গ্রন্থ Five Laws of Library Science, Colon Classification ও Classified Catalogue Code আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। তিন বাংলার কুমার মুনীন্দ্রদেব

রায় মহাশয়ের কথা। অভিজাত বংশে জন্মেও জনসাধারণের সেবায় গ্রন্থাগারকে নিয়োগ করবার তাঁর তীব্র আকাঙ্খা সত্যই বিস্ময়কর। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে আমার প্রথম কলকাতায় আসা। সেই বছর মহাবোধী সোসাইটি হলে মুনীন্দ্র বাবুর উদ্যোগে আয়োজিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভায় আমি প্রথম বক্তৃতা করি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন।

মুনীন্দ্রবাবু আমার রচিত "আদর্শ গ্রন্থাগার আইন" বাংলাদেশে চালু করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বড়লাটের অসম্মতির জন্য বিধান সভায় এই আইন আলোচিত হয়নি। প্রাথমিক বাধাবিপত্তি এড়িয়ে ১৯৪৮ সালে মাদ্রাজে (ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম) ও ১৯৫৪ সালে হায়দ্রাবাদে গ্রন্থাগার আইন চালু হয়। কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয় যে-দেশে প্রথম গ্রন্থাগার আইন চালু করবার প্রচেষ্টা হয়েছিল সেই বাংলাদেশে এখনও গ্রন্থাগার আইন পাশ হয়নি। আমি আপনাদের পরিষদের কর্মসচিবের কাছে একটি খসড়া দিয়েছি। বাঙ্গালীর কাছে আমার আবেদন ১৯৫৮ সালের মধ্যেই এখানে গ্রন্থাগাব আইন বিধিবদ্ধ করে মুনীন্দ্র বাবুর আশাকে চরিতার্থ করেন।

কেন গ্রন্থাগার আইন

ত্রিশ বছর আগে গ্রন্থাগার আইন মুষ্টিমেয় কেবলমাত্র কয়েকজন দূরদর্শীর কাছে প্রয়োজনীয় বলে মনে হ'ত। কিন্তু আজ সকলের কাছে তা অপরিহার্য। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছি অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই দেশবাসীর জ্ঞানের পিপাসা কত বেড়েছে। তাদের জাগ্রত মনের চাহিদা বই দিয়ে মেটানো যায়। সাক্ষরদের হাতে সাধারণ গ্রন্থাগার মারফৎ তাই বই তুলে দিতে হবে আর নিরক্ষরদের তা পড়ে শোনাতে হবে।

আমাদের দেশে সংবিধান সকলকে ভোটাধিকার দিয়েছে, কিন্তু জ্ঞান ভান্ডারের চাবি কি সকলে পেয়েছে? অশিক্ষা আর সার্বজনীন ভোটাধিকারের মিলনের বিষময় ফল আমরা দুটি সাধারণ নির্বাচনে প্রত্যক্ষ করেছি। অন্যদিকে আমাদের গ্রন্থাগার-অব্যবস্থার সুযোগে এদেশে বিদেশী রাষ্ট্রগুলি তাদের গ্রন্থাগার মারফৎ নিজদের স্বার্থ প্রচারে নেমেছেন। পাশ্চাত্য দেশে রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও বিদেশী রাষ্ট্রের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরস্পর পরিপূরক। আমাদের দেশে একতরফা প্রচারের বিষময় ফল সম্বন্ধে সরকারের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান যুগের ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের যুগে উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নততর ও

দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

নবদ্বীপ ১৩৬৪

[সম্মে]লনের দ্বিতীয় দিনের প্রাতঃকালীন অধিবেশনে ভাষণ দান করিতেছেন শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়
মঞ্চোপরি মূল-সভাপতি ডক্টর এস. আর. রঙ্গনাথন, শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীতিনকড়ি বাগচী প্রভৃতিকে দেখা যাইতেছে।

(যুগান্তর পত্রিকার সৌজন্যে)

সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিগণের একাংশ

আলোচনা চক্রের বৈঠকে

প্রথম দল

দ্বিতীয় দল

আলোচনা চক্রের বৈঠকে

তৃতীয় দল

চতুর্থ দল

পঞ্চম দল
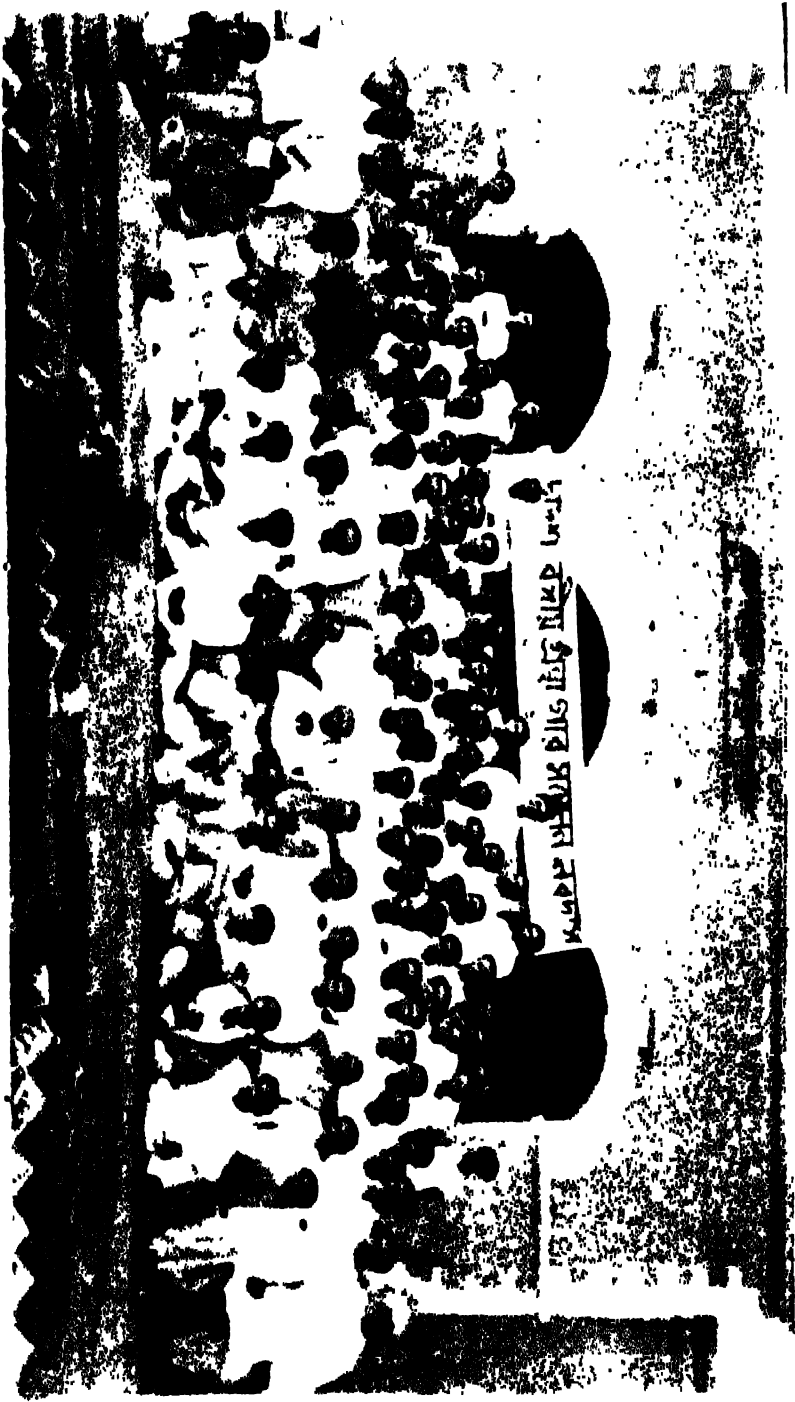
সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দ

অব্যাহত রাখার জন্য চাই দক্ষ ও শিক্ষিত কর্মী। এখানেও সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য দেশে "পুস্তক-দুর্ভিক্ষের" প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এর জন্য ১৯৫২ সালে আমি যে ধরণের প্রস্তাব করেছিলাম—অত্যন্ত আনন্দের কথা-তারই অনুসরণে "ন্যাশনাল বুক কাউন্সিল" গঠিত হয়ে এ সমস্যা সমাধানে সরকার সচেষ্ট হয়েছেন। শুধুমাত্র সরকারী কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের দ্বারা সংগঠিত হয়ে "লালফিতার" বাঁধনে যেন এর গতি রুদ্ধ না হয়ে যায়।

বয়স্কশিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

সরকারী তরফ থেকে বয়স্ক শিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে এক সঙ্গে বেঁধে দেবার প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু এই দুটি ব্যবস্থার মূলে পার্থক্য উপলব্ধির প্রয়োজন আছে, নচেৎ উভয়েরই ক্ষতি।

গ্রন্থাগারের অর্থের সূত্র

মাদ্রাজ গ্রন্থাগার আইন ব্যবস্থায় জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ আদায়ীকৃত গ্রন্থাগার-শুল্কের সমপরিমাণ অর্থ রাজ্য সরকার সাহায্য করেন। অন্যান্য করের কথা বিবেচনা করে এই আইনে ৩ নয়া পয়সা গ্রন্থাগার শুল্ক ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু এই অর্থে জেলার এক তৃতীয়াংশ লোকের জন্য চাহিদা মেটানো যায়। তাও কেবলমাত্র পৌনঃপুনিক খরচা। শিক্ষিতের হার কম বলে এখন একে পর্যাপ্ত মনে হবে। এককালীন খরচ এ অর্থে মেটানো অসম্ভব। সমস্ত দিক বিবেচনা করে মনে হয় রাজ্য সরকারের পক্ষে জেলা কর্তৃপক্ষ আদায়ীকৃত শুল্কের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ সাহায্য করা যথাযথ হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে গ্রন্থাগার ভবন, আসবাবপত্র ও প্রাথমিক পুস্তক সংগ্রহের জন্য এককালীন সাহায্য পেতে পারি। পৌনঃপুনিক খরচের জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্য ব্যয় করা যুক্তিসঙ্গত হবে না—কারণ গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি ব্যবস্থায় কেন্দ্রের অবাঞ্ছনীয় হস্তক্ষেপের আশঙ্কা আছে।

বাংলাদেশে সাধারণ গ্রন্থাগার-ব্যবস্থায় ১৯৫৮-৫৯ সালে প্রস্তাবিত বাজেটে ৮ লক্ষ টাকা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের জন্য ৩২ হাজার টাকা বরাদ্দ আছে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারসমূহের ২½ লক্ষ টাকা দেবেন। অর্থাৎ মাথাপিছু ৭ নয়া পয়সা। কেবল অক্ষর জ্ঞান-সম্পন্ন জনসংখ্যার হিসাবে মাথাপিছু ২৫ টাকা। বাংলাদেশের পক্ষে প্রয়োজন

মাথাপিছু এক টাকা। গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ না হলে এ সম্ভব হবে না। তা ছাড়া ৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা উন্নয়ন খাতে অর্থাৎ এর মোটা অংশ এককালীন খরচ হিসাবে ধরা হবে।

পৃথক গ্রন্থাগার বিভাগ

মাদ্রাজ গ্রন্থাগার আইন দশ বৎসর চালু হয়েছে, কিন্তু যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা সুখপ্রদ নয়। মাদ্রাজ আইনে শিক্ষাধিকর্তা (D. P. I.) পদাধিকার বলে সাধারণ গ্রন্থাগারের অধিকর্তা একজনের পক্ষে দুটি দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করা অসম্ভব। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়া প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা ব্যবস্থার অন্য কোন পর্যায় শিক্ষা বিভাগের আওতায় আসেনি। সুতরাং শিক্ষা বিভাগের সংগে গ্রন্থাগারকে যুক্ত করার প্রয়োজনই নেই। রাজ্য গ্রন্থাগারিকের অধীনে একটি পৃথক গ্রন্থাগার বিভাগের সৃষ্টি করতে হবে।

অত্যন্ত আনন্দের কথা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য ১·৭৫ কোটি টাকা সরকার মঞ্জুর করেছেন। কিন্তু আমাদের দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হোল এই যে অযোগ্য গ্রন্থাগার কর্মী নির্বাচন, সরকারী অব্যবস্থার জন্য এই অর্থের একটি বিপুল অংশের অপচয় ঘটেছে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

শিক্ষা-অধিকর্তার অধীনে বিদ্যালয় আর মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলি আছে। বাংলাদেশের দশটি সরকারী মহাবিদ্যালয়ের (কলা) গ্রন্থাগারে বই কেনার জন্য ১৯৫৮-৫৯ সালে ১৭,০০০৲ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। অর্থাৎ ছাত্রপিছু দুটাকারও কম। অথচ আন্তর্জাতিক হার হ'ল ছাত্রপিছু ১৫৲ টাকা। ২৯টি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য এই বাবদ বরাদ্দ টাকার পরিমাণ ৭০০০৲ টাকা! বেসরকারী বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ না করাই ভাল। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার বলতে তাই বুঝি একটি অর্গলাবদ্ধ গৃহে পুরাণো বাতিল বই জড়ো হয়ে আছে। তাহলে আমরা কি করে আশা করতে পারি যে শিক্ষা অধিকর্তার বিভাগ হঠাৎ গ্রন্থাগারমনা হয়ে উঠবেন এবং সাধারণ গ্রন্থাগারের সর্বাঙ্গীন বিকাশে ব্রতী হবেন।

জন ডিউই পরিকল্পিত নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের শ্রেণীতে শ্রেণীতে বক্তৃতার স্থান নেই। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের যথোচিত ব্যবহারের মধ্যে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার সাফল্য নিহিত আছে।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে মূলতঃ স্থানীয় ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

এই জেলাভিত্তিক আঞ্চলিক আত্মকর্তৃত্ব সম্পন্ন ও স্বয়ং সম্পূর্ণ ব্যবস্থায় :

প্রতিটি জেলার জেলায় নিজস্ব ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যের প্রতি ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপন করিবার জন্য জনসাধারণের সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগিতা লাভের পথে সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে এবং জনসাধারণকে তাহার উন্নতিবিধানে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করিবার জন্য এক বা একাধিক গ্রন্থ সংগ্রহ ও মিউজিয়াম সংস্থাপন প্রয়োজন এবং জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অপরিসীম গুরুত্বের জন্য এ ব্যবস্থা যত ত্রুটিমুক্ত হইবে দেশের সর্বাংগীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সার্থক রূপায়ণ ততই সহজসাধ্য হইবে।

এই সকল কারণে সরকার প্রবর্তিত যে জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এ যাবত কাজ করিয়া চলিয়াছে তাহা ইতিমধ্যে কতদূর সাফল্যলাভ করিয়াছে, জেলা গ্রন্থাগার সংস্থাগুলির পরিচালন-ব্যবস্থা নির্ভুল কিনা এবং কিভাবে অগ্রসর হইলে ঈপ্সীত ফললাভ ত্বরান্বিত হইবে—এই সকল বিষয়ে আজ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্তৃক নিরপেক্ষ হিসাব নিকাশ প্রয়োজন।

এই সভা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে অন্যান্য বিষয়ের সংগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অবিলম্বে উল্লিখিত হিসাব নিকাশ গ্রহণ করুন এবং জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করুন :

(ক) প্রতিটি জেলা কেন্দ্রীয় সংস্থা বাবদ এ যাবত কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে এবং কাজের অগ্রগতি তদনুপাতিক হইয়াছে কিনা ?

(খ) জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সেবার ধরণ এবং পরিধি বর্তমান কিরূপ।

(গ) জেলার প্রকৃত চাহিদা কি ধরণের এবং কতটা ; বর্তমান ব্যবস্থা এ চাহিদা কত শতাংশ পূরণে সক্ষম।

(ঘ) জেলার জন পরিচালিত যে সকল বৃহৎ গ্রন্থাগার রহিয়াছে তাহাদের গৃহ, আসবাবপত্র, গ্রন্থসম্ভার, কর্মী, অর্থ প্রভৃতির তুলনায় জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অবস্থা কি ?

(ঙ) জেলার সর্বস্তরের জনপরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির গ্রন্থসংগ্রহ সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে আছে কিনা এবং এই গ্রন্থ সম্ভারকে জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মোট গ্রন্থ সংগ্রহের সঙ্গে যোগ করিলে মোট চাহিদার কত শতাংশ পূরণ সম্ভব।

(চ) জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সেবা সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক কিনা—যদি না হয় তবে কিভাবে অদূর ভবিষ্যতে ইহাকে নিঃশুল্ক করা যাইতে পারে।

(ছ) জেলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রতি কতটা দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

(জ) জেলার জন-পরিচালিত সংস্থাগুলি সরকারের নিকট হইতে কি পরিমাণে অর্থ সাহায্য লাভ করে, এবং সামগ্রিক জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় ইহাদের সহযোগিতা কতদূর লাভ করা সম্ভব হইয়াছে।

(ঝ) ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের কার্যপ্রণালী কি এবং তাহা কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছে এবং সংগঠিত জেলা গ্রন্থাগার সংসদগুলি উপযুক্ত জনপ্রতিনিধিত্ব সম্পন্ন কিনা।

গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারী পরিকল্পনা প্রবর্তিত হওয়ার বহুপূর্ব হইতেই পশ্চিমবঙ্গের ছোট বড় প্রায় ২,৫০০টি জন প্রচেষ্টায় পরিচালিত গ্রন্থাগার নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী প্রায় ১৫,০০০ সমাজ সেবা কর্মীর সাহায্যে অন্যূন ৭০ লক্ষ গ্রন্থসম্ভার লইয়া পরিচালিত হইতেছে। এই ২,৫০০ই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিপুল সম্পদকে আগামী দিনের জনপ্রিয় সার্থক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপনের নিমিত্ত পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা—জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ। তাই উপরে উল্লিখিত ব্যবস্থা অবলম্বনকালে এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বিষয়ের সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ও সরকার কর্তৃক অনুসন্ধান ও সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচার প্রয়োজন :

(ক) বর্তমানে ব্যবহৃত গ্রন্থযান এবং তাহার পরিচালন ব্যবস্থা কতদূর ফলপ্রসূ হইয়াছে।

(খ) যে সকল স্থানে গ্রন্থযান পৌঁছায় না সেই সকল স্থানের জন্য গ্রন্থযান ব্যতীত অন্য কোন চলাচল ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ করিবার প্রয়োজনীয়তা এবং সুযোগ সুবিধা কতটুকু আছে।

(গ) গ্রন্থ আদান-প্রদান ব্যতীত গ্রন্থযানটিকে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ কার্যে ব্যবহার করিবার সুযোগ-সুবিধা আছে কিনা।

(ঘ) ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার পরিচালন ক্ষেত্রে সম্মিলিত গ্রন্থসূচী প্রণয়ন, বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে একই ভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সংগঠিত করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে কিনা; এবং হইয়া থাকিলে তাহার সমাধান সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

(ঙ) জেলাস্থ বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থ-সম্ভারকে ভ্রাম্যমান ব্যবস্থার মধ্যে আনা সম্ভব কি না। এই সভা জনকল্যাণের জন্য অর্থ বা শ্রমের অপব্যয়কে রোধ করিবার জন্য উক্ত অনুসন্ধান কার্যে সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ করিতেছে।

এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে –(১) ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী রোমান অক্ষরের পরিবর্তে ভারতীয় অক্ষরে নির্মাণ করিতে হইবে, (২) ভারতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রত্যেক ভাষাভিত্তিক মণ্ডলের জন্য পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডে সেই অঞ্চলের লিপিতে নির্মাণ করিতে হইবে (৩) আঞ্চলিক ভাষার জন্য গ্রন্থপঞ্জী নির্মাণের দায়িত্ব রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সেই রাজ্যের প্রকাশনাবিধারিক (Registrar of Publication) কিংবা ঐ কার্যের ভারপ্রাপ্ত প্রাধিকারিকের উপর ন্যস্ত থাকিবে। কিন্তু সংস্কৃত, ইংরাজী বা এইরূপ অঞ্চলবিশেষ নিরপেক্ষ ভাষায় গ্রন্থপঞ্জী নির্মাণের ভার জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার গ্রহণ করিবে (৪) ভারতীয় গ্রন্থপঞ্জীতে সূচী লিখন, বিন্যাসক্রম প্রভৃতি ভারতীয় রীতি অনুযায়ী করিতে হইবে—কোন বিদেশীয় রীতি অনুযায়ী নহে।

এই সম্মেলন, পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার সংগঠনের যথাযথ পদ্ধতি নিরূপন ডাঃ রঙ্গনাথন যে গ্রন্থাগার আইনের খসড়া রচনা করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছে, এই সম্মেলন মনে করে যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উচিত এই খসড়াটিকে বহুল প্রচার করা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা যে তাঁহারা যেন তাঁহাদের মতামত ৩১শে জুলাইয়ের পূর্বে পরিষদকে জানাইয়া দেন। এই সম্মেলন পরিষদকে অনুরোধ করিতেছে যে এই সমস্ত মতামত বিবেচনা করিয়া পরিষদ যেন খসড়াটির প্রয়োজনমত পরিবর্তন করিয়া, গ্রন্থাগারের জন্য ট্যাক্সের হার এবং ঐ হারের অনুপাতে সরকারের সাহায্য কিরূপ হওয়া উচিত তাহা নিরূপণ করিয়া বিলটি আইন সভায় বিধিবদ্ধ করিবার প্রয়াস করেন।

নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে

গৌরাঙ্গ চন্দ্র কুণ্ডু

বিশ্ব-রহস্যের মহাসত্যগুলির কথা ভাবলে কেবলই মনে হয়—ভাঙ্গা গড়ার বৈপ্লবিক সুর। কেবলই শোনা যায়—ভাঙ্গ, গড়, এগিয়ে চলো। এধারা চলে আসছে যুগের পর যুগ ; এ নিয়মেই জাগতিক লীলা খেলার বিচিত্র স্বাক্ষর আজো বিরাজমান। নবদ্বীপের সমাজচিত্র ও সেই নিয়মের অনুশাসনকে স্বীকার করে বর্তমান ধারায় এগিয়ে চলেছে।

আজ ভাবতেও আশ্চর্য লাগে—১৯০৭ সালে পোড়ামাতলার মাঠে যে গ্রন্থাগারের গোড়াপত্তন স্থিরিকৃত হয়, আজ কিনা সেই গ্রন্থাগারের প্রাঙ্গণে সারা বাংলাদেশব্যাপী গ্রন্থাগার সম্মেলনের আয়োজন। মাত্র বিংশ শতাব্দীর আদি-অন্ত লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এর মধ্যে কত উত্থান পতনের হাওয়া বয়েছে ; ভাঙ্গা-গড়ার কত বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। সে সব পরিবর্তনেরই কোন একটি ধাপে গড়ে উঠে নবদ্বীপের সাধারণ গ্রন্থাগার, আজ যেখানে দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মহাসমারোহ। তাই প্রসঙ্গতঃ এই গ্রন্থাগারের ইতিবৃত্ত সন্ধান করা অত্যাবশ্যক।

শিক্ষা-দীক্ষায়, সাহিত্যে ধর্মে, আচারে অনুষ্ঠানে নবদ্বীপের সংস্কৃতি যেমন বহু প্রাচীন, তেমনি সমৃদ্ধ। শিক্ষা জগতে এস্থানের নাম সুবিদিত। সারা ভারতে সংস্কৃত শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হিসাবে নবদ্বীপ বাংলার অক্সফোর্ড নামে পরিচিত। দেশ বিদেশের হাজার হাজার পড়ুয়াদের আনাগোনায় নবদ্বীপের জনসমাজ তখন স্ফীত হয়ে উঠেছিল। ভাগীরথীর উভয় তীরে গড়ে উঠে হাজার হাজার ছাত্র নিবাস। সকালে সন্ধ্যায় গঙ্গার ঘাটে সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের স্নান সমারোহ—সংস্কৃত শ্লোক ও মন্ত্র ধ্বনিতে তখন নবদ্বীপের আকাশ বাতাস মুখরিত ছিল। নব্যন্যায়ের প্রবর্তক নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, স্মৃতির বিজয় বাহক স্মার্ত রঘুনন্দন, তন্ত্রশাস্ত্রের প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রভৃতি মনীষীদের প্রতিভায় বাংলাদেশ গৌরবোজ্জল হয়ে উঠেছিল। প্রেম ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও তাঁরই প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম বাংলা দেশকে প্রেম ও ভক্তি স্রোতে প্লাবিত করে একটি নূতন দিকের সন্ধান দিয়ে গেছে। নবদ্বীপ তথা বাংলার সেই খ্যাতি শুধু রাজ

দরবার নয়, ভারতের বিদগ্ধ জনসমাজেও সম্মান অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছিল, এবং তার নমুনা স্বরূপ বহু টোলবাড়ীর অস্তিত্ব ও সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র বিরাজমান দেখা যায়।

তারপর এলো ভাঙ্গনের পালা। নবদ্বীপের শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা দিল বিরাট পরিবর্তন। ইংরাজী শিক্ষার প্রাধান্য বেড়ে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। একদিকে ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। অন্যদিকে সংস্কৃত টোলগুলি ধীরে ধীরে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে থাকে। ফলে সংস্কৃত শিক্ষার অনুশীলন ও চর্চা নিস্তেজ হয়ে আসে। কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষার সেই শোচনীয় পরিণাম কতিপয় বিশিষ্ট পন্ডিত ও ইংরাজী শিক্ষাভিমানীর মনে আঘাত হানে, এবং তারই ফলে নবদ্বীপ সমাজে সংস্কৃত শিক্ষার মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠা দ্বারা নবদ্বীপ সংস্কৃতিকে অক্ষুন্ন রাখার পরিকল্পনা নিয়ে ১৯০৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী এই সাধারণ গ্রন্থাগারের পত্তন হয়।

প্রারম্ভে এর নামকরণ হয় "নবদ্বীপ পাবলিক লাইব্রেরী"। সামান্য কয়েকখানা বাংলা ও সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহ করে করুণানিধন মুখোপাধ্যায়ের বহির্বাটী ঘরে গ্রন্থাগারের কাজ আরম্ভ হয়। তৎকালীন সভাপতি রায়বাহাদুর দ্বারিকানাথ ভট্টাচার্য ও সম্পাদক দেবেন্দ্র নাথ বাগচী উভয়ের প্রচেষ্টায় লাইব্রেরীটি দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলে এবং ১৯১০ সালে ভারত সম্রাটের মৃত্যুতে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এর নাম পরিবর্তন করে "সপ্তম এডোয়ার্ড এ্যাংলো-সংস্কৃত লাইব্রেরী" রাখা হয়।

এরপর গৃহ নির্মাণ পর্ব। বিভিন্ন স্থান থেকে গৃহনির্মাণ কল্পে অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় এবং তার মধ্যে মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর ৮০০/ টাকা উল্লেখযোগ্য। ১৯১৫ সালের ১৮ই জুলাই ভিত্তি স্থাপিত হয়ে সে বছরেই ৩০শে আগষ্ট নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সম্পন্ন হয়। ইতিমধ্যে বাংলার লাটসাহেব লর্ড কারমাইকেলের বদন্যতায় গ্রন্থ ও আসবাব-পত্রাদি ক্রয়ের জন্য ২০০০৲ টাকা সরকারী সাহায্য প্রাপ্তিতে লাইব্রেরীর উন্নতির পথ অনেকটা প্রশস্ত হয়ে যায়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য ও উপদেশও এই গ্রন্থাগারকে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে দেয় এবং সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহের অনুপ্রেরণা এনে দেয়। তাঁরই চেষ্টায় এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে বহু সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এভাবে বিভিন্ন

ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে লাইব্রেরীর উন্নতির ধারা অগ্রসর হয়। ১৯২১ সালে তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা হর্ণেল সাহেবের ২০০০৲ অর্থ সাহায্য গ্রন্থাগারের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করে। এরূপে ১৯২১ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ৩৩.বৎসরকাল লাইব্রেরীর একটানা উন্নতির ইতিহাস। কিন্তু ১৯৫৪ সাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ইতিহাস কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনপূর্ণ এবং আলোচ্য ক্ষেত্রে তা' অনুধাবনীয়।

এই সময়ের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান ঘটনা হলো ১৯৫৫ সালের ১লা নভেম্বর পূর্বের ইংরাজী নামের পরিবর্তে "নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার" নামকরণ। পূর্ববর্তী নামানুযায়ী জনসাধারণের সংগে লাইব্রেরীর যে একটা বিভেদাত্মক সম্পর্ক ছিল, সেটা তিরোহিত হয়ে একাত্মতার নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হলো। অন্যতম বৈশিষ্ট্যের মধ্যে "বুক ব্যাঙ্কের" ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও প্রাইভেট এবং, এ পরীক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের উদ্দেশ্যেই এই বিভাগটি খোলা হয়েছে। এর দ্বারা যে বহু ছাত্র-ছাত্রী ও পরীক্ষার্থীর উপকার হচ্ছে, নবদ্বীপের গ্রন্থাগার ইতিহাসে তা' উল্লেখযোগ্য। তারপর উল্লেখ করতে হয় গ্রন্থাগার শিক্ষণ শিবিরের কথা। নবদ্বীপ তথা নদীয়ার ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলি বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সুসংবদ্ধ করার জন্য অভিজ্ঞ ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত কর্মী সৃষ্টি করার পরিকল্পনা নিয়ে এই শিক্ষণ শিবির উদ্বোধন করা হয়েছিল, এবং এখান থেকে ২৮ জন কর্মী শিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে নিজ নিজ গ্রন্থাগার পুনর্গঠন ও সুসংবদ্ধ করার কাজে ব্রতী হবার সুযোগ পান। এরপরই এলো এই গ্রন্থাগারকে গ্রাম্য আঞ্চলিক গ্রন্থাগার (Rural Area Library) হিসাবে নদীয়া সমাজ জিলা শিক্ষা বিভাগ থেকে সরকারী অনুমোদন। গ্রন্থাগারের গৃহাদি ও পুস্তক বৃদ্ধির জন্য সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় এবং একটা নূতন পরিকল্পনা নিয়ে দ্রুত অগ্রগতির পথে গ্রন্থাগারের কাজ এগিয়ে চলে। এই বছরের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শিশু বিভাগের উদ্বোধনও নবদ্বীপ গ্রন্থাগার সমাজে নূতন আলোড়নের সূচনা করে দেয়। বহু শিশু সাহিত্য, ম্যাপ, চার্ট ও বিভিন্ন প্রকার শিক্ষোপকরণের দ্বারা শিশুদের আনন্দের মাধ্যমে জ্ঞান দেওয়ার পক্ষে শিশু বিভাগ খুবেই কার্যকরী হয়েছে। এ বছরেই গ্রন্থাগারের সংগে একটি সমাজশিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং বিভিন্ন বয়সের বহু শিক্ষার্থী সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত এখানে পড়াশুনা করার সুযোগ পায়। রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত ও রবীন্দ্র সাহিত্যের উপর রচিত

সমস্ত গ্রন্থ সম্ভারে পূর্ণ "রবীন্দ্র বিভাগ"টি এই গ্রন্থাগারের সৌষ্ঠবকে বহুগুণে সমৃদ্ধ করেছে। সর্বশেষে উল্লেখ করতে হয় দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের কথা, যার মাধ্যমে নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার বাংলা তথা সারা ভারতে স্বীয় কার্যাবলীসহ আত্মপরিচয় দেওয়ার সুযোগ করে নিয়েছে। মফঃস্বল অঞ্চলেও একটা গ্রন্থাগারে এরূপ অগ্রগতির পশ্চাতে যে কর্মপ্রচেষ্টা ও কর্মকুশলতা রয়েছে, তা' প্রশংসাযোগ্য এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে আদর্শস্থানীয়।

এর বর্তমান অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা যায়, বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার অন্যতম প্রধান। এর পুস্তক সংখ্যা ১৩,০০০ এবং পুঁথির সংখ্যা ২,৫০০। তা ছাড়া, প্রতি বছরেই নূতন গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য সরকারী অর্থসাহায্য ভবিষ্যত সম্ভাবনার ইঙ্গিত করে দিচ্ছে। বর্তমানে এর গ্রাহক সংখ্যা ২৫,০০০। অবৈতনিক পাঠক সংখ্যাও দৈনিক ৫০এর উর্দ্ধে। এখানে পুস্তক বিনিময় প্রথার (Exchange Scheme) ব্যবস্থা করে নবদ্বীপের বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে পুস্তক ধার দেওয়া হয়। গবেষক ও চিন্তাশীল পাঠক, সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র পাঠক, গল্প উপন্যাস পাঠক—এরূপ বিভিন্ন প্রকার পাঠকদের জন্য সুব্যবস্থা করা হয়েছে। সকাল ৭টা থেকে ৯টা এবং বৈকাল ৪টা থেকে ৭টা গ্রন্থাগার খোলা থাকে। মাসিক চাঁদা ।।০, ভর্তি চাঁদা ১৲ এবং পুস্তক গৃহে লওয়ার জামীনস্বরূপ ৫৲ ১০৲ জমা রাখার নিয়ম।

পরিচালনা ও সহযোগিতার কথা আলোচনা করতে যেয়ে কেবল নবদ্বীপ নয়, বাংলার বহু কৃতী ও সুযোগ্য সন্তানগণের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। ৺দেবেন্দ্র নাথ বাগচী, শ্রীরণজিৎ কুমার ভট্টাচার্য, জ্ঞানরঞ্জন রায় ও শ্রীতিনকড়ি বাগচীর কর্মকুশলতায় গ্রন্থাগার ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেচে। নবদ্বীপের বিশিষ্ট পণ্ডিত মণ্ডলী, দ্বারিকা ভট্টাচার্য, বিচারপতি বিজন কুমার মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বিমান বিহারী মজুমদার প্রভৃতি মনীষীগণের সহযোগিতা ও সাহায্যে গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছে। লাইব্রেরীর বর্তমান উন্নতির মূলে রয়েছেন শ্রীবিজয়গোপাল গোস্বামী ও তরুণ উদীয়মান কর্মী শ্রীনির্মলচন্দ্র চৌধুরী।

বর্তমান প্রগতির গতিকে লক্ষ্য করে এর বিরাট সম্ভাবনা ও ভবিষ্যতের প্রতি ইঙ্গিত করে একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনে ও জনশিক্ষা বিস্তারে নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার এক অভিনব ভূমিকা গ্রহণ করবে।

সম্মেলনে বিদেশ হইতে এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে প্রাপ্ত শুভেচ্ছা বাণীর কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

American Library Association, Chicago :

The officers and staff of the American Library Association send Greetings and congratulations to the members of the Bengal Library Association on the occation of its Twelfth Annual Conference. We wish you success both in your Conference and in the work in which we are mutually engaged.

Special Libraries Association, New York :

The continued success of the Bengal Library Association in furthering the professional interests of Librarians has been a matter of satisfaction to the special Libraries Association. We congratulate you on your plans for the 12th Bengal Library Conference and wish you every success in this and future activities.

Japan Library Association, Tokyo :

Hearty Congratulation on your Annual Conference.

Canadian Library Association, Ottawa :

The officers and members of the Canadian Library Association send their best wishes to the Bengal Library Conference for a most successful gathering on the 4th and 5th of April, 1958.

Head, Libraries Division, UNESCO, Paris :

I was pleased to learn that the 12th Bengal Library Conference will be held 4-5 April in West Bengal, and I am happy to convey to you my best wishes for the success of your meeting. Unesco attaches great importance to the development of libraries as essential elements in the cultural and educational activities of each country, and it is therefore gratifying to know that the

library movement has progressed in Bengal to the point where statewide integrated service is a possibility. I am sure that you present conference will be another big step forward, and I hope that the future will bring the Bengal Library Association on complete success in reaching its objectives.

The Librarian of Congress, Washington :

With Dr. S. R. Ranganathan serving as the general President of this conference, it is certain to be a successful one. I congratulate you on getting such a stimulating and well-informed librarian to serve in this capacity.

The Library Association, London :

The Bengal Library Association has played an important part in the great progress made in the last few years in the development of libraries. I would ask you to convey to the participants, through the President, Dr. S. R. Ranganathan, the best wishes of the Council and Members of the library Association on the occassion of the twelfth Bengal Library Conference.

Library Association of Australia, Sydney :

On behalf of the Library Association of Australia it gives me very great pleasure indeed to extend to your Association its congratulations on the opening of your 12th Conference and its best wishes for the success of the Conference. We feel that the conference will do a great deal to further the course of library development in your country.

Rai Harendra Nath Choudhury, Education Minister, Government of West Bengal :

I am glad to learn that the Twelfth Bengal Library Conference is going to be held at Nabadwip Sadharan Granthagar on the 4th and 5th April 1958. I wish the conference all success.

Secretary, Kerala Granthasala Sanghom :

I wish the conference entire success.

Humayun Kabir, New Delhi :

I am glad to know that you are holding the Twelfth Bengal Library Conference at Nabadwip on the 4th and 5th April 1958. I wish the Conference every success.

Madras Library Association, Madras :

We are aware that since early in 1920, The Bengal Library Association has been striving hard for the establishment of an Integrated Library Service in Bengal. In 1930 or so, Kumar Munindra Deb Rai Mahasai, a great enthusiast for the library cause, wanted to introduce library bill in your state Assembly, ...This bill was prepared in cooperation with Dr. S. R. Ranganathan, who is presiding over the deliberations of your present Conference. But, in spite of the best efforts of Mahasai the bill could not be introduced as the Viceroy did not accord the necessary sanction for its introduction. However, we are now in better days. We hope you will, with your great influence, succeed in convincing your Government of the need for a comprehensive Library Legislation and see that a public Libraries Act. is put in its Statute Book without further delay. We wish your Conference all success in all your deliberations in general and in this activity of the organisational side in particular.

J. C. Ghose, Planing Commission, New Delhi :

I am glad to know that you are holding the Twelfth Bengal Library Conference on the 4th and 5th April and I wish the function success.

Tushar Kanti Ghose :

I am glad to know that the 12th Bengal Library Conference is going to be held shortly at Nabadwip Sadharan Granthagar, Nadia. The spread of education and culture depends largely on libraries not only in the metropolis but also in district towns and villages. I hope your Association while discussing the problems of libraries of West Bengal, will also take up the task of creating a sort of library movement in the country. I wish you every success.

Delhi, Library Association :

Wish you all success for the Conference.

গ্রন্থাগার সংবাদ

পালপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী ॥ বরাহনগর ॥ কলিকাতা ৩৬ ॥

গত ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী পালপাড়া লাইব্রেরীর উদ্যোগে রজত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অখিল নিয়োগী গ্রন্থাগার সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। উৎসবের দ্বিতীয় দিনে আবৃত্তি, রচনা প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরিত হয়, ইহাতে পৌরপ্রধান শ্রীকানাই লাল ঢোল পুরস্কার বিতরণ করেন। সাহিত্যিক শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগারটির মঙ্গল কামনা করিয়া দেশে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। প্রধান অতিথি ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ ইন্‌ফরমেশন সার্ভিসের সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীচিন্ময় তাঁহার ভাষণে বলেন যে, গ্রন্থাগারের গুরুত্ব পুস্তকের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। পুস্তকগুলির সারমর্ম পাঠক-পাঠিকার চিত্ত অধিকার করিলেই গ্রন্থাগারের সার্থকতা।

সিঁথি বনমালি বিপিন পাবলিক্ লাইব্রেরী

॥ ১৩, আটাপাড়া লেন ॥ কলি—২ ॥

গত ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত লাইব্রেরীর 'রজত জয়ন্তী উৎসব' বিশেষ নিষ্ঠার সহিত উদ্‌যাপিত হয়। বাংলা দেশের বহু মনীষির পদধূলিতে ধন্য এই গ্রন্থাগার। জাতির জীবনে শিক্ষার আলোকে বিকিরণে বিশেষ যত্নবান। বর্তমানে জনসংখ্যার অনুপাতে দেশে উপযুক্ত গ্রন্থাগারের সংখ্যা একেবারে নগণ্য বলিলেই হয়, এই গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতি সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থাগারের উন্নয়নমূলক একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারত পাঠাগার ॥ ২৭, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লেন ॥ হাওড়া ॥

গত ২৩শে মার্চ পাঠাগারের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সম্পাদক বিগত বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। সভায় ১৯৫৮-৬০ সালের জন্য কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ

নির্বাচিত হন। সভাপতি—শ্রীকৃষ্ণপদ মুখোপাধ্যায়, সহঃ সভাপতি—শ্রীমনীষী প্রসাদ গুহ, শ্রীযুগোল কিশোর মণ্ডল। সম্পাদক—শ্রীইন্দ্রনাথ ঘোষ, সহঃ সম্পাদক—শ্রীসমরেন্দ্র নাথ দাস, শ্রীউদয় নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীজয়ন্ত মণ্ডল।

কাদম্বিনী স্মৃতি জ্ঞানাগার ॥ রামকৃষ্ণবাটী ॥ হুগলী ॥

কাদম্বিনী স্মৃতি জ্ঞানাগারের উন্নতি কল্পে এবং পল্লীর সামগ্রীক মংগলের উদ্দেশ্যে চারিজন উৎসাহী কর্মীকে লইয়া একটি স্থায়ী ট্রাস্ট বোর্ড গঠিত হইয়াছে। এই চারিজন হইতেছেন শ্রীঅনুকূল চন্দ্র কোলে, সত্যচরণ মালিক, নিতাই চন্দ্র কর ও ব্রজনাথ নন্দী। প্রতিষ্ঠান যাহাতে সরকারী সাহায্য পায় তাহার জন্য নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। শ্রীনন্দী জ্ঞানাগারের উন্নতির জন্য ৩ কাঠা জমি, ১৫০৲ টাকা মূল্যের আলমারি ও পুস্তক দান করিয়া পল্লীবাসীর পরম উপকার করিয়াছেন।

গুড়াপ সুরেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ॥ গুড়াপ ॥ হুগলী ॥

গত ৩০শে মার্চ, রবিবার গুড়াপ সুরেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসব স্থানীয় রজনীকান্ত বিদ্যায়তন প্রাঙ্গণে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সুসম্পন্ন হয়। 'যুগান্তর'—সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন এবং হুগলী জেলার সমাজশিক্ষা প্রাধিকারিক শ্রীতাপস সেনগুপ্ত প্রধান-অতিথির আসন অলংকৃত করেন। সভার প্রারম্ভে, রজনীকান্ত বিদ্যায়তনের প্রধান শিক্ষক শ্রীভবানী শঙ্কর ভট্টাচার্য বিশিষ্ট অতিথিবর্গকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। পাঠাগারের সভাপতি শ্রীসন্তোষ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে পাঠাগারের সাধারণ ও কিশোর বিভাগের মোট সদস্য সংখ্যা ২১২ জন, মোট পুস্তক সংখ্যা ১৬৮০। বার্ষিক আয় মোট ১২৫৮৷৶০ আনা। কলিকাতার নবজাত শিল্পী-সংঘ 'পদক্ষেপ'এর প্রযোজনায় সাড়ে-তিনঘণ্টা ব্যাপী 'বিচিত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল। শ্রীপূর্ণদাস বাউলের কণ্ঠ-সংগীত, শ্রীসবিতাব্রত দত্তের আবৃত্তি ও গান, দর্শকবৃন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় অভিনন্দিত হয়।

হরাজদাসপুর সাধারণ পাঠাগার ও ভুপেন্দ্র পাঠ নিকেতন ॥ হরাল ॥ হুগলী

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী উক্ত পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সম্পাদক বিগত বৎসরের কার্য বিবরণী এবং আয় ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপিত করেন। সভায় ১৩৬৫-৬৭ সালের কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়। সম্পাদক তাঁর ভাষণে বলেন যে, দীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া পাঠাগারের নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রচেষ্টা চলিতেছিল, আজিকে আমাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করিয়াছে ইহার জন্য আমরা মাননীয় সভ্য আঃ রহমানের নিকট কৃতজ্ঞ। ইনি ২৫০৲ টাকা নগদ ও ৫ কাঠা জমি দান করিয়া আমাদের নিজস্ব গৃহ নির্মাণের জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। উহা ছাড়া তিনি মাননীয় জেলা শাসককেও ধন্যবাদ জানান। সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্বাচিত হইয়াছেন। সভাপতি শ্রীএ, এস, নাগ, সহঃ সভাপতি মহঃ ইউনুস সরকার ও মহঃ হাসেন মণ্ডল, সম্পাদক এম, খালেদ আরিফ, কোষাধক্ষ্য এম, জামালউদ্দিন আহম্মদ, গ্রন্থাগারিক শ্রীনীরদবরণ দাস।

নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার ॥ নবদ্বীপ ॥ নদীয়া।

বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারী নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার রুরাল এরিয়া লাইব্রেরীর দ্বার উদ্বোধন করেন নদীয়া জেলার সমাজ শিক্ষার প্রধান পরিদর্শক শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগের উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক শ্রীমনি বাগচী। নবদ্বীপের স্থানীয় সংগ্রহের উপরে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করায় জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন।

গত ২৭শে জানুয়ারী সুভাষ শিল্প ভারতীর উদ্যোগে সুভাষ স্মৃতি পাঠাগারে খেজুরী, ভগবানপুর ও নন্দীগ্রাম থানার গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন থানার ১৮টি গ্রন্থাগারের ৫৪ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। ভূতপূর্ব লোকসভার সদস্য শ্রীবসন্তকুমার দাস সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সম্মেলনে প্রধান অতিথি পঃ বঙ্গের সমাজ শিক্ষার মুখ্য পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় ও জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকর্তা শ্রীগদাধর নিয়োগী মহাশয় গ্রন্থাগার পরিচালনা ও গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে দুইটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

গ্রন্থাগারসমূহের প্রতিনিধিগণ তাঁদের প্রত্যেকের পাঠাগার পরিচালনায় সংকট ও অসুবিধার কথা ব্যক্ত করেন। ফলে আলোচনা খুবই মনোজ্ঞ ও কার্যোপযোগী হইয়া উঠে। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে মাঝে মাঝে এই প্রকারং আলোচনা ও রাজ্য সরকারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিগণের পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির জন্যে গ্রন্থাগার প্রতিনিধিগণের সম্মিলিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। সম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র প্রামাণিক সমাগত প্রতিনিধি ও অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানাইয়া একটি ভাষণ দেন।

গদাধর গ্রন্থাগার ॥ বহরকুলি ॥ বর্ধমান ॥

১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই গ্রন্থাগারটি সম্প্রতি সরকার কর্তৃক Rural Library বা আঞ্চলিক পাঠাগার হিসাবে অনুমোদিত হইয়াছে। গত ২৭শে জানুয়ারী বর্ধমান জেলা সমাজশিক্ষাধিকারিক শ্রীগৌরাঙ্গকান্তি চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীসুনীল রায় এবং জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য শ্রীসরল সেন গ্রন্থাগার ও তৎসংলগ্ন স্থান পরিদর্শন করেন। গত ১২ই ফেব্রুয়ারী সরকারী অর্থে শ্রীসমরপ্রসাদ ভট্টাচার্যকে গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থাগার গৃহ সম্প্রসারণের জন্য সরকার কর্তৃক তিন হাজার টাকা মঞ্জুর হয়।

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী গ্রন্থাগারে আগামী বৎসরের জন্য নূতন কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। ইহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্বাচিত হইয়াছেন। সভাপতি অধ্যাপক বাবুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। সহঃ সভাপতি শ্রীঅনাথবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায়। সম্পাদক শ্রীদেবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। সহঃ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ শ্রীগৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়।

রামেন্দ্র সুন্দর-স্মৃতি পাঠাগার ॥ জেমো ॥ মুর্শিদাবাদ ॥

বিগত ৪ঠা ফাল্গুন বৈকালে কান্দী রাজ কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। কান্দী রাজ কলেজের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীবলরাম চক্রবর্তী মহাশয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন।

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারীর সাবলীল প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ পাঠ, শ্রীপতিত পাবন মিত্রের আচার্য দেবের রাজনৈতিক জীবন ও পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বৈদেশিকের দৃষ্টিতে আচার্য দেবের দোষমুক্ত চরিত্র এবং শ্রীআশুতোষ সেনগুপ্তের আচার্য দেবের বহু বহুমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে বক্তৃতা খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

গ্রন্থ সমালোচনা

নব জ্ঞান-ভারতী—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা—১৩। মূল্য—১৫৲ টাকা ও ২০৲ টাকা।

বাঙলা বিশ্বকোষের হিন্দী সংস্করণ দেখে গান্ধীজী নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে অভিনন্দন জানাবার জন্য তাঁর বাড়ি গিয়েছিলেন। ভারতীয় ভাষায় এরূপ রেফারেন্স বুই প্রকাশের কাজে বাঙালী পথ প্রদর্শন করেছিল। তখন এ ধরণের রেফারেন্স বই সংকলন করা যে কত কঠিন তা উপলব্ধি করেই গান্ধীজী শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিশ্বকোষের পর বাঙলা ভাষায় কোনো উল্লেখযোগ্য রেফারেন্স বই প্রকাশিত হয়নি। বাঙলার তুলনায় এদিক দিয়ে অন্যান্য ভাষা অনেক অগ্রসর হয়েছে। মারাঠী, তামিল, তেলুগু ভাষায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রেফারেন্স বই বেরিয়েছে। তামিল বিশ্বকোষের অঙ্গসজ্জা এমন সুন্দর যে হঠাৎ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বলে ভুল হওয়া বিচিত্র নয়। ওড়িয়া বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ডও বেরিয়ে গেছে।

ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে রেফারেন্স বইয়ের অভাব আমরা প্রতি পদে উপলব্ধি করি। য়ুরোপ, আমেরিকা সম্বন্ধে তুচ্ছ প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদের অসুবিধা হয় না। বিদেশী রেফারেন্স বইয়ের প্রাচুর্য তার কারণ। নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স বইয়ের অভাবে আমাদের দেশের শিক্ষার্থী, সাধারণ পাঠক এবং গবেষক অধ্যয়নে বাধা পান। ইংরেজী কিংবা ভারতীয় ভাষায় ভারত-সম্বন্ধীয় রেফারেন্স বই না থাকবার কতকগুলি কারণ আছে। প্রথম কারণ, ভারতের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য বই ও তথ্যের অভাব। রেফারেন্স বইয়ের সংকলক এই সব পুঁথিপত্র থেকে

তথ্য আহরণ করে এমনভাবে তাদের বিন্যাস করেন যাতে পাঠকের নিকট এগুলি সহজলভ্য ও সহজগ্রাহ্য হয়। কিন্তু সংকলককে যদি তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণা করতে হয় তাহলে রেফারেন্স বইয়ের কাজ বন্ধ থাকবে। সংগৃহীত তথ্যকে বিচার ও বিশ্লেষণ দ্বারা গ্রহণ করাই সংকলকের উদ্দেশ্য, গবেষণা দ্বারা তথ্য আবিষ্কার নয়।

রেফারেন্স বই সংকলন করবার জন্য যেরূপ পরিশ্রমী, তথ্যাভিজ্ঞ কর্তব্যনিষ্ঠ ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন তেমন লোকের সংখ্যা আমাদের দেশে বেশী নেই। যদি বা তেমন সংকলক পাওয়া যায়, প্রকাশক পাওয়া আরো কঠিন। রেফারেন্স বই ব্যয়বহুল, এবং বিক্রি অনিশ্চিত। সুতরাং সাধারণ প্রকাশক রেফারেন্স বই প্রকাশ করে ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক। গল্প-উপন্যাসের বই নিয়ে ব্যবসা করা এর চেয়ে অনেক সহজ এবং নিশ্চিত।

বলা বাহুল্য, বাঙলা রেফারেন্স বইয়ের এরূপ অবস্থায় শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "নব জ্ঞান-ভারতী" পেয়ে বিশেষ আনন্দলাভ করেছি। প্রভাতবাবু একটি ছোট বাঙলা কোষগ্রন্থের কাজ শুরু করেছিলেন অনেকদিন পূর্বে। এই কোষগ্রন্থের প্রথম দু'খন্ড ছাপা হবার পর পরবর্তী খন্ডগুলির প্রকাশ দুর্ভাগ্যক্রমে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু প্রভাতবাবু হতাশ না হয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ অপেক্ষা করছিলেন এবং তথ্য সংগ্রহ করে যাচ্ছিলেন। "নব জ্ঞান-ভারতীর" বর্তমান খন্ডটি তাঁর দীর্ঘকালের সাধনার ফল। এই খন্ডটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ভৌগোলিক অভিধান। বাঙলা ভাষায় ভৌগোলিক অভিধান এই প্রথম ; অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় এরূপ ভৌগলিক কোষ আছে বলে জানি না। সুতরাং "নব জ্ঞান-ভারতী"র ভৌগোলিক খন্ডটি পথিকৃতের দাবী করতে পারে।

আমাদের ভূগোল পাঠ সাধারণতঃ স্কুলের শিক্ষায় সঙ্গেই সমাপ্ত হয়। অথচ আজকাল ক্রমশঃ ভূগোলবিদ্যার প্রয়োজন বাড়ছে। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর দূরত্ব কমে যাচ্ছে। সংবাদপত্রে প্রতিদিন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার ঘটনা পড়ি ; ইতিহাস ও রাজনীতির বই পড়তে হলেও ভৌগোলিক নামগুলি এড়ানো যায় না। দুর্ভাগ্যক্রমে এসব নাম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রায়ই অস্পষ্ট। বিদেশের কথা না হয় বাদ দিলাম। ভারত—

এমনকি পশ্চিমবঙ্গের জেলা মহকুমা এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থানগুলির অবস্থান সম্বন্ধেও আমাদের অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা নেই। একথা অপ্রিয় হলেও সত্য। হাতের কাছে একটি ভৌগোলিক অভিধান থাকলে প্রয়োজন অনুসারে কোনো একটি স্থানের বিবরণ সহজেই জানা যেতে পারে। প্রভাতবাবুর "নব জ্ঞান-ভারতী" সর্বপ্রথম আমাদের এই সুবিধা করে দিল।

পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য স্থানগুলির নাম বর্ণানুসারে বিন্যাস করে তাদের প্রয়োজনীয় বিবরণ দেওয়া হয়েছে এই অভিধানে। স্বভাবতঃই ভারত ও পাকিস্থানের ভৌগোলিক নামগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি জায়গার ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহাসিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব, জনসংখ্যা এবং অন্যান্য তথ্য এই অভিধানে পাওয়া যাবে। দেশ ও মহাদেশগুলির বিবরণ বেশ বিস্তৃত। সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান এবং ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক স্থানগুলির নামও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোনারকের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রভাতবাবু শুধু ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হননি, সংক্ষেপে তিনি কোনারক মন্দিরের ইতিহাস ও শিল্পকলার বিবরণও দিয়েছেন! সেন্সাস রিপোর্ট ও অন্যান্য আকর গ্রন্থ থেকে অধুনাতম তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বাঙলা নামগুলির পাশে বন্ধনীর মধ্যে ইংরাজী নাম দেওয়ায় পাঠকদের বিশেষ উপকার হবে। প্রভাতবাবু বাঙালী পাঠক ও লেখকদের উপকার করেছেন ভৌগোলিক নামগুলির উচ্চারণ বাঙলায় লিপিবদ্ধ করে। ভারতেরই বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক নামগুলির ইংরাজী রূপ দেখে যথার্থ উচ্চারণ কি হবে তা অনুমান করা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রভাতবাবু অনেক পরিশ্রম করে প্রকৃত উচ্চারণ নির্দেশ করেছেন।

সংক্ষেপে তথ্যমূলক বিবরণ কত সুস্পষ্টরূপে পরিবেশন করা যায় প্রভাতবাবু তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ভবিষ্যতে রেফারেন্স গ্রন্থের সংকলক তাঁর পদ্ধতি অনুসরণ করলে উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই।

বলা বাহুল্য, আলোচ্য অভিধানে হয়ত কিছু উল্লেখযোগ্য ভৌগোলিক নাম বাদ পড়েছে, আবার কয়েকটি অপ্রয়োজনীয় নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; হয়ত সুপ্রচলিত রূপ 'উড়িষ্যার' পরিবর্তে 'ওড়িশা' গ্রহণ করা নিয়ে মতভেদ হতে পারে, এবং আরো দু'একটি বিষয়ে মতভেদ হওয়া সম্ভব। কিন্তু তার

ফলে গ্রন্থের মূল্য বা নির্ভরযোগ্যতা বিন্দুমাত্র হ্রাস পাবে না। এ সব ত্রুটি সামান্য। বিদেশে এ জাতীয় গ্রন্থ সম্পাদক মণ্ডলীর দ্বারা সংকলিত হয়। প্রভাতবাবু যে একক চেষ্টায় এরূপ প্রথম শ্রেণীর একটি রেফারেন্স বই রচনা করতে পেরেছেন তা তাঁর পক্ষে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। বইএর সর্বত্র তাঁর পরিশ্রম তথ্যানিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসার স্বাক্ষর সুস্পষ্ঠ। বাঙালী পাঠক, এবং বিশেষ করে বাঙলা দেশের গ্রন্থাগারিকরা, এই ভৌগোলিক অভিধানটির জন্য প্রভাতবাবুর নিকট ঋণ স্বীকার করবেন। বাঙলা দেশের স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শ্রেণীর গ্রন্থাগারে ভৌগোলিক অভিধানটি অপরিহার্য রেফারেন্স বই হিসাবে সমাদৃত হবে বলে আশা করি।

প্রকাশক এরূপ একটি গ্রন্থ প্রকাশের ঝুঁকি গ্রহণ করে তাঁর বাঙালা সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। কয়েকটি প্রয়োজনীয় মানচিত্র ও ইংরেজী বনাম বাঙলা ভৌগোলিক নামে একটি নির্ঘণ্ট দেওয়া হলে বইয়ের উপযোগিতা অনেক বাড়ত।

"নব জ্ঞান-ভারতীর" পরবর্তী নামগুলির জন্য অপেক্ষা করে আছি।

—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেমময় বাংলা ॥ বিনোবা ॥ শ্রীপরমেশ বসু কর্তৃক অনূদিত ॥ সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি ॥ কলিকাতা ॥ ১৯৫৭ ॥ ২২৬ পৃঃ ॥ দেড় টাকা ॥

প্রেমময় বাংলা বিনোবাজীর পঁচিশদিনব্যাপী বাংলাদেশে ভূদানবার্তা প্রচারের সম্পর্কে পঁচিশটি ভাষণ। ভ্রমণের সময় ছিল ১৯৫৫ সালের ১ হতে ২৫ জানুয়ারি। বিনোবাজী প্রথম দিনই বলেছিলেন। "আমি আপনাদের কাছ থেকে কেবল প্রেমদানই চাই।" পঁচিশ দিন ধরে তিনি বিচার আলোচনা করেছেন, কোথাও পুনরুক্তি নাই। প্রথম দিনই বলে নিয়েছিলেন, "প্রতিদিন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য উপস্থিত করব।" তাই তিনি করেছেন; স্থানীয় আপত্তি বা মন্তব্য আলোচনা করেছেন। গ্রাম ও শহরের স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। অহিংসার বাণী সর্বোদয়ের কথা শুনিয়েছেন। ভূদানের সঙ্গে এ সকলের যথার্থ সম্পর্ক সহজ ভাষায় প্রেমের ভাব দিয়ে বুঝিয়েছেন। দৃঢ়ব্রত বিনোবা তাঁর পরিকল্পনা সামনে

রেখে আমাদের চিত্তকে প্রেমের দ্বারা স্পর্শ করতে চেয়েছেন। প্রকাশক সংঘ ভাষণগুলি একত্র করে ছাপিয়ে সাধারণের হিতসাধন করেছেন। আমরা সাধারণত যা এক কাণ দিয়ে শুনি তা আর এক কাণ দিয়ে বেরিয়ে যায়—কিন্তু পুস্তকাকারে প্রকাশিত এই মূল্যবান কথাগুলির আবেদন অত সহজে যাবে না বলে আশা করা যায়। সে আশা কেনই বা করব না? প্রেমের বাণী ব্যর্থ হবে না, এই ভরসাই করব।

—প্রিয়রঞ্জন সেন

বিজ্ঞপ্তি

কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের এলাকাভুক্ত যে সকল সাধারণ গ্রন্থাগার পৌর প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৮-৫৯ সালের গ্রন্থাগার সাহায্যের জন্য আবেদন করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের পৌর প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা বিভাগ হইতে নির্দিষ্ট ফর্ম সংগ্রহ করিয়া আগামী ১৫ই মে, ১৯৫৮ তারিখের মধ্যে আবেদন পত্র জমা দিতে হইবে। পৌর প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার সাহায্যের মুদ্রিত শর্তাবলী ফর্মের সঙ্গেই পাওয়া যাইবে।

সম্পাদকীয়

নবদ্বীপ সম্মেলন

গত ৪ঠা ও ৫ই এপ্রিল নবদ্বীপে দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'ল। মুখ্যতঃ দুটি কারণে এবারের সম্মেলন গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। একটি হ'ল সম্মেলনের মূল সভাপতি হিসাবে ডাঃ রঙ্গনাথনের উপস্থিতি এবং অন্যটি হ'ল বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্বন্ধে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সভাপতির ভাষণ প্রদান ছাড়াও ডাঃ রঙ্গনাথন বাংলাদেশের উপযোগী একটি খসড়া "গ্রন্থাগার আইন" তৈরী করে দিয়েছেন। সম্মেলনে এটির উপর আলোচনা হয়। এ ছাড়া পরিষদের পক্ষ থেকে রাজ্যের বর্তমান জিলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপর একটি প্রবন্ধ সম্মেলনে আলোচনার জন্য পেশ করা হয়। এই দুটির উপর প্রতিনিধিদের আলোচনার ভিত্তিতেই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দুটি গৃহীত হয়েছে।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে প্রয়োজন আছে শুধুমাত্র এই অবিসংবাদী সত্যকে যুক্তি তর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে। গ্রন্থাগার আজ জনমানসে স্বীকৃতি লাভ করেছে। জেলায় জেলায় সরকারী উদ্যোগে গ্রন্থাগার স্থাপনের শুভ সূচনাকে আমরা তাই অভিনন্দন জানিয়েছি।

আমরা গ্রন্থাগারের বিস্তৃতি চেয়েছি। তার অর্থ এই নয় যে এখানে সেখানে নিতান্ত খাপছাড়া ভাবে কতকগুলি গ্রন্থাগার গড়ে উঠুক। বিগত সম্মেলনেই আমরা আদর্শ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপ কেমন হবে সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হয়েছি। আমাদের মূল বক্তব্য তাই ছিল সমগ্র রাজ্যের জন্য স্বয়ং সম্পূর্ণ সুপরিকল্পিত ও সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সৃষ্টি। কিন্তু আমাদের রাজ্যে এখনও পর্যন্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যে রূপ নিয়েছে তাকি এই পর্যায়ে পৌঁছেছে? জেলায় জেলায় সরকারী ব্যবস্থায় যে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে তাকি আমাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে

পারে ? তাই আজ প্রয়োজন হয়েছে বর্তমান অবস্থার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি বলিষ্ঠ রূপ দেওয়া। পরিষদ রচিত জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপর প্রবন্ধ এবং ডাঃ রঙ্গনাথনের খসড়া আইন এই বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করেছে।

পরিষদ রচিত প্রবন্ধ আলোচনান্তে গৃহীত প্রস্তাবে জেলা গ্রন্থাগারগুলির বর্তমান কার্য পদ্ধতি সম্বন্ধে কতগুলি প্রশ্ন সে সম্বন্ধে সামগ্রিক অনুসন্ধানের সুপারিশ করা হয়েছে। এই প্রস্তাবে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এই রাজ্যে জন প্রচেষ্টায় গঠিত ও পরিচালিত যে সমস্ত ছোট বড় গ্রন্থাগারগুলি এতদিন জনসাধারণের পাঠতৃষ্ণা নিবারণ করে আসছে। সমগ্র রাজ্যে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে তারা কি আত্মবিলীন করবে ? জনসাধারণের অর্থে ও প্রচেষ্টার এই বিরাট অপচয় কি সমীচীন ? কিভাবে (জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে) জনসাধারণের অপরিসীম শক্তির এই অভাবের সুযোগ্য স্থান তৈরী করে দিয়ে সামগ্রিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সফল করে তোলা যায় তার উপায়-উদ্ভাবনের সময় আছে।

বর্তমান জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমাজ শিক্ষার আর্থিক বরাদ্দের উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে কেন্দ্রের এই আর্থিক দায়িত্বের সঙ্কোচন ও প্রসারণের উপর রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এই অসহায় অবস্থা স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। উপরন্তু সমাজ শিক্ষা ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে একত্র বেঁধে দেওয়ার ফলে উভয়েরই অগ্রগতি হচ্ছে। সমাজশিক্ষা ও গ্রন্থাগারকে একার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করবার একটা ঝোঁক চেপেছে। ফলে গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন পরিচালনার ক্ষেত্রেও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি ও সংকটের উদ্ভব হয়েছে। ডাঃ রঙ্গনাথনের খসড়া আইনের দুটি অন্যতম ধারা হল, (১) গ্রন্থাগারকে আর্থিক ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবার জন্য কর ধার্য করা এবং (২) গ্রন্থাগারের জন্য পৃথক বিভাগ স্থাপন করা।

প্রথমোক্ত ধারাটি খুবই বিতর্কমূলক। আমাদের দেশে নতুন করে কোন কর ধার্য করবার প্রস্তাব নিশ্চয় অভিনন্দন লাভ করবে না। কিন্তু বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে এবং আমাদের দেশের সরকারী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিগত কয়েক বৎসরের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করে একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে সুসংবদ্ধ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার

জন্য এর প্রয়োজনীয়তা আছে। আর্থিক গুরুত্ব ব্যতীত এই ব্যবস্থার একটা নৈতিক প্রভাবও আছে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য জনসাধারণ যদি একটি নয়া পয়সাও ব্যয় করেন তবে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ বাড়বে। এই প্রসঙ্গে আর দুটি কথা উল্লেখযোগ্য। কর ধার্য করে যত টাকা উঠবে রাজ্য সরকারকে অন্ততঃ তার দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ দিতে হবে। এই অর্থ পৌনঃপৌনিক ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ থাকবে। এককালীন ব্যয়ের জন্য কেন্দ্র অর্থ সাহায্য করবেন। কর ধার্য করার ব্যাপারে সচেতন হয়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে জনসাধারণ একে বোঝা বলে মনে না করেন। সেজন্য অর্থনীতিবিদ এবং আইন সভার সদস্যদের পরামর্শ আবশ্যক। জনকল্যাণের ব্যাপারে দলগত নির্বিশেষে সমস্ত গুণীজনের সমর্থন পাওয়া যাবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করবার প্রথম চেষ্টা হয়েছিল বাংলা দেশে মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের উদ্যোগে ১৯৩০ সালে। সেই আইনের খসড়া তৈরী করে দিয়েছিলেন ডাঃ রঙ্গনাথন। সেদিনের চেষ্টা সফল হয়নি। দীর্ঘ ২৮ বৎসর পরে আবার আমরা আরেকটি খসড়া গ্রন্থাগার আইনসহ ডাঃ রঙ্গনাথনকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি। মাদ্রাজ এবং হায়দ্রাবাদে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করতে গিয়ে ডাঃ রঙ্গনাথন যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেই অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বর্তমান খসড়াটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিশূন্য করবার প্রয়াস পেয়েছেন। এই অভিজ্ঞতা থেকেই গ্রন্থাগারের জন্য একটি পৃথক বিভাগ সৃষ্টি করবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন।

বাংলা দেশ প্রথম উদ্যোগী হয়েও ভারতবর্ষে প্রথম গ্রন্থাগার আইন তৈরী করবার ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারেনি। কুমার মুণীন্দ্রদেবের সেই আশা কি আমরা সফল করতে পারবো ?

গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী

- "গ্রন্থাগার" বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র; প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।
- গ্রন্থাগারের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম সডাক ৩৲ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ।/০ আনা (৩১ নয়া পয়সা)। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণ পত্রিকা বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন।
- সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক ও পত্রিকার জন্য সংবাদ ও প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টরূপে লিখিয়া সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। অমনোনীত রচনা ডাক টিকিট ও ঠিকানাযুক্ত খাম দেওয়া থাকিলে ফেরত দেওয়া হয়।
- পত্রিকা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ পত্রিকার শাখা কার্যালয় ৩৩, হজুরিমল লেনে রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত অন্যান্য দিন সন্ধ্যা ৬৷০ হইতে ৯টার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে।
- "গ্রন্থাগার" সম্পর্কীয় টাকাকড়ি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ১২ (Central Library, The University, Calcutta-12), ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।